পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা

রমাপ্রসাদ দাস

রীডার, দর্শন বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শিবপদ চক্রবর্ত্তী

রীডার, দর্শন বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

মুখবন্ধ

...খানি দর্শনের সাম্মানিক পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত। এতে পাশ্চাত্য ... প্রধানত জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যার, দুরূহ তত্ত্বগুলি যথাসম্ভব বিশদভাবে ও ... করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সহজবোধ্য করতে ... আলোচ্য বিষয়ের যাতে অতিসরলীকরণ না হয় এবং আলোচনার ঈপ্সিত ... বজায় থাকে সেদিকেও নজর রেখেছি।

...নত স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত হলেও, আমাদের বিশ্বাস ...কোনো উৎসাহী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বই পড়ে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি ... ধারণা করে নিতে পারবেন।

এ গ্রন্থে অনুসৃত বানান, যতিচিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন আর পরিভাষা ...র্কে এখানে ...কটা কথা বলে নেবার প্রয়োজন, মনে করছি।

পরিভাষা : আমাদের দার্শনিক সাহিত্যে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পরিভাষা এখনও ...ড়ে ওঠে নি। কাজেই প্রয়োজন মত অনেক পারিভাষিক শব্দ আমাদের ...নিজেদেরই উদ্ভাবন করতে হয়েছে। যে সব পারিভাষিক শব্দ চালু হয়ে গেছে, ...ন্দ না হলেও, অনেক ক্ষেত্রে তা মেনে নিয়েছি (যেমন, 'ভাববাদ')। তবে ... প্রচলিত পারিভাষিক নাম অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তা ...র করেছি (যেমন, 'অভিজ্ঞতাবাদ')।

প্রসঙ্গত, "বাক্য" কথাটি সংস্কৃতে এবং বাংলায় অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত ...য় : "বাক্য" বলতে বিবৃতির শাব্দিক রূপও (সেন্‌টেন্‌স্‌-ও) বোঝায়; আবার ...বৃতি বা উক্তিও (বচন, প্রপোজিশন, স্টেটমেন্ট্‌-ও) বোঝায়। কথাটি আমরা ...াপকতম অর্থে ব্যবহার করেছি, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া "বচন"-এর ব্যবহার ...ড়িয়ে গেছি।

যে সব পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছি তার ইংরেজি প্রতিশব্দ মূল রচনায় ...ণভাবে ব্যবহার করা হয় নি। এতে শিক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা হবার ... নয়, কেননা বাংলাতেই তারা দর্শনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। ... বাংলা পারিভাষিকের চেয়ে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ আরও বেশী সহজবোধ্য— ...া মনে করার কোনো সঙ্গত যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। তারপর ...ষিক শব্দের—সে বাংলা হোক কি ইংরেজি হোক—অর্থ ব্যাখ্যা করে না ... নির্ভুল প্রয়োগ সম্ভব নয়, আর অর্থই যদি ব্যাখ্যা করে দেওয়া ...লে বিকল্প (ইংরেজি) প্রতিশব্দের আর প্রয়োজন কী?

... বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চা করতে হলে এবং বাংলাকে দর্শন আলোচনার ...র তুলতে হলে, ইংরেজি প্রতিশব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত। ... ঠিক যে আমরা, দর্শনের শিক্ষকেরা, ইংরেজির মাধ্যমেই দর্শন

পঠন-পাঠনে আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। এ কথা বিবেচনা করে পাদটীকায় ইংরেজি প্রতিশব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, আর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের এক তালিকা গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

বানান: বিসর্গের ব্যবহারের ব্যাপারে ব্যাকরণের নিয়মশৃঙ্খল কিছুটা করে নিলে ক্ষতি কী? বিশেষত, অন্ত্য বিসর্গ বর্জন করতে কী তারপর, পারিভাষিক শব্দের বেলায়, বিশেষত যে পারিভাষিক পুনঃপুন করা প্রয়োজন সেগুলির বেলায়, অন্তঃপাতী বিসর্গ বর্জন করতে, যথা: পূর্ব পরতঃসাধ্য, স্বতঃসত্য, স্বতঃমিথ্যা—এদের পরিবর্তে যথাক্রমে, 'পূর্বতসিদ্ধ', পর ইত্যাদি লিখতে, কী আপত্তি? যে বৈয়াকরণ নিয়মের শিথিলকরণের করছি, বস্তুত জ্ঞানতত্ত্ব অংশে (প্রথম থেকে একাদশ অধ্যায়) পরীক্ষা ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। আশা করি বৈয়াকরণরা এ নিয়মভ মার্জনা করবেন।

যতিচিহ্ন: প্রাচীন বাংলার পূর্ণচ্ছেদ দুই-দাঁড়ি আজকাল আর ব্যবহৃত না; এ যতিচিহ্নটি গদ্যে ত একেবারেই অচল। কিন্তু গ্রন্থনগত একত্ব দেখাব জন্য ও গ্রন্থনগত অনেকার্থতা এড়াবার জন্য আমরা দুই-দাঁড়িও ব্যবহার করেছি এ বইতে এ যতিচিহ্নটির ব্যবহার সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে: অব্যবহিত পূর্বব কোলন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী দুই-দাঁড়ি পর্যন্ত যা লিখিত তা একই সূত্রে গ্রথিত বলে গণ্য। মানে কোলন ও দুই-দাঁড়ির অন্তর্বর্তী অংশে একই মত, একই ব্যক্তির বক্তব্য, অথবা একই বক্তব্য বা যুক্তি ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করতে হবে॥

উদ্ধৃতিচিহ্ন—প্রয়োগ ও উল্লেখ: উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে—কোনো বক্তার কোনো উক্তি যে অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে তা ঘোষণা করার জন্য, অথবা কোনো পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ যে উল্লেখ করা হয়েছে তা বোঝাবার জন্য। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে যে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তার সম্বন্ধেই এখানে কিছু বলতে চাই। আর তা বলতে গেলে পারিভাষিক "প্রয়োগ" ও "উল্লেখ"-এর পার্থক্যের কথাও প্রথমে বলে নেওয়া দরকার। হাল আমলের ইংরেজি পরিভাষায়, এ পার্থক্য হল "ইউজ" ও "মেন্‌শন্‌"-এর পার্থক্য।

কোনো প্রতীক বা প্রতীকসমষ্টি ব্যবহার করে আমরা কোনো পদার্থ বা ব্যাপার নির্দেশ করি। নব্য যুক্তিবিজ্ঞানের পরিভাষায়: আমরা প্রয়োগ করি পদ ও বাক্য, আর উল্লেখ করি যথাক্রমে পদার্থ ও ব্যাপার। কিন্তু অনেক সময় আমরা শব্দ, পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ সম্বন্ধেও উক্তি করি। এ জাতীয় ভাষাগত 'পদার্থ' সম্বন্ধে: অর্থহীন, সত্য, মিথ্যা, ব্যাকরণসম্মত—প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করি; যথা বলি: "জো" একটা বাংলা শব্দ, "স্বতসত্য" ব্যাকরণসম্মত নয়, "দর্শন কেবল ঈশ্বরালোচনা" এ কথা অসত্য। এ রকম ক্ষেত্রে যুক্তিবৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয়: ঐ শব্দ, বাক্য ইত্যাদি (যেগুলি সম্বন্ধে কোনো উক্তি করা হয়েছে) উল্লেখ করা হল। এখন কোনো শব্দ বাক্য ইত্যাদি যে উল্লেখ করা হয়েছে

(মানে শব্দ বাক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যে, উক্তি করা হয়েছে) তা বোঝাতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের প্রয়োজন। যথা, যদি "মানুষ" শব্দটি সম্বন্ধে উক্তি করি, শব্দটি উল্লেখ করি, এবং বলি যে এ শব্দটি একটি বাংলা শব্দ তাহলে কথাটা এভাবে ব্যক্ত করলে চলবে না: মানুষ বাংলা শব্দ, বলার দরকার: "মানুষ" বাংলা শব্দ। "মানুষ বাংলা শব্দ"—এ জাতীয় উক্তি অসঙ্গত (আমরা মানুষরা কি বাংলা শব্দ?)। সেরূপ: আমি জানি যে ব, কিন্তু তুমি জান না যে ব সত্য—এ বাক্যে দ্বিতীয় ব-কে উদ্ধৃতির চিহ্নের মধ্যে রাখা দরকার।

কিন্তু যেখানে মনে হয়েছে, বিভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই সেখানেই উদ্ধৃতি চিহ্ন পরিহার করেছি; যেমন আমরা: ব সত্য ব মিথ্যা—এ রকম বাক্যও প্রয়োগ করেছি। আবার উদ্ধৃতি চিহ্ন থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে উল্লেখ-করা বাক্য, শব্দ ইত্যাদির আদিতে কোলন ও অন্তে ড্যাস দিয়ে "এ বাক্যটি", "এ বাক্যগুলি" ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণ—অনেকের মতে: এখানে ব্যথা, ওখানে লাল—এসব বাক্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোনো বাক্য যে উল্লেখ করা হয়েছে তা বোঝাবার জন্য বাক্যটি পৃথক ছত্রে মুদ্রিত হয়েছে। উদাহরণ—নব্য দৃষ্টিবাদী মতে:

নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের পাশে যার নাম লেখা রহিয়াছে
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে

—এ বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ বা আক্ষরিক অর্থ নেই, আছে কেবল আবেগব্যঞ্জক অর্থ। স্পষ্টতই এখানে রবীন্দ্রকাব্য থেকে আহরিত বাক্যটি প্রয়োগ করা হয় নি, উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর রচনায় বাক্যটি প্রয়োগ করেছিলেন।

এ বই লিখতে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি "পাঠনির্দেশ"-এতে (339 পৃঃ) সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ পাঠনির্দেশ ঋণ স্বীকার-পত্র বলেও বিবেচ্য।

এ দেশের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি, প্রখ্যাত অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য, এ বইর পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখে দিয়েছেন। এবং বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব ফিলসফির অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে বহু মূল্যবান উপদেশ পেয়েছি। আর দর্শন পরিষদের অধ্যক্ষ ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাহায্য না পেলে এ বই আদৌ প্রকাশিত হত কিনা জানি না। কৃতজ্ঞ চিত্তে এদের অকৃপণ সাহায্যের কথা স্মরণ করছি।

প্রকাশনার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-এর কর্মকর্তা শ্রীঅবনী মিত্রের উৎসাহ, তৎপরতা ও সহৃদয়তার সাধুবাদ না করলে কর্তব্যচ্যুতি হবে; শ্রীমিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আর বিখ্যাত এস. এ্যাণ্টল প্রেসের শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতা ও সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; শ্রীমুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমুখোপাধ্যায় ও তাঁর প্রেসের কর্মীদের তৎপরতার তুলনা হয় না; এদের তৎপরতার ফলে বইটির মুদ্রণ কার্য অতিদ্রুত, প্রায় মাস দেড়েকের মধ্যে, সম্পন্ন হয়েছে।

তবে এদের দুতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা আমাদের পক্ষে সহজ হয় নি। ফলে বইটির দু এক জায়গায় কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। এতে পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়, কেননা ভুলগুলি এমন যে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সংশোধন করে নিতে পারবে।

বাংলা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থের বড় অভাব। আমাদের এ বইখানি যদি সে অভাব কিঞ্চিৎমাত্র দূর করতে পারে, আর প্রধানত যাদের জন্য পুস্তকখানি লিখিত তাদের প্রয়োজন যদি কিছুটা মেটাতে পারে, তাহলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব —মনে করব আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

সব শেষে একটা ঘরোয়া কথা। এ বইর প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম অধ্যায় (সপ্তম বিভাগ বাদে), এবং অষ্টম থেকে একাদশ অধ্যায় রমাপ্রসাদ দাসের রচনা, আর বাকি অংশ শিবপদ চক্রবর্ত্তীর।

কলিকাতা
১০.১১.৭৪

রমাপ্রসাদ দাস
শিবপদ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দর্শনের বিষয়বস্তু

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারণা

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান

চতুর্থ অধ্যায়

সত্যতা

পঞ্চম অধ্যায়

দেশ ও কাল

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্রব্য ও জাতি

সপ্তম অধ্যায়

কারণ

অষ্টম অধ্যায়

দৃষ্টিবাদ, বুদ্ধিবাদ, বিচারবাদ ও স্বজ্ঞাবাদ

নবম অধ্যায়

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ (দৃষ্টসত্ত্ববাদ)

দশম অধ্যায়

বস্তুবাদ

একাদশ অধ্যায়

ভাববাদ

দ্বাদশ অধ্যায়

জড় ও জড়বাদ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাণ ও প্রাণবাদ

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্রমবিকাশ তত্ত্ব

পঞ্চদশ অধ্যায়

মন বা আত্মা

ষোড়শ অধ্যায়

দেহমনের সম্পর্ক

সপ্তদশ অধ্যায়

মূল্য বা ইষ্ট

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিশ্বতত্ত্ব ও ভাববাদ

ঊনবিংশ অধ্যায়

অস্তিবাদ

*

প্রথম অধ্যায়

দর্শনের বিষয়বস্তু

1. দর্শন ও দার্শনিক সমস্যা

দর্শন কী ? দর্শনের বিষয়বস্তু কী ? দর্শনের কী প্রয়োজন ? —এসব প্রশ্নের সহজ উত্তর হল : এ জাতীয় প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে দর্শনের গ্রন্থ পাঠ করার দরকার। দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করলে তবে জানা যাবে দর্শনের বিষয়বস্তু কী, প্রয়োজন কী ॥

মনে হয়, এ উত্তর প্রশ্নকর্তার মনঃপূত হবে না। প্রশ্নকর্তা বলতে পারেন : কিন্তু কোনো শাস্ত্রপাঠের সুরুতে শাস্ত্রটির বিষয়বস্তু কী, এর লক্ষ্য কী—এসব অনুবন্ধ উল্লেখ করাই ত প্রচলিত রীতি। আর আমরা কী পাঠ করতে যাচ্ছি তা কি আগে থেকে জেনে নেওয়া ভাল নয় ?

এ কথার উত্তরে বলব : দর্শন সম্বন্ধে কোনো ধারণা, কোনো প্রত্যাশা, নিয়েই ত আমরা দর্শন পাঠ করতে আসি। দর্শন সম্বন্ধে কোনো ধারণা বা প্রত্যাশা না থাকলে আমরা দর্শন অধ্যয়নে আগ্রহ প্রকাশ করতাম না। এখন, দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করলে তবে বোঝা যাবে আমাদের ধারণা নির্ভুল কিনা, আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হল কিনা ॥

ঐ কথার উত্তরে আরও বলব : এ কথা ঠিক নয় যে, সব শাস্ত্রকারেরা তাঁদের শাস্ত্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা ক'রে, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজন নির্দেশ ক'রে, তবে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানীরা কি তাদের গ্রন্থের সূচনায়, বিজ্ঞান কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করেন ? পদার্থবিজ্ঞানের গ্রন্থে কি পদার্থবিজ্ঞানের প্রকৃতি, গণিতের গ্রন্থে কি গণিতের প্রকৃতি বা প্রয়োজন, সম্বন্ধে আলোচনা থাকে ? ত বিজ্ঞানীরা এ জাতীয় আলোচনা না করে, সরাসরি বৈজ্ঞানিক সমস্যা তুলে সমাধান করার চেষ্টা করেন, আবিষ্কৃত তথ্য উল্লেখ করেন, রচিত নিয়ম ্যা ও প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান কী —এটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা পদার্থবিজ্ঞান কী —এটা পদার্থবিজ্ঞানের আন্তর সমস্যা নয়, বাহ্য সমস্যা। ার্থবিজ্ঞানের স্বরূপ কী ? —এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারলেও কোনো ব্যক্তি প ্থবিজ্ঞানী হতে পারেন। কোনো কর্মে —যথা, বৈজ্ঞানিক কর্মে, শিল্পকলা ক ্ সার্থকভাবে ও সফলভাবে লিপ্ত হওয়া এক কথা, আর কর্মটির প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞা থাকা অন্য কথা। কাব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেও কাব্যকর্মে লিপ্ত হওয়া যায়, কবিখ্যাতি অর্জন করা যায়। অন্যান্য শিল্পকলাবিদ্ সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা খাটে। সেরূপ, ইতিহাস কী —এটা ঐতিহাসিক সমস্যা বা ইতিহাসের আন্তর সমস্যা নয়, ইতিহাসের দিক থেকে এটা বাহ্য সমস্যা। বিজ্ঞানী, শিল্পী, ইতিহাসবিদ্,—এ'রা ত কেউ তাদের আলোচ্য শাস্ত্রের স্বরূপ আলোচনা করার

প্রয়োজন বোধ করেন না, বা তাঁদের এ জাতীয় আলোচনা করা উচিত —এ দাবীও কেউ করে না। বিজ্ঞানীদের যদি বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার দায়িত্ব না থাকে তাহলে দার্শনিকেরই বা দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করার দায়িত্ব থাকবে কেন? বিজ্ঞানী যদি এরূপ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে তাহলে দার্শনিকই বা অনুরূপ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না কেন?

আমরা যে উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছি তার আসল হেতু হল এই: দর্শন কী —এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আর দার্শনিকরাও সাধারণত এ প্রশ্ন না তুলে সরাসরি কোনো দার্শনিক সমস্যা আলোচনা করেন, তাদের দার্শনিক বক্তব্য পেশ করেন। তারপর যারা দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন তাদের মধ্যে ঐকমত্য খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন, এমন কি পরস্পরবিরুদ্ধ, লক্ষণ দিয়েছেন। দর্শনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যেসব উক্তি করা হয়েছে, নমুনা হিসাবে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

দর্শনের লক্ষ্য হল শাশ্বতের জ্ঞান, বস্তুর সারধর্মের জ্ঞান।
এবং দার্শনিক হলেন সর্বকাল ও সর্বসত্তার দ্রষ্টা॥ —প্লেটো
দর্শন হল জ্ঞানবিষয়ক বিজ্ঞান, জ্ঞানের সমালোচনা। —কান্ট্
দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। —কোঁৎ
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করাই দর্শনের লক্ষ্য। —হারবার্ট স্পেন্সার
দর্শন হল ভাষা-সমালোচনা।
দর্শন কোনো তত্ত্বের সমষ্টি নয়, দর্শন এক প্রকারের ক্রিয়া॥ —উইট্গেন্স্টাইন্

উপরোক্ত প্রায়-পরস্পরবিরোধী লক্ষণগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে দর্শনের সর্বজন-গ্রাহ্য কোনো লক্ষণ দেওয়া সহজ নয় (হয়ত সম্ভবও নয়)। প্রখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে যখন এমন তীব্র মতভেদ তখন আমরা যে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষণ দিতে পারব এটা দুরাশা বলে মনে হয়। তারপর উক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঙ্গত কোন্‌টি অসঙ্গত, বা কোনোটিই সঙ্গত কিনা, এদের দোষ গুণ কী —এসব আলোচনা করতে গেলে দর্শন আলোচনা স্থগিত রেখে দর্শনের দর্শন করতে হয়। পরে দেখব, দর্শন কাকে বলে এ আলোচনাও একটা দর্শন, অনেক নব্য দার্শনিক এ দর্শনকে দর্শনবিষয়ক দর্শন বলে অভিহিত করেন। কিন্তু আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় দর্শন, দর্শনবিষয়ক দর্শন নয়। তাছাড়া, দর্শনবিষয়ক দর্শন সম্বন্ধেও দার্শনিকদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। কাজেই দর্শনের প্রকৃতি আলোচনা করেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

তবে "দর্শন"-এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। কেননা কাদের দার্শনিক আখ্যায় অভিহিত করা যায়, কী জাতীয় গ্রন্থ দার্শনিক গ্রন্থ, কী জাতীয় উক্তি দার্শনিক উক্তি সে সম্বন্ধে অনেকটা ঐকমত্য দেখা যায়। যথা, এটা সর্বজনস্বীকৃত যে প্লেটো, আরিস্টটল্, হেগেল্, কান্ট্ যেমন দার্শনিক, সেরূপ এদের দার্শনিক মতের যারা তীব্র বিরোধিতা করেন তারাও, যথা—হিউম্, রাসেল্, উইট্গেন্স্টাইন্ এরাও, দার্শনিক। এরা সবাই দার্শনিক ঠিক, কিন্তু এদের মধ্যে "পারিবারিক সাদৃশ্য" ভিন্ন অন্য কোনো ব্যাপক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত।

একই পরিবারের লোকের মধ্যে —যথা, ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে— একজন লম্বা একজন বেঁটে, একজন ফর্সা একজন কাল, একজন বুদ্ধিমান একজন বোকা, হলেও এদের মধ্যে একটা মিল, পারিবারিক সাদৃশ্য, খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যেও এরূপ ক্ষীণ সাদৃশ্য বর্তমান। ক্রিকেট খেলা, ফুটবল্ খেলা, তাস খেলা, পেশেন্‌স্ খেলা (নিজে নিজে তাস মেলানো)—এসবই খেলা ; কিন্তু এদের মধ্যে কী সাদৃশ্য তা স্পষ্ট করে বলতে পারি না। সেরকম, ঈশ্বর আলোচনা ধর্মালোচনাও দর্শন ; আবার ঈশ্বরালোচনা ধর্মালোচনা অর্থহীন —এটা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে যে আলোচনা করা হয় তাও দর্শন। সমগ্রসত্তা সম্বন্ধে আলোচনাও দর্শন, আবার ভাষাবিশ্লেষণও দর্শন বলে স্বীকৃত হয়। " দর্শন হল শাশ্বতের জ্ঞান " এটা যেমন দার্শনিক উক্তি, সেরকম " শাশ্বতবিষয়ক উক্তি মাত্রই অর্থহীন শব্দবিন্যাস" এ উক্তিও দার্শনিক উক্তি বলে স্বীকৃতি পায়। অথচ উক্তরূপ উক্তি বা আলোচনার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। যা বলা হল তার থেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্য প্রতিপন্ন হয়, ঠিক ; কিন্তু এত উদার-ভাবে বা ব্যাপকভাবে " দর্শন " কথাটি প্রয়োগ করলে " দর্শন "-এর সংজ্ঞা রচনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে। প্রাচীনকালে জ্ঞানা-সক্তিকেই দর্শন বলা হত। এটাই " ফিলসফি"র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। প্রসঙ্গত, কথিত আছে যে, গ্রীক্ দার্শনিক পাইথাগোরাস্-ই প্রথম (কারও কারও মতে, সক্রেটিস্-ই) নিজেকে ফিলসফার বা জ্ঞানাসক্ত বলে বর্ণনা করেন। এ অর্থে যে কোনো বিষয়ের মননশীল আলোচনা,—বিদ্যা, শাস্ত্র বা বিজ্ঞান —"দর্শন" পদবাচ্য। পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্যসমালোচনা —এ সবই দর্শন। নিউটন্-এর বিখ্যাত (পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক) গ্রন্থের নাম " প্রাকৃতদর্শনের সূত্রাবলী "। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও পদার্থবিজ্ঞান প্রাকৃত দর্শন নামে অভিহিত হয়। পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার নাম " দর্শন "। যে কোনো বিষয়ে— ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে— গবেষণা করলে এখনও 'ডকটর অব ফিলসফি' উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানকালে "দর্শন" কথাটি অনেক সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন বিজ্ঞানের, বৈজ্ঞানিক কর্ম আর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের, স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়। গৃহীত সংকীর্ণ অর্থে—বিজ্ঞান দর্শন থেকে ভিন্ন, বৈজ্ঞানিক কর্ম ও দার্শনিক কর্ম ভিন্ন, বৈজ্ঞানিক উক্তি ও দার্শনিক উক্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। তবে "দর্শন"-এর সংকীর্ণ অর্থটি কী তাও নির্দিষ্টভাবে বলা সহজ নয়। এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্টভাবে কেবল এ কথাই বলা যায় : " দর্শন "-এর সংকীর্ণ অর্থে কোনো বিজ্ঞানই দর্শন বলে গণ্য হতে পারে না। " দর্শন " কথাটির অর্থ কিছুটা পরিচ্ছিন্ন হল ঠিক, কিন্তু এ কথাটির প্রাচীন ব্যবহারের মধ্যে যে ব্যাপকতা ও অনির্দিষ্টতা ছিল তা এখনও " দর্শন " কথাটিতে কিছুটা লেগে আছে। সংকীর্ণ অর্থে—মানব জীবনের লক্ষ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরতা—এসব নিয়ে আলোচনা দর্শন বলে পরিগণিত হয় ; আবার, এরূপ আলোচনা করতে গিয়ে যে সব উক্তি করা হয় সে সব উক্তি অর্থহীন, দর্শনের কাজ উক্তরূপ আলোচনার অসারতা বা অর্থহীনতা

দেখানো, বা দর্শনের কাজ কেবল ভাষাবিশ্লেষণ —এ মতবাদও " দর্শন "-এর সংকীর্ণ অর্থেই দার্শনিক মতবাদ বলে গণ্য হয়। কাজেই সংকীর্ণ অর্থে দর্শন বলতে কী বোঝায় তা বলাও সহজ নয়।

দর্শনে কী জাতীয় সমস্যা আলোচিত হয়, কিরূপ সমস্যা দার্শনিক সমস্যা বলে পরিগণিত হয়, তা আলোচনা করলে দর্শনের বিষয়বস্তুর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। কাজেই " দর্শন "-এর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করে দার্শনিক সমস্যার নমুনা হিসাবে কয়েকটি সমস্যা উল্লেখ করা যাক :

জীবনের লক্ষ্য কী, তাৎপর্য কী? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ? আত্মা কী? আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে নাকি আমরা যন্ত্রবৎ? ঈশ্বর বলে কিছু আছে কি, এ জগতের কোনো স্রষ্টা আছে কি? ইন্দ্রিয়ানুভবে যে জগৎ দেখতে পাই তার পরম সত্ত্ব আছে? নাকি এ জগৎ স্বপ্ন মায়া বা মতিভ্রম? ভাল মন্দ বলতে কী বোঝায়? ভাল মন্দ কি বাস্তব পদার্থের ধর্ম? নাকি এসব আমাদের মনের সৃষ্টি? সৌন্দর্য কী? জ্ঞান কী? বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ কি জ্ঞানে ধরা দেয়? বস্তুস্বরূপ অজ্ঞেয় নয় ত? কাল কী পদার্থ? অভাব বলে কোনো বাস্তব পদার্থ আছে কি নেই? সত্য কী? বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞান কি প্রকৃত সত্তার জ্ঞান দিতে পারে? "আমি জানি" বলতে কী বোঝায়? দর্শন কী? দার্শনিক সমস্যা কাকে বলে?

লক্ষণীয় যে, কোনো বিজ্ঞানে এসব সমস্যা আলোচিত হয় না। জীবন ও জগতের এমন কোনো বাস্তব দিক নেই যা কোনো না কোনো বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়; কিন্তু কোনো বিজ্ঞানই উক্তরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করে না। বিজ্ঞান সত্যের সন্ধান করে, কিন্তু সত্য কী এ প্রশ্ন তোলে না। বিজ্ঞানের লক্ষ্য জ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞান জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে বা জ্ঞানশক্তির সামর্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে না। তারপর বিজ্ঞান বিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলে না, ইতিহাস ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করে না। সত্য কী, জ্ঞান কী, বিজ্ঞানের স্বরূপ কী, ইতিহাসের স্বরূপ কী—এসব প্রশ্ন কোনো বিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয় নয়। কাজেই এমন বিদ্যা বা শাস্ত্র থাকার কথা বা থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে এ জাতীয় প্রশ্ন আলোচিত হবে। দর্শন হল এমন বিদ্যা। এহেন কোনো অ-বৈজ্ঞানিক বা অতি-বৈজ্ঞানিক সমস্যা নেই যা দর্শনের আলোচ্য বিষয় নয়। লক্ষণীয়, বিজ্ঞান কী এটা যেমন দর্শনের আলোচ্য বিষয়, দর্শন কী, দর্শন আদৌ সম্ভব কিনা—এসবও দর্শনের আন্তর সমস্যা ॥

2. দর্শন ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান কী তা আমরা সবাই মোটামুটি জানি। বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে দর্শনের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম : বিজ্ঞানীর যদি বিজ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনার দায়িত্ব না

থাকে তাহলে দার্শনিককেই বা দর্শনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে হবে কেন? এখন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

(1) বিজ্ঞান কী এটা বিজ্ঞানের আন্তর সমস্যা নয়, বৈজ্ঞানিক সমস্যা নয়; কিন্তু দর্শন কী, এমন কি দর্শন সম্ভব কিনা —এসব দার্শনিক সমস্যা, দর্শনের আন্তর সমস্যা। এখানেই দর্শন ও বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। বিজ্ঞানের প্রকৃতির আলোচনা বৈজ্ঞানিক আলোচনা নয়, দার্শনিক আলোচনা; কিন্তু দর্শনের প্রকৃতির আলোচনাও দার্শনিক আলোচনা। প্রত্যেক বিজ্ঞানের কতকগুলি বাহ্য সমস্যা থাকে; যথা, পদার্থবিজ্ঞান কী —এটা পদার্থবিজ্ঞানের বাহ্য সমস্যা। কোনো বিজ্ঞানেরই স্বরূপ সংক্রান্ত সমস্যা সে বিজ্ঞানের (বা অন্য কোনো বিশেষ বিজ্ঞানের) আন্তর সমস্যা নয়, বাহ্য সমস্যা। এসব বাহ্য সমস্যা যে বিদ্যায় আলোচিত হয় তার নাম দর্শন। তাহলে বলতে পারি ঃ

যে বিদ্যার স্বরূপ আলোচনাও সে বিদ্যার আন্তর সমস্যা তার নাম দর্শন।

(2) কোনো বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কী তা বলা সহজ। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে —জীববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু জীবজগৎ, পদার্থবিজ্ঞান পদার্থ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মন। কিন্তু দর্শনের বিষয়বস্তু কী তা বলা কঠিন। আর "বিষয়বস্তু" বলতে যদি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়, বাস্তব জগতের কোনো বিভাগ, বোঝায় তাহলে বলতে হয় ঃ দর্শনের কোনো বিষয়বস্তু নেই। তবে "বিষয়বস্তু" কথাটি আরও ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়; এ অর্থে—"বিষয়বস্তু" মানে ঃ চিন্তার বিষয়, যা চিন্তা করা হয়। এ অর্থে দর্শনের অবশ্যই একটা বিষয়বস্তু আছে।

দর্শনের অন্যতম বিষয়বস্তু হল ঃ বিভিন্ন বিজ্ঞানে অনুসৃত পদ্ধতি, পূর্বস্বীকৃতি (সত্য বা স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত বাক্য) বা ধারণা —যেগুলি বিজ্ঞানের বাহ্য বিষয়। বিজ্ঞান যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য —বিজ্ঞানে যেসব বাক্যের সত্যতা বিনা প্রমাণে মেনে নেওয়া, যেসব ধারণা প্রয়োগ করা হয়, তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যও—একটি শাস্ত্রের দরকার। এ শাস্ত্রের নাম দর্শন। যথা, বিজ্ঞানে নিরীক্ষণ পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, কারণিকতা নীতিটি অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়, দেশ, কাল —এসব ধারণা যথার্থ বলে মেনে নেওয়া হয়। দর্শন বিজ্ঞানে-ব্যবহৃত পদ্ধতির যাথার্থ্য আলোচনা করে। দেশ কাল এসব ঠিক কী বোঝায়, দেশ কাল বলে বাস্তব কোনো পদার্থ আছে কিনা —এ সব প্রশ্ন বিজ্ঞানে আলোচিত হয় না, আলোচিত হয় দর্শনে।

দর্শনে যে সামান্য ধারণাগুলি আলোচিত হয় বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে তুলনা করে তাদের দার্শনিক ধারণা বলে চিহ্নিত করা যায়। যথা, অবদমন, অবচেতন, বেগ, ত্বরণ, আস্রবন, কেলাসন, রাসায়নিক প্রশমন —এসব বৈজ্ঞানিক ধারণা। কিন্তু কারণতা, নিয়ম, পদার্থ, সত্যতা, সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা, সত্তা, অর্থ (বাক্যার্থ, পদার্থ), মিথ্যাত্ব, জ্ঞান —এসব দার্শনিক ধারণা; দর্শনের আলোচ্য বিষয় —এ অর্থে দার্শনিক ধারণা। বিজ্ঞান উক্তরূপ সামান্য ধারণাগুলি বিচার বিশ্লেষণ

না করেই প্রয়োগ করে। দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল এ জাতীয় ধারণার বিশ্লেষণ ও স্পষ্টীকরণ।

(3) বলা হয়েছে: বিজ্ঞানের বাহ্য সমস্যাগুলি দর্শনের আন্তর সমস্যা। এ উক্তি থেকে এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, দর্শন তার বিষয়বস্তু কেবল বিজ্ঞান থেকেই আহরণ করে, বিজ্ঞানের উৎপত্তি না হলে দর্শনের উদ্ভব হত না—দার্শনিক সমস্যা থাকত না। কিন্তু আগেই দেখেছি, দর্শন থেকেই বিভিন্ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি। দেখেছি, এখন যা পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতির আলোচ্য বিষয় বলে পরিগণিত হয় এককালে এসব বিষয় নিয়ে দার্শনিক জল্পনা কল্পনা হত। অপরিণত দশায় এ বিদ্যাগুলি দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকের পূর্বে "সায়েনস্" বা "বিজ্ঞান" কথাটির প্রচলন সুরু হয়নি। কিন্তু যখন কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বা পরীক্ষণনিরীক্ষণযোগ্য, যাচাইযোগ্য, সিদ্ধান্তে আসা গেছে তখনই সে বিষয়টি কোনো বিশেষ বিজ্ঞান নামে চিহ্নিত হয়েছে, স্বতন্ত্র বিদ্যা বলে গণ্য হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন বিদ্যা দর্শনের আওতা থেকে বেরিয়ে এসেছে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে—এবং এভাবে আস্তে আস্তে দর্শনের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে এবং "দর্শন" কথাটি ক্রমশ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যাদের দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক তাদের লক্ষ্য হল দর্শনের বিজ্ঞানীকরণ—দর্শনের কোনো বিভাগ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট যাচাইযোগ্য তথ্য আহরণ, ও নিয়ম প্রণয়ন, করে দর্শনের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা। সমাজবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান —এসব কিছুকাল আগেও দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল; এখন এসব স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অনেকে দাবী করেন, নীতিবিদ্যাও (যা এখনও সাধারণত দর্শনের অংশ বলে গণ্য হয়) সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গ, সুতরাং দর্শন নয়, বিজ্ঞান বলে গণ্য।

কেউ কেউ, যথা মার্কিন দার্শনিক উইলিয়ম্ জেমস্, মনে করেন দর্শনের ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানীকরণের ফলে—দর্শনের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ ক'রে দর্শনের আওতা থেকে বেরিয়ে যাবার ফলে— একদিন দর্শন, বিজ্ঞানে শতধাবিভক্ত হয়ে, নিঃশেষিত হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, জেমস্-এর মতে: যে সব জিজ্ঞাসার এখন সদুত্তর (বৈজ্ঞানিক উত্তর) পাওয়া যায় নি তার আলোচনাই দর্শন॥ কিন্তু উক্ত আশা বা আশঙ্কা অমূলক। কেননা: প্রত্যেক বিজ্ঞানের কিছু বাহ্য সমস্যা থাকবেই। এসব দর্শনের আন্তর সমস্যা। অন্তত এসব বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যা দর্শনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত থাকবে॥ আর বিজ্ঞানে-ব্যবহৃত সামান্য ধারণার, যথা কারণ, দেশ কাল, দ্রব্য—এসব ধারণার, জ্ঞান, সত্যতা, সম্ভাব্যতা, অবশ্যম্ভবতা —এসব ধারণার, বিশ্লেষণ নিয়েই দার্শনিক ব্যাপৃত থাকতে পারেন। তাছাড়া, দর্শন যে কেবল বিজ্ঞান থেকেই সমস্যা আহরণ করে তা নয়। বিজ্ঞানে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগ নিয়ে, বিশেষ প্রকারের কর্ম নিয়ে (যথা পূর্তবিদ্যায়, বাস্তুবিদ্যায়), বিশেষ বিমূর্ত বিষয় নিয়ে (যথা গণিতে),

আলোচনা করা হয়। কিন্তু দর্শনের জিজ্ঞাসা অনেক ব্যাপক। যথা, এ জগতের প্রকৃত সত্তা আছে কি না, স্বয়ংসৎ পদার্থের জ্ঞান সম্ভব কিনা, জ্ঞান কী—এ জাতীয় প্রশ্ন কোনো বিশেষ বিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয় নয়, এসব দর্শনের আলোচ্য। তারপর দর্শন—দর্শন ও বিজ্ঞানের, দর্শন ও ধর্মের, বিজ্ঞানও প্রাত্যহিক জীবনের বিশ্বাসসমূহের, সম্পর্কও আলোচনা করে। এসবও কোনো বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়। কাজেই দর্শনের অন্তর্গত বিষয়গুলি বিজ্ঞানে উন্নীত হয়ে দর্শনের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এলেও দর্শনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার কথা নয়।

(4) ওপরে যা বলা হয়েছে তার থেকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বাক্যের পার্থক্য এবং দার্শনিক বাক্যের বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট যাচাইযোগ্য তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কৃত হলে বিষয়টি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের রূপ নেয়। যা যাচাইযোগ্য তাই বৈজ্ঞানিক বাক্যের মর্যাদা পায় ("বৈজ্ঞানিক বাক্য" কথাটির ব্যাপক অর্থে)। ফলে, দার্শনিক বাক্য যাচাইযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না। আর দর্শন যে জাতীয় বিষয় সম্বন্ধে উক্তি করে সে সব বিষয়ে যাচাইযোগ্য সুনির্দিষ্ট বাক্য পাওয়া সম্ভব নয়। যথা—ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা; বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না, বস্তু-প্রতিরূপের জ্ঞান হয়; যে বাক্যের সঙ্গে বাক্যবর্ণিত ব্যাপারের আনুরূপ্য আছে সে বাক্য সত্য—এসব উক্তি যাচাইযোগ্য হতে পারে না। কেননা তথ্য বলতে যদি কোনো অনুভবগম্য ব্যাপার বোঝায় তাহলে দার্শনিক বাক্য তথ্যজ্ঞাপক নয়, সুতরাং এদের যাচাইকরণের কথাও ওঠে না। একটা উদাহরণ।

জল ৩২ ডিগ্রি ফারেন্‌হাইটে বরফে পরিণত হয়

—এ বাক্য সত্য, কেননা এ বাক্যের সঙ্গে বাক্যবর্ণিত ব্যাপারের আনুরূপ্য আছে। এ বাক্যটি সুনির্দিষ্ট ও যাচাইযোগ্য, সুতরাং এটি একটি বৈজ্ঞানিক বাক্য। কিন্তু যে সূত্রের উপর নির্ভর করে বলা হল যে উক্ত বাক্যটি সত্য সে সূত্রটি, মানে—

যে সব বাক্য বর্ণিত-ব্যাপারের অনুরূপ সে সব বাক্য সত্য

—এ বাক্যটি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বাক্য নয়। এ বাক্যের যাচাইকরণ সম্ভব নয়। প্রথম বাক্যটিতে একটি জাগতিক ব্যাপার (জলের বরফে পরিণত হওয়া) বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু শেষোক্ত বাক্যটিতে কোনো জাগতিক ব্যাপার বর্ণিত হয় নি। জলের বরফে পরিণত হওয়া যেমন-ব্যাপার, বাক্যের সঙ্গে ব্যাপারের আনুরূপ্য থাকা তেমন-ব্যাপার নয়। শেষোক্ত (দার্শনিক) বাক্যটি—জাগতিক ব্যাপার সংক্রান্ত বাক্য নয়, বলা যায়—বাক্য ও ব্যাপারের সম্বন্ধ সংক্রান্ত।

নব্য ইংরেজ দার্শনিক এয়ার বলেন: দার্শনিক বাক্য বিশেষ-ব্যাপার-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ কোনো বিশেষ ব্যাপারের উপর দার্শনিক বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ভর করে না। দুটি পরস্পরবিরোধী বৈজ্ঞানিক বাক্যের মধ্যে কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা, প্রাসঙ্গিক ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করে (বা গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে) তা নির্ণয় করা যায়। দেখানো যায়: প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বিজ্ঞানীদের বিরোধের হেতু। প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হলে বৈজ্ঞানিক বিরোধের নিষ্পত্তি

হয়। কিন্তু এভাবে দার্শনিক মতবিরোধের নিষ্পত্তি হয় না। দার্শনিকরা প্রশ্ন তোলেন—মন কী, জীবন বা প্রাণ কী? এমন নয় যে: মনোবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞান কোনো তথ্য দেখিয়ে এসব প্রশ্নের সমাধান করতে পারবে, বা এ জাতীয় তথ্যের অজ্ঞতা হেতুই দার্শনিকরা উক্তরূপ সমস্যার সম্মুখীন হন। দার্শনিকরা জানেন মনোবিজ্ঞান মন সম্বন্ধে, জীববিজ্ঞান প্রাণ সম্বন্ধে, কী বলে; কিন্তু তবু তারা উক্তরূপ প্রশ্ন তোলেন। একটা উদাহরণ। জ্ঞান কী—এ প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন দার্শনিক-উক্তি করা হয়েছে, যথা—

জ্ঞান হল নির্ভুল বিশ্বাস

জ্ঞান হল নিশ্চিতিবোধ

জ্ঞান বলে কিছু নেই: "আমি জানি যে এ পৃষ্ঠাটি বাংলায় লেখা"
—একথা বললে কেবল এ উক্তি করা হয় যে
"এ পৃষ্ঠাটি বাংলায় লেখা"

জ্ঞান অনির্বাচ্য, যার জ্ঞান হয়নি তাকে বোঝানো যাবে না জ্ঞান কী
—এ উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য বা কোনোটিই সত্য কিনা, পরীক্ষণ নিরীক্ষণ দিয়ে বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, "জল পড়ে, পাতা নড়ে" এ বাক্যের সত্যতা যেমন-ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এ বাক্যের সত্যতা তেমন-ভাবে নির্ণয় করা যায় না, হয়ত আদৌ নির্ণয় করা যাবে না।

(5) আমরা বলেছি: বিজ্ঞান আর দর্শনের বিষয়বস্তু ভিন্ন, বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে, দর্শনের নেই। যা কোনো বিজ্ঞানেই আলোচিত হয় না তাই দর্শনের আলোচ্য বলে গণ্য হতে পারে॥ কিন্তু একথাও বলা যায় যে—দর্শন আর বিজ্ঞানের (বা শিল্পকলার) পার্থক্য মূলত পদ্ধতির পার্থক্য। দর্শনে ও কোনো বিজ্ঞানে একই বিষয় সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে। যথা, মন কী, সংবেদনের কী স্বরূপ —এসব প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানেও আলোচিত হয়, দর্শনেও আলোচিত হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা-পদ্ধতি ভিন্ন।

বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের মত দর্শনেও কোনো বাক্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করা হয়, নানারূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়। কিন্তু দার্শনিক যুক্তি অবরোহী যুক্তিও নয়, আবার আরোহী যুক্তিও নয়। কোনো দার্শনিক বাক্য গাণিতিক বা জ্যামিতিক বাক্যের মত প্রমাণিত হতে পারে না। আবার দার্শনিক বাক্য নিরীক্ষণ পরীক্ষণ দিয়ে বা আরোহী যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাহলে দার্শনিক পদ্ধতি কী?

3. দার্শনিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী? দার্শনিক পদ্ধতি বলে স্বতন্ত্র কোনো পদ্ধতি আছে কি? প্লেটো ও হেগেল্ মনে করতেন দার্শনিক পদ্ধতি বলে

স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতি আছে। এ'রা দুজনই এ পদ্ধতিকে একই নামে ("দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি" নামে) অভিহিত করেছেন, কিন্তু দার্শনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ বলেন: সত্য বুদ্ধিগম্য নয়, বোধি বা স্বজ্ঞা বলে এক বিশেষ প্রকারের সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে ('বৌদ্ধিক সহানুভূতি'তে) দার্শনিক সত্য ধরা দেয়। উইট্‌গেন্‌স্টাইনের মতে দার্শনিক পদ্ধতি হল: অর্থহীনতা উদঘাটন (যথা, অতীন্দ্রিয় জগৎ সংক্রান্ত বাক্যের অর্থহীনতা প্রদর্শন), শ্লিক্ ও এয়ার-এর মতে—ধারণা-বিশ্লেষণ ও ধারণা স্পষ্টীকরণ, হুসারল্-এর মতে—অবভাস বর্ণন বা সারধর্ম বর্ণন। স্পীনোজা মনে করতেন, দার্শনিকদের জ্যামিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত; আর হিউম্-এর মতে এবং রাসেল্-এর মতে—দর্শনেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, দার্শনিকরা বস্তুত নানান প্রকারের যুক্তি বা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। যথা, কেউ জ্যামিতিক যুক্তির মত যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। কেউ বা কোনো প্রকল্প খণ্ডন করতে গিয়ে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, কখনও কখনও দার্শনিকরা ভাষার অনেকার্থতা দেখিয়েছেন, ভাষা বিশ্লেষণ করে কোনো তত্ত্ব খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন॥ আবার এও দেখি যে, কোনো দার্শনিক যে পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন তিনি নিজেই সব সময় তা অনুসরণ করেন নি। যথা, হিউম্ যে কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই প্রয়োগ করেছেন, বা তার যুক্তিগুলি যে কেবল অনুভবনির্ভর—একথা বলা যায় না। আর উইট্‌গেন্‌স্টাইনের রচনায় যে কেবল অর্থহীনতা উদঘাটন প্রচেষ্টা দেখা যায় তা নয়।

দার্শনিক পদ্ধতি কী তা নির্দিষ্টভাবে বলা শক্ত। তবে মনে হয়, দার্শনিক পদ্ধতি বলে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। দার্শনিকরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। দর্শন ভিন্ন অন্য বিদ্যায় যে সব পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় দার্শনিক পদ্ধতিকে তার থেকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় পদ্ধতি হতে হবে—এমন কথা নেই। তবে কোনো কোনো প্রকারের যুক্তি কেবল দর্শনালোচনার বৈশিষ্ট্য—যথা অনবস্থা প্রদর্শন, বাক্য ও বাক্যের বৈয়াকরণ রূপের বিশ্লেষণ। কিন্তু দার্শনিক তার সুবিধামত যে কোনো স্বীকৃত যুক্তিপদ্ধতি বা বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

একথা মনে রাখার দরকার, পূর্ববর্তী দার্শনিকরা যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন তার কোনো কোনোটি এখন অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে: স্বতঃসত্য কোনো বাক্য থেকে অবরোহ প্রক্রিয়ায় দার্শনিক সত্য নিষ্কাশন করা যায় না। এ কথাও প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে: প্রাকৃত বিজ্ঞানে যে পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় তা দর্শনে প্রযোজ্য নয়। উক্তরূপ নেতিবাচক উক্তি ছাড়া দার্শনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব হল না। দার্শনিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলে, প্রখ্যাত দার্শনিকদের গ্রন্থ পাঠ করলে, তবেই দার্শনিক পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

4. জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা

দর্শনে যেসব বিষয়ের আলোচনা হয় সেগুলি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি বিষয়ের আলোচনাকে অধিবিদ্যা[1] বা তত্ত্ববিদ্যা বলে, আর কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা জ্ঞানতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। এ বইর প্রথম দিকে জ্ঞানতত্ত্ব, আর শেষের দিকে অধিবিদ্যা, আলোচিত হবে।

জ্ঞানতত্ত্ব

"জ্ঞানতত্ত্ব" নামটি থেকেই বোঝা যায় দর্শনের এ বিভাগটির প্রধান আলোচ্য জ্ঞান। জ্ঞান কী? জ্ঞানের উৎস কী? স্বরূপ কী?—এসব প্রশ্ন আলোচিত হয় দর্শনের জ্ঞানকাণ্ডে বা জ্ঞানতত্ত্বে। জ্ঞান প্রসঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা, বিশ্বাস অনুভব—এ সবের কথা ওঠে। ওঠে জ্ঞানের প্রকারভেদের কথা। অনুভব ও বুদ্ধি ছাড়া জ্ঞানের অন্য উৎস আছে কিনা, থাকলে তার স্বরূপ কী—এসবও জ্ঞানতত্ত্বের আলোচ্য। তারপর ইন্দ্রিয়ানুভবে বা বুদ্ধিতে যা পাই না তারও জ্ঞান হতে পারে কিনা, কোনো জ্ঞান নিঃসন্দিগ্ধ বা অবশ্যম্ভব বলে গণ্য কিনা, জ্ঞানের সীমারেখা টানা যায় কিনা বা কোথায় টানব—এসবও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা।

অধিবিদ্যা

অধিবিদ্যাসংক্রান্ত প্রায় সব কিছুই বিতর্কমূলক। যারা নিজেদের অধিবিদ্যাবিদ্ (সংক্ষেপে, অধিবিদ্) বলে বর্ণনা করেন তাদের নিজেদের মধ্যেও অধিবিদ্ হিসাবে তাদের কী কাজ, অধিবিদ্যায় কী পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত—এ সব বিষয়ে ঐকমত্য নেই। তবে গতানুগতিক দর্শনে যা অধিবিদ্যা বলে খ্যাত তাতে কী জাতীয় প্রশ্ন তোলা হয় তা লক্ষ করলে অধিবিদ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যাবে। আত্মা কী? এ জগতের কি পারমার্থিক সত্ত্ব আছে? এ জগৎ মৃণ্ময় না চিন্ময়? পরম সত্ত্ব কী? দেশকাল—এসবেরও কি মনোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে?—এসব আধিবিদ্যক[2] প্রশ্ন। তারপর অধিবিদ্যার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি—অধিবিদ্ ব্রাড্‌লিকে অনুসরণ করে। ব্রাড্‌লি বলেছেন:

> অধিবিদ্যার লক্ষ্য হল অবভাস[3]-অতিশায়ী পরম সত্ত্বের জ্ঞান, প্রাথমিক সূত্র বা চরম সত্য অনুসন্ধান, আর সমগ্র বিশ্বকে, খণ্ডিত (বৈজ্ঞানিক) দৃষ্টিতে নয়—সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অখণ্ড সত্তারূপে জানা।

(ক) অধিবিদ্যার লক্ষ্য হল আপাত-সৎ বস্তু থেকে প্রকৃত-সৎ (স্বয়ংসৎ) বস্তুকে পৃথক করা, বস্তুর প্রকৃত ধর্ম বা সারধর্ম নির্ণয় করা। সাধারণভাবে বলতে পারি অধিবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয়—সত্তা ও অস্তিতা। উক্ত লক্ষ্যকে অধিবিদ্যার ধ্রুব লক্ষ্য করার মূলে আছে এ বাস্তব অভিজ্ঞতা বা বিশ্বাস: বস্তু

1. Metaphysics 2. metaphysical 3 appearance

যেভাবে সাধারণ বোধে, যথা অনুভবে, ধরা দেয় তা বস্তুর প্রকৃত রূপ নয়, তা হল বস্তুর বাহ্য রূপ বা অবভাস (বস্তুর যে রূপ আমাদের বোধে ভাসে তাকে বলে অবভাস)। কিন্তু অবভাস অবভাসরূপে চিহ্নিত হয়ে আমাদের বোধে আসে না, তাও প্রকৃত সত্তার দাবী নিয়েই উপস্থিত হয়। কাজেই জ্ঞাত বিষয়ের কোন্‌টি অবভাস, "কেবল অবভাস", সুতরাং চরম সত্তা নয়, আর কোন্‌টির পরম সত্ত্ব আছে তা আলোচনা করার দরকার। এ আলোচনাই অধিবিদ্যা।

(খ) অধিবিদ্যা সম্বন্ধে এ দাবী করা হয় যে অধিবিদ্যার সমস্যা সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং সব চেয়ে ব্যাপক। সব চেয়ে বেশী মৌলিক—কেননা, দাবী করা হয়, অধিবিদ্যায় যেসব সমস্যা আলোচনা করা হয় সে সবের সমাধান না হলে অন্যান্য বিশেষ (কম ব্যাপক) সমস্যারও সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, গাণিতিক অনুসন্ধান করতে হলে গাণিতিক পদার্থের, যথা সংখ্যার, বাস্তব সত্ত্ব আছে, নাকি এ সব কল্পনাপ্রসূত—এসব প্রশ্ন উঠতে পারে, এবং এ জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য আধিবিদ্যক আলোচনার প্রয়োজন। তারপর, অধিবিদ্যার অনুসন্ধান পদ্ধতি সর্বব্যাপক বলে দাবী করা হয়। এবং এ দাবীর সমর্থনে বলা হয়ঃ প্রত্যেক বিজ্ঞান প্রকৃতির একটি বিশেষ বিভাগ, বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া বা ধারণা, নিয়ে আলোচনা করে; কাজেই বিজ্ঞানের খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ ধরা দিতে পারে না। আর বিজ্ঞানীরা অধিবিদ্‌দের মত ব্যাপক সামগ্রিক সমস্যাও আলোচনা করেন না॥ যথা, বিজ্ঞানীরা জড়ের প্রকৃতি, জড়পরমাণুর আন্তর গঠন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি কেবল জড় উপাদানেই গঠিত কিনা, জড়ই একমাত্র সৎপদার্থ কিনা, নাকি চৈতন্যেরই পরম সত্ত্ব আছে—এ সব প্রশ্ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন॥ কাজেই দাবী করা হয় যে, আধিবিদ্যক সমস্যা সব চেয়ে মৌলিক ও ব্যাপক।

(গ) অধিবিদ্যা সম্বন্ধে এ দাবীও করা হয় যেঃ অধিবিদ্যা বিনাবিচারে কিছুই মেনে নেয় না। অন্যান্য বিদ্যা (বিজ্ঞান) কতকগুলি পদার্থের অস্তিত্ব বা কতকগুলি সূত্রের সত্যতা বিনাবিচারে মেনে নেয়। কাজেই এসব বিদ্যায় যেসব সিদ্ধান্ত করা হয় সে সব নিঃসন্দিগ্ধ সত্য বা চরম সত্য বলে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু অধিবিদ্‌রা আত্মসমালোচনা করতে ভয় পায় না; অধিবিদ্যা আত্মসমালোচক অনুসন্ধান-পদ্ধতি—অর্থাৎ অধিবিদ্যা নিজেই নিজের যাথার্থ্য বিচার করে। এমন কি অধিবিদ্যা সম্ভব কিনা—এ প্রশ্নও অধিবিদ্যায় আলোচিত হতে পারে॥ এ দাবীও করা হয় যেঃ পদে পদে আত্মসমালোচনা করে বলে আধিবিদ্যক সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য। অধিবিদ্‌রা বলেনঃ "বৈজ্ঞানিক বাক্য", যথা—"এটা একটা লাল 'ফুল", "বিষপানে মৃত্যু হয়"—এসব, নিঃসন্দিগ্ধ নয়, সংশয়যোগ্য। কিন্তু আধিবিদ্যক বাক্য, যথা—"আমি সংশয় করি, এবং আমার অস্তিত্ব আছে"—এ আধিবিদ্যক বাক্য সংশয়াতীত। এ জাতীয় বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে সংগতভাবে সংশয় পোষণ করা যায় না॥

প্রসঙ্গত, অধিবিদ্যা সম্বন্ধে সর্বশেষ দাবীটি কোনো কোনো অধিবিদ্ ভিন্ন আর কেউ মানবেন বলে মনে হয় না।

5. অধিবিদ্যার সম্ভবপরতা

অধিবিদ্যা বলে কোনো বিদ্যা সম্ভব —এ কথাই অনেকে স্বীকার করেন না। কেননা, তাদের মতে ঃ অনুভব ভিন্ন জ্ঞান হতে পারে না, বা অনুভবগম্য প্রাকৃত পদার্থ ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থ (অতীন্দ্রিয় পদার্থ) নেই, বা আছে কিনা তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল অতীন্দ্রিয় জগৎ, সুতরাং অধিবিদ্যা অসম্ভব॥ হিউম্, কান্ট্, কোঁৎ, হারবার্ট স্পেন্সার —সাধারণভাবে সব জড়বাদী, প্রাকৃতবাদী বা দৃষ্টিবাদীই— এ মতের সমর্থক।

যাঁরা অধিবিদ্যা বলে কোনো পরাবিদ্যার সম্ভবপরতা স্বীকার করেন না তাদের প্রকৃত বক্তব্য হল ঃ আধিবিদ্যক বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব বৈজ্ঞানিক বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্বের মত সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না; এক কথায়—আধিবিদ্যক বাক্য যাচাইযোগ্য নয়। এ অভিযোগ মেনে নিতে অধিবিদ্‌দের আপত্তি থাকবার কথা নয়। কেননা এ অভিযোগ মেনে নিলে কেবল এ কথাই স্বীকার করা হয় যে, অধিবিদ্যা বিজ্ঞান নয়। অধিবিদ্যা বিজ্ঞান নয়, বরং বিজ্ঞান থেকে ব্যাপকতর উন্নততর বিদ্যা —এটা ত অধিবিদ্‌দেরই দাবী। কিন্তু, অধিবিদ্যা বিজ্ঞান নয়—এ সত্য থেকে একথা নিঃসৃত হয় না যে অধিবিদ্যা অসম্ভব। অধিবিদ্যা বিজ্ঞান নয়, সুতরাং অধিবিদ্যা অসম্ভব—এ কথা বলার অর্থ বিজ্ঞান ছাড়া অন্য সব বিদ্যার সম্ভপরতা অস্বীকার করা। সব বিষয়ের বিজ্ঞানীকরণ যদি সম্ভব হত তাহলে অধিবিদ্যা কেন, দর্শন বলেই কিছু থাকত না। কিন্তু সব আলোচনার বিজ্ঞানীকরণ সম্ভব নয়। বিজ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র আদর্শ, যাচাইযোগ্য বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো বাক্যের সত্যতা ঘোষণা করা যায় না —এসব কথা মেনে নিলে তবেই অধিবিদ্যা অসম্ভব বলে মনে হবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই জ্ঞান বলে গ্রাহ্য হতে পারে না —এ ধারণা অসঙ্গত বলে মনে হয়।

অধিবিদ্‌রা বলেন ঃ আমাদের কেবল অবভাসের জ্ঞান হয়; বস্তুর প্রকৃতসত্তা, আন্তর-সত্তা বা সারধর্মের জ্ঞান হতে পারে না —একথা যারা বলে তারাও প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করে নেয় যে অবভাসের অতিরিক্ত কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে। পরম সত্তার কোনো ধারণা না থাকলে কোনো কিছু অবভাস বলে গণ্য হতে পারে না॥ উইট্‌গেন্‌ষ্টাইন্-এর মতে অধিবিদ্যার অর্থহীনতা বা অসারতা প্রতিপন্ন করাই দর্শনের লক্ষ্য। কিন্তু উইট্‌গেন্‌ষ্টাইনও স্বীকার করেন যে ঃ যে ব্যক্তি বলে "আমাদের জ্ঞানের একটা সীমা আছে, এ সীমা অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায় না" সে ব্যক্তি আসলে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। সীমান্তের অপর পারে যে কিছু আছে তা না জানলে কি করে বোঝা যাবে যে এটাই সীমান্ত॥

যুগে যুগে দৃষ্টিবাদী, প্রকৃতিবাদী, জড়বাদী দার্শনিকেরা অধিবিদ্যা বিরোধী

অভিযান চালিয়েছেন। কিন্তু অধিবিদ্যা সম্পর্কে মানুষ নিরাসক্ত মোহমুক্ত হয়েছে বলে ত মনে হয় না। মানুষ আপাত-সৎ আর চরম-সৎ-এর মধ্যে, অবভাস আর সারধর্মের মধ্যে, পার্থক্য করবেই। এ দৃশ্যমান জগতের অতিবর্তী কোনো পারমার্থিক সত্তা আছে কিনা তা জানবার চেষ্টা করবেই। মানুষ ঈশ্বর অনুসন্ধান করবে, আত্মা অমর কিনা, মৃত্যুই জীবনের শেষ কিনা—এসব অনুসন্ধান করবে। মানুষের বৌদ্ধিক-আবেগী প্রকৃতিতে অধিবিদ্যার সম্ভবপরতা নিহিত। এ জাতীয় বিষয়ে আলোচনা করে স্থির অসংশয়িত সিদ্ধান্তে আসা না গেলেও (আর আসা যে যাবে না তা প্রমাণিত হয়নি এখনও) এ জাতীয় আলোচনা নিরর্থক নয়। অধিবিদ্যা চর্চা করে যদি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারি ঃ ঈশ্বর আমাদের কল্পনার সৃষ্টি, আত্মা হল জড়েরই একটি ক্ষণস্থায়ী বিকার, জড় ভিন্ন আর কিছুরই পরম সত্ত্ব নেই, তাহলে অন্তত একটা পীড়াদায়ক সংশয় থেকে মুক্তি পাব। এটাই কি কম কথা ?

অধিবিদ্যার প্রয়োজন প্রদর্শন করতে গিয়ে ব্রাড্‌লি যে আবেগমুখর উক্তি করেছেন তার মর্মার্থ হল এই ঃ

> যেদিন মানুষ কাব্য কলা ও ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ হয়ে যাবে, জীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে না, যেদিন রহস্যময়তা ও মুগ্ধবিস্ময় বোধ মানুষকে আন্দোলিত আলোড়িত করবে না, মানুষ বিশ্বের রহস্যময়, হয়ত অনির্বাচ্য অনির্দেশ্য, দিকের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে, স্বপ্নসঘন প্রভাত প্রদোষের আকর্ষণে বিস্ময়াবিষ্ট হবে না—বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরি শুনে উন্মনা হবে না—সেদিন মানুষের চরম দুর্দিন। কেবল এ হেন দুর্দিনেই অধিবিদ্যার কোনো সার্থকতা থাকবে না॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধারণা

1. ভূমিকা ঃ ধারণা ও জ্ঞান

আমরা জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করতে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ কী? জ্ঞানের উৎস কী?—জ্ঞান কী? কেমন করে জ্ঞান লাভ করি? —এসব প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে ধারণা (সামান্যবোধ, প্রত্যয়) সম্বন্ধে আলোচনা করে নেবার দরকার। কেননা, কোনো বিষয়ে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয়ে জ্ঞান হতে পারে না। যেমন, ঘট সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে এ জ্ঞান হতে পারত না যে ওটা ঘট; দুই আর চার সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে এ জ্ঞান হতে পারত না যে ঃ দুই আর দুইতে চার।

ধারণা ও জ্ঞান ঃ ধারণা না থাকলে জ্ঞান হতে পারে না। কিন্তু ধারণা জ্ঞান নয়, জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত। যদি কেউ বলে "ঘট," তাহলে বক্তার উচ্চারিত শব্দ থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে বক্তা কিছু জেনেছে; তাছাড়া, বক্তার উচ্চারিত শব্দ থেকে আমাদের শাব্দজ্ঞান হয় না। ধারণা ব্যক্ত হয় শব্দে, আর জ্ঞান ব্যক্ত হয় বাক্যে। অবশ্য আমরা "কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান", "কর্তব্যজ্ঞান", "হিতাহিতজ্ঞান" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি; আমরা এমনও বলি ঃ তার ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান আছে। এ রকম ক্ষেত্রে "জ্ঞান" কথাটি ধারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, "তার ঘটজ্ঞান আছে," এ কথার অর্থ ঃ সে ঘটকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করতে পারে। সেরকম, "তার হিতাহিতজ্ঞান আছে" অর্থ ঃ তার হিত ও অহিতের ধারণা আছে, সে ভাল মন্দের পার্থক্য বোঝে॥ কোনো প্রশ্নের উত্তরে উচ্চারিত "হ্যাঁ", "না", "আমি", "রাম" প্রভৃতি শব্দ থেকে জ্ঞান হয়, ঠিক; কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে এ শব্দগুলি আসলে বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। যথা,"কে এ কাজ করেছে?" —এর উত্তরে "রাম" উচ্চারণ করলে প্রকৃত পক্ষে বলা হয় যে ঃ রাম এ কাজ করেছে।

জ্ঞান ব্যক্ত হয় বাক্যে—আমি জানি যে এটা ঘট, আমি জানি যে $2+2=4$ —এ জাতীয় বাক্যে। আবার, ধরা যাক, "এটা কী?"—এ প্রশ্নের উত্তরে নির্ভুল ভাবে বলা হল "এটা ঘট"। "দুই আর দুইতে কত হয়?" —এর উত্তরে বলা হল "দুই আর দুইতে চার হয়"॥ উক্ত দৃষ্টান্তের উত্তরগুলিতে জ্ঞান ব্যক্ত হয়েছে।

আমরা বলেছি ঃ ধারণা না থাকলে জ্ঞান হতে পারে না, এবং জ্ঞান ব্যক্ত হয় বাক্যে। এ কথাটাই এখন এভাবেও বলতে পারি ঃ ধারণা না থাকলে বাক্য প্রয়োগ করা যায় না, বাক্যের অর্থ বোঝা যায় না। যথা, কোনো ব্যক্তির ঘটের ধারণা না থাকলে, "এটা ঘট", "ঘটটি কাল" এ সব বাক্যের অর্থ বুঝতে পারত না, এবং বলতে পারত না ঃ আমি জানি এ ঘটটা কাল।

এজন্য, জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করার আগে ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করে নেবার দরকার।

ধারণা করাও এক প্রকারের জানা ঃ আমরা বলেছি—ধারণা জ্ঞান নয়, জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত। এ কথাটির অর্থ ভাল করে বুঝে নেবার দরকার, আর কথাটি আরও সঠিকভাবে বলা প্রয়োজন। আমরা দেখব যে ধারণা-করতে-পারাও এক প্রকারের জানা, ধারণা থাকাও এক প্রকারের জ্ঞান। কোনো ব্যক্তির, ক-এর, যদি ধ (যথা, ধুনুচি) সম্বন্ধে ধারণা না থাকে তাহলে তার এরূপ জ্ঞান হবে না ঃ অমুক বস্তুটি ধ, ধ-টি অমুক প্রকারের। কিন্তু ধারণা করতে পারাও এক প্রকারের জানা। "ক-এর ধ বিষয়ে ধারণা আছে" বা "ক ধ-এর ধারণা করতে পারে" এ কথার অর্থ ঃ কোনো কিছুর ধ হওয়া যে কী ক তা জানে, ক ধ-নামক বস্তুকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করতে জানে। যথা, "রামের ধুনুচি সম্বন্ধে ধারণা আছে" -এর অর্থ হল ঃ ধুনুচি কী বস্তু রাম তা জানে, রাম ধুনুচিকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করতে পারে, রাম ধুনুচির লক্ষণ জানে।

তাহলে, "ধারণা জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত"—এ কথার অর্থ ঃ "দ হল ধ", "ধ হল ন" ইত্যাদি আকারের জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত হল অন্য এক প্রকারের জ্ঞান। এ শেষোক্ত প্রকারের জ্ঞান থাকা মানে ধারণা থাকা।। আমরা জ্ঞান বলতে প্রথম প্রকারের জ্ঞানই বুঝব। কিন্তু এ জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত ধারণা-থাকা নামক জ্ঞান। কাজেই প্রথম প্রকারের জ্ঞান—ক হল খ, ক খ নয়—এ আকারের জ্ঞান আলোচনা করার সুরুতে ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করে নেব। এ প্রসঙ্গে প্রধানত দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করব ঃ ধারণার উৎস কী ? ধারণার স্বরূপ কী ?

ধারণার উৎস সম্বন্ধে দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদ আছে ঃ ধারণাবিষয়ক দৃষ্টিবাদ ও ধারণাবিষয়ক বুদ্ধিবাদ —সামান্য দৃষ্টিবাদ ও সামান্য বুদ্ধিবাদ* (সংক্ষেপে, দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদ)।

2. সামান্য বুদ্ধিবাদ

বুদ্ধিবাদীরা বলেন, ধারণা সহজাত ও স্বতঃস্ফুরণীয়। দার্শনিক লাইব্‌নিট্‌স্ মনে করেন ঃ সব ধারণাই সহজাত। ধারণার উৎস হল মন (বা বুদ্ধি) —বাইরের কোনো উদ্দীপক ধারণা উৎপাদন করতে পারে না।। দার্শনিক দেকার্ত এ ব্যাপারে

---

*Concept Empiricism ও Concept Rationalism

"ধারণাবিষয়ক" বা "সামান্য"—এ বিশেষণের তৎপর্য হল এই : আমরা জ্ঞানের উৎস ও স্বরূপ প্রসঙ্গেও দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদের কথা বলব—এবং এ প্রসঙ্গে "জ্ঞানবিষয়ক (বাচনিক) দৃষ্টিবাদ" ও "জ্ঞানবিষয়ক (বাচনিক) বুদ্ধিবাদ" এ কথা দুটি ব্যবহার করব। শেষোক্ত মতবাদ থেকে পৃথক করার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গে "ধারণাবিষয়ক" ("সামান্য") বিশেষণটি যুক্ত হল। তবে আমরা ধারণা প্রসঙ্গে কথা বলছি—এ কথা মনে রাখলে এ বিশেষণটি অনুক্ত রাখা চলে। এজন্য বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কেবল "দৃষ্টিবাদ" ও "বুদ্ধিবাদ" এ নাম দুইটি সাধারণভাবে ব্যবহার করব।

লাইব্‌নিটস্‌-এর মতো চরমপন্থী নন। তিনি বলেন: একথা ঠিক সব ধারণা সহজাত নয়, বহু ধারণা আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করি। কিন্তু এমন অনেক ধারণা আছে যা ইন্দ্রিয়গম্য নয়—যেমন, অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ইত্যাদির ধারণা। ইন্দ্রিয়লভ্য কোনো অনুভবের সাহায্যে এসব বস্তুর ধারণা করা যায় না। নিত্য, অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবে[1] ধরা দেয় না। এ জাতীয় বস্তুর ধারণা সহজাত॥

দেকার্ত-এর দর্শনে সহজাত ধারণার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানান যুক্তি দিয়ে দেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ যুক্তিগুলির একটির ভিত্তি হল সহজাত ধারণা। যুক্তিটি এই: ঈশ্বর বলতে বোঝায়—কোনো নিত্য অসীম, নিখুঁত, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ব্যক্তি। কিন্তু নিত্য নিখুঁত প্রভৃতির ধারণা ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য নয়, সুতরাং পূর্বতসিদ্ধ*, অনুভবপূর্ব বা সহজাত। এ সহজাত ধারণাবলীর কারণ কোনো অনিত্য, সসীম, অ-সর্বজ্ঞ ও অ-সর্বশক্তিমান ব্যক্তি হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে।

দৃষ্টিবাদীরা বুদ্ধিবাদের তীব্র বিরোধী। তারা এ মতের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ভ্রান্ত ও আজগুবী বলে মতটি বর্জন করেন। তারা বলেন: কোনো বিষয়ে কোনো সহজাত ধারণা আছে—এ কথা বলার অর্থ—ধারণাটি সার্বিক, সকল মানুষের মনে ধারণাটি সমভাবে বর্তমান। কিন্তু কোনো সর্বজনগৃহীত ধারণার সাক্ষাৎ মেলে না। সহজাত বা সার্বিক ধারণা বলে যদি কিছু থাকত তাহলে শিশুমনে বা জড়ধী ব্যক্তির মনেও তা সমভাবে বর্তমান থাকত। কিন্তু শিশুদের পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়, তাদের মন আনকোরা কাগজের মত—তাতে কোনো ধারণার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া না। আর জড়ধী ব্যক্তিদের মনে নিত্য, অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর প্রভৃতি (সহজাত-বলে-কথিত) ধারণার উন্মেষই কোনো কালে হয় না। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে সকল মানুষের মনেই ঈশ্বরের ধারণা আছে তাহলেও একথা বলা যায় না যে সকলের ঈশ্বর-ধারণা অভিন্ন। আবার, দৃষ্টিবাদীরা বলেন: ইন্দ্রিয়ানুভবের পূর্বেকার অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই। কাজেই ইন্দ্রিয়ানুভবের পূর্বে কারও মনে কোনো সহজাত ধারণা থাকে কিনা তা জানবার কোনো উপায় নেই॥

লক্ষণীয় যে, দৃষ্টিবাদীরা যখন বুদ্ধিবাদের সমালোচনা করেন তখন তারা ধরে নেন: দেকার্ত, লাইব্‌নিট্‌স্‌ প্রভৃতি বুদ্ধিবাদীর মতে ধারণা জন্মগত—জন্মাবার মুহূর্তে বা তার পূর্বে কতকগুলি ধারণা মানুষের মনে প্রোথিত হয়, এবং এ সব ধারণা পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটভাবে মানুষের মনে অবস্থান করে। কেননা, তা না হলে দৃষ্টিবাদীরা এ সমালোচনা করতেন না, বা প্রশ্ন তুলতেন না—কই, শিশুর বা জড়ধী ব্যক্তির মনে ত এ জাতীয় ধারণার লেশমাত্র চিহ্নও থাকেনা? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেকার্ত প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের "সহজাত" অর্থ জন্মগত নয়, তাদের

1. ইন্দ্রিয়ানুভব=sense-experience

*পূর্বতসিদ্ধ=পূর্বতঃসিদ্ধ=পূর্বতোসিদ্ধ

ব্যবহৃত "সহজাত" অর্থ —বুদ্ধিগম্য ; তাদের মতে —ইন্দ্রিয়ানুভবের সাহায্য ছাড়া, কেবল বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বা মনের সাহায্যে যে ধারণা আয়ত্ত করা যায় তাই সহজাত। অর্থাৎ "সহজাত" মানে স্বতঃস্ফুরণীয়, কেবল বুদ্ধির ফলেই স্ফূর্তি লাভ করতে পারে এমন। যথা, ঈশ্বরের ধারণা সহজাত এ অর্থে নয় যে শিশুর মনেও ঈশ্বরের ধারণা আছে। ধারণাটি সহজাত এ অর্থেই ঃ উত্তরকালে কারও মনে যদি এ ধারণার উদয় হয় তাহলে বুঝতে হবে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার ফলেই এ ধারণার উন্মেষ হয়েছে। তাহলে "সহজাত" অর্থ স্বতঃস্ফুরণীয়, আর "স্বতঃস্ফুরণীয়" অর্থ বুদ্ধিগম্য।

সামান্য বুদ্ধিবাদের সমালোচনা

প্রশ্ন ওঠে ঃ কেবল বুদ্ধি বা মননের ফলে কোনো ধারণার উৎপত্তি হতে পারে কি? এ কথা অনস্বীকার্য যে এমন কতকগুলি ধারণা আছে যা স্পষ্টতই ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া অর্জন করা যায় না। যথা, জড় বস্তুর গুণ সম্পর্কিত ধারণা —লাল, নীল, উষ্ণ, শীতল, অম্ল, মধুর ইত্যাদির ধারণা। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে অন্ধরা রঙের, যথা লাল রঙের, ধারণা করতে পারে না, অন্তত স্বভাবী চক্ষুষ্মান ব্যক্তির লালের যে-ধারণা, অন্ধরা লালের ঠিক সে-ধারণা করতে পারে না।

তবে এ কথাও ঠিক—নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ঈশ্বর প্রভৃতির, এমন কি দেশকাল প্রভৃতিরও, ধারণা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। কালের ধারণার কথাই ধরা যাক। কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবে কালের ধারণা অর্জন করা যায় না ; কেবল তাই নয়—এ ধারণা না থাকলে পৌর্বাপর্য (পূর্বাপর) -এর বোধও হতে পারে না ; কালের ধারণা পৌর্বাপর্য জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত। কিন্তু তাই বলে এ কথাও বলা যায় না যে, কালের ধারণা সহজাত বা অনুভবনিরপেক্ষ। দার্শনিক কাণ্ট্ মনে করেন—দেশবোধ ও কালবোধ ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে আসে না, আমাদের মনে পূর্বেই দেশবোধ কালবোধ যদি না থাকত তাহলে দৈশিক ও কালিক পদার্থের অনুভব, এমন কি কোনো ইন্দ্রিয়ানুভবই, সম্ভব হত না। কিন্তু কাণ্ট্ একথাও বলেন ঃ দেশ কাল প্রভৃতির বোধ* ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে উৎপন্ন হয় না, ঠিক ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া এ সবের স্পষ্ট বোধ হয় না। কালবোধ দেশবোধ ভিন্ন কালিক ও দৈশিক জ্ঞান (যে জ্ঞান "এ ঘটনা ঐ ঘটনার পরে", "এ বস্তুটি ঐ বস্তুর দক্ষিণে"—এ জাতীয় বাক্যে ব্যক্ত হয়) সম্ভব নয়, কাণ্টের মতে—কোনো ইন্দ্রিয়ানুভবই সম্ভব নয়। কিন্তু আবার ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়াও দেশকাল বোধের বিকাশ হয় না। অর্থাৎ, দেশবোধ ও কালবোধ অনুভব থেকে উৎপন্ন হয় না, ঠিক ; কিন্তু অনুভবেই এদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কাণ্টের মতে কেবল বুদ্ধির ফলে কোনো ধারণার উৎপত্তি হতে পারে না।** তবে জ্ঞান হতে গেলে

* লক্ষণীয়, কাণ্টের মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেশ কাল প্রসঙ্গে "বোধ" কথাটি ব্যবহার করেছি। তার কারণ কাণ্টের মতে দেশ কাল এসব ধারণা (সামান্য) নয়, এসব হল সংবেদনের আকার।

** শ্রীরাসবিহারিদাস-কৃত "কাণ্টের দর্শন", দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভব এ দুইয়েরই প্রয়োজন। একথা ঠিক যে, কাণ্ট দেশ কাল দ্রব্য, গুণ এসবকে পূর্বতসিদ্ধ[1] বলে মনে করেন। তবে বুদ্ধিবাদীরা সহজাত বলতে যা বোঝেন কাণ্ট্ পূর্বতসিদ্ধ বলতে তা বোঝেন না। কাণ্টের মতে ঃ দেশ কাল পূর্বতসিদ্ধ—এ কথার অর্থ, এসব সংবেদনের আকার, আর দ্রব্য, গুণ এসব বুদ্ধির আকার—কাজেই এসবও পূর্বতসিদ্ধ ॥

3. সামান্য দৃষ্টিবাদ

লক্, বার্ক্লি, হিউম্—এ তিনজন ইংরেজ দার্শনিক এ মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। এ'দের মতে ঃ ধারণার একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। ইন্দ্রিয়ানুভব ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে ধারণা অর্জন করা যায় না ॥

সংবেদন ও অন্তর্বেদন ঃ লক্ ॥ লক্ বলেন ঃ ইন্দ্রিয়ানুভবের দুই রূপ—সংবেদন[2] ও অন্তর্বেদন[3]। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে ইন্দ্রিয়ানুভব হয় তাকে বলে সংবেদন আর অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে অনুভব হয় তাকে বলে অন্তর্বেদন। আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞানীরা যাকে অন্তর্দর্শন বলেন লকের ভাষায় তাই অন্তর্বেদন। ইন্দ্রিয়ানুভবের এ দুই রূপ যেন মনের দুটি বাতায়ন; এ বাতায়ন ছাড়া মনের অন্য কোনো প্রবেশপথ নেই। সংবেদনে, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের—দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবনেন্দ্রিয় প্রভৃতির—সাহায্যে, যে ধারণা পাই সেগুলি বহির্জাগতিক বিষয় সংক্রান্ত, যথা ঃ লাল, নীল, শক্ত, নরম, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদির ধারণা। আর অন্তর্বেদনে, অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে, যে সব ধারণা পাই সেগুলি মনোজগৎ সংক্রান্ত, যথা ঃ সুখ, দুঃখ, ব্যথা, মোহ, ঘৃনা, ক্রোধ ইত্যাদির ধারণা। লক্ প্রথম প্রকারের ধারণাকে "সংবেদনজন্য ধারণা" আর দ্বিতীয় প্রকারের ধারণাকে "অন্তর্বেদনজন্য ধারণা" বলে অভিহিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা "ধারণা" শব্দটি ব্যবহার করেছি "সামান্য" বা "কন্সেপ্ট্"-এর প্রতিশব্দ হিসাবে। লক্ ও বার্ক্লি কিন্তু "আইডিয়া" কথাটি ব্যবহার করেন, এবং "আইডিয়া" বলতে বোঝেন ঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ আভাস, সংক্ষেপে, ইন্দ্রিয়লব্ধ বা ইন্দ্রিয়প্রদত্ত। এখন এ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে সাধারণত "ধারণা" কথাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু "ধারণা" বা "আইডিয়া" সাধারণত ভিন্ন অর্থে, লক্ ও বার্ক্লে যে অর্থে ব্যবহার করেন তার চেয়ে ব্যাপক অর্থে, ব্যবহৃত হয়; সামান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা জড় বস্তুর গুনের—শ্বেত, রক্ত, শ্বেতত্ব, রক্তত্ব প্রভৃতির—ধারণার কথা যেমন বলি, তেমনি আবার গণতন্ত্র, ঔচিত্য, সাধুতা প্রভৃতি বিমূর্ত বিষয়ের ধারণার কথাও বলি। যেমন আমরা বলি ঃ তোমার নারাঙ্গি রঙের ধারণা নেই, তার পেস্তাসবুজের ধারণা আছে। আরও বলি ঃ গণতন্ত্র সম্বন্ধে তোমার স্পষ্ট ধারণা নেই; হিন্দুরাই প্রথম শূন্যের (0-এর) ধারণা করতে পেরেছিল; তুমি "ক অথবা খ" এরূপ বাক্যের

1. a priori 2. sensation 3. reflection

অর্থ বুঝতে পারছ না, কেননা তোমার 'অথবা' সম্বন্ধে ধারণা নেই। শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে যে জাতীয় ধারণার কথা বলা হল, বলা বাহুল্য, সে জাতীয় ধারণা সরাসরি ইন্দ্রিয়গম্য নয়।

ছাপ ও ধারণা ঃ হিউম্॥ লক্ ও বার্ক্‌লি "আইডিয়া" (বা "ধারণা") শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সে অর্থে আমার ইন্দ্রিয়ানুভবে যে লাল নীল পাই সে অনুভূত লাল নীল হল ধারণা। কিন্তু যে লাল রঙ দেখি সে রঙের বোধকে বা ঐ অনুভূত রঙকে সাধারণত আমরা ধারণা বলে বর্ণনা করি না। আমরা বলি নাঃ লাল একটি ধারণা; আমরা বলি লাল-এর ধারণার কথা, যথা বলিঃ "তার লাল রঙের ধারণা নেই", "ওর নারাঙ্গি রঙের ধারণা আছে"। ওর নারাঙ্গি রঙের ধারণা আছে—এ কথা বলতে বুঝি নাঃ নারাঙ্গি রঙ ওর ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয়, বুঝিঃ ও নারাঙ্গি রঙকে অন্য রঙ থেকে পৃথক করতে পারে। লক্, বার্ক্‌লি এবং সতের'শ আঠার'শ শতাব্দির বহু লেখক "ধারণা" বলতে প্রায় যে কোনো অনুভবই বুঝতেন। হিউম্ লক্ষ করেন যে, লক্ ও বার্ক্‌লি "ধারণা" কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সাধারণ ভাষাও এ শব্দটি সে অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না; লক্ষ করেন যে, সাধারণ ভাষায় ইন্দ্রিয়ানুভবের সাক্ষাৎ বিষয়কে ধারণা বলে না। এজন্য হিউম্ ইন্দ্রিয়লব্ধ আভাস থেকে ধারণাকে পৃথক করেন। এবং অনুভব প্রসঙ্গে দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেনঃ ইম্‌প্রেশন্ (ছাপ) আর আইডিয়া (ধারণা)। কোনো উদ্দীপক সরাসরি কোনো ব্যক্তির কোনো ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করলে ইন্দ্রিয় যা গ্রহণ করে, ব্যক্তিটির মনে যে ছাপ পড়ে, মনে যা প্রতিভাত বা মুদ্রিত হয়, তাকে বলে ছাপ বা ইম্‌প্রেশন্। "ইম্‌প্রেশন্" বলতে হিউম্ যা বোঝেন আধুনিক কালের দার্শনিকরা তাকেই বলেন ইন্দ্রিয়লব্ধ বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত[1] বা অক্ষোপাত্ত*। কাজেই আমরা "ছাপ"-এর বদলে "অক্ষোপাত্ত"ও ব্যবহার করতে পারি। যখন কোনো লাল বস্তু দেখি তখন আমার মনে যে লালের ছাপ পড়ে তা হল একটি ইম্‌প্রেশন্। অপরপক্ষে, লাল বস্তুটি অপসারিত হলে, অথবা চোখ্ বন্ধ করে যে লালের কল্পনা করি, বা লালের যে স্মৃতি হয়, তা হল লালের ধারণা বা আইডিয়া। লক্ষণীয়, এখানে "ধারণা করা" মানেঃ কল্পনা করা, স্মরণ করা। হিউমের মতে —ধারণা** হল ছাপের বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রতিচ্ছবি। ধারণা অনুষঙ্গী ইন্দ্রিয়োপাত্তের উপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়োপাত্ত (ছাপ) ধারণার আবশ্যিক সর্ত॥ পূর্বে ক-এর ছাপ না হলে ক-এর ধারণাও হতে পারে না। হিউমের প্রখ্যাত মতবাদটি এভাবে ব্যক্ত করা যায়ঃ

যে বিষয়ের ছাপ হয় নি তার ধারণাও হতে পারে না।

---

1. sense-datum

* "অক্ষ" মানেও ইন্দ্রিয়। তবে বাংলায় ইন্দ্রিয় অর্থে এ কথাটির ব্যবহার নেই। কাজেই আমরা সাধারণভাবে "ইন্দ্রিয়োপাত্ত" কথাটি প্রয়োগ করব।

** অবশ্যই এ ধারণা লক্-কথিত ধারণা নয়।

যথা, লাল রঙের ধারণা করতে হলে আগে লালের ইন্দ্রিয়ানুভব হওয়ার দরকার। অন্ধ ব্যক্তি লালের ধারণা করতে পারে না, কেননা তার লালের ছাপ নেই। মনোজগৎ সংক্রান্ত ধারণা সম্বন্ধেও হিউম্ উক্ত সূত্রটি প্রয়োগ করেন। যথা, যার ব্যথার অনুভব হয় নি, যার মনে ব্যথার ছাপ পড়ে নি, সে ব্যথার ধারণা করতে পারবে না, যার ঘৃণার অনুভব হয় নি তার ঘৃণার ধারণা থাকতে পারে না। স্পষ্টতই এখানে অনুভব বলতে বুঝছি ইন্দ্রিয়ানুভব —লকের সংবেদন বা অন্তর্বেদন।

হিউমের মতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বলেছি ঃ ধারণা হল ছাপের প্রতিচ্ছবি, বলেছি ঃ ছাপ স্মরণের ফলে, বা ছাপের ভিত্তিতে কল্পনার ফলে, ধারণা গড়ে ওঠে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলার দরকার যে, ছাপের সংযোজন ও বিন্যাসের ফলেও ধারণা গঠিত হয়। একটা উদাহরণ। কমলালেবুর ধারণা হয় কেমন করে? দর্শন-ইন্দ্রিয়ানুভবের সাহায্যে কমলা রঙের ছাপ পেলাম, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মসৃণ, কোমল, গোলের ছাপ পেলাম, রসনার সাহায্যে মধুর (স্বাদ) -এর ছাপ পেলাম। লক্ষণীয় কমলা রঙ, মসৃণ, কোমল এসব ধারণা নয়, এসব হল ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ছাপ। হিউম বলেন ঃ এ ছাপগুলিকে সংযোজিত করে, যূথবদ্ধ করে আমরা কমলালেবুর ধারণা পাই। কমলালেবু, আম, জাম, টেবিল, চেয়ার, বই, কলম প্রভৃতির, অর্থাৎ দ্রব্যের, ছাপ হয় না; এদের ধারণা হয়। ছাপ হল ইন্দ্রিয়ানুভবের সাক্ষাৎ বিষয়। কিন্তু (হিউমের মতে) কোনো দ্রব্য ইন্দ্রিয়ানুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হতে পারে না। দ্রব্যস্থিত গুণ মনে ছাপ ফেলতে পারে, দ্রব্য দ্রব্যের ছাপ ফেলতে পারে না।

সরল ধারণা ও জটিল ধারণা ঃ লক্

যে বস্তুর কোনো ছাপ পাইনি তার সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারি। যেমন আমরা সুবর্ণ পর্বতের ধারণা করতে পারি, সবুজ গোলাপের ধারণা করতে পারি —যদিও সুবর্ণ পর্বত বা সবুজ গোলাপ থেকে কোনো ছাপ পাইনি। যে ব্যক্তি জেব্রা বা গবয় দেখেনি সেও জেব্রা ও গবয়ের ধারণা করতে পারে॥

লক্ ও হিউম্ জানতেন এ আপত্তি উঠতে পারে। এজন্যই লক্ ধারণাকে সরল ধারণা ও জটিল ধারণা—এ দুভাগে ভাগ করেছেন; আর হিউম্ ছাপ ও ধারণার পার্থক্যের কথা বলেছেন। লাল, নীল, নরম, গরম প্রভৃতির ধারণা (লকের ভাষায় "ধারণা") হল সরল ধারণা, আর সবুজ গোলাপ, সুবর্ণ পর্বত, ঈশ্বর, এমন কি—কমলালেবু, টেবিল, চেয়ার, প্রভৃতির ধারণা হল জটিল ধারণা। মনে রাখতে হবে

লকের "সরল ধারণা" = হিউমের "ছাপ" ("সরল ছাপ")

লক্ বলেন ঃ সরল ধারণা বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করে, পরিবর্তিত পরিবর্ধিত করে জটিল ধারণা গঠন করা হয়। আমরা সবুজ গোলাপের ধারণা করতে পারি, কেননা আমাদের সবুজের সরল ধারণা (ছাপ) আছে, আর গোলাপ কি তা আমরা জানি। কেউ যদি বলে জেব্রা ঘোড়ার মত, তবে গায়ে হলদে ডোরা-

কাটা তাহলে আমরা জেব্রার ধারণা করতে পারি, কেননা আমাদের হলদে রঙের (সরল) ধারণা আছে, ডোরাকাটা সম্বন্ধে ধারণা আছে, ঘোড়ার (জটিল) ধারণা আছে। সেরকম ইন্দ্রিয়ানুভবে ঈশ্বরকে না পেলেও, মানুষের মধ্যে শক্তি, জ্ঞান, কারুণ্য, মহত্ব প্রভৃতি যে সব গুণ সীমিত মাত্রায় প্রত্যক্ষ করি সেগুলিকে আরও পরিবর্ধন করে ধারণাগুলিকে যুক্ত করে তবে ঈশ্বরের (জটিল) ধারণা গঠন করতে পারি। লকের মতে ঃ সরল ধারণা গ্রহণের বেলায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ানুভবের বেলায়, মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় আর জটিল ধারণা গঠনের বেলায় মন সক্রিয়। এবং মনের সক্রিয়তা বলতে বোঝায় সরল ধারণার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নানাভাবে বিন্যস্তকরণ। এ সব ক্রিয়া ভিন্ন মন অন্য কোনো দিক থেকে সক্রিয় নয়। মন জটিল ধারণার স্রষ্টা, কিন্তু কোনো সরল ধারণা (ছাপ) সৃজন করতে পারে না ॥

ছাপ ও ধারণার পার্থক্য

সরল ধারণা ও জটিল ধারণার, ছাপ ও ধারণার; পার্থক্য কী, কোন্ ধারণা সরল কোন্ ধারণা জটিল তা কিভাবে নির্ণয় করব? এ ব্যাপারে লক্ কোনো নির্ভরযোগ্য নির্ণায়ক নির্দেশ করেন নি। হিউম্ বলেছেন ঃ ছাপ হল স্পষ্ট, উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ বা প্রাণবন্ত আর ধারণা হল অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, নিস্প্রভ বা দুর্বল। হিউম্ বলেন ঃ এদের পার্থক্য এত স্পষ্ট যে আমরা দুর্বলতম ছাপকেও ধারণা বলে, বা বলিষ্ঠ ধারণাকেও ছাপ বলে, ভুল করি না। যথা, মৃদু-আলোতে-দেখা বস্তুর ছাপকে একটা (কল্পিত বস্তুর) ধারণা বলে ভুল করি না। "উজ্জ্বল" "প্রাণবন্ত"—এ বিশেষণগুলি ঔপমিক, তবে ধরা যাক এদের অর্থ আমরা বুঝতে পারছি। তবু এসব নির্ণায়কের সাহায্যে ছাপকে ধারণা থেকে সহজে পৃথক করা যায় না।

হিউম্ নিজেই স্বীকার করেছেন—প্রলাপী জ্বরে বা উন্মত্ততায় ধারণা বা কল্পিত বিষয়ও ছাপের মত জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ জাতীয় ক্ষেত্রকে হিউম্ ব্যতিক্রম বা অস্বভাবী দৃষ্টান্ত বলে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু স্বভাবী অবস্থায়ও "এটা ছাপ না ধারণা" এ সংশয় হতে পারে। যথা, আমার বন্ধুরা বলল "ঐ দূরস্থ বৃক্ষশাখে একটি পাখি বসে আছে", আমি অভিনিবেশ সহকারে দেখার চেষ্টা করছি এবং আমার যেন এখন মনে হচ্ছে আমিও পাখিটি দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমার সংশয় হতে পারে ঃ আমি কি সত্যই দেখছি (দার্শন ছাপ পাচ্ছি) নাকি কল্পনা করছি, এটা কি ছাপ না ধারণা? আর একটা দৃষ্টান্ত। আমি ক-কে ঘৃণা করি বলে মনে করছি। এ ব্যাপারেও আমার সংশয় হতে পারে —আমার এ বোধ কি ঘৃণা (আমার মনে কি ঘৃণার "ছাপ" পড়েছে) নাকি আমার ঘৃণাবোধ হয়েছে বলে কল্পনা করছি, নাকি আসলে এ বোধ ঘৃণা নয়, হিংসা।

এ প্রসঙ্গে লক্ যা বলতে পারতেন এবং হিউম্ যা বলতে চেয়েছিলেন

তা আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। ছাপ (সরল ধারণা) এমন যে এদের নামের অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় না, ছাপবোধক শব্দের জাতিবিভেদকঘটিত সংজ্ঞা[1] দেওয়া যায় না, কেবল দৃষ্টান্তপ্রদর্শক সংজ্ঞা[2] দেওয়া যায়। যথা, লাল, নীল, প্রভৃতির অনুভবে যা পাই তা হল ছাপ, কেননা "লাল", "নীল" এ শব্দগুলি কী বোঝায় কেবল লাল নীল বস্তু নির্দেশ করেই তা বোঝানো যায়। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন (দৃষ্টান্তপ্রদর্শক সংজ্ঞা) ছাড়া এদের অর্থ বোঝানো যায় না, এদের অন্যরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। অপরপক্ষে, কমলালেবু, নদী, পর্বত, জেব্রা, সোনার পাহাড় প্রভৃতি সম্বন্ধে পাই ধারণা ; কেননা "কমলালেবু", "নদী", "পর্বত" প্রভৃতি নামের অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়, এদের জাতিবিভেদকঘটিত সংজ্ঞা দেওয়া যায়, বা বর্ণনামূলক কোনো বাক্য প্রয়োগ করে এ সবের নির্দেশিত বস্তু চিনিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে বলতে পারি ঃ যে শব্দগুলির অর্থ দৃষ্টান্তপ্রদর্শক সংজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে শেখা যায় না, সে শব্দগুলি সরল অবিশ্লেষণীয় গুণ বোঝায় ; এ গুণগুলি যখন অনুভবে ধরা দেয় তখন বলা হয় এদের ছাপ বা সরল ধারণা হল। অপরপক্ষে, যে শব্দগুলির* অর্থ অন্যভাবে শেখানো যায়, যাদের জাতিবিভেদকঘটিত সংজ্ঞা দেওয়া যায়, সে শব্দগুলি জটিল গুণ, দ্রব্য বা কর্ম বোঝায় ; এ জাতীয় শব্দ যা বোঝায় তার ধারণা (জটিল ধারণা) হয়, ছাপ হয় না।

সামান্য দৃষ্টিবাদের সমালোচনা

আপাতদৃষ্টিতে দৃষ্টিবাদ নির্ভুল বলে মনে হয়। এ মতবাদকে সাধারণ লোকের এত স্বাভাবিক বলে মনে হয় যে তাদের প্রশ্ন জাগে ঃ অনুভব ভিন্ন আবার ধারণা হবে কেমন করে ? সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে না যে কতগুলি সহজাত ধারণা নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি, বা প্লেটোর মতো এ কথাও বিশ্বাস করে না যে পূর্বজন্মে-অর্জিত-ধারণার স্মরণই সব ধারণার উৎস।

ধারণা ও মনশ্চিত্র ঃ আলোচ্য মতবাদকে যে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয় তার একটা হেতু হল এই ঃ "ধারণা" কথাটি অনেক সময় মনশ্চিত্র[3] অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং দৃষ্টিবাদীরা যখন ধারণার কথা বলেন তখন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনশ্চিত্র বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের কথাই বলেন। এখন যদি "ধারণা" কেবল মনশ্চিত্র অর্থেই ব্যবহৃত হয় তা হলে স্পষ্টতই ধারণা মাত্রেরই উৎস ইন্দ্রিয়ানুভব—লকের সংবেদন বা অন্তর্বেদন। আর সেক্ষেত্রে দৃষ্টিবাদের মূল বক্তব্য ধারণার লক্ষণ থেকেই নিঃসৃত হয়। তার মানে— ধারণা বলতে যদি মনশ্চিত্র বা ইন্দ্রিয়োপাত্তই বোঝায় তাহলে

ধারণার একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব

এ কথা বললে কোনো তথ্য পরিবেশন করা হয় না, "ধারণা" শব্দটির সংজ্ঞাই

---

1. definition per genus et differentiam 2. ostensive definition

* উদাহরণ : "মানুষ", "দুগ্ধশুভ্র", "সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ", "খুন করা", "উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করা", "সোনার পাহাড়" ইত্যাদি।

3. image

ব্যক্ত করা হয়।` অর্থাৎ সেক্ষেত্রে উক্ত বাক্যটি সংশ্লেষক[1] নয়, বিশ্লেষক[2] —স্বগত বাক্য[3] বা তাদাত্ম্য বাক্য, সুতরাং বন্ধ্যা বাক্য।

কিন্তু "ধারণা" কথাটি এমন অর্থেও ব্যবহৃত হয় —যে অর্থে কোনো কিছুর মনশ্চিত্র না থাকলেও তার ধারণা থাকতে পারে। শেষোক্ত অর্থেই গণতন্ত্র, সাধুতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতির ধারণার কথা বলা হয়। এ কথা সত্য যে লাল রঙের অনুভব না হলে লালের মনশ্চিত্র গঠিত হয় না। তার থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, লালের ইন্দ্রিয়ানুভব না হলে লালের ধারণা হতে পারে না। একটা উদাহরণ। কোনো মানুষের অবলোহিতের[4] মনশ্চিত্র থাকতে পারে না, কেননা মানুষ এ আলো প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যেহেতু অবলোহিতের কোনো ইন্দ্রিয়ানুভব হয় না, যেহেতু মানুষের মনে এ আলো কোনো ছাপ ফেলতে পারে না, সেহেতু অবলোহিতের মনশ্চিত্রও হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যায় না যে আমাদের অবলোহিতের ধারণা নেই। পদার্থবিজ্ঞানীরা অবলোহিতের কথা বলেন; লাল নীলের মত একেও বর্ণালীর বিশেষ অংশের সঙ্গে যুক্ত করেন। অবলোহিত সম্বন্ধে যা বলা হল অতিবেগনী সম্পর্কেও ঠিক সে কথা খাটে। সেরকম, তেজস্ক্রিয়তারও মনশ্চিত্র হয় না, কেননা এর ইন্দ্রিয়ানুভব হয় না। কিন্তু এমন কথা বলা যায় না যে তেজস্ক্রিতার ধারণা হয় না। কোন বস্তুতে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা আছে পদার্থবিজ্ঞানীরা তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। এমনকি বর্ণান্ধ ব্যক্তিও বর্ণ-পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে পারেন; আমরা রঙ সম্বন্ধে যা জানি তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী তথ্য জানতে পারেন। এরকম বর্ণান্ধ পদার্থবিজ্ঞানীর রঙের মনশ্চিত্র হয় না, কিন্তু অবশ্যই তার রঙের ধারণা আছে। তাহলে কোনো কিছুর ইন্দ্রিয়ানুভব না হলে তার ধারণা থাকতে পারে না —হিউমের এ উক্তি ঠিক নয়।

হিউম্-কথিত "বিরুদ্ধ ব্যাপার"-এর গুরুত্ব ঃ হিউম্ নিজেই স্বীকার করেছেন যে "ছাপ ছাড়া ধারণা হতে পারে না"—এ সূত্রের একটা ব্যতিক্রম আছে। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ আভার নীল ভিন্ন অন্য সব রঙ প্রত্যক্ষ করেছে। আরও ধরা যাক, ঐ বিশেষ আভার নীল রঙটি বাদ দিয়ে, সমস্ত নীল রঙকে উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে বিশেষ ক্রমে বিন্যস্ত করে ঐ ব্যক্তির সামনে তুলে ধরা হল। প্রশ্ন হল—ঐ ব্যক্তি কি অপ্রদর্শিত, "হারানো", নীল রঙটি সম্বন্ধে ধারণা করতে পাববে না? হিউম বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি নীলমালার এক জায়গায় (অপ্রদর্শিত নীলটির জায়গায়) একটি ফাঁক লক্ষ করবে। তার মনে হবে, এখানে আর একটি আভার নীল থাকবার কথা, এবং অন্য সব বর্ণের আর সাদা-কালোর বোধের অনুভব ও অন্যান্য নীলাভার বোধের ভিত্তিতে অপ্রদর্শিত নীল রঙ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে॥ তার মানে, হিউম্ স্বীকার করেন যে এরকম ক্ষেত্রে ছাপ ছাড়াও ধারণা হতে পারে। ওপরে যে ব্যাপারের কথা বলা হল হিউম তাকে "একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার" বা ব্যতিক্রম বলে বর্ণনা করেছেন; বলেছেন ঃ এ অসাধারণ

1. synthetic 2. analytic 3. tautology 4. অবলোহিত=infra-red

দৃষ্টান্তটি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় ব্যাপার নয়, অন্তত তার সূত্রটি পরিবর্তন করার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে "বিরুদ্ধ" দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ বিরুদ্ধ ব্যাপারটি স্বীকার করেন বলে একথাও হিউমকে অবশ্যই মানতে হবে যে "ছাপ ছাড়া ধারণা হয় না"—এ সার্বিক উক্তি অসত্য।

ধারণা ও অনুভবের সম্পর্ক ঃ অনুভব ছাড়া ধারণা হয় না—এ কথা না হয় সাধারণভাবে মেনে নিলাম। কিন্তু অনুভবের সঙ্গে ধারণার সম্পর্ক দেখানো, কোন্ কোন্ অনুভব (ছাপ), থেকে বিশেষ কোনো ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তা দেখানো সহজ নয়, হয়ত সম্ভবও নয়।

লাল, নীল, ঠাণ্ডা, গরম প্রভৃতির ধারণার সঙ্গে অনুভবের সম্পর্ক দেখানো সহজ। আবার হয়ত দেখানো যায়, লাল নীল প্রভৃতির বোধের ভিত্তিতে বিমূর্তন ক্রিয়ার সাহায্যে লালত্ব, নীলত্ব প্রভৃতির ধারণা গঠন করেছি। কিন্তু গণতন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, বিপ্লব প্রভৃতির ধারণা পাই কেমন করে? কোন্ অনুভবের ভিত্তিতে? একথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না যে কতকগুলি বিশেষ বোধ না হলে গণতন্ত্রের ধারণা হতে পারত না। হয়ত—কেবল স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ হলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা না শুনলে, জনমতের শক্তি, নির্বাচন, ভোটাধিকার প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে আমরা গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা করতে পারতাম না। কিন্তু ঠিক কোন্ কোন্ অনুভবের ফলে গণতন্ত্রের ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তা বলা সহজ নয়। অনুভব থেকে উক্তরূপ বিমূর্ত বিষয়ের ধারণার কি করে উৎপত্তি হয় দৃষ্টিবাদীরা তা দেখাতে পারেন বলে মনে হয় না।

অনুভব ও গাণিতিক ধারণা ঃ গাণিতিক ধারনার সঙ্গে অনুভবের সম্পর্ক দেখানো আরও শক্ত। দুই চার প্রভৃতির ধারণার উৎপত্তি হয় কি করে? দৃষ্টিবাদীরা বলেন এ জাতীয় ধারণার উৎসও অভিজ্ঞতা। তারা বলেন ঃ গণিত বস্তুর গুণগত দিক অগ্রাহ্য করে, পরিমাণগত দিক নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণ হিসাবে দুই-এর ধারণার কথাই ধরা যাক। আমরা দুটো আম, দুটো জাম, দুটো বই—এরকম আরে বহু জোড়া জোড়া বস্তু প্রত্যক্ষ করেছি। এখন এ জোড়াগুলির পরিমাণগত দিকের উপর জোর দিয়ে গুণগত দিক অগ্রাহ্য করে, বিমূর্তন ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা দুই-এর ধারণা গঠন করেছি॥ এটা হল দৃষ্টিবাদীদের ব্যাখ্যা। এখন 2, 3, 4-এর মত আমাদের 35792460-এরও ধারণা আছে; না থাকলে এ সংখ্যাটি কোনো গাণিতিক বাক্যে, যথা $35792460+2=35792462$ —এ বাক্যে, নির্ভুলভাবে ব্যবহার করি কেমন করে? এ জাতীয় বাক্যের অর্থ বুঝি কি করে? 35792468 আর 24683579-এর পার্থক্য বুঝি কেমন করে? কিন্তু এ ধারণাগুলির উৎস কী? (=, + -এর ধারণারই বা উৎস কী?) আমরা কেউ 35792460 সংখ্যক বস্তুর সমষ্টি প্রত্যক্ষ করি নি, আর করলেও জানতে পারিনি ঐ সমষ্টিতে উক্ত সংখ্যক বস্তু ছিল। তাহলে এরকম বৃহৎ সংখ্যার সঙ্গে অনুভবের সম্পর্ক রইল কোথায়? দৃষ্টিবাদীরা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন না, কিন্তু আমরা পারি। এর জবাব হল এই ঃ উক্তরূপ বৃহৎ

সংখ্যার ধারণার বস্তুত, যে কোনো গাণিতিক ধারণার, মূলে আছে—গণিত-শেখা নামক উপলব্ধি ; 1, 2, 3,.........9, 0, +, = প্রভৃতি প্রতীক ব্যবহার করতে শেখা—এবং শেখা এক প্রকারের বোধ বা উপলব্ধি বা অনুভব। দৃষ্টিবাদীরা "অনুভব" কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করেন এ জবাবে কিন্তু কথাটি সে অর্থে ব্যবহৃত হল না, ব্যবহৃত হল আরও ব্যাপক অর্থে। এ জবাব মেনে নিলে একথাও মেনে নিতে হয়ঃ সব ধারণার উৎস অনুভব, তবে কেবল ইন্দ্রিয়ানুভব নয়।

অনুভব ও যুক্তিবৈজ্ঞানিক ধারণাঃ "ধারণা" কথাটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে —এবং, অথবা, হয়, নয়, যদি, আছে, নেই —প্রভৃতির ধারণার কথাও বলা যায়। এখন, এ জাতীয় ধারণার উৎস কী? এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে এসব ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। এমন কোনো ইন্দ্রিয়ানুভব দেখানো যায় না যার সম্পর্কে বলা যায় যে, ঐ ঐ অনুভবের সঙ্গে "এবং" "অথবা" প্রভৃতি সাক্ষাৎভাবে বা গৌণভাবে জড়িত। উক্তরূপ ধারণার উৎস ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব নয়, ঠিক ; তবে একরূপ উপলব্ধির ভিত্তিতে এ জাতীয় ধারণা গড়ে ওঠে। এ উপলব্ধি ভাষা-শেখা বা প্রতীক-ব্যবহার-করতে-শেখা নামক বোধ।

ওপরে যা বলা হল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যেঃ ধারণার একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব, যে বিষয়ের ইন্দ্রিয়ানুভব হয় না তার ধারণাও হয় না —এসব দৃষ্টিবাদী উক্তি পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান

1. "জ্ঞান" ও "জানার" বিভিন্ন অর্থ

"জ্ঞান" ও "জানা" এ কথাগুলি অন্তত তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা প্রধানত "জানা" শব্দটি নিয়েই আলোচনা করব। কেননা "তার এ ব্যাপারে জ্ঞান নেই", "আমায় জ্ঞান দিতে হবে না" আমরা এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করি ঠিক; কিন্তু সাধারণ ভাষায় "জ্ঞান"-এর চেয়ে "জানা"-রই বিভিন্ন রূপ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত বাক্য তিনটি লক্ষণীয়ঃ

রাম নাচতে জানে। রাম শ্যামকে জানে।
রাম জানে যে শঙ্করাচার্য একজন দার্শনিক ॥

এ বাক্যগুলিতে "জানে" কথাটি তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যগুলির আকার হল যথাক্রমেঃ

ক —তে জানে। ক —কে জানে।
ক জানে যে ———।

এ আকারগুলি অনুসরণ করে আমরা তিন রকম জানার কথা বলবঃ

—তে জানা, —কে জানা, জানা যে ———

আর তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলবঃ

কর্মজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, ব্যাপারজ্ঞান ॥*

1. —তে জানা ঃ কর্মজ্ঞান ॥ অনেক সময় আমরা "জানা" বলতে বুঝি কোনো কাজ করতে পারা। এ অর্থে "জ্ঞান" মানে কোনো কর্মে নৈপুণ্য, কোনো কাজ করার ক্ষমতা। এ অর্থেই আমরা বলিঃ আমি সাঁতার কাটতে জানি, সে সংস্কৃত জানে, তুমি গাইতে জান কি? অনুরূপ অর্থে আমরা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান, গুরুগুর্বীজ্ঞান, হিতাহিত জ্ঞানের কথা বলি। "সে সংস্কৃত জানে" অর্থঃ সে সংস্কৃত ভাষা পড়তে বুঝতে (লিখতে বা বলতে) পারে। "ক —তে জানে" এ আকারে ক-এর পরিবর্তে কোনো ব্যক্তির নাম আর ড্যাসের জায়গায় ("জানা", "হওয়া" প্রভৃতি) ভিন্ন কোনো ক্রিয়াপদ বসালে যদি সত্য বাক্য পাওয়া যায় তাহলে সে বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হবে তা হল কর্মজ্ঞানের দৃষ্টান্ত।

2. —কে জানা ঃ বস্তুজ্ঞান ॥ অনেক সময় আমরা "জ্ঞান" কথাটি ব্যবহার করি পরিচয় অর্থে, সেরূপ "জানা" বলতে বুঝি—চেনা। যেমন, আমরা বলিঃ তুমি রামকে জান কি; উত্তরে হয়ত বলিঃ হাঁ আমি রামকে জানি। এখানে "জানা"

---

* যথাক্রমে—knowing how, knowlege of (রাসেল্-এর knowledge of things) ও knowing that (রাসেলের knowledge of truths)

অর্থ চেনা। এ অর্থে কোনো বস্তুকে জেনেও, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলেও, বস্তুটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাও জানতে পারি। যেমন, রামের সম্বন্ধে প্রায় কোনো কিছু না জেনেও আমি রামকে জানতে পারি (অবশ্য রাম সম্বন্ধে অন্তত এটুকু জানি যে ঐ ব্যক্তির নাম রাম)। উক্তরূপ জ্ঞানকে বলে বস্তুজ্ঞান। এবং "ক —কে জানে" এ আকারে ক-এর বদলে কোনো ব্যক্তির নাম আর ড্যাসের জায়গায় কোনো বস্তুর বা ব্যক্তির নাম বসালে বস্তুজ্ঞানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে, যথা রামকে, "জানা"-র আলোচ্য অর্থে না জানলেও, না চিনলেও, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি ("জানার" অন্য অর্থে, তৃতীয় অর্থে)। যথা, জানতে পারি যে রাম রমেশবাবুর প্রথম পুত্র, জানতে পারি যে রাম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, জানতে পারি যে রাম প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছে। এ বাক্যটি লক্ষ কর: তুমি ধনীর দুলাল, অভাব কী তুমি জান না, জান না যে অভাবের তাড়নায় লোকে আত্মহত্যা করতে পারে। এ বাক্যে প্রথম "জান না"-টিতে "জানা" কথাটি বস্তুজ্ঞান অর্থে ("—কে জানা" অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে, আর দ্বিতীয় "জান না"-টির "জানা" কথাটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শেষোক্ত প্রকারের "জানার" অর্থ নিচে আলোচিত হল।

3. **জানা যে —: ব্যাপারজ্ঞান।।** ব্যাপারজ্ঞানকে বাচনিক জ্ঞান বলেও অভিহিত করা যায়। এ অর্থে জানা মানে কোনো বাক্য সত্য বলে জানা। এ অর্থে আমরা বলি: আমি জানি যে —, সে জানে যে —। এ ক্ষেত্রে "যে"র পরবর্তী ড্যাসের স্থলে কোনো (নির্দেশক) বাক্য বসালে ব্যাপার-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যথা: আমি জানি যে $2+2=4$, সে জানে যে সব মানুষই স্বার্থপর। আলোচ্য প্রকারের জ্ঞানের দৃষ্টান্তবোধক বাক্যে "যে" কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ "যে" শব্দটি বাচনিক জ্ঞানের নির্দেশক। জানার শেষোক্ত অর্থে, যদি কারও কোনো বিষয়ে জ্ঞান আছে কি না তা বোঝার জন্য প্রশ্ন করতে হয় তাহলে সে প্রশ্নের আকার হবে: তুমি কি জান যে — এবং এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্ত আকার গ্রহণ করবে: আমি জানি যে —, আমি জানি না যে —।

যে তিন প্রকারের জ্ঞানের কথা বলা হল তাদের সম্পর্ক আলোচনা করলে দেখা যাবে: ব্যাপারজ্ঞানই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একে অন্য দু রকমের জ্ঞানের আবশ্যিক সর্তও বলা যায়, বলে মনে হয়। কর্মজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান হতে হলে, কোনো কাজ করতে জানতে হলে, কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে জানতে (চিনতে) হলে, অবশ্যই কিছু ব্যাপারজ্ঞান থাকার দরকার। যথা, সাঁতার কাটতে জানতে হলে (কর্মজ্ঞান) অন্তত এ ব্যাপারজ্ঞান থাকার দরকার যে: জলের প্রকৃতি এরূপ, জানার দরকার যে: হস্তপদ সঞ্চালন না করলে জলে ডুবে যায়। রামকে জানতে হলে (বস্তুজ্ঞান) অন্তত এ ব্যাপারজ্ঞান থাকার দরকার যে এ ব্যক্তির নাম রাম। অপরপক্ষে, সাঁতার কাটতে না জেনেও ("—তে জানা" অর্থে) সাঁতার কাটা সম্বন্ধে অনেক সত্য বাক্য জানা যায় ("জানা যে—" অর্থে),

সাঁতার কাটা সম্বন্ধে বই লেখা যায়। সক্রেটিস্‌কে না জেনেও ("—কে জানা অর্থে) সক্রেটিস্‌ সম্বন্ধে অনেক ব্যাপারজ্ঞান থাকতে পারে।

যে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হল তাদের মধ্যে তৃতীয় প্রকার জ্ঞানই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সাধারণভাবে জ্ঞান বলতে এখন থেকে বুঝব বাচনিক জ্ঞান।

2. "জ্ঞান" ঃ ব্যাপকতম অর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ

ভারতীয় দার্শনিকরা "জ্ঞান" শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। এ অর্থে তাঁরা মিথ্যাজ্ঞানের কথাও বলেন। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করে তারও জ্ঞান হয়, তবে তার জ্ঞান হল অ-যথার্থ জ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান। এটি "জ্ঞান"-এর ব্যাপকতম অর্থ।

মনে রাখতে হবে ঃ আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করতে যাচ্ছি। পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণত "জ্ঞান" অনেক সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে—"মিথ্যা জ্ঞান" বা "ভ্রমজ্ঞান" স্ববিরোধী কথা। আমরা এ সংকীর্ণ অর্থেই "জ্ঞান" শব্দটি ব্যবহার করব।

জ্ঞান ও সত্যতা ।। আমি জানি ঃ এ ফুলটা লাল

আমি জানি ঃ দুই আর দুইতে চার

এখানে আমি জানি বলার অর্থ— এ দাবী করা যে, কোলনের পরবর্তী বাক্যগুলি সত্য। কোনো বাক্য, ব, সত্য হলেই এ দাবী করা যায় ঃ আমি জানি যে ব।

আমি জানি যে ব, এবং ব বাক্যটি মিথ্যা—এটা একটা স্ববিরোধী উক্তি*

কিন্তু আমি তুমি সত্য বলে না জানলেও কোনো বাক্যের সত্য হতে বাধা নেই। এমন বহু বাক্য আছে যা সত্য বলে আমার তোমার জানা নেই। কিন্তু কোনো বাক্য ব সত্য না হলে এ কথা বলা যায় না যে ঃ আমি জানি যে ব (সত্য)। আমি জানি যে ব—এ বাক্য যদি সত্য হয়, আমার যদি প্রকৃতই এ জ্ঞান হয়, তাহলে অবশ্যই ব সত্য। কাজেই

আমি জানি যে ব, ∴ ব সত্য

এ যুক্তি বৈধ ॥ কিন্তু "ব সত্য"—এ বাক্য থেকে এ কথা নিঃসৃত হয় না যে কোনো ব্যক্তি ক জানে যে ব। কাজেই

ব সত্য, ∴ ক-ব্যক্তি জানে যে ব

এ যুক্তি অবৈধ ॥

3. "সত্য হওয়া" আর "সত্য বলে বিশ্বাস করা"

লক্ষণীয় যে

ব বাক্যটি সত্য

আমি বিশ্বাস করি যে ব (সত্য)

---

* অবশ্য আমরা এমন উক্তিও করি : আমি জানতাম যে তুমি সত্যবাদী, এখন দেখছি তুমি সত্যবাদী নও। এখানে "জানতাম" মানে মনে করতাম, বিশ্বাস করতাম।

আরও একটা কথা। " 'ব' সত্য (মিথ্যা)"-এর পরিবর্তে আমরা সংক্ষেপে লিখব : ব সত্য (মিথ্যা)।

এ বাক্য দুটি সমার্থক নয়। আমরা বিশ্বাস করতে (মনে করতে) পারি অমুক বাক্যটি সত্য ; কিন্তু বাক্যটি বস্তুত মিথ্যা হতে পারে ; আবার কেউ সত্য বলে বিশ্বাস না করলেও কোনো বাক্য সত্য হতে পারে।

রাম বিশ্বাস করে যে ব সত্য কিন্তু ব সত্য নয়

রাম বিশ্বাস করে না যে ব সত্য কিন্তু ব সত্য

এ বাক্য দুটির কোনোটির মধ্যে কোনো অসংগতি নেই।

"সত্য হওয়া" আর "সত্য বলে বিশ্বাস করা" এক কথা নয়। "ব সত্য" আর "ক ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে ব সত্য" এ বাক্য দুটির পার্থক্য এভাবে ও দেখানো যায়।

রাম বলল ঃ ব সত্য শ্যাম বলল ঃ ব সত্য নয়

এখানে রাম ও শ্যামের উক্তি—"ব সত্য" ও "ব সত্য নয়" পরস্পরবিরোধী। কিন্তু

রাম বলল ঃ আমি বিশ্বাস করি যে ব সত্য

শ্যাম বলল ঃ আমি বিশ্বাস করি যে ব সত্য নয়, (বা

শ্যাম বলল ঃ আমি বিশ্বাস করি না যে ব সত্য)

এ ক্ষেত্রে কিন্তু রাম ও শ্যামের উক্তি* পরস্পরবিরোধী নয় ; এ উক্তি দুটির উভয়ই যুগপৎ সত্য হতে পারে। একই বাক্য যুগপৎ সত্য ও মিথ্যা হতে পারে না, কিন্তু একই বাক্যকে কেউ সত্য, কেউ মিথ্যা বলে মনে করতে (বিশ্বাস করতে) পারে। এর থেকে বোঝা গেল যে কোনো বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা কারও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। আমার যদি স্থির বিশ্বাস হয় যে ব সত্য তাহলেও ব মিথ্যা হতে পারে, আর আমি যদি বিশ্বাস করি ব মিথ্যা তাহলেও এমন হতে পারে যে ব প্রকৃতপক্ষে সত্য।

4. জ্ঞান ও বিশ্বাস ঃ "বিশ্বাস করা" ("মনে করা")

রাম বলল ঃ চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পাহাড় আছে। আমরা জানি "চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পাহাড় আছে" এ বাক্য সত্য না হলে বলা যায় না যে ঃ রাম জানে —চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পাহাড় আছে। ধরা যাক, চাঁদের অপর দিকে সত্যই পাহাড় আছে। তাহলে, "চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পাহাড় আছে"—এ বাক্য সত্য। ধরা যাক, রাম কিন্তু বিশ্বাস করে না যে চাঁদের অপর দিকে পাহাড় আছে। রাম উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছে রসিকতা করে, বা "অপর" কথাটির ব্যবহার বোঝাতে গিয়ে, বা কোনো কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে॥ প্রশ্ন ঃ তাহলে কি বলা যায়— রাম জানে যে চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পাহাড় আছে ? উত্তর ঃ না, যায় না। কোনো বাক্য ব সত্য —এ জ্ঞান হতে গেলে "ব বাক্যটি সত্য" এ কথা বিশ্বাস করার দরকার। ধরা যাক, রাম বিশ্বাস করে না যে ব সত্য, তাহলে রাম সঙ্গতভাবে এ দাবীও করতে পারে না ঃ আমি জানি যে ব। কাজেই

* উক্তি বলতে এখানে কোলনের পরবর্তী অংশ বোঝাচ্ছে।

আমি জানি যে ব কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না (মনে করি না) যে ব
—এ উক্তি স্ববিরোধী ।*

"জানা"র বা "সত্য বলে জানা"র অর্থের মধ্যে সত্য-বলে-বিশ্বাস-করাও নিহিত আছে। অর্থাৎ "আমি জানি যে ব" এ বাক্য থেকে নিঃসৃত হয় যে "আমি বিশ্বাস করি যে ব"। তার মানে

আমি জানি যে ব, ∴ আমি বিশ্বাস করি যে ব

এ যুক্তি বৈধ ॥ কিন্তু কেউ যদি কোনো বাক্যকে সত্য বলে মনে করে (বিশ্বাস করে) তাহলেই বলা যায় না যে ঃ সে জানে যে ব্যকটি সত্য। কেননা, আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করলেও কোনো বাক্য বস্তুত মিথ্যা হতে পারে, এবং কোনো বাক্য ব মিথ্যা হলে বলা যায় না যে ঃ ক ব্যক্তি জানে যে ব। কাজেই

আমি বিশ্বাস করি যে ব, ∴ আমি জানি যে ব

এ যুক্তি অবৈধ ॥

5. জ্ঞান ও নিশ্চিতিবোধ

জ্ঞান ও বিশ্বাসের পার্থক্য সম্বন্ধে যা বলেছি তার উত্তরে কেউ হয়ত বলবেন ঃ "জানা" মানে বিশ্বাস-করা নয়, ঠিক ; তবে "জানা" মানে নিশ্চিতিবোধ থাকা, "জ্ঞান" মানে নিশ্চিতিবোধ। ক-এর যদি ব সম্বন্ধে নিশ্চিতিবোধ থাকে তাহলেই বলা যাবে ঃ ক জানে যে ব।

কিন্তু "জ্ঞান" আর "নিশ্চিতিবোধ" একার্থক নয়। কোনো বিষয়ে জ্ঞান হলে অবশ্যই নিশ্চিতিবোধ জন্মে। কিন্তু কারও কোনো বিষয়ে, ব বিষয়ে, নিশ্চিতিবোধ থাকলেই বলা যায় না যে সে-ব্যক্তি জানে যে ব। জ্ঞান আর বিশ্বাস-করণের পার্থক্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, জানা আর নিশ্চিতিবোধ-থাকা সম্বন্ধেও ঠিক তাই বলা যায়। বলতে পারি ঃ

ক জানে যে ব, ∴ ক-এর এ নিশ্চিতিবোধ আছে যে ব সত্য

এ যুক্তি বৈধ। কিন্তু

ক-এর এ নিশ্চিতিবোধ আছে যে ব সত্য, ∴ ক জানে যে ব

এ যুক্তি অবৈধ ॥

6. জ্ঞান ও অবশ্যম্ভব[1] সত্য

বিশ্বাস ও আপতিক[2] সত্য ঃ "জ্ঞান"-এর সংকীর্ণতম অর্থ

আমরা বলেছি— ভারতীয় দার্শনিকরা "জ্ঞান" কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। আমরা যে সংকীর্ণ অর্থে এ কথাটি ব্যবহার করছি সে অর্থে "মিথ্যাজ্ঞান", "ভ্রমজ্ঞান" এসব স্ববিরোধী কথা। কোনো কোনো পাশ্চাত্য দার্শনিক "জ্ঞান" কথাটি আরও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন। তারা বলেন—

---

* আমরা এমন উক্তি করি ঃ আমি জানি যে লটারিতে এক লক্ষ টাকা পেয়েছি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বলা বাহুল্য এ বাক্যের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই, কেননা এখানে "বিশ্বাস করতে পারছি না" মানে – কল্পনা করি নি, আশা করি নি।

1. necessary 2. contingent

কোনো বাক্য ব অবশ্যম্ভবভাবে সত্য না হলে বলা যায় না যে: আমি জানি যে ব। ব যদি বস্তুত সত্য হয় তাহলে ব সম্বন্ধে বড় জোর বলা যায়: আমি বিশ্বাস করি যে ব। এ মতে: জ্ঞান মাত্রই অবশ্যম্ভব সত্যের জ্ঞান, পূর্বতসিদ্ধ বাক্যের জ্ঞান। বস্তুত-সত্য বা আপাতিক-সত্য বাক্য বিশ্বাস করা যায়, সত্য বলে জানা যায় না ॥

ধরা যাক, ব একটি বস্তুত-সত্য (পরতসাধ্য[1]) বাক্য
আর, ভ একটি অবশ্যম্ভব-সত্য (পূর্বতসিদ্ধ[2]) বাক্য
তাহলে, আলোচ্য মতে এ কথা বলা যাবে না যে

ক জানে যে ব।

বলা যেতে পারে

ক বিশ্বাস করে যে ব।

কিন্তু এ কথা বলা যাবে যে

ক জানে যে ভ (যেখানে ভ একটি অবশ্যম্ভব বাক্য) ॥

এ মতে

ক জানে যে ব এবং ব অবশ্যম্ভবভাবে সত্য নয়

এ উক্তি স্ববিরোধী। কেননা জ্ঞানমাত্রই অবশ্যম্ভব সত্যের জ্ঞান।

ওপরে যাদের মত উল্লেখ করছি (প্লেটো ও তার অনুগামীদের, সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদীদের, মত) তাদের মতে

এ ফুলটা লাল, রাম বুদ্ধিমান, সব হাঁস সাদা

এ জাতীয় বাক্যের বিরুদ্ধ বাক্য সম্ভবপর, সুতরাং এরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে, অবশ্যম্ভবভাবে সত্য নয়। সুতরাং এদের সম্বন্ধে "জ্ঞান" বা "জানা" ব্যবহার করা যায় না; যথা, বলা যায় না—

রাম জানে যে এ ফুলটা লাল
আমি জানি যে রাম বুদ্ধিমান ॥

কিন্তু "$2+2=4$", "ত্রিভুজের তিনকোণের যোগফল দু সমকোণ" এসব অবশ্যম্ভব সত্য, এদের বিরুদ্ধ বাক্য সম্ভবপর নয়। সুতরাং এদের সম্বন্ধে "জ্ঞান" বা "জানা" যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়; যথা, বলা যায়—

আমি জানি যে $2+2=4$
আমি জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল দু সমকোণ।

আলোচ্য মতে, যে বাক্যের মিথ্যা হওয়া অসম্ভব সে বাক্য সম্বন্ধেই "জানা" ব্যবহার করা যায়, আর যে বাক্যের মিথ্যা হওয়া সম্ভবপর সে বাক্য সম্বন্ধে "জানা" ব্যবহার করা অসঙ্গত। কিন্তু বস্তুত-সত্য (পরতসাধ্য) বাক্যের মিথ্যা হওয়া একদিক থেকে অসম্ভব। অসম্ভবপরতা দু রকম: যৌক্তিক অসম্ভবপরতা ও বাস্তব অসম্ভবপরতা। "লাল ফুলটা লাল"—এ বাক্যের মিথ্যা হওয়া অসম্ভব; এ অসম্ভবপরতা হল যৌক্তিক অসম্ভবপরতা। আর "এ ফুলটা লাল"—এ বাক্য যদি বস্তুত সত্য হয়

1. a posteriori 2. a priori

তাহলে, এ বাক্যেরও মিথ্যাত্ব অসম্ভব ; এ অসম্ভবপরতা হল বাস্তব অসম্ভবপরতা। "লাল ফুলটা লাল"—এ বাক্যের বিরুদ্ধ বাক্য যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, আর "এ ফুলটা লাল" এর বিরুদ্ধ বাক্য বস্তুত অসম্ভব। কাজেই "ক জানে যে ব"—এ বাক্যে "জানা" বলতে যদি এই বোঝায় যে ব-এর মিথ্যা হওয়া অসম্ভব তাহলেও "জ্ঞান" কথাটি কেবল অবশ্যম্ভব সত্যের জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করা সমীচীন নয় ; বস্তুত-সত্য বাক্যের বেলায়ও জ্ঞানের কথা বলা যায়।

তাছাড়া, সাধারণ ভাষায় আমরা যেমন পূর্বতসিদ্ধ বাক্যের, অবশ্যম্ভব সত্যের, জ্ঞানের কথা বলি তেমনি আবার বস্তুত-সত্য, পরতসাধ্য বা আপতিক বাক্যের বেলায়ও জ্ঞানের কথা বলি। যথা, আমরা বলি

আমি জানি যে ঃ $2+2=4$

আমি জানি যে ঃ এটা আমার ডান হাত

(ডান হাত দেখিয়ে)। কেবল প্রথম প্রকারের বাক্যের বেলায় "জানি" ব্যবহার করা সঙ্গত, আর দ্বিতীয় প্রকারের বাক্যের বেলায় "জানি"র প্রয়োগ অসঙ্গত —এ কথা বলার কোনো যুক্তি নেই।

7. জ্ঞান কী ?

মনে করা যাক, ক কোনো ব্যক্তি আর ব কোনো বাক্য (নির্দেশক বাক্য)। "জ্ঞান কী ?" এ প্রশ্নটি আমরা এভাবে উত্থাপন করতে পারি ঃ কখন এ কথা বলা যায় যে—"ক জানে যে ব"? কী কী সর্ত পালিত হলে বলতে পারি "ক জানে যে ব" ?

প্রথম সর্ত ঃ ব-কে অবশ্যই সত্য হতে হবে। ব যদি মিথ্যা হয় তাহলে এ কথা বলা যায় না যে "ক জানে যে ব"। আমরা "জানা" কথাটি যে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছি সে অর্থে

ক জানে যে ব ⊃ ব সত্য* —এ বাক্য অবশ্যম্ভব সত্য

আর, ক জানে যে ব এবং ব সত্য নয় —এ বাক্য স্ববিরোধী।

এদিক থেকে "মনে করে", "বিশ্বাস করে", "আশা করে", "আকাঙ্খা করে" এসব ক্রিয়াবাচক কথা থেকে "জানে"র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে।

ক মনে করে (বিশ্বাস করে, আশা করে, আকাঙ্খা করে) যে ব সত্য এবং ব সত্য নয়

এ জাতীয় বাক্যের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। কিন্তু ব প্রকৃতপক্ষে সত্য না হলে বলা যায় না যে ঃ ক-এর এ জ্ঞান হয়েছে যে ব। ব-এর সত্যতা ক-ব্যক্তির ব বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত, কিন্তু পর্যাপ্ত সর্ত নয়। অর্থাৎ

ব সত্য না হলে এ জ্ঞান হতে পারে না যে ব

কিন্তু ব সত্য হলেই বলা যায় না কারও ব বিষয়ে জ্ঞান হয়েছে॥ এমন বহু বাক্য আছে যা সত্য, কিন্তু আমরা অনেকে জানি না যে বাক্যগুলি সত্য। কাজেই

* "—এ বাক্য থেকে নিঃসৃত হয় যে—", "—উপপাদন করে যে—" এ কথাগুলির বদলে "⊃" ব্যবহার করা হল।

1. necessary condition 2. sufficient condition

ব সত্য কিন্তু ক জানে না যে ব

এ বাক্য স্ববিরোধী নয়। সংক্ষেপে, সত্যতা জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত, পর্যাপ্ত মত নয়।

দ্বিতীয় সর্ত ঃ ব-কে কেবল সত্য হলে চলবে না। ক-ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে যে ব সত্য। "জানা" কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে সে অর্থে

ক জানে যে ব ⊃ ক বিশ্বাস করে যে ব—এ বাক্য অবশ্যম্ভব সত্য

আর, ক জানে যে ব কিন্তু ক বিশ্বাস করে না যে ব—এ বাক্য স্ববিরোধী। ব-বিশ্বাস করাও ব-জানার আবশ্যিক সর্ত। অর্থাৎ ক-এর এ বিশ্বাস না থাকলে বলা যাবে না যে ঃ ক জানে যে ব। কিন্তু বিশ্বাস, এমন কি নিশ্চিতিবোধও জ্ঞানের পর্যাপ্ত সর্ত নয়। অর্থাৎ ক-এর যদি এ বিশ্বাস বা নিশ্চিতিবোধ থাকে যে ব সত্য কেবল তাহলেই বলা যাবে না—ক জানে যে ব। কাজেই এমন হতে পারে যে

ক বিশ্বাস করে যে ব, কিন্তু ক জানে না যে ব।

ওপরে যে সর্ত দুটির কথা বলা হল, তাদের প্রত্যেকটি আবশ্যিক সর্ত, কোনেটি পর্যাপ্ত সর্ত নয়। আবার সর্ত দুটি যুক্ত করলেও জানার পর্যাপ্ত সর্ত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এ কথা বলা যায় না যে

ক বিশ্বাস করে যে ব এবং ক সত্য = ক জানে যে ব।

নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে ব সত্য—এ বিশ্বাস এবং ব-এর সত্যতা ব-জানার পর্যাপ্ত সর্ত নয়।

উক্তির সময়	বক্তা	উক্তি বা বিশ্বাস
পয়লা বৈশাখ	রাম	কাল আমি লটারীতে এক লক্ষ টাকা পাব
পয়লা জ্যৈষ্ঠ, উনসত্তর সাল	শ্যাম	এ বছর পয়লা আষাঢ় বৃষ্টি হবে

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ ধরা যাক, দোসরা বৈশাখ রাম সত্যই লটারিতে এক লক্ষ টাকা পেল। কাজেই রামের বিশ্বাস সত্য হল। কিন্তু আমরা কি বলব যে পয়লা বৈশাখ রাম জানত যে দোসরা বৈশাখ সে এক লক্ষ টাকা পাবে?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ ধরা যাক, উনসত্তর সালের পয়লা আষাঢ় বৃষ্টি হল, এবং শ্যামের বিশ্বাস বা ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য প্রমাণিত হল। কিন্তু এ কথা কি বলা যাবে —উনসত্তরের পয়লা জ্যৈষ্ঠ, শ্যাম জানত যে ঐ বছর পয়লা আষাঢ় বৃষ্টি হবে?

উপরোক্ত উদাহরণগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, এমন হতে পারে ঃ

ক বিশ্বাস করে যে ব, এবং ব সত্য, কিন্তু তবু বলা যায় না "ক জানে যে ব"।

কাজেই ব-এর সত্যতা এবং 'ব সত্য' এ বিশ্বাস ক-জানার পর্যাপ্ত সর্ত নয়। তাহলে জ্ঞানের পর্যাপ্ত সর্ত কী? আর কোন্ সর্ত পূরিত হলে বলা যাবে— ক জানে যে ব। প্লেটো এ সমস্যার কথা তোলেন। প্লেটোকে অনুসরণ করে সমস্যাটি এভাবে উত্থাপন করা যায় ঃ

জ্ঞান ও সত্য বিশ্বাসের* পার্থক্য কী?

এবং এভাবে সমস্যাটির পুনরুক্তি করা যায় ঃ

ক জানে যে ব

এ উক্তিকে সত্য হতে হলে, নির্ভুলভাবে এ উক্তি করতে হলে,

1. অবশ্যই ব-কে সত্য হতে হবে
2. অবশ্যই ক-কে বিশ্বাস করতে হবে যে ব
3. ....।

এখানে তৃতীয় সর্তের শূন্যস্থান কী দিয়ে পূরণ করব? এটা প্লেটোর সমস্যা।

আমরা প্লেটো-উত্থাপিত সমস্যার একটি দিক উল্লেখ করেছি: তৃতীয় সর্তটি কী? এর আরও একটি দিক হল এই: তৃতীয় সর্তের শূন্যস্থানে যা-ই নিবেশন করি না কেন, তার অর্থ হবে "জানতে হবে যে —"। অর্থাৎ, "জানা" কথাটি ধরে না নিয়ে "জানা"র অর্থ ব্যাখ্যা করা, জ্ঞানের পর্যাপ্ত সর্ত উল্লেখ করা, শক্ত। কিন্তু "জানা"র অর্থ পূর্বেই ধরে নিলে চক্রক দোষ হতে বাধ্য। মনে করা যাক, তৃতীয় সর্তটি এভাবে উল্লেখ করা হল

3. ক-কে নির্ভুল প্রত্যক্ষে (স্মৃতিতে বা অনুমানে) লাভ করতে হবে যে ব।
এখন "নির্ভুল প্রত্যক্ষে...........লাভ করতে হবে যে" এর অর্থ হল: জানতে হবে যে —।

তাহলে প্রকৃতপক্ষে সর্ত তিনটিতে বলা হয় যে:

ক জানে যে ব

এ উক্তিকে সত্য হতে হলে

1. অবশ্যই ব-কে সত্য হতে হবে
2. অবশ্যই ক-কে বিশ্বাস করতে হবে যে ব
3. ক-কে জানতে হবে যে ব ॥

বলা বাহুল্য, উক্ত ব্যাখ্যা চক্রক দোষে দুষ্ট। সমস্যা হল চক্রক দোষ এড়িয়ে কি ভাবে "জ্ঞান" কথাটি ব্যাখ্যা করা যায়। বিভিন্ন দার্শনিক এ সমস্যাটি নানান ভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ যে সফল হয়েছেন তা বলা যায় না। এসব প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ হল এই: জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়া যায় না, কেবল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় "জানা" বলতে কি বোঝায় তা আমরা বুঝি। জ্ঞানের পর্যাপ্ত সর্ত ও লক্ষণ দিতে পারি না, ঠিক; কিন্তু জ্ঞান কাকে বলে বুঝতে পারি।

জ্ঞানের লক্ষণ বা পর্যাপ্ত সর্ত উল্লেখ করতে না পারলেও আমরা অন্তত দুটি আবশ্যিক সর্ত উল্লেখ করেছি, "জ্ঞান" কথাটির বিভিন্ন অর্থ আলোচনা করেছি, কোন্ অর্থে এ কথাটি ব্যবহার করব তা বলেছি। উপরোক্ত আলোচনার এটাই সার্থকতা।

---

* "সত্য বিশ্বাস" মানে এই নয় যে: ব সত্য —এ বিশ্বাস; এ কথার মানে: ব বস্তুত সত্য, এবং ব সত্য —এ বিশ্বাস।

চতুর্থ অধ্যায়

সত্যতা

1. ভূমিকা

জ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা করতে গেলে সত্যতার কথা না তুলে উপায় নেই। আমরা দেখেছি,

ক জানে যে ব

এ কথা বলা যায় না, যদি না ঃ

ব বস্তুত সত্য হয়, এবং

ক বিশ্বাস করে যে ব সত্য।

এখন 'ব সত্য' এ কথা সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করা যায় কখন? ব সত্য—এটা যদি ক-এর অন্ধবিশ্বাস হয়, ক যদি অহেতুক বিশ্বাস করে যে ব, তাহলে কিন্তু বলা যায় না যে ক জানে যে ব সত্য। ক-কে সঙ্গতভাবে এ বিশ্বাস করতে হলে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে ব সত্য। কি করে জানা যায় যে কোনো বাক্য ব সত্য? এটা হল সত্যতা নির্ণয়ের সমস্যা।

কি করে সত্যতা নির্ণয় করা যায়, সত্যতার মানদণ্ড কী? এ প্রশ্নের নানা উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ উত্তরের ভিত্তিতে সত্যতা সম্বন্ধে নানান মতবাদ গড়ে উঠেছে। প্রধান মতবাদগুলি হল ঃ স্বতবোধ্যবাদ* (বা স্বপ্রামাণ্যবাদ), প্রয়োগবাদ, সংসক্তিবাদ ও আনুরূপ্যবাদ।

2. সত্যতানির্ণয় ঃ স্বতবোধ্যবাদ

সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হল স্বতবোধ্যতা[1], নিঃসন্দিগ্ধতা বা নিশ্চিতিবোধ। এ মতবাদ অনুসারে ঃ কোনো বাক্য ব যে সত্য তা স্বতই প্রতীয়মান হয়, স্বতই বোঝা যায় যে ব সত্য, ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য। স্বতবোধ্যতাই সত্যতা নির্ণয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। ব সত্য—এ বিশ্বাস আমাদের কাজে লাগে, বা এ বিশ্বাস অন্য কোনো সত্য বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়—এসব থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে ব সত্য॥ স্বতবোধ্যবাদীরা বলবেন ঃ

ব সত্য এ বিশ্বাসের ফলে প্রবৃত্তিসামর্থ্য হয়, বিশ্বাসটি ফলপ্রসূ;
∴ জানা যায় যে ব সত্য।

আমি যা সত্য বলে জেনেছি তার সঙ্গে ব-এর সংগতি আছে
∴ আমি জানি যে ব সত্য।

এ সব যুক্তি অসঙ্গত॥

---

*স্বতবোধ্য=স্বতঃবোধ্য   1. self-evidence

দেকার্ত আলোচ্য মতবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। তিনি বলেন যা-ই আমাদের বোধে স্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্নরূপে[1] ধরা দেয় তাই সত্য। যথা, "আমি চিন্তা করি এবং আমি আছি"—এ সত্য আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার, এ বাক্যের সত্যতা স্বতবোধ্য ; কাজেই নিশ্চিত হতে পারি যে বাক্যটি সত্য। অন্য নানা হেতুতে ব বাক্যের সত্যতা দাবী করা যেতে পারে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ব সম্বন্ধে সংশয় হতে পারে। ব সম্বন্ধে যদি আমার স্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন বোধ হয়, যদি দেখা যায় ব স্বতবোধ্য, দেকার্ত বলেন, কেবল তাহলেই বলা যায় : আমরা জানি ব সত্য।

দেকার্ত ও লক্ ভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক। কিন্তু দেকার্তের মতো, লক্‌ও বলেন যে স্বপ্রামাণ্যবোধ বা স্বজ্ঞার বলেই আমরা কোনো বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারি। যথা, "যদি ক=খ হয় তাহলে খ=ক"—এ বাক্যের সত্যতা স্বতবোধ্য ; কাজেই নিশ্চিত হতে পারি যে বাক্যটি সত্য। এরকম বাক্যের সত্যতা "দেখা" ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে এদের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যে ব্যক্তি এ বাক্যের সত্যতা "দেখতে" পাবে না তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে বোঝানো যাবে না যে বাক্যটি সত্য।

মনে রাখতে হবে, স্বতবোধ্যবাদীরা এ দাবী করে না যে : স্বতবোধ্যতাই সত্যতা নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড, তারা এ দাবী করেন না যে : সব বাক্যের সত্যতা স্বতবোধ্য, কোনো বাক্য উচ্চারিত হলেই 'স্বতই এ বোধ হবে যে বাক্যটি স্বতসত্য বা স্বতমিথ্যা*। তারা স্বীকার করবেন যে এমন বহু বাক্য আছে যার সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিতিবোধ বা স্বপ্রামাণ্যবোধ নেই, এ সব বাক্য সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা যায়।

স্বতবোধ্যবাদীরা কেবল এ দাবী করেন যে : অন্য প্রকারের বাক্য সম্বন্ধে যাই হোক না কেন, অন্তত যুক্তিবিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ গণিতের মূল সূত্রগুলি —যে সূত্রগুলি নির্ভুল অবরোহের ভিত্তি সে সূত্রগুলি —যে স্বতঃসিদ্ধ স্বতবোধ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।**

তারা বলেন, আমরা যে সত্যতত্ত্বই গ্রহণ করি না কেন—এমন কতকগুলি বাক্য আছে (যুক্তিবিজ্ঞান ও গণিতের মূল সূত্র) যাদের সম্বন্ধে স্বতবোধ্যতা ভিন্ন অন্য কোনো মানদণ্ড খাটে না। এ জাতীয় বাক্যের সত্যতা সাক্ষাৎভাবে প্রতীয়মান হয়, সাক্ষাৎ বোধ বা স্বজ্ঞায়[3] ধরা দেয়।

এটাই আলোচ্য মতের উৎকর্ষ বলে দাবী করা হয়।

---

1. পরিচ্ছিন্ন=distinct * স্বতসত্য=স্বতঃসত্য, স্বতমিথ্যা=স্বতঃমিথ্যা

** স্মরণীয় যে, দেকার্ত নিঃসন্দিগ্ধ ও স্বতবোধ্য বাক্যের যে উদাহরণ দেন তা হল : আমি চিন্তা করি এবং আমার অস্তিত্ব আছে—এ আপতিক বাক্য। বস্তুত এ বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে কি করে নিঃসংশয় হলেন তা অনুসন্ধান করতে গিয়েই দেকার্ত আলোচ্য মানদণ্ডটির সন্ধান পান। (আপতিক=contingent)

3. স্বজ্ঞা=intuition

যেমন, ধরা যাক, বলা হল ঃ

কোনো বাক্যের সঙ্গে যদি বাক্যবর্ণিত ব্যাপারের মিল থাকে তাহলে বাক্যটি সত্য বলে গণ্য।

কিন্তু কোনো বাক্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ব্যাপারের যে মিল তার সাক্ষাৎ প্রতীতি না হলে, মিল যে আছে তা "দেখা" না গেলে, বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা বোঝা যাবে না ॥

আবার, ধরা যাক, বলা হল ঃ

কোনো বাক্য ব-এর সঙ্গে অন্য কতকগুলি বাক্য ত, থ, দ, ধ-এর যদি সংগতি থাকে তাহলে ব সত্য বলে গণ্য।

এক্ষেত্রেও বলা যায়, সংগতি যে আছে তা স্বতবোধ্য না হলে, তা "দেখা" না গেলে, জানা যাবে না যে ব সত্য।

তারপর বলতে পারি ঃ

যদি কোনো বাক্য ভ অন্য কোনো সত্য বাক্য ব থেকে নির্ভুলভাবে নিঃসৃত হয় তাহলে ভ সত্য বলে গণ্য।

ভ সত্য, কেননা ব সত্য। কিন্তু ব যে সত্য তা কেমন করে জানি? উত্তর ঃ কেননা, জানি যে ফ সত্য। কিন্তু ফ যে সত্য তা কেমন করে জানা গেল? উত্তর ঃ কেননা, জানি যে প সত্য। ভ কেননা ব, ব কেননা ফ, ফ কেননা প.........এভাবে ক্রমাগত পিছু হটে এক জায়গায় (মৌলিক সূত্রে) এসে থামতে হবে, এবং বলতে হবে অমুক বাক্যটি যে সত্য তা স্বতবোধ্য।

স্বতবোধ্যবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া দরকার। ধরা যাক,

ব একটি অবশ্যম্ভব বাক্য এবং

ভ একটি পরতসাধ্য[1] বাক্য (সুতরাং ভ নিঃসন্দিগ্ধ নয়, বস্তুত ধরা যাক ভ মিথ্যা)

এখন স্বতবোধ্যবাদের জোরে

ক দাবী করল ঃ আমি জানি যে ব সত্য, কেননা বাক্যটি স্বতবোধ্য মনে হচ্ছে

খ দাবী করল ঃ আমি জানি যে ভ সত্য, কেননা বাক্যটি আমার কাছে স্বতবোধ্য বা আমার স্বজ্ঞা নামক বোধে জেনেছি যে ভ সত্য।

আমরা কি খ-এর দাবী মেনে নেব? বলা বাহুল্য খ-এর দাবী অসঙ্গত (কেননা ভ মিথ্যা*)। কেন ক-এর দাবী সঙ্গত, আর খ-এর দাবী অসঙ্গত? এর উত্তরে কিন্তু বলা যাবে না যে— ব অবশ্যম্ভব সত্য কিন্তু ভ মিথ্যা। কেননা দুটি ক্ষেত্রেই স্বতবোধ্যতার দাবী করা হয়েছে এবং স্বতবোধ্যতা বা স্বপ্রামাণ্যবোধের দিক থেকে বাক্য দুটির মধ্যে কোনো ভেদ নেই। যদি বলা হয় ব অবশ্যম্ভব সত্য, এবং ভ মিথ্যা, বলে ক-এর দাবী গ্রাহ্য আর খ-এর দাবী অগ্রাহ্য, তাহলে স্বীকার করা হয় যে স্বতবোধ্যতা ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে জানতে পেরেছি যে ব সত্য আর ভ মিথ্যা। তা যদি জানা যায় তাহলে স্বতবোধ্যতা মানদণ্ডের আর প্রয়োজন কোথায়?

---

1. পরতসাধ্য=পরতঃসাধ্য=contingent=আপতিক

* মনে করা যাক, খ-এর রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। সেক্ষেত্রে, ভ = এটি একটি সাপ।

ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যায় যে স্বতবোধ্যতা একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড বলে গ্রাহ্য হতে পারে না।

যে বাক্যই স্বতবোধ্য তাই সত্য বলে গণ্য

—এ নীতি মেনে নিলে সত্য বাক্যকে সব সময় মিথ্যা বাক্য থেকে পৃথক করা যায় না। অসত্য বাক্যে স্বতমিথ্যাত্বের ছাপ থাকে না, অসত্য বাক্যও স্বতসত্য বলে প্রতীয়মান হয়। ভ্রমপ্রত্যক্ষে বা অমূলপ্রত্যক্ষেও নিশ্চিতিবোধ বা স্বপ্রামাণ্যবোধ থাকে। যে ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সেও মনে করে "ওটা একটা সাপ" এ বাক্য স্বতবোধ্য, স্পষ্ট, পরিচ্ছিন্ন ও সুনিশ্চিত।

আমি জানি যে ব সত্য, কেননা ব আমার কাছে স্বতবোধ্য

(দেকার্তের ভাষায়, ব স্পষ্ট, পরিচ্ছিন্ন বা স্বপ্রকাশিত)

—এ যুক্তি মানা যায় না, মানলে যে কোনো ব্যক্তির—অমুক বাক্য সত্য—এ জাতীয় যে কোনো দাবী মেনে নিতে হবে। যথা, স্বীকার করতে হবে যে

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, আত্মা অমর, আমি ঈশ্বর বা ঈশ্বরের দূত, ঈশ্বর আমায় এ কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন, জড়ও চিন্ময়, আমি ব্রহ্মস্বরূপ

এসব বাক্য—কারও না কারও কাছে সত্য বলে প্রতিপন্ন ; কেননা কেউ না কেউ, সাধারণভাবে অতীন্দ্রিয়ানুভববাদীরা, দাবী করেছেন যে এসব বাক্য তাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, স্বতবোধ্য। আমরা বলছি না যে উক্ত বাক্যগুলি মিথ্যা, কেবল বলছি : কারও কাছে স্বতবোধ্য বলে মনে হয়েছে বলে উক্ত বাক্যগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে—এ কথা মানা যায় না।

দেকার্ত স্পষ্টতা ও পরিচ্ছিন্নতার কথা, স্বতপ্রকাশতার* কথা, বলেন। কিন্তু যা একজনের কাছে স্পষ্ট তা অন্যের কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে ; হতে পারে—আমার কাছে ব স্পষ্ট ও স্বতপ্রকাশিত, কিন্তু তোমার ব বিষয়ে সংশয় আছে। কাজেই স্পষ্টতা, পরিচ্ছিন্নতা বা স্বতবোধ্যতা সত্যতানির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড বলে গণ্য হতে পারে না। স্বতবোধ্যতার মত বিষয়ীগত মানদণ্ড মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে : সত্য আপেক্ষিক, একই বাক্য ব অমুকের পক্ষে সত্য, তমুকের পক্ষে অসত্য।

স্বতবোধ্যতা মানদণ্ডের সমর্থনে অনেক সময় কেবল এ দাবীই করা হয় যে গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্বতসিদ্ধ** বাক্য সম্বন্ধে স্বতবোধ্যতা মানদণ্ডটি খাটে। কিন্তু এ সীমিত দাবীও কি টেকে? এ কথা কি বলা যায় যে : স্বতবোধ্যতা মানদণ্ড প্রয়োগ করেই জেনেছি যে অমুক অমুক বাক্য সত্য? বলা যায় বলে মনে হয় না। কেননা এমন বহু গাণিতিক বাক্য আছে যা আমরা সত্য বলে স্বীকার করি অথচ বাক্যগুলি স্বতবোধ্য নয়। যথা, আমরা জানি $1234 + 5678 = 6912$—এ বাক্যটি সত্য ; কিন্তু এ কথা বলা যায় না, স্বতবোধ্যতা দিয়েই বুঝতে পেরেছি যে বাক্যটি সত্য (বস্তুত অঙ্ক কষে তবে জেনেছি যে বাক্যটি সত্য)। আর একটা উদাহরণ।

---

* স্বতপ্রকাশ=স্বতঃপ্রকাশ ** পূর্বতসিদ্ধ=পূর্বতঃসিদ্ধ

n সংখ্যক অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল n^2

এ বাক্যটি স্বতবোধ্য নয়, অথচ এ বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানতে পারি যে বাক্যটি সত্য (পারি, অন্য কোনো মানদণ্ড প্রয়োগ করে)।

3. সত্যতার লক্ষণ ও সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড

আমরা সত্যতা নির্ণয়ের কথা বলেছি এবং এ প্রসঙ্গে একটি মতবাদ আলোচনা করেছি। সত্যতা কী তা বলি নি। স্পষ্টতই ব যে সত্য এ জ্ঞান আর ব যে সত্য এ ব্যাপার—এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ব-এর সত্য হওয়া আর 'ব সত্য' একথা জানা এক কথা নয়। "সত্য" আর 'সত্য বলে নির্ণিত" একার্থক নয়। এমন হতে পারে যে ব সত্য কিন্তু আমরা জানি না যে ব সত্য। তার মানে, সত্যতা প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন ওঠে :

(i) কোনো বাক্যের সত্যতা বলতে কী বোঝায় ? 'ব সত্য' এ কথার অর্থ কী ?

(ii) কোনো বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা কি করে নির্ণয় করা যায় ? কি করে জানা যায় যে ব সত্য ?

প্রথম প্রশ্নটি সত্যতার লক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন। প্রশ্নটি এভাবেও ব্যক্ত করা যায় : যে ধর্ম থাকার দরুণ বাক্য সত্য হয় সে ধর্মটি কী ? সত্যতার লক্ষণ কী ? স্বরূপ কী ? এ সমস্যা সত্যতার লক্ষণ রচনার, সত্যতার স্বরূপ নিরুপণের, সমস্যা। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সত্যতার পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন। প্রশ্নটি এভাবেও উত্থাপন করা যায় : কি করে জানি অমুক বাক্যটি সত্য ? কোনো বাক্য সত্য কি সত্য নয় তা কি করে নির্ণয় করব ? 'ব বাক্যটি সত্য'—এ দাবীর যাথার্থ্য পরীক্ষা করব কি করে ?

সত্যতার লক্ষণ কী ? সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড কী ? —এ প্রশ্ন দুটি যে ভিন্ন তা অনস্বীকার্য। কোনো বাক্য ব সত্য—এ কথার অর্থ এই নয় যে অমুক পরীক্ষা করে জানতে পেরেছি যে ব সত্য। একটা উদাহরণ। "ঔরঙ্গজেব তার পিতাকে বন্দী করেছিল এবং ভ্রাতাকে হত্যা করিয়েছিল" (এ বাক্যটির পরিবর্তে ব ব্যবহার করব)—এ বাক্যের সত্যতা নির্ণয় করেছি ঐতিহাসিক নথিপত্র দেখে। ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখে জেনেছি যে বাক্যটি সত্য। কিন্তু ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন বলেই, নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে বলেই, ব বাক্যটি সত্য হয়নি ; ব সত্য কেননা : বস্তুত ঔরঙ্গজেব তার পিতাকে বন্দী করেছিল, তার ভ্রাতা দারাকে ঘাতক দিয়ে খুন করিয়েছিল। তাহলে ব বাক্যটি সত্য এ কথা বলতে কী বুঝি, আর কেমন করে জানলাম যে ব সত্য—এ দুটি ভিন্ন ধরণের জিজ্ঞাসা। কাজেই যে ধর্মের ভাব বা অভাব দেখে সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়, সে ধর্ম দিয়ে সত্যতার লক্ষণ দিতে হবে এমন কথা নেই। অপরপক্ষে, এমন হতে পারে যে— যে-ধর্ম দিয়ে সত্যতার লক্ষণ দেওয়া হল সে-ধর্মের ভাব বা অভাব লক্ষ করে সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা গেল না। যথা, আমরা বলতে পারি—

ব সত্য, কেননা বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে ব-এর আনুরূপ্য আছে (আনুরূপ্যবাদ[1])
কিন্তু আমি জানি যে ব সত্য, কেননা ব বিশ্বাসটি আমাদের কাজে আসে
ব বিশ্বাসের ফলে প্রবৃত্তিসামর্থ্য হয় (প্রয়োগবাদ[2])।

যথা : "এটা জল"—এ বাক্য সত্য, কেননা প্রকৃতই এটা জল, প্রকৃতই এতে জলত্ব ধর্ম আছে। কিন্তু, আমি জানি যে "এটা জল"—এ বাক্য সত্য, কেননা "এটা"-নির্দেশিত পদার্থটি পান করে তৃষ্ণা দূর হল ॥

মনে হতে পারে : যে ধর্ম আছে বলে কোনো বাক্য সত্য হয়, ঠিক সে ধর্মেরই ভাব বা অভাব দেখেই কোনো বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করতে পারা উচিত। যা দিয়ে কোনো পদার্থের, ক-এর, লক্ষণ দেওয়া হয় সে ধর্মের অস্তিত্ব বা অভাব দেখেই ত জানতে পারার কথা প্রদত্ত পদার্থটি সত্যই ক কিনা। যথা, ত্রিভুজের লক্ষণ হল তিন-বাহু-বেষ্টিত-সমতল-ক্ষেত্রত্ব নামক ধর্ম। এখন এ ধর্মটি কোনো পদার্থে আছে কি নেই তা দেখেই বুঝতে পারা উচিত পদার্থটি ত্রিভুজ না অন্য কিছু ॥ কাজেই মনে হতে পারে : যে ধর্ম দিয়ে সত্যতার লক্ষণ দেওয়া হয় সে ধর্মের ভাব বা অভাব দেখেই সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করতে পারার কথা। যথা, আমরা যদি আনুরূপ্য দিয়ে সত্যতার লক্ষণ দিই তাহলে আমাদের বলা উচিত আনুরূপ্যই সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড ॥

কিন্তু "ব সত্য" এ কথার একটাই অর্থ, অথচ নানানভাবে এ বাক্যের সত্যতা নির্ণয় করা যেতে পারে, ব যে সত্য (বা মিথ্যা) তা নানানভাবে জানা যেতে পারে। এ কথার অর্থ : সত্যতার লক্ষণ একভাবে দিলেও নানা ভাবে সত্যতা পরীক্ষা করা যায়। তাছাড়া, এমন হতে পারে যে—যে-ধর্ম থাকার দরুণ কোনো বাক্য সত্য হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে-ধর্মটি বর্তমান কিনা তা সহজে নির্ণয় করা যায় না। যেমন, উত্তাপ বলতে বোঝায় আণবিক চাঞ্চল্য (উত্তাপের লক্ষণ), কিন্তু আণবিক চাঞ্চল্যের সাক্ষাৎ বোধ হয় না; কাজেই কোনো কিছু উত্তপ্ত কিনা তা আমরা স্পর্শ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি (উত্তাপ নির্ণয়ের একটি উপায়)। সেরকম, এমন হতে পারে যে অমুক ধর্ম আছে বলে ব বাক্যটি সত্য, কিন্তু ব-তে যে ঐ ধর্মটি আছে তা সরাসরি জানা যায় না। এরকম ক্ষেত্রে লক্ষণজ্ঞাপক ধর্মটি অনুসন্ধান না করে অন্য ভাবে ব-এর সত্যাসত্য পরীক্ষা করি। এক কথায়, সত্যতার লক্ষণজ্ঞাপক ধর্ম আর সত্যতা-নির্ণায়ক ধর্মকে অভিন্ন হতে হবে—এ কথা মনে করার কোনো সঙ্গত হেতু নেই।

সত্যতার মানদণ্ড হিসাবে আমরা একটি মতবাদ আলোচনা করেছি। নিচে আরও তিনটি মতবাদ আলোচিত হল : প্রয়োগিক সত্যতত্ত্ব[3], সংসক্তিবাদ[4] ও আনুরূপ্যবাদ। স্বতবোধ্যবাদ এ দাবী করে না যে : স্বতবোধ্যতা সত্যতার লক্ষণ, ব সত্য কেননা ব স্বতবোধ্য। এ মতবাদের দাবী হল—স্বতবোধ্যতা

---

1. Correspondence Theory 2. Pragmatism
3. Pragmatic Theory of Truth 4. Coherence Theory

মানদণ্ড দিয়ে সত্যতা পরীক্ষা করা যায়॥ কিন্তু যে মতবাদগুলি আমরা এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি সেগুলি কেবল সত্যতার মানদণ্ডবিষয়ক মতবাদ নয়, সত্যতার লক্ষণ বা স্বরূপ সংক্রান্ত মতবাদও বটে। অর্থাৎ মতবাদগুলির প্রত্যেকটির দাবী এ রকমঃ ধ ধর্মটি সত্যতার লক্ষণ, এবং এ ধর্মটি আছে কি নেই তা দেখেই বোঝা যাবে কোনো বাক্য সত্য নাকি মিথ্যা।

4. প্রায়োগিক সত্যতত্ত্ব

মার্কিন দার্শনিক পারস্, উলিয়াম্ জেমস্, জন্ ডিউঈ প্রয়োগবাদ নামক আধুনিক (প্রধানত মার্কিন) দার্শনিক তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। বলা বাহুল্য, সত্য সম্পর্কে প্রায়োগিক তত্ত্ব, সংক্ষেপে প্রায়োগিক সত্যতত্ত্ব, এঁদেরই নামের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। তবে ইংরেজ প্রয়োগবাদী শীলার-ও জেমস্-এর সত্যতত্ত্ব-সদৃশ একটি সত্যতত্ত্ব প্রচার করেন।

জেমস্ বলেন— বিজ্ঞানে পরীক্ষাভিত্তিক যাচাইকরণের দ্বারাই কোনো ধারণার সত্যতা নির্ণিত হয়। যাচাই-করা ধারণা (অর্থাৎ সত্য ধারণা) আমাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, ব্যবহারিক জীবনের স্বার্থসিদ্ধ করে। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য বলতে বোঝায়ঃ যাচাইকৃত, হিতকর বা স্বার্থসম্পাদক। অধিবিদ্যায় যে সব উক্তি করা হয়, বা ঈশ্বর পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস, তাদের সত্যতা নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য কোনো মানদণ্ড বিজ্ঞানে কিন্তু মেলে না। এদের যাথার্থ্য যাচাই করা যায় না, ঠিক; কিন্তু এদের ফলাফল নির্ণয় করা যায়। জেমস্-এর মতেঃ এ জাতীয় কোনো বিশ্বাসের ফল যদি কল্যাণকর হয়, এ জাতীয় বিশ্বাস যদি আমাদের জীবনে কোনো সুযোগ সুবিধা আনে, জীবন ধারণের পক্ষে হিতকর হয়—তাহলে সে বিশ্বাস সত্য বলে গণ্য। যথা, যদি ঈশ্বরে-বিশ্বাস, ঈশ্বরের কল্পনা বা ধারণা, আমাদের "কাজে লাগে", এর ফল যদি আমাদের পক্ষে শুভ হয় তাহলে, "সত্য"-এর ব্যাপক অর্থে, এসব ধারণা সত্য। কাজেই জেমস্ এ দুঃসাহসিক ও প্রায়-হতবুদ্ধিকর ঘোষণা করলেন যেঃ

> "যে ধরণের আচরণ সুবিধাজনক তাই যেমন নায্য বলে গণ্য, সেরকম যে ধরণের চিন্তা সুবিধাজনক তাই সত্য"।

আবার,

> "সকল বিশেষ বিশেষ সত্যের মধ্যে যে ধর্ম সাধারণভাবে বর্তমান তা (অর্থাৎ সত্যের লক্ষণ) হলঃ এরা কাজে লাগে"॥

(1) প্রয়োগবাদী সত্যতত্ত্বের মূল বক্তব্য

সত্য সম্বন্ধে সব প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মধ্যে যে ঐকমত্য আছে তা নয়। কোনো কোনো ব্যাপারে এদের মধ্যে গুরুতর মতানৈক্য দেখা যায়। যথা, হিতকর

বিশ্বাস মাত্রই সত্য—জেমস্ প্রচারিত এ মতকে প্রয়োগবাদশিরোমণি পারস্ "আত্মঘাতী" বলে বর্ণনা করেছেন। আর প্রখ্যাত প্রয়োগবাদী ডিউঈ-র মতে জেমস্-এর উক্ত মত প্রয়োগবাদবিরোধী, "অপ্রায়োগিক"।

আমরা প্রধানত জেমস্-প্রচারিত প্রায়োগিক সত্যতত্ত্ব আলোচনা করব। এ সত্যতত্ত্ব সংক্ষেপে নিম্নোক্ত চারটি বাক্যে ব্যক্ত করা যায় :

(ক) সত্য বিশ্বাস হল এমন বিশ্বাস যার যাচাইকরণ[1] হয়েছে বা যাচাইযোগ্য।

(খ) সত্য বিশ্বাস হল এমন বিশ্বাস যা সুবিধাজনক বা হিতকর,
—যা "কাজে লাগে", যাতে "কাজ হয়"।

(গ) সত্য "স্থানু" বা শাশ্বত নয়, সত্য হল অনিত্য, "পরিবর্তনশীল" ধর্ম।

(ঘ) সত্য "মানুষ-সৃষ্ট" ফল, সত্য হল অর্জিত ধর্ম ॥

(2) প্রয়োগবাদী সত্যতত্ত্বের সমালোচনা

নিচে প্রত্যেকটি উক্তি নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করব, এবং মুখ্যত মূর-এর "জেমস্-এর প্রয়োগবাদ" নামক প্রবন্ধ অনুসরণ করে প্রত্যেকটি উক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করব।

জেমস্ তার সত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "ধারণার"-র সত্যতার কথা বলেন। আমরা জানি নিছক ধারণা প্রসঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা ওঠে না; বাক্য বা উক্তি বা বিশ্বাস প্রসঙ্গেই সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা ওঠে। তবে জেমস্ "ধারণা" কথাটি ব্যবহার করেন বিশ্বাস বা বাক্য অর্থে। কাজেই জেমস্-প্রচারিত সত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা "ধারণা"র পরিবর্তে সাধারণভাবে "বিশ্বাস" কথাটি ব্যবহার করব।

(ক) পূর্বপক্ষ : সত্য বলতে বোঝায়— যাচাইকৃত বা যাচাইযোগ্য।

জেমস্ বলেন :

> "সত্য ধারণা হল এমন ধারণা যা আমরা প্রমাণ করতে পারি, সমর্থন করতে পারি, যাচাই করতে পারি। যে ধারণা এভাবে প্রমাণ, সমর্থন বা যাচাই, করা যায় না তা মিথ্যা"।

স্পষ্টতই জেমস্-এর বক্তব্য হল :

(ক) যে সকল বিশ্বাস যাচাইযোগ্য তার সবই সত্য।

(খ) যে সকল বিশ্বাস সত্য তার সবই যাচাইযোগ্য ॥

এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে জেমস্-এর মতে : "সত্য" ও "যাচাইযোগ্য" একার্থক শব্দ ; যাচাইযোগ্যতা হল সত্যতার লক্ষণ।

পূর্বপক্ষ খণ্ডন

প্রয়োগবাদী তত্ত্ব ও নির্মধ্যতার সূত্র[2] : উল্লিখিত উক্তি দুটির মধ্যে প্রথমটি অবশ্যই সত্য ; কিন্তু, এ কথা অসংশয়ে বলা যায় যে, দ্বিতীয়টি অসত্য। এ

1. verification 2. Law of Excluded Middle

কথা অনস্বীকার্য যে : এমন অনেক সত্য বাক্য (বিশ্বাস) আছে, বিশেষত অতীত ঘটনা সম্বন্ধে, যা আমরা যাচাই করতে পারি না, এবং সম্ভবত কোনো মানুষ কোনোদিনই যাচাই করতে পারবে না। এবং মূর যথার্থই বলেছেন, কোনো সত্য বিশ্বাসের মধ্যে এমন কিছু নেই যার ফলে বিশ্বাসটিকে অবশ্যই আমাদের দ্বারা যাচাইযোগ্য হতে হবে। একটা উদাহরণ। মনে করা যাক : আমি একজনকে একটা চিঠি লিখেছিলাম এবং আমি বিশ্বাস করি যে ঐ চিঠিতে একটা বিশেষ খবর জানিয়েছিলাম। আমার পত্রপ্রাপক কিন্তু বলেন এবং প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে আমি আমার চিঠিতে তাকে ঐ খবর জানাই নি ॥ আরও মনে করা যাক : আমার চিঠিখানা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে, ঐ চিঠির কোনো অনুলিপি নেই, ঐ চিঠি সম্বন্ধে আমি ও আমার পত্রপ্রাপক ভিন্ন অন্য কেউ কিছু জানে না, এবং আমরা দুজনই মনে করছি যে আমাদের স্মৃতি অভ্রান্ত ॥ বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আমাদের দুজনের দুটি বিরুদ্ধ বিশ্বাসের কোনোটির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। কাজেই আলোচ্য মত অনুসারে এ বিশ্বাস দুটির কোনোটি সত্য নয়। কিন্তু দুটি বিরুদ্ধ বচনের একটি সত্য—এটা যুক্তিবিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র (নির্মধ্যতার সূত্র, নির্মধ্যম সূত্র বা মধ্যবিহীনতার সূত্র)। দেখা গেল,

যদি "সত্য" ও "যাচাইযোগ্য" এ শব্দ দুটিকে একার্থক বলে গণ্য করা হয় তাহলে : নির্মধ্যতার সূত্রটিকে অসত্য বলে মানতে হয়,

কিন্তু নির্মধ্যতার সূত্রটি অসত্য এ কথা মানা যায় না ;

∴ এ কথাও মানা যায় না যে : "সত্য" = "যাচাইযোগ্য" ॥

কারনাপ-এর যুক্তি : ওপরে যা বলা হল তা কারনাপ্ আরও সুষ্ঠুভাবে সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রয়োগিক সত্যতত্ত্ব মানলে নির্মধ্যম নীতি অগ্রাহ্য করতে হয়। এ নীতি অনুসারে, অবশ্যই

ব সত্য v ~ব সত্য* (1)

অথবা ব v ~ব

(এখানে ব যেকোনো একটি বাক্য, আর ~ব তার বিরুদ্ধ বাক্য বোঝাচ্ছে)।

এখন "সত্য" আর "যাচাইযোগ্য" যদি একার্থক হত তাহলে নির্মধ্যতার সূত্রটি এভাবে ব্যক্ত করা যেত**

ব যাচাইযোগ্য v ~ব যাচাইযোগ্য (2)

কিন্তু এ বাক্যটিকে নির্মধ্যতার সূত্র বলে গ্রহণ করা যায় না, কেননা বাক্যটি স্পষ্টতই অসত্য। এমন বাক্য (ও তার বিরুদ্ধ বাক্য) থাকতে পারে যার সত্যতা যাচাই করা যায় না। যথা :

তিন শত বছর আগে ঠিক এদিনে এক্ষণে কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছিল

এমন নয় যে তিন শত বছর আগে এদিনে এক্ষণে কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছিল

---

* "অথবার" পরিবর্তে "v" চিহ্নটি ব্যবহার করা হল।

** (1)-এতে "সত্য"—এর পরিবর্তে "যাচাইযোগ্য" নিবেশন ক'রে।

এ বিরুদ্ধ বাক্য দুটির কোনোটিই যাচাইযোগ্য নয় (ধরা যাক, তিন শত বছর আগেকার কোনো বৃষ্টিলেখ নেই)। "সত্য" মানে যদি যাচাইযোগ্য হয় তাহলে উক্ত বাক্য দুটির কোনোটিই সত্য নয়, অথচ নির্মধ্যতার সূত্র অনুসারে— অবশ্যই এদের কোনো একটি সত্য।

একটা কথা। জেমস্ কেবল এ কথা বলেন না যে "সত্য"="যাচাইযোগ্য", তিনি আরও বলেন ঃ "সত্য"="যাচাইকৃত", বা "যাচাই-হয়েছে-এমন"। জেমস্-এর এ উক্তি যদি সত্য হত তাহলে নির্মধ্যতার সূত্রটি
অর্থাৎ

ব সত্য v ~ব সত্য

এ সূত্রটি এভাবেও ব্যক্ত করা যেত ঃ

ব-এর যাচাই হয়েছে v ~ব-এর যাচাই হয়েছে।

বলা বাহুল্য উক্ত উক্তি দুটি সমার্থক নয় ঃ প্রথম উক্তিটি অবশ্যই সত্য আর দ্বিতীয়টি স্পষ্টতই মিথ্যা। এ কথা স্পষ্টতই মিথ্যা যে প্রত্যেকটি বিশ্বাস (বা বাক্য) অথবা তার বিরুদ্ধ বিশ্বাস (বা বাক্য) যাচাই করা হয়ে গেছে।

সত্যতার লক্ষণ ও মানদণ্ড—এদের পার্থক্য অগ্রাহ্য ঃ সত্যতার লক্ষণ আর সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড যে পৃথক, মনে হয়, জেমস্ এ কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এবং ফলে সত্যতার একটি মানদণ্ডতেই সত্যতার লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। একথা মানতে বাধা নেই যে যাচাইকরণ সত্যতা নির্ণয়ের একটি মানদণ্ড। কিন্তু "যাচাই-করা-হয়েছে-এমন" বা "যাচাই-করা-যায়-এমন" এ শব্দসমষ্টিগুলি দিয়ে সত্যতার লক্ষণ দেওয়া যায় না। যার যাচাই হয়নি তা সত্য কি মিথ্যা তা আমরা জানতে পারি নি ; কিন্তু কোনো বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা আমরা জানি না বলে বাক্যটি সত্যও নয় মিথ্যাও নয় —এ কথা মানা যায় না। যাচাইকরণের উপর সত্যতার জ্ঞান নির্ভর করে, সত্যতা নির্ভর করে না। বাক্যের সত্যতা নির্ভর করে বাক্যটিতে যা বলা হয় তার সঙ্গে বাস্তব ব্যাপারের সংগতি আছে কি নেই তার উপর, আমার জানা না জানার উপর কোনো বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ভর করে না।

(খ) পূর্বপক্ষ ঃ "সত্য" বলতে বোঝায় হিতকর, সুবিধাজনক বা উপকারী। জেমস্ বলেন ঃ

> "সত্য হল যা সুবিধাজনক কেবল তাই।
>
> কোনো ধারণা ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তা বিশ্বাস করা আমাদের জীবনের পক্ষে লাভজনক॥"

স্পষ্টতই জেমস্ বলতে চান ঃ

(ক) যে সকল বিশ্বাস সত্য তার সবই হিতকর।

(খ) যে সকল বিশ্বাস হিতকর তার সবই সত্য॥

এ উক্তি দুটি থেকে বোঝা যায় যে জেমস্-এর মতে "সত্য" আর "হিতকর" একার্থক, এবং হিতকারিতা হল সত্যতার লক্ষণ।

পূর্বপক্ষ খণ্ডন

সত্য বলে হিতকর, না হিতকর বলে সত্য ? ঃ (ক), (খ)—এ উক্তি দুটির প্রথমটি না হয় সত্য বলে মেনে নিলাম ; কিন্তু দ্বিতীয়টি যে অসত্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এ কথা না হয় মানা যায় যে, যেসব বিশ্বাস সত্য সে সব অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগে, আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক, হিতকর। আর মিথ্যা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চললে অনেক অসুবিধা। যেমন, আমি যদি বিশ্বাস করি যে আমার হাতঘড়ি ঠিক সময় দেয়, কিন্তু যদি প্রকৃতপক্ষে আমার ঘড়িটি সঠিক ঘড়ির চেয়ে মন্থরগতিতে চলে, অর্থাৎ আমার উক্ত বিশ্বাস যদি মিথ্যা হয়, তাহলে হয়ত আমি গাড়ী ফেল করব, হয়ত কলেজে পৌঁছাতে আমার দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু, সব সত্য বিশ্বাসই কাজে আসে —একথা সম্ভবত মানা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য বিশ্বাসের ফলে আমাদের কোনো না কোনো সুবিধা হয়। কিন্তু সত্য বিশ্বাস যে কাজে আসে তার হেতু হল বিশ্বাসগুলির পূর্বস্থ সত্যতা। বিশ্বাসগুলি সত্য বলেই কাজে লাগে। আমাদের কাজে লাগে বলে এরা সত্য নয়, বা সত্য হয়ে ওঠে না।

হিতকর মিথ্যা ঃ এ কথা একেবারেই মানা যায় না যে, সব হিতকর বিশ্বাসই সত্য বা কোনো মিথ্যা বিশ্বাসই হিতকর হতে পারে না। হিতকর বিশ্বাসও মিথ্যা হতে পারে। আবার মিথ্যা বিশ্বাসও হিতকর হতে পারে। একটা উদাহরণ। মনে করা যাক ঃ রামের ঘড়ি ঠিক সময় দেয় না (মন্থর গতিতে চলে), কিন্তু রাম বিশ্বাস করে যে তার ঘড়িটি ঠিক সময় দেয়। এবং তার ঘড়ি ঠিক সময় দেয় —এ মিথ্যা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চলেছিল বলে, রাম যে-ট্রেণে যাবে বলে স্থির করেছিল সে-ট্রেণ ফেল করল। আরও ধরা যাক, রামের বিশ্বাস সত্য হলে রাম যে-ট্রেণ ধরতে পারত, যে ট্রেণটি রাম বস্তুত ফেল করল, সে-ট্রেণটি দুর্ঘটনায় পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং ঐ ট্রেণের সব যাত্রীই মারা গেল॥ এ ক্ষেত্রে রামের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে ('আমার ঘড়ি ঠিক সময় দেয়'—এ মিথ্যা বিশ্বাসের ফলে) রাম প্রাণে বেঁচে গেল। এবং তার ভ্রান্ত বিশ্বাসটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে তার পক্ষে হিতকর বলে প্রমাণিত হল। আবার, মৃত্যুর-পরে-স্বর্গসুখ-এতে বিশ্বাস, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, মানুষের কাজে আসে—বহু মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু এ কথা অসংশয়ে বলা যায় না যে এসব বিশ্বাস সত্য ; হতে পারে এসব হিতকর বিশ্বাস মিথ্যা। ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যায় যে

"ব সত্য" ও "ব হিতকর" সমার্থক বাক্য নয়।

সত্যতা ও হিতকারিতা যে অভিন্ন ধর্ম নয় তা এভাবেও দেখানো যায়। নিম্নোক্ত বাক্য দুটি লক্ষণীয়।

ঈশ্বর মঙ্গলময় —এ বিশ্বাসটি সত্য
ঈশ্বর মঙ্গলময় —এ বিশ্বাসটি হিতকর

এ বাক্য দুটি সমার্থক নয়। কেননা: এদের দ্বিতীয়টি সম্ভবত সত্য, কিন্তু এমন হতে পারে যে প্রথমটি মিথ্যা। কিন্তু দুটি সমার্থক বাক্যের একটি সত্য অন্যটি মিথ্যা হতে পারে না॥

অপ্রয়োজনীয় সত্য : ব সত্য কিন্তু অপ্রয়োজনীয়—এ উক্তি স্ববিরোধী নয়।। "সত্য" আর "হিতকর" যে একার্থক নয় তা এভাবেও দেখানো যায়। ধরা যাক, এ কথা মেনে নিলাম যে: কোনো হিতকর বাক্যই মিথ্যা নয়, এবং বস্তুত সব হিতকর বাক্যই সত্য। কিন্তু তাহলেও এমন কথা বলা যায় না যে, কোনো সত্য বিশ্বাসই অপ্রয়োজনীয় হতে পারে না, বা হতে পারত না। এমন কথা বলা যায় না যে

এ সত্য বিশ্বাসটি অপ্রয়োজনীয় (1)

এ বাক্যটি স্ববিরোধী। এ আকারের বাক্য যদি বস্তুত সত্য নাও হয় তাহলেও এর মধ্যে কোনো যৌক্তিক অসংগতি নেই। যথা, এমন কথা বলা যায় না যে

আমার হাতের কলমটি লাল —এ সত্য বিশ্বাসটি অপ্রয়োজনীয়

এ বাক্যটি স্ববিরোধী। এখন, "সত্য" ও "প্রয়োজনীয়" যদি একার্থক শব্দ হয় তাহলে উপরোক্ত (1)-সংখ্যক বাক্যে "সত্য"-এর পরিবর্তে "প্রয়োজনীয়" শব্দটি বসিয়ে পাই

………এ প্রয়োজনীয় বিশ্বাসটি অপ্রয়োজনীয়। (2)

বলা বাহুল্য এটি একটি স্ববিরোধী বাক্য। মূল বাক্যটি, (1)-সংখ্যক বাক্যটি, কিন্তু স্ববিরোধী নয়। একটি অ-স্ববিরোধী বাক্যে "সত্য"-এর পরিবর্তে "প্রয়োজনীয়" ব্যবহার করার ফলে অ-স্ববিরোধী বাক্যটি স্ববিরোধী বাক্যে রূপান্তরিত হল। "সত্য" ও "প্রয়োজনীয়" যদি একার্থক হত তাহলে মূল বাক্যটি ও তার রূপান্তরিত রূপটি সমার্থক হত। সুতরাং "সত্য" ও "প্রয়োজনীয়" (বা "হিতকর") একার্থক নয়। সুতরাং প্রয়োজনীয়তা বা হিতকারিতা দিয়ে সত্যতার লক্ষণ দেওয়া অসঙ্গত।

"ব" সত্য = ব, কিন্তু "ব" হিতকর ≠ ব : একটি সাম্প্রতিক সত্যতত্ত্ব অনুসারে—

"ব" সত্য = ব ("রাম বুদ্ধিমান" সত্য = রাম বুদ্ধিমান)

"ব" মিথ্যা = ~ব ("রাম বুদ্ধিমান" মিথ্যা = এমন নয় যে রাম বুদ্ধিমান)

এখন নিম্নোক্ত বাক্য দুটি লক্ষ করা যাক:

"ঈশ্বর করুণাময়" —এ বিশ্বাস (বাক্য) সত্য

"ঈশ্বর করুণাময়" —এ বিশ্বাস (বাক্য) হিতকর।

স্পষ্টতই বাক্য দুটি সমার্থক নয়। কেননা

"ঈশ্বর করুণাময়" এ বাক্য সত্য = ঈশ্বর করুণাময়

কিন্তু "ঈশ্বর করুণাময়" এ বাক্য হিতকর ≠ ঈশ্বর করুণাময়

সুতরাং "সত্য" আর "হিতকর" একার্থক নয়। সুতরাং হিতকারিতা দিয়ে সত্যতার লক্ষণ দেওয়া যায় না।

"কাজে আসা" দ্ব্যর্থতাবোধক —রাসেল্ ।। জেমস্ বলেন : সত্য বিশ্বাস হল এমন বিশ্বাস যা "কাজে আসে", "কাজ দেয়", যা "ফলপ্রসূ" ।

রাসেলের অভিযোগ হল এই : জেমস্ বিজ্ঞানের দোহাই দেন এবং বলেন যে বিজ্ঞানে "সত্য" বলতে বোঝায় কার্যকরী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন বলেন ঐ প্রকল্পটি কার্যকরী তখন তারা এ কথাই বলতে চান যে ঐ প্রকল্প থেকে যাচাইযোগ্য বচন নিঃসৃত (অবরোহিত) হয়; তাঁদের বক্তব্য এই নয় যে ঐ প্রকল্প বিশ্বাসের ফল মঙ্গলজনক। রাসেল্ বলেন, বিজ্ঞানীরা কখনও "কার্যকরী" বা "কাজে লাগল" বলতে মঙ্গলজনক বা হিতকর বোঝেন না।

"কাজে আসে", "কার্যকরী", "ফলপ্রসূ"—এসব দ্ব্যর্থতাবোধক। কোনো বিশ্বাস কাজে লাগতে পারে দু ভাবে, দু অর্থে—

(ক) যা বিশ্বাস করা হয় তা বস্তুত ঘটলে, যথা যে ভবিষ্যদ্‌বাণী বিশ্বাস করা হয় সে ভবিষ্যদ্‌বাণী বস্তুত ফললে,

(খ) বিশ্বাসটি বিশ্বাসকারীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করলে, তাদের কোনো ইষ্ট সাধন করলে।

এখন, এমন হতে পারে—কোনো বিশ্বাস উক্ত অর্থের এক অর্থে কাজে লাগল আর অন্য অর্থে অকেজো। উদাহরণ : একদিন ত্রাণকর্তা (মেসাইয়া) মর্তে অবতীর্ণ হয়ে তাদের উদ্ধার করবেন—ইহুদীদের এ বিশ্বাস তাদের বিশেষ কাজে লেগেছিল, তাদের ব্যক্তিজীবনে সহনশীলতা, উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। কিন্তু এক অর্থে এ বিশ্বাস কার্যকরী হয়নি, কেননা ত্রাণকর্তার আবির্ভাব নামক ঘটনা বস্তুত ঘটে নি। মনে হয়, "কাজে আসা" কথাটির দ্ব্যর্থতা জেমস্‌কে বিভ্রান্ত করেছে। এক অর্থে এ কথা বলা যায় : কোনো বাক্য সত্য এ বিশ্বাসটি দিয়ে যদি কাজ হয় তাহলে বোঝা যায় বিশ্বাসটি সত্য। কিন্তু কোন্ অর্থে? এ অর্থে : বাক্যটিতে যে ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে বা যে ঘটনা ঘটবে বলে দাবী করা হয়েছে সে ব্যাপার বস্তুত বর্ণিত-ব্যাপারের অনুরূপ হলে, বা কল্পিত ঘটনাটি প্রকৃতই ঘটলে। কিন্তু এ অর্থে নয় : বিশ্বাসটি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় বলে, কাজেই এ বিশ্বাস দিয়ে "কাজ হয়" বলে, বিশ্বাসটি সত্য ॥

জেমস্-এর মত "আত্মঘাতী" ও "অপ্রায়োগিক"—পারস্ ও ডিউঈ : কেবল ভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকরাই নয়, কোনো কোনো প্রয়োগবাদীও জেমস্-এর মতের সমালোচনা করেন। পারস্ জেমস্-এর মতকে "আত্মঘাতী" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এ মতবাদ মেনে নিলে অধিবিদ্যা ও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকেও স্বাগত জানাতে হয়, মানতে হয় যে অধিবিদ্যা ও ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত উক্তিই সত্য; কেননা এ জাতীয় উক্তি ও বিশ্বাস আমাদের কাজে লাগে—আমাদের উৎসাহ দেয়, তৃপ্তি দেয়, সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু নব্য দৃষ্টবাদীদের মতো, পারস্ মনে করেন : অধিকাংশ আধিবিদ্যক উক্তি "অর্থহীন বক্‌বকানি"।

প্রয়োগবাদের আরও একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা, ডিউঈ, অভিযোগ করেছেন যে,

বিশ্বাসের যাথার্থ্যের ও বিশ্বাসের মূল্যের মধ্যে যে-পার্থক্য, জেমস্ সে পার্থক্য ধরতে পারেন নি। তিনি বলেন : প্রয়োগবাদ বিশ্বাসের মূল্য নিয়েই তুষ্ট থাকবে ; বিশ্বাসের মূল্য দিয়েই তার সত্যতা নির্ণয় করবে —এটা একটা "অপ্রায়োগিক" প্রস্তাব।

(গ) পূর্বপক্ষ : সত্যতা একটি পরিবর্তনশীল ধর্ম।

জেমস্ বলেন : সত্য স্থানু অপরিবর্তনীয় নয়, সত্য "পরিবর্তনশীল"

আর, ডিউঈ বলেন : সত্যতা পূর্বস্থ ধর্ম নয়, সত্যতা "ঘটে", ধারণা সত্য হয়ে ওঠে, ধারণা সত্যতা অর্জন করে ॥

আলোচ্য মতে কোনো বিশ্বাস স্বতই সত্যও নয় মিথ্যাও নয় ; বিশ্বাসটি সমর্থিত, যাচাইকৃত হলে তবেই তা সত্য হয়ে ওঠে।

পূর্বপক্ষ খণ্ডন

সত্যতা সম্পর্কে আলোচ্য মত যুক্তিসহ নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক : সোমবার শ্যামবাবু খুন হলেন এবং অনেকের বিশ্বাস যে রামই শ্যামবাবুকে খুন করেছে। আরও মনে করা যাক : পুলিশ ও গোয়েন্দা অনুসন্ধান করে পরের শনিবার নাগাদ স্থির সিদ্ধান্তে এল, প্রমাণ করল যে—রামই শ্যামবাবুর হত্যাকারী। এ ক্ষেত্রে

রাম শ্যামবাবুর হত্যাকারী —এ বিশ্বাসের সত্যতা শনিবার প্রমাণিত হয়েছে

এ বাক্যটি সত্য। কিন্তু এ সত্য বাক্যটির বদলে বলা যায় না যে

রাম শ্যামবাবুর হত্যাকারী—এ বিশ্বাসটি শনিবার সত্য হয়ে উঠেছে।

"রাম শ্যামবাবুর হত্যাকারী"—এ বাক্যের সত্যতা আমরা হত্যার পরমুহূর্তে বা সোম থেকে শুক্রবারের মধ্যে, জানতে পারি নি, ঠিক। কিন্তু একথা বলা অসঙ্গত যে এ বাক্য সোম-শুক্রবারের মধ্যে সত্য ছিল না, অনুসন্ধানের সাফল্যহেতু সত্য হয়ে উঠল। আলোচ্য বাক্যের সত্যতার হেতু হল : রাম কর্তৃক শ্যামবাবুর হত্যা —এ ঘটনা।

রাম শ্যামবাবুর হত্যাকারী —এ উক্তি শনিবার সত্য, এবং

রাম শ্যামবাবুর হত্যাকারী —এ উক্তি সোমবার অসত্য (ছিল)

এ কথা মেনে নিলে রামকে শ্যামবাবুর হত্যার জন্য অভিযুক্ত করা যায় না, কেননা হত্যাকাণ্ড হয়েছে সোমবার, এবং প্রায়োগিক তত্ত্ব অনুসারে সোমবার এ উক্তি অ-সত্য ছিল।

"সত্য" কালনিরপেক্ষ : সত্যতা একটি পরিবর্তনশীল ধর্ম—এ মতের সমালোচনা করতে গিয়ে কারনাপ্ বলেছেন : "সত্য" একটি কালনিরপেক্ষ শব্দ। এখানেই "সত্য"-এর সঙ্গে "জ্ঞাত", "সমর্থিত", "প্রমাণিত", "যাচাইকৃত" প্রভৃতি শব্দের পার্থক্য। শেষোক্ত শব্দগুলি যা বোঝায় তা কালসাপেক্ষ,—কোনো বিশেষ কালে কিছু জ্ঞাত হয়, সমর্থিত বা যাচাইকৃত হয়। কিন্তু কোনো ক্ষণে কোনো বাক্য বা বিশ্বাস সত্য হয়ে ওঠে—এ কথা বলা যায় না। আমাদের সাধারণ ভাষায় উক্ত পার্থক্যের স্বীকৃতি মেলে। আমরা বলি

এ কথা যে সত্য তা এখন জানা গেল, আগে জানতাম না যে এ কথা সত্য।

এ কথা সত্য কিনা কাল জানতে পারব। এখন এ কথা সমর্থিত হল ॥

কিন্তু আমরা এমন কথা বলি না বা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করি না যে

আজ এ বাক্যটি সত্য। কাল ঐ বাক্যটি সত্য হবে।

রাম শ্যামবাবুর হত্যাকারী —এ বাক্য শনিবার সত্য ॥

সত্তা ও সত্য ঃ সত্যতার উৎপত্তি বিকাশ হয়, সত্যতা "ঘটে", "সঞ্চিত হয়" —ডিউঈ ও জেমস্-এর এ ভ্রান্ত মতবাদের মূলে আছে "সত্তা" ও "সত্যতা"—এ শব্দ দুটির অর্থের একীকরণ। কিন্তু সত্তা ও সত্যতা এক নয়। সত্যতা হল সত্তাসংক্রান্ত কোনো উক্তির, বর্ণনা বা বিশ্বাসের, যাথার্থ্য। সত্তাই বিশ্বাসের যাথার্থ্যের নিয়ন্তা। কোনো বিশ্বাস সত্য কি মিথ্যা তা নির্ভর করে সত্তার স্বরূপের উপর, সত্তার স্বরূপ এমন এমন বলে অমুক বিশ্বাসটি সত্য, তমুক বিশ্বাসটি মিথ্যা। সৎ পদার্থ, আরও সংকীর্ণ ভাবে বলতে গেলে, বাস্তব জগৎ, পরিবর্তনশীল ঃ এখন যে জাগতিক অবস্থা পূর্বে তা ছিল না—হাজার বছর আগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত, এখন খায় না, হয়ত মানুষ একদিন মঙ্গলগ্রহে গিয়ে বসবাস করবে। কিন্তু সত্য অপরিবর্তনীয় স্থির, এক অর্থে শাশ্বত। ব্রাড্‌লির বিখ্যাত উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

যা কখনও সত্য তা সর্বকালেই সত্য, যা কখনও মিথ্যা তা সর্বকালেই মিথ্যা।

যথা

আজ তিয়াত্তর সালের পয়লা জানুয়ারী বিকেলে কলকাতায় বৃষ্টি হল

(ধরা যাক এ বাক্য সত্য)—এ বাক্য হাজার হাজার বছর পরেও সত্য থাকবে, কলকাতা নগরের অবলুপ্তি হলেও সত্য থাকবে ; যেমন, 'সীজারকে সিনেটভবনে হত্যা করা হয়েছিল'—এ বাক্য আজও সত্য।

সত্য বিশ্বাস কখনও মিথ্যা বিশ্বাসে, আর মিথ্যা বিশ্বাস কখনও সত্য বিশ্বাসে, পরিণত হতে পারে না। এমন হতে পারে, আমি যা সত্য বলে মনে করেছিলাম তা বস্তুত মিথ্যা ছিল বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল, আর আমি যা মিথ্যা বলে মনে করি তা বস্তুত সত্য। কিন্তু আমার কোনো বিশ্বাস যদি মিথ্যা হয় তাহলে তা সর্বকালেই মিথ্যা, আর যদি সত্য হয় তাহলে সর্বকালেই সত্য।

টীকা ঃ সত্যতা ও মিথ্যাত্ব শাশ্বত ॥ ওপরে যা বলা হল তা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক

রামের বয়স বাইশ বছর —আমার এ বিশ্বাস সত্য

(ধরা যাক, বাহাত্তর সালে আমি এ উক্তি করছি এবং বাহাত্তর সালে রামের প্রকৃত বয়স বাইশ বছর)। যখন রাম এ বয়স ছাড়িয়ে যাবে, যেমন পঁচাত্তর সালে, আমার বিশ্বাসটি কি তখন মিথ্যা হয়ে যাবে ? না, তা যাবে না ; কেননা. আমার বিশ্বাস বা বক্তব্য হল ঃ

বাহাত্তর সালে রামের বয়স বাইশ বছর।

বলা বাহুল্য, এ বিশ্বাসটি পঁচাত্তর সালে কেন, রামের মৃত্যুর পরও সত্য হয়ে থাকবে।

সাধারণত কোনো বিশ্বাস ব্যক্ত করতে গিয়ে, বা উক্তি করিতে গিয়ে, আমরা বর্ণিত ঘটনার স্থানকাল সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করি না। যথা, বলি

এখন কলকাতায় বৃষ্টি নামল।

এজন্য এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে সত্য বিশ্বাস মিথ্যা হয়ে যেতে পারে, আর মিথ্যা বিশ্বাস সত্য হয়ে উঠতে পারে। যথা, ভুল করে ভাবতে পারি: বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলেই "এখন কলকাতায় বৃষ্টি নামল"—এ বাক্য মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু (ধরা যাক) এ উক্তিটি করা হল বাহাত্তর সালে পয়লা আষাঢ় দুপুর বারোটায় এবং বৃষ্টি নামল কলেজ স্কোয়ারে। অনির্দিষ্টভাবে উক্তি না করে যদি বলি

উনিশ শ' বাহাত্তর সালে পয়লা আষাঢ় দুপুর বারোটায় কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে বৃষ্টি নামল*

তাহলে আর বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। পরিষ্কার বোঝা যায় যে উক্ত সত্য বাক্যটি চিরকালই সত্য থাকবে, কখনও মিথ্যা বাক্যে পরিণত হবে না।

(ঘ) **পূর্বপক্ষ:** সত্যতা "মানুষ-সৃষ্ট" ধর্ম, মানুষের কর্মের ফল।

জেমস্ বলেন: "আমাদের সত্যতা" বহুলাংশে মানুষ-সৃষ্ট পদার্থ, মানুষের কর্মের পরিণতি।

পূর্বপক্ষ খণ্ডন: স্পষ্টতই জেম্স্ এখানে

"(সত্য) বিশ্বাস সৃজন করা" আর "বিশ্বাসের সত্যতা সৃজন করা", বা

"(সত্য) বাক্য বিশ্বাস করা" আর "বিশ্বাসকে সত্য করে তোলা", অর্থাৎ

"বিশ্বাস করা" আর "বিশ্বাসকে সত্য করা"

—এ বাক্যাংশগুলির অর্থের যে পার্থক্য তা অগ্রাহ্য করেছেন, বা এদের পার্থক্য ধরতে পারেন নি। এক অর্থে আমি আমার বিশ্বাসের স্রষ্টা; এ অর্থে: আমি, আমার মন ও বিচারশক্তি না থাকলে বিশ্বাসও থাকত না। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে: আমরা আমাদের বিশ্বাসের সত্যতার স্রষ্টা, অথবা আমরা আমাদের বিশ্বাসকে সত্য করে তুলি। "বিশ্বাসকে সত্য করে তোলার" মানে: বিশ্বাসটির সত্য হওয়ার ব্যাপারে আমাদের "হাত থাকা"। মূর্ বলেন: যদি কোনো কিছু ক ঘটানোর ব্যাপারে আমার হাত থাকে তাহলে এবং কেবল তা হলেই, বলা যায় আমি ক-এর স্রষ্টা। কিন্তু কোনো বিশ্বাসকে সত্য করার ব্যাপারে আমাদের হাত থাকে না। যথা, আমি বিশ্বাস করি যে এক ঘণ্টা বাদে বৃষ্টি নামবে। ধরা যাক্, ঠিক এক ঘণ্টা বাদেই বৃষ্টি নামল। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না, আমার ইচ্ছায় বা চেষ্টায় বৃষ্টি হয় নি। কাজেই উক্ত বিশ্বাসের সত্যতা আমার সৃষ্টি নয়। কোনো বিশ্বাসের সত্যতার হেতু হল: সে-বিশ্বাস-অতিবর্তী কোনো ব্যাপার। আমাদের

* অবশ্য ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলতে হলে, পরবর্তীকালে "নামল"-এর বদলে "নেমেছিল" ব্যবহার করতে হবে।

যাচাইকরণের ফলে, বা আমাদের কাজে আসে বলে, কোনো বিশ্বাস সত্যতা অর্জন করে না ; বিশ্বাস-অতিবর্তী কোনো বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে মিল থাকে বলেই যাচাই করা সম্ভব হয়, এবং বিশ্বাসটি আমাদের কাজে লাগে।

3. প্রায়োগিক সত্যতা-মানদণ্ড

এতক্ষণ আমরা সত্যতার লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রায়োগিক সত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি : হিতকারিতা বা যাচাইযোগ্যতা সত্যতার লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা : মিথ্যা বিশ্বাসও হিতকর হতে পারে, আর সব সত্য বিশ্বাসেরই যাচাই হয় না।

এখন প্রশ্ন, প্রায়োগিক সত্যতত্ত্বে কি সত্যতা নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড পাওয়া যায় ?

প্রায়োগিক মানদণ্ডের দুই রূপ : (১) কোনো বিশ্বাস ব যাচাইযোগ্য হলে বুঝতে হবে যে ব সত্য, (২) বিশ্বাসটি যদি কাজে লাগে তাহলে বিশ্বাসটি সত্য বলে গণ্য। প্রথম রূপটি সম্বন্ধে বলা যায় :

এ কথা ঠিক যে যাচাইকরণ (নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ) বাস্তব-ব্যাপার-বিষয়ক বাক্যের সত্যতা নির্ণয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড।

নিচে প্রধানত দ্বিতীয় রূপটি আলোচিত হল। দ্বিতীয় রূপ সম্বন্ধে বলা যায় :

কোনো বাক্য যদি সত্য হয় তাহলে 'বাক্যটি সত্য' এ বিশ্বাস সাধারণত আমাদের কাজে আসে, আর বাক্যটি যদি মিথ্যা হয় তাহলে "বাক্যটি সত্য" এ মিথ্যা বিশ্বাসে কোনো কাজ হয় না। এজন্য বাস্তব সাফল্য অসাফল্য, কাজে-লাগা না-লাগা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নিরূপণ করতে পারি॥ কিন্তু এ প্রায়োগিক মানদণ্ড স্বতন্ত্র ও চরম মানদণ্ড বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা, কাজে-লাগে-না-এমন বিশ্বাসও সত্য হতে পারে। কাজেই কোনো বিশ্বাস কাজে লাগল না বলে, এ সিদ্ধান্ত করা যায় না—বিশ্বাসটি মিথ্যা। অথচ প্রায়োগিক মানদণ্ড অনুসারে— সত্য-কিন্তু-অকেজো বিশ্বাস মিথ্যা। সুতরাং প্রায়োগিক মানদণ্ডের দ্বিতীয় রূপটি নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রায়োগিক মানদণ্ড ও অনবস্থা[1] দোষ : তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নিলাম যে

ব, 'ব' সত্য

এ রূপ বাক্যের সত্যতা-মানদণ্ড হিসাবে প্রায়োগিক মানদণ্ড ব্যবহার করা যায় : ব সত্য—কেননা ব বিশ্বাসটি (বাক্যটি) হিতকর। কিন্তু দেখা যাবে প্রায়োগিক মানদণ্ড ব্যবহার করে

ব বিশ্বাসটি হিতকর

এ জাতীয় বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করা যায় না। এবং প্রায়োগিক মানদণ্ড দিয়ে এরূপ বাক্যের সত্যতা নির্ণয় যদি অসম্ভব হয় তাহলে এ মানদণ্ড দিয়ে

1. infinite regress

ব, 'ব' সত্য —এ জাতীয় বাক্যের সত্যতা নির্ণয়ও সম্ভব নয়। কেননা প্রয়োগ-বাদী মতে ব বাক্যের সত্যতা নির্ভর করে "ব হিতকর"—এ বাক্যের (সত্যতার) উপর। প্রয়োগবাদী মতে ব সত্য, কেননা ব বিশ্বাস হিতকর। কিন্তু

ব বিশ্বাসটি হিতকর

এ বাক্যের সত্যতা নির্ণয় করব কেমন করে? "ব বিশ্বাসটি হিতকর" এ বিশ্বাসটি আবার হিতকর কিনা তা বিচার করে? এ বিশ্বাসটিকে সত্য হতে হলে

"ব বিশ্বাসটি হিতকর"—এ বিশ্বাস হিতকর

এ বাক্যটি সত্য হওয়ার দরকার। এখন এরকম কোনো বিশ্বাস হিতকর কিনা তা নির্ণয় করতে গিয়ে হিতকারিতা মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হলে যে অনবস্থা দোষ হয় তা সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু ব বিশ্বাসটি হিতকর কিনা তা নির্ণয় করার জন্য হিতকারিতার মানদণ্ড প্রয়োগ করার দরকার নেই। দেখার দরকার বস্তুত এ বিশ্বাসের ফলে কারও কোনো হিতসাধন হল কিনা। অর্থাৎ ব-তে বিশ্বাস হিতকর কিনা —বাস্তব জগতের দিকে তাকিয়ে, বিশ্বাসটির ফলাফল লক্ষ করে, তা বুঝতে হবে। যদি বস্তুত দেখি ব-তে বিশ্বাসের ফল হিতকর তাহলে বুঝব "ব বিশ্বাসটি হিতকর"—এ বাক্য সত্য, সুতরাং ব বাক্যটি সত্য। তাহলে

ব বিশ্বাসটি হিতকর

এ বাক্য যে সত্য তা জানা যায়, প্রয়োগবাদী মানদণ্ড প্রয়োগ করে নয়, অন্য কোনো মানদণ্ড প্রয়োগ করে ;—বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে উক্ত বাক্যের আনুরূপ্য বা মিল আছে কিনা তা দেখে।

সংক্ষেপে, কোনো বিশ্বাস হিতকর কিনা আনুরূপ্য মানদণ্ড দিয়েই তা নির্ণয় করা যায়। কাজেই যারা হিতকারিতা মানদণ্ডের কথা বলেন তারাও আসলে আনুরূপ্য মানদণ্ডের উপরেই নির্ভর করে চলেন।

প্রায়োগিক মানদণ্ড ও সত্যের আপেক্ষিকতা ঃ জেম্‌স্-ব্যবহৃত "কাজে লাগে", "হিতকর"-এ কথাগুলির অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট। কার কাজে লাগে—ব্যক্তির বা সমগ্র সমাজের? ধরা যাক, কোনো বিশ্বাস রামের কাজে লাগল, কিন্তু এতে শ্যামের বা অন্য কারও কোনো হিতসাধন হল না। তাহলে কি বলব বিশ্বাসটি রামের পক্ষে সত্য, অন্য ব্যক্তির পক্ষে অসত্য? বলা বাহুল্য আলোচ্য মতবাদের পরিণতি হল ঃ সত্যের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব— "মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি"—এ প্রাচীন গ্রীক্ মতবাদের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সত্যতা ব্যক্তিসাপেক্ষ নয়। সত্যতা যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ এ সত্যের স্বীকৃতি মেলে সাধারণ ভাষায়ও। আমরা বলি

ব সত্য, ভ মিথ্যা

কিন্তু নিম্নোক্তরূপ বাক্‌ভঙ্গি অনুমোদন করি না

এ বাক্যটি ক-ব্যক্তির পক্ষে সত্য এ বাক্যটি খ-ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা।

আবার ধরা যাক, কোনো বিশ্বাস একবারমাত্র কাজে লাগল (এবং

প্রায়োগিক মানদণ্ড অনুসারে বিশ্বাসটি সত্য হল)। ধরা যাক, পরে আর এ বিশ্বাসটি কারও কাজে লাগল না। তাহলে? এ প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে: (ক) ক্ষণিকের জন্য সত্য হয়ে বিশ্বাসটি (হয়ত চিরকালের জন্য) অসত্য হয়ে গেল। (খ) কোনো বিশ্বাস একবারমাত্র কাজে লাগলেই বিশ্বাসটি সত্য বলে বিবেচ্য। কিন্তু প্রথম উত্তরটি অসঙ্গত কেননা, আমরা দেখেছি, যা সত্য তা কখনও মিথ্যায় পরিণত হতে পারে না। আর দ্বিতীয় উত্তরটি মানলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে: অকেজো বিশ্বাসও সত্য হতে পারে। কেননা একবারমাত্র কাজে লেগেই বিশ্বাসটি যে সময়ে অকেজো হয়ে থাকল সে সময়ে ঐ বিশ্বাসটিকে সত্য বলে গণ্য করার অর্থ—এ কথা স্বীকার করা যে অকেজো বিশ্বাসও সত্য হতে পারে। কিন্তু প্রয়োগবাদীরা এ পরিণতি গ্রহণ করতে পারেন না।

জেম্‌স্‌-এর "শেষ পর্যন্ত হিতকর": জেমস্‌ অবশ্য একথা বলেন না যে: কোনো বিশ্বাস একবারমাত্র কাজে লাগলেই তা সত্য হয়ে ওঠে। তিনি বলেন: কোনো বিশ্বাসকে সত্য হতে হলে তাকে "শেষ পর্যন্ত" হিতকর হতে হবে। জেমস্‌-এর সমালোচনা করে রাসেল্‌ বলেছেন: জেমস্‌-প্রচারিত এ মানদণ্ড এতই শিথিল যে এতে কোনো কাজ হয় না (সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায় না)। কেননা কোনো বিশ্বাস "শেষ পর্যন্ত" মানুষের পক্ষে হিতকর কিনা তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার॥ বলা যায়—একমাত্র সর্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই, যে ব্যক্তি কোনো বিশ্বাসের সকল ভবিষ্যত ফল দেখতে পায় তার পক্ষেই, বিশ্বাসটির সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব। আমরা, মানুষরা, সর্বজ্ঞ নই, কাজেই প্রায়োগিক মানদণ্ড (প্রায়োগিক মানদণ্ডের দ্বিতীয় রূপটি) প্রয়োগ করে সত্যাসত্য নির্ণয় মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

5. সংসক্তিবাদী সত্যতত্ত্ব[1]

সংসক্তিবাদী সত্যতত্ত্ব হল অদ্বৈতবাদী ভাববাদের একটি বৈশিষ্ট্য; এ ভাববাদের সঙ্গে সংসক্তিবাদী সত্যতত্ত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যথা, এ সত্যতত্ত্ব হেগেল্‌ ও ব্রাড্‌লির ভাববাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দৃষ্টিবাদী দার্শনিকরা অদ্বৈত-বাদী ভাববাদের কঠোর সমালোচক। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, কোনো কোনো নব্য দৃষ্টিবাদীও সংসক্তিবাদী সত্যতত্ত্ব প্রচার করেন। এ প্রসঙ্গে নয়রাথ্‌ ও হেম্‌পেল্‌-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা এঁদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এখন এ দুটি বিদ্যায় সাধারণত সংসক্তিকেই সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফলে, আধিবিদ্যা বিরোধী হয়েও এ'রা সংসক্তিবাদী সত্যতত্ত্ব সমর্থন করেন।

---

1. Coherence Theory of Truth

(1) সংসক্তি ও বাক্যমণ্ডল

সংসক্তিবাদীরা বলেন : সংসক্তি, সংগতি বা সামঞ্জস্যের ধারণা দিয়েই সত্যতা ধারণাটি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার দরকার। সংসক্তি হল বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক॥ মনে হয়, সংসক্তিবাদের মূল কথা হল : বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র বা অসংবদ্ধ বাক্য প্রসঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা ওঠে না। কোনো বাক্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত কোনো বাক্য প্রসঙ্গেই সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা উঠে। অর্থাৎ "সত্য" ও "মিথ্যা" এ বিশেষণ দুটি কোনো স্বতন্ত্র ও অসংবদ্ধ বাক্য প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয়, কোনো বাক্য অন্য কোনো বাক্য বা বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তবে বাক্যটি সত্য বা মিথ্যা বলে গণ্য॥

বাক্য-মণ্ডল কাকে বলে? যে বাক্য-সমষ্টির মধ্যে প্রতিপত্তি[2] বা প্রসক্তির সম্বন্ধ বর্তমান সে বাক্যসমষ্টিকে বলে বাক্যমণ্ডল। বাক্যমণ্ডলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল বিশুদ্ধ গণিত। বিশুদ্ধ গণিতের অন্তর্গত বাক্যগুলি এমনভাবে সম্পৃক্ত যে এদের কোনো একটি মিথ্যা হলে অন্য সব বাক্য সত্য হতে পারত না, এদের সূত্র বা হেতুবাক্যগুলি সত্য হলে প্রতিপাদ্যগুলি মিথ্যা হতে পারে না।

(2) সংসক্তিবাদের বক্তব্য

সংসক্তিবাদী সত্যতত্ত্ব অনুসারে—

কোনো বাক্য ব সত্য—এ কথা বলার অর্থ : কোনো বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে, এবং ভ বাক্যটি মিথ্যা—এ কথা বলার অর্থ : কোনো বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে ভ-এর বিরোধ বা সংসক্তি-অভাব আছে।

কোনো বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা নির্ণয় করতে হলে দেখার দরকার গৃহীত বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে বাক্যটির সংসক্তি আছে কিনা, ব-তে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের অর্জিত জ্ঞানের মিল আছে কিনা। সত্যতা পরীক্ষা মানে সংসক্তি পরীক্ষা। সংসক্তিবাদের যৌক্তিক-দৃষ্টিবাদী সমর্থকদের মতে : কোনো বাক্যকে সত্য হতে হলে—তাকে যে-বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে সংসক্তিসম্পন্ন হতে হবে সে-বাক্য-মণ্ডল বা জ্ঞানমণ্ডল হল সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানসমূহ; এরূপ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংসক্তি থাকলেই ব সত্য, নতুবা ব মিথ্যা। অপরপক্ষে, সংসক্তিবাদের অধি-বিদ্যাবিদ্-সমর্থকেরা এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপকতম অদ্বয় জ্ঞানমণ্ডলের কথা বলেন; তাঁরা বলেন : না, এরূপ খণ্ড খণ্ড জ্ঞানমণ্ডলের কোনো একটির সঙ্গে সংসক্তি সম্বন্ধ থাকলেই ব সত্য বলে গণ্য হতে পারে না। কোনো বাক্য ব-কে সত্য হতে হলে একটি অদ্বয় ব্যাপকতম জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে॥

(3) সংসক্তি সম্বন্ধের সম্বন্ধী

সংসক্তিবাদীরা "সামঞ্জস্য", "সংসক্তি", "সংগতি" বা "মিল"-এর কথা বলেন। তাঁরা বলেন : সত্যতা হল সংসক্তি, সামঞ্জস্য, সংগতি বা মিল। এ কথাগুলির অর্থের মধ্যে একটা অনির্দিষ্টতা আছে। ফলে, আনুরূপ্যবাদীদেরও এ শব্দগুলি

1. মণ্ডল=system 2. implication

ব্যবহার করতে বাধা নেই, তারাও বলতে পারেন ঃ সত্যতা হল সংসক্তি……। তবে আনুরূপ্যবাদীদের মতে, যে-সংসক্তির ফলে কোনো বাক্য সত্য হয় তা হল বাক্য ও ব্যাপারের সম্বন্ধ। অপরপক্ষে, সংসক্তিবাদীরা বাক্যের সঙ্গে বাক্যমণ্ডলের সংসক্তির কথা বলেন। তারা বলেন ঃ "সংসক্তি" বলতে বাক্যের সঙ্গে বাক্যাতীত অন্য কিছুর (যথা, আনুরূপ্যবাদ-কথিত "ব্যাপার"-এর) সম্বন্ধ বোঝায় না। সংসক্তি হল বাক্যের সঙ্গে বাক্যমণ্ডলের বা জ্ঞানমণ্ডলের সম্বন্ধ॥ এখানেই আনুরূপ্যবাদ ও সংসক্তিবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। আনুরূপ্যবাদের মতে সংসক্তি বা আনুরূপ্য সম্বন্ধের সম্বন্ধী দুটি হল ঃ একদিকে বাক্য অপরদিকে ব্যাপার। আর সংসক্তিবাদের মতে সংসক্তি সম্বন্ধের সম্বন্ধী দুটি হল ঃ বাক্য ও বাক্যমণ্ডল ; এ মতে— এ সম্বন্ধটি খাটে বাক্য ও বাক্য-মণ্ডলের মধ্যে।

(4) সংসক্তি সম্বন্ধের স্বরূপ

"সংসক্তি", "সামঞ্জস্য", "সংগতি" বা "মিল"—এ শব্দগুলি সাধারণত একার্থক শব্দ হিসাবে, এবং অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে, ব্যবহৃত হয়। দুটি বাক্যের মধ্যে যদি অবিরোধ থাকে, অর্থাৎ বাক্য দুটি যদি এমন হয় যে এদের-একটি-সত্য-অন্যটি-মিথ্যা নয়, তাহলেই বলা যায় বাক্য দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বা সংগতি আছে। এ অর্থে "সংগতি", "সামঞ্জস্য" প্রভৃতির অর্থ হল ঃ অসামঞ্জস্যের অভাব, অসংগতির অভাব। এ অর্থে দুটি স্বতন্ত্র বাক্যের মধ্যেও সংসক্তি থাকতে পারে। যথা, "এ ফুলটা লাল", "ঐ ফুলটা হলদে"—এদের মধ্যে অসংগতি নেই, কাজেই উক্ত অর্থে, এদের মধ্যে সংসক্তি বা সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু সংসক্তিবাদী সত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে "সংসক্তি" কথাটি এমন দুর্বল বা অনির্দিষ্ট সম্বন্ধ বোঝায় না, এ কথাটি এ প্রসঙ্গে অনেক নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে, কোনো বাক্যমণ্ডল খ-এর সঙ্গে ব বাক্যের সংসক্তি আছে —এ কথার অর্থ ঃ

খ-এর অন্তর্গত বাক্যগুলি থেকে ব নিঃসৃত (অবরোহিত) হয়,
খ-এর অন্তর্গত বাক্যগুলি ব বাক্যকে প্রতিপাদন করে,[1]
খ-এর অন্তর্গত বাক্যগুলি সত্য হলে ব মিথ্যা হতে পারে না, বা
যদি ব মিথ্যা হয় তাহলে খ-এর অন্তর্গত সব বাক্যই সত্য হতে পারে না।

ওপরে যে সম্বন্ধের কথা বলা হল, বলা বাহুল্য, তা হল যৌক্তিক প্রসক্তি বা প্রতিপত্তির সম্বন্ধ। তাহলে, সংসক্তিবাদ প্রসঙ্গে "সংসক্তি" বলতে বুঝতে হবে ঃ প্রসক্তি বা প্রতিপত্তির সম্বন্ধ।

(5) সত্যতার লক্ষণ ঃ সংসক্তি ও আন্তরসম্বন্ধ তত্ত্ব

সংসক্তিবাদীদের মতে সংসক্তি যে কেবল সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড তা নয়, সংসক্তি সত্যতার লক্ষণও বটে, তারা বলেন ঃ

— সত্য = — বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে — -এর সংসক্তি আছে
ব সত্য = খ বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে।

1. প্রতিপাদন করে=implies

কোনো বাক্যমণ্ডল বা জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে সংসক্তি থাকাই সত্যতা। উক্ত মতবাদের একটি ভিত্তি হল ভাববাদীদের আন্তরসম্বন্ধ তত্ত্ব। আমরা মনে করি—ক বস্তুটি এরূপ বলে (যথা, তরল বলে) অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে অমুক অমুক সম্বন্ধে (যথা, মিশে যাওয়ার সম্বন্ধে) সম্বন্ধ হতে পারে। কিন্তু আন্তর-সম্বন্ধবাদীরা বলেন— অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে অমুক অমুক সম্বন্ধে সম্পর্কিত হয় বলেই ব-এর স্বরূপ এমন। এ সম্বন্ধতত্ত্ব অনুসারেঃ কোনো বস্তু ক-এর স্বরূপ নির্ভর করে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে ক-এর যে সম্বন্ধ তার উপর। ক অমুক অমুক বস্তুর সঙ্গে ঐ ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বলে, ক এরূপ ; কিন্তু ক যদি ঐ ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ না হয়ে অন্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হত তাহলে ক-এর স্বরূপ অন্যরকম হত॥ এ তত্ত্ব অনুসারে বস্তুমাত্রই সম্বন্ধ-অনুবিদ্ধ; সম্বন্ধ বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বস্তুর স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত করে। সংসক্তিবাদের ভাববাদী সমর্থকরা মনে করেন— আন্তরসম্বন্ধ তত্ত্ব প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই খাটে। তারা বলেনঃ কোনো বাক্য ব অন্য যে সকল বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলি না জানলে, ব সত্য কি ব মিথ্যা তা নির্ণয় করা দূরে থাক, "ব সত্য" "ব মিথ্যা" এ কথাগুলির অর্থই বোঝা যেত না। যথা, "এ পাতাটি সবুজ"ঃ বস্তুত সবুজের সঙ্গে বর্ণালীর অন্যান্য রঙের যে সম্বন্ধ (যেমন, সবুজ-রঙ লাল নীল প্রভৃতি থেকে ভিন্ন, নীল ও হলুদের মাঝামাঝি জায়গায় সবুজের স্থান) তা যদি জানা না যেত, তাহলে এ বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা জানা যেত না, এমনকি বাক্যটির অর্থই বোধগম্য হত না। সুতরাং সংসক্তিবাদীরা এ সিদ্ধান্ত করেন যেঃ অন্যান্য বাক্যের সঙ্গে আন্তর সম্বন্ধে সম্পর্কিত হবার দরুণই কোনো বাক্য সত্য বা মিথ্যা হয়, এবং আন্তর সম্বন্ধ হল সংসক্তি সম্বন্ধ, কাজেই এ সম্বন্ধ বিচার করেই কোনো বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা জানা যায়।

(6) সত্যতার মাত্রাভেদ

সংসক্তিবাদের একটি পরিণতি হল "সত্যতার মাত্রাভেদ"[1] তত্ত্ব। এ তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ভাববাদী দার্শনিক ব্রাড্‌লি। এঁর মতে— সংসক্তির মাত্রাভেদ আছে। যেমন, ধরা যাক, শিশুর জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে "সব লেবু মিষ্টি"—এ বাক্যের সংসক্তি আছে, আর আমাদের মত বয়স্ক ব্যক্তিদের জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে সংসক্তি আছে এ বাক্যেরঃ কোনো কোনো লেবু মিষ্টি আর কোনো কোনো লেবু টক। প্রথম ক্ষেত্রে সংসক্তির যে মাত্রা তার চেয়ে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে সংসক্তির মাত্রা বেশী, কেননা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাক্যটি একটি বৃহত্তর জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে সংসক্ত। এখন,

যেহেতুঃ সংসক্তির মাত্রাভেদ আছে,
সব বাক্যকেই একটি সর্বগ্রাসী বাক্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না,
জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানমণ্ডল বা বাক্যমণ্ডল পরিবর্তিত হয়, এবং
সংসক্তির ফলেই বাক্য সত্য হয় ;

সেহেতুঃ বাক্যের সত্যতার মাত্রাও পরিবর্তিত হয়, এবং
কোনো বাক্যই পরিপূর্ণরূপে সত্য বলে গণ্য নয়, অর্থাৎ
বাক্য মাত্রই আংশিকভাবে সত্য, আংশিকভাবে মিথ্যা॥

---

1. degrees of truth

যেমন, উক্ত উদাহরণে প্রথম বাক্যটি (আংশিকভাবে) সত্য, কেননা শিশুর জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে বাক্যটির সংসক্তি আছে, কিন্তু আংশিকভাবে মিথ্যা কেননা প্রাপ্তবয়স্কদের বৃহত্তর জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে এর সংসক্তি নেই। আলোচ্য মতে কোনো বাক্যই সম্পূর্ণরূপে সত্য নয় আবার সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা নয়। যথা, এ মতে—

এ পৃষ্ঠাটি সংস্কৃতে লেখা

এ বাক্যটি "এ পৃষ্ঠাটি বাংলায় লেখা"র চেয়ে অনেক বেশী মিথ্যা, কিন্তু বাক্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, আংশিকভাবে সত্য ; কেননা—এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থ নিহিত আছে যে

সংস্কৃত একটি ভাষা, এ পৃষ্ঠাটি কোনো-না-কোনো ভাষায় লিখিত।

এ বাক্যগুলির অর্থ প্রথমোক্ত বাক্যটির অর্থের অন্তর্গত। এখন, এ শেষোক্ত বাক্যগুলি সত্য বলে মূল বাক্যটির বক্তব্যের কিছুটা অংশ সত্য, সুতরাং মূল বাক্যটিও আংশিকভাবে সত্য। আবার, "2+2=5"-এর চেয়ে "2+2=4" অনেক বেশী সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। গাণিতিক বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে "2+2=4"-এর সংসক্তি আছে বলে বাক্যটি সত্য বলে গ্রাহ্য—এ কথা ঠিক। কিন্তু আমরা যদি এক অদ্বয় সর্বব্যাপক জ্ঞানমণ্ডলে পৌঁছাতে পারতাম তাহলে সে জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে বাক্যটির সংসক্তি দেখা যেত কিনা, কে জানে? (তাছাড়া, গণিতের বাইরেও সব সময় "2+2=4"—এ কথা খাটে কি?) কাজেই সংসক্তিবাদী ব্রাড্‌লি বলবেন: 2+2=4—এ বাক্যও আংশিকভাবে মিথ্যা।

(7) সংসক্তি সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড

এ কথা অনস্বীকার্য যে গাণিতিক বাক্যের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য সংসক্তি মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয় এবং সম্ভবত গাণিতিক বাক্যের ক্ষেত্রে এটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড। যদি দেখা যায় যে কোনো গাণিতিক বাক্য ব কোনো গৃহীত সূত্র বা কোনো নিষ্কাশিত উপপাদ্য থেকে নিঃসৃত হয় তাহলে ব সত্য বলে বিবেচ্য। গণিতে বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নিরূপন করা হয় বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সংসক্তি, প্রসক্তি বা প্রতিপত্তি আছে কিনা তাই দেখে।

কিন্তু সংসক্তিবাদীরা কেবল এ দাবী করেন না যে গণিতে সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হল সংসক্তি ; তাদের দাবী হল: সত্যতা নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড—কি গণিতে কি অন্যত্র—সংসক্তি। তাঁরা বলেন, অতীতসংক্রান্ত বাক্যের ক্ষেত্রে সংসক্তি ভিন্ন অন্য কোনো মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় না। যথা, সতর শ' সাতান্ন সালে পলাশী যুদ্ধ হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন—এ সব বাক্যের সঙ্গে অন্যান্য বাক্যের (ইতিহাসে লিপিবদ্ধ বাক্যের) সংসক্তি আছে কিনা তাই বিচার করা যায় ; অতীত কোনো ঘটনার সঙ্গে এদের মিলিয়ে দেখার কথা ওঠে না—আমরা অতীতে ফিরে যেতে পারি না, অতীত ঘটনাকে

বর্তমানকালে ধরে আনা যায় না। কাজেই অতীতসংক্রান্ত বাক্যের বেলায় সত্যাসত্য নির্ণয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হল সংসক্তি—বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্বন্ধ।

সংসক্তিবাদীরা আরও দাবী করেন যে : কেবল অতীতবিষয়ক বাক্যের বেলাতেই নয়, বর্তমানসংক্রান্ত বাক্যের ক্ষেত্রেও সংসক্তির মানদণ্ডেই সত্যতা মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয়। একটা উদাহরণ : ভূতলে একটা ঘট আছে। আমরা সাধারণ লোকেরা মনে করি যে এ বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা নির্ণয় করতে হলে, দেখতে হবে বর্ণিত ব্যাপারের সঙ্গে উক্তিটির মিল আছে কিনা, দেখতে হবে প্রকৃতই ভূতলে ঘট আছে কিনা। আনুরূপ্যবাদীরা বলেন, (এ রকম ক্ষেত্রে) বাক্যের সঙ্গে বাস্তব ব্যাপারের আনুরূপ্যই সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড। এ মতের প্রতিবাদ করে সংসক্তিবাদীরা বলেন : ব্যাপার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা ভুল, ব্যাপার বলতে তোমরা অনড় অচল পাথরের মত কিছু একটা কল্পনা করছ, যেন চোখ খুললেই পাথরসদৃশ স্বনির্ভর ব্যাপারটা দেখতে পাবে। যাকে ব্যাপার বল তাও জ্ঞাননির্ভর; শুধু তাই নয় ব্যাপার হল প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি। যেমন, ভূতলে ঘট আছে—এ ব্যাপারটা আসলে "ঐ যা দেখেছি তা এমন এমন", "একে ঘট বলে", "ওটা ভূতল", "ঐখানে ঘট আছে"—প্রভৃতি বাক্যের সমষ্টি। নিছক ব্যাপার বলে কিছু নেই। কাজেই ব্যাপারের সঙ্গে বাক্যের আনুরূপ্য আছে কিনা তা দেখার কথা ওঠে না। বাক্যের সঙ্গে বাক্যমণ্ডলের সম্পর্ক বিচার করেই জানা যায় কোনো বাক্য সত্য নাকি মিথ্যা।

(8) সমালোচনা

(ক) সংসক্তি ও বিকল্প বাক্যমণ্ডল : অবাধকতা নীতি[2]

ব সত্য = — বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে

এ মতবাদ মেনে নিলে এর পরিণতি হিসাবে এ উদ্ভট কথাও মানতে হয় যে দুটি বিরুদ্ধ বাক্য, অথবা দুই বা ততোধিক বিপরীত বাক্য, যুগপৎ সত্য হতে পারে।

রাসেল্ বলেছেন : এ কথা মনে করার কোনো হেতু নেই যে, সব বাক্যকেই কেবল একটি সর্বগ্রাসী অন্বয় বাক্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র বাক্যমণ্ডলের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। এখন ধরা যাক, প, ফ, ব তিনটি পরস্পরবিপরীত বাক্য (যথা, তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প), তিনটি বিভিন্ন বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে এদের এক একটির সংসক্তি সম্বন্ধ আছে—প-এর একটি মণ্ডলের সঙ্গে, ফ-এর অন্য মণ্ডলের এবং ব-এর অন্য মণ্ডলটির সঙ্গে। এখন "ব সত্য" আর "অমুক মণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে" যদি সমার্থক হত তাহলে প, ফ, ব এ তিনটি পরস্পরবিপরীত বাক্যের প্রত্যেকটিকে সত্য বলে গণ্য করতে হত। আবার যদি ব-এর সঙ্গে কোনো মণ্ডলের, আর ~ব-এর (ব-এর বিরুদ্ধ বাক্যের) সঙ্গে অন্য একটি মণ্ডলের সংসক্তি থাকে, তাহলে বলতে

2. Law of (Non-) contradiction

হবে যেঃ ব, এবং ~ব উভয়ই সত্য। কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানের একটি মৌল সূত্র হলঃ দুটি বাধক বাক্য—কি বিপরীত কি বিরুদ্ধ—যুগপৎ সত্য হতে পারে না (অবাধকতার নীতি)।

উপরোক্ত আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে সংসক্তিবাদীরা বলতে পারেনঃ আমরা এমন কথা বলি না যে

ব সত্য = —মণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে

আমরা বলি

ব সত্য = বৃহত্তম জ্ঞানমণ্ডল-এর সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে।

(খ) সংসক্তি ও বিরুদ্ধ বাক্যমণ্ডল ঃ নির্মধ্যতার সূত্র[1]

সত্য = বৃহত্তম বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে সংসক্তি আছে

—এ মতবাদ মেনে নিলে এর যৌক্তিক পরিণতি হিসাবে এ উদ্ভট কথাও মানতে হবে যে, দুটি বিরুদ্ধ বাক্যের কোনোটিই সত্য নয়।

মনে করা যাক, একটি বাক্যমণ্ডলের নাম ক, আর অন্যটির নাম খ। আরও মনে করা যাক, ক ও খ দুটি সমব্যাপক কিন্তু বিরুদ্ধ বাক্যমণ্ডল, এবং সকল বাক্য এ মণ্ডল দুটির কোনো না কোনটির অন্তর্ভুক্ত। যথা, ব ক-এর অন্তর্ভুক্ত, ~ব খ-এর অন্তর্ভুক্ত, ফ যদি ক-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে ~ফ খ-এর অন্তর্ভুক্ত, প যদি খ এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে ~প ক-এর অন্তর্ভুক্ত, এরূপে প্রত্যেকটি বাক্য মণ্ডলদুটির কোনো না কোনোটির অন্তর্ভুক্ত। এখন, বাক্য-মণ্ডল দুটি সমব্যাপক, সুতরাং কোনো বাক্য সম্বন্ধেই বলা যাবে না যেঃ একটি বৃহত্তম মণ্ডলের সঙ্গে বাক্যটির সংসক্তি আছে। সুতরাং, উপরোক্ত সংসক্তিবাদী তত্ত্ব মেনে নিলে, কোনো বাক্য সম্বন্ধেই বলা যাবে না যে বাক্যটি সত্য। তাহলে, এ কথা মানতে হবে যে ব-বাক্যটিও সত্য নয় এবং এর বিরুদ্ধ ~ব বাক্যটিও সত্য নয়। কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানের একটি মৌল সূত্র অনুসারেঃ

দুটি বাক্যের একটি অবশ্যই সত্য (নির্মধ্যম নীতি, মধ্যবিহীনতার সূত্র)।

ওপরে যে আপত্তির কথা বলা হল তাকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। দুটি সমব্যাপক-এবং-বিরুদ্ধ বাক্যমণ্ডল বস্তুত নেই—এ কথা বললে উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হয় না। কেননা এরকম দুটি বাক্যমণ্ডলের অস্তিত্ব যদি নাও থাকে তাহলেও এ জাতীয় মণ্ডলের যৌক্তিক সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না, ফলে এ সম্ভাবনার যে যৌক্তিক পরিণতি তাও অগ্রাহ্য করা যায় না।

(গ) সংসক্তিবাদ ও অনবস্থা[2]

সত্যতার লক্ষণ হল সংসক্তি—এ কথা বললে অনবস্থা দোষ ঘটে।

মনে করা যাক, ব বাক্যটি সত্য, এবং ব-এর সত্যতার হেতু হল তথদধ বাক্য-মণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি। অর্থাৎ তথদধ ব-কে প্রতিপাদন করে। এখন, কোনো বাক্য $ব_1$ থেকে $ব_2$ নিঃসৃত হলেই $ব_2$ সত্য বলে গণ্য হতে পারে

1. Law of Excluded Middle 2. infinite regress

না। $ব_2$ সত্য হতে পারে যদি (1) $ব_1$ $ব_2$-কে প্রতিপাদন করে এবং (2) $ব_1$ সত্য হয়। অর্থাৎ $ব_1$ থেকে $ব_2$ নিঃসৃত (অবরোহিত) হলেই এ দাবী করা যায় না যে $ব_2$ সত্য, $ব_2$-কে সত্য হতে হলে হেতুবাক্য $ব_1$-কেও সত্য হতে হবে। তাহলে, আমাদের দৃষ্টান্তের ব সত্য হতে পারে যদি প্রতিপাদক বাক্যমণ্ডল তথদধ সত্য হয়। প্রশ্ন ওঠে: ব-এর সত্যতার হেতু না হয় তথদধ (এ বাক্যগুলি); কিন্তু ত, থ, দ প্রভৃতি বাক্য যে সত্য তার হেতু কী? ধরা যাক, ত সত্য কেননা চছজ প্রভৃতির সঙ্গে ত-এর সংসক্তি আছে। কিন্তু চ যে সত্য তার হেতু কী? বলা বাহুল্য, কোনো বাক্যের সত্যতা অন্য কোনো বাক্যের সত্যতার উপর নির্ভরশীল—সব বাক্য সম্বন্ধে এ রকম ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনবস্থা দোষ হয়।

অনুমানে আমরা কোনো বাক্য হ-এর সত্যতা মেনে নিয়ে দাবী করি যে হ সত্য, এবং হ থেকে স নিঃসৃত হয়, সুতরাং স বাক্যটিও সত্য। এরকম ক্ষেত্রে বলতে পারি: স সত্য, কেননা হ সত্য, এবং হ-এর সঙ্গে স-এর সংসক্তি আছে। কিন্তু কোনো বাক্য বা বাক্যসমষ্টির সত্যতা মেনে না নিয়ে কেবল সংসক্তি দিয়েই সব বাক্যের সত্যতা ব্যাখ্যা করা যায় না।

(ঘ) "সংসক্তি"র অর্থ: "সত্যতা"র সংজ্ঞা ও চক্রক দোষ[1]

কোনো বাক্যমণ্ডল তথদধ……… -এর সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে

এ কথার অর্থ:

যদি তথদধ………সত্য হয় তাহলে ব অবশ্যই সত্য।

উক্ত বাক্য দুটির সমার্থতা লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে: "সত্য" কথাটির অর্থ না বুঝলে "অমুক বাক্যের সঙ্গে অমুক বাক্যের সংসক্তি আছে"—এ কথার অর্থ বোঝা যায় না। সত্যতার ধারণা না থাকলে সংসক্তির ধারণাও হতে পারে না। কাজেই যারা বলেন

ব সত্য = ম-এর (মণ্ডলের) সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে

তারা প্রকৃতপক্ষে এ কথাই বলেন যে

ব সত্য = ম সত্য হলে ব অবশ্যই সত্য হবে

অর্থাৎ যারা "সংসক্তি" কথাটি ব্যবহার করে "সত্যতা"র সংজ্ঞা দেন, সত্যতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন, তারা আসলে সত্যতার ধারণা দিয়ে "সত্যতা"র সংজ্ঞা দেন সত্যতা ব্যাখ্যা করেন।

(ঙ) সংসক্তি ও যুক্তিবৈজ্ঞানিক সূত্র (রাসেল্)

সংসক্তিবাদীরা বলেন: ব সত্য, কেননা কোনো বাক্যমণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে, সংসক্তির দরুণই ব সত্য। কিন্তু সংসক্তির দরুনই ব সত্য—এ কথা সব বাক্য সম্বন্ধে বলা যায় না; রাসেল্ বলেছেন, অন্তত যুক্তিবিজ্ঞানের সূত্র সম্বন্ধে, যথা অবাধকতার সূত্র সম্বন্ধে, বলা যায় না। কেননা, এ সূত্রের

1. circularity

সত্যতা মেনে না নিলে "সংসক্তি"র অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় না। রাসেল্ বলেছেন ঃ এ সূত্রটি যদি সত্য না হত তাহলে সংসক্তির (বা অ-সংসক্তির)সম্বন্ধ খাটত না। সংসক্তির অর্থ ঃ

খ মণ্ডলের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে=

খ মণ্ডলের বাক্যগুলি সত্য হলে ব মিথ্যা হতে পারে না, বা

খ মণ্ডলের বাক্যগুলি সত্য আর ব মিথ্যা— এ বাক্যটি স্ববিরোধী।

এখন, কোনো বাক্যকে স্ববিরোধী বলার অর্থ কী? স্ববিরোধী বলা হয় কেন? অবাধকতার সূত্র অনুসারে—কোনো বাক্য ও তার বিরুদ্ধ বা বিপরীত বাক্য যুগপৎ সত্য হতে পারে না। উপরোক্ত সমার্থক বাক্যগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় অবাধকতার সূত্র মেনে না নিলে "সংসক্তি"র অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার, অবাধকতার সূত্র খাটে বলেই, দুটি বাধক বাক্য যুগপৎ সত্য হতে পারে না বলেই, বাক্যের মধ্যে সংসক্তির সম্বন্ধ খাটতে পারে; এবং এ সূত্রের সত্যতা মেনে নিলেই বলা যায় অমুক বাক্যের সঙ্গে অমুক বাক্যমণ্ডলের সংসক্তি আছে। অবাধকতার সূত্রটি যদি সত্য না হত, তাহলে কোনো বাক্যের সঙ্গে অন্য কোনো বাক্যের সংসক্তি বা অ-সংসক্তি থাকত না। এখন,

দুটি বাধক বাক্য সত্য হতে পারে না

এ বাক্যটির সত্যতার উৎস কী? উত্তরে একথা বলা যাবে না যে, সংসক্তির ফলেই এ বাক্যটি সত্য; কেননা ঃ এ বাক্যটি সত্য বলেই সংসক্তির সম্বন্ধ খাটে। কাজেই সংসক্তির মানদণ্ড দিয়ে উক্ত বাক্যের (অবাধকতার সূত্রের) সত্যতা নির্ণয় করা যায় না। যদি বলা হয় যে— অন্য বাক্যের সঙ্গে সংসক্তি-সম্বন্ধ থাকার ফলেই অবাধকতার নীতি সত্য —তাহলে চক্রক দোষ হবে। এ জন্য রাসেল্ বলেছেন ঃ যুক্তিবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি যে বাক্য-কাঠামো দেয়, সে কাঠামোর মধ্যেই সংসক্তি মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু এ সূত্রগুলিকে আবার সংসক্তি মানদণ্ডের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

(চ) সত্যতার মাত্রাভেদ ঃ "অর্ধসত্য"

সংসক্তিবাদীরা সত্যতার মাত্রাভেদের কথা বলেন। কিন্তু "সত্যতার মাত্রাভেদ" তত্ত্বটি আপত্তিকর।

বাক্য মাত্রই হয় সত্য নতুবা মিথ্যা; কোনো বাক্য কম বা বেশী সত্য হতে পারে না। এমন হতে পারে, কোনো বাক্য ব সত্য কি মিথ্যা তা আমরা জানি না। কিন্তু কোনো বাক্য আংশিকভাবে সত্য মিথ্যা হতে পারে না। একটা উদাহরণ ঃ এ পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণভাবে বাংলায় লেখা। এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে সত্য। এ পৃষ্ঠাটিতে যদি দু একটি অ-বাংলা শব্দ থাকত তাহলে বাক্যটি আংশিকভাবে মিথ্যা হত না, সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলে বিবেচিত হত। কেননা সেক্ষেত্রে এ কথা নির্ভুলভাবে বলা বলা যেত না যে ঃ পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণভাবে বাংলায় লেখা।

এ কথা ঠিক যে অনেক সময় আমরা নিম্নোক্তরূপ বাক্‌ভঙ্গি প্রয়োগ করি: তার কথা পুরোপুরি সত্য নয়, আংশিকভাবে সত্য; তার বিবৃতিতে কতটুকু সত্য (সত্যতা) আছে? অনেক সময় আমরা সার্থকভাবে "অর্ধসত্য" কথাটিও ব্যবহার করি। যখন এ রকম বাক্‌ভঙ্গি ব্যবহার করা হয় তখন কিন্তু সত্যতার মাত্রার কথা বলা হয় না। যথা, যখন বলি তার উক্তি অর্ধসত্য তখন এ কথাই বলা হয় যে: সে সকল প্রাসঙ্গিক সত্য-বাক্য উল্লেখ করে নি। "ব বাক্যটি অর্ধসত্য"—এ কথার অর্থ এই নয় যে ব-এর মধ্যে কিছুটা সত্যতা কিছুটা মিথ্যাত্ব আছে। এ কথার অর্থ: যে প্রসঙ্গে ব উচ্চারণ করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে আরও যেসব সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি তা উল্লেখ করা হয় নি, সত্য গোপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে সত্য (মনে করা যাক, ব সত্য), তবে আরও যে সব কথা বলা উচিত ছিল তা বলা হয় নি। একটা উদাহরণ: বাসদুর্ঘটনায় আহত কোনো ব্যক্তি তার চিকিৎসকের কাছে জানতে চাইল তার কোথায় কোথায় আঘাত লেগেছে এবং উত্তরে চিকিৎসক বললেন—আপনার পায়ের হাড় ভেঙ্গেছে। ধরা যাক, বস্তুত ঐ ব্যক্তির পায়ের হাড় ভেঙ্গেছে, কোমরে আঘাত লেগেছে আর মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছে, এবং মস্তিষ্কের আঘাত সারবার মত নয়। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের উক্তিটিকে আমরা অর্ধসত্য বলে বর্ণনা করতে পারি। এ উক্তিকে আমরা অর্ধসত্য বলি এজন্য: এ প্রসঙ্গে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য চিকিৎসক জানালেন না, (আহত ব্যক্তির স্বার্থেই) গোপন করে গেলেন। কিন্তু চিকিৎসক সব ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন না বলে, "আপনার পায়ের হাড় ভেঙ্গেছে" এ বাক্য আংশিকভাবে মিথ্যা হয়ে গেল না। এ বাক্যটি পরিপূর্ণরূপে সত্য, এর মধ্যে মিথ্যার খাদ নেই।

(ছ) সংসক্তি ও অনুভব

বিকল্প বা বিরুদ্ধ বাক্যমণ্ডলের সম্ভবপরতার ভিত্তিতে সংসক্তিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হয় (যথা, প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি)। এ সব আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সংসক্তিবাদী "অনুভবের-সঙ্গে-সংসক্তি"র[1] কথা বলেন। যথা, ব্লান্‌সারড্‌ বলেন: সংসক্তিবাদ এ কথা বলে না যে যেকোনো বাক্যমণ্ডলই সত্য, এ মতে কেবল একটি অদ্বয় বাক্যমণ্ডলই সত্য হতে পারে। বাস্তব ও সম্ভাব্য সব কিছু যে মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, যে মণ্ডল আমাদের বাস্তব অনুভব অগ্রাহ্য করে না, কেবল সে মণ্ডলই সত্য॥

কিন্তু সংসক্তিবাদ সমর্থন করতে গিয়ে বাস্তবতা ও অনুভবের কথা তুললে এ মতবাদের মূল বক্তব্যই অস্বীকার করা হয়। বাস্তবতা ও অনুভবের দোহাই দিলে এ কথাই মেনে নেওয়া হয় যে—কেবল বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সংসক্তির উপর সত্যতা নির্ভর করে না। মেনে নেওয়া হয় যে—বাক্য ভিন্ন অন্য

1. অনুভবের সঙ্গে সংসক্তি=coherence with experience

কিছুর সঙ্গে সংসক্তির ফলেই কোনো বাক্য সত্য হয়। এর উত্তরে সংসক্তিবাদীরা বলতে পারেন : অনুভবের সঙ্গে কোনো বাক্যের ব-এর, সংসক্তির অর্থ হল—অনুভবলব্ধ বাক্যের সঙ্গে ব-এর সংসক্তি। কিন্তু অনুভবলব্ধ বাক্যগুলির সত্যতা আবার সংসক্তির উপর নির্ভর করে না, —করে যে ব্যাপারের অনুভব হয় সে ব্যাপারের সঙ্গে বাক্যগুলির সম্পর্কের উপর। অনুভব ও বাস্তবতার কথা সংসক্তিবাদীদের মুখে সাজে না। কেননা তাদের প্রধান বক্তব্য হল এই : সত্যতা হল বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সংসক্তি। ব বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের (ব্যাপারের নয়, বাক্যের) সংসক্তি থাকলেই ব সত্য॥ তাই যদি হবে তাহলে আবার অনুভব ও বাস্তব ব্যাপারের কথা ওঠে কেমন করে ?

(জ) ব্যাপার ও ব্যাপারবিষয়ক বাক্যের পার্থক্য

সংসক্তিবাদের ভাববাদী সমর্থকদের আর একটি দোষ হল এই : তারা ভুলে যান যে ব্যাপার[1] আর ব্যাপারবিষয়ক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। এবং তারা ব্যাপারকে বাক্যে বা জ্ঞানে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। ফলে তাঁরা

(ক) বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্বন্ধ (সংসক্তি), আর

(খ) বাক্যের সঙ্গে কোনো জ্ঞাত ব্যাপারের সম্বন্ধ (আনুরূপ্য বা অন্য সম্বন্ধ)

—এ সম্বন্ধ দুটির পার্থক্য অগ্রাহ্য করেন।

এ কথা ঠিক আমরা অনেক সময় সত্যতা নির্ণয় করতে গিয়ে সংসক্তি মানদণ্ড প্রয়োগ করি এবং যদি দেখি যে পূর্বেই-সত্য-বলে-গৃহীত তথদধ-এর সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে তাহলে মনে করি যে ব সত্য। এ রকম ক্ষেত্রে 'ব সত্য' এ কথা মনে করার হেতু হল এ বিশ্বাস : যে বাক্যগুলির সঙ্গে ব-এর সংসক্তি আছে সেগুলির (তথদধ-এর), বা অন্য যে বাক্যের সঙ্গে (চছজঝ-এর সঙ্গে) আবার তথদধ-এর সংসক্তি আছে সে বাক্যগুলির, সত্যতা শেষ পর্যন্ত কোনো বাক্য-অতিবর্তী ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল। সংক্ষেপে, কোনো বাক্য যে সত্য তার হেতু এই নয় যে, অন্য বাক্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। তার হেতু হল : কোনো বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে বাক্যটির সম্পর্ক আছে।

(ঝ) সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড : সংসক্তিবাদের গুরুত্ব

আমরা বলেছি : সংসক্তি সত্যতার লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে না; "সংসক্তি" দিয়ে "সত্যতা"র সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

কিন্তু সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে সংসক্তির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। গাণিতিক বাক্যের ক্ষেত্রে সংসক্তি ভিন্ন অন্য কোনো মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় না। বিশুদ্ধ গণিতে কোনো বাক্য ব-এর সত্যতা বা গ্রহণযোগ্যতার যৌক্তিক-পরীক্ষা করতে হলে, দেখতে হয় ব-এর সঙ্গে গৃহীত বাক্যগুলির সংসক্তি

1. fact

আছে কিনা। গৃহীত সূত্র বা পূর্বেই-প্রতিপাদিত বাক্য থেকে ব নিঃসৃত হয় কিনা। এরূপ পরীক্ষা করার অর্থ— সংসক্তি আছে কিনা তা দেখা।

তারপর প্রাত্যহিক জীবনে ও প্রাকৃত বিজ্ঞানেও আমরা অনেক সময় সফল-ভাবে সংসক্তি মানদণ্ড প্রয়োগ করে থাকি। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য কোন্‌টি ত্যাজ্য তা নির্ণয় করতে গিয়েও সংসক্তি মানদণ্ড ব্যবহার করি। তারপর, এ মানদণ্ড ব্যবহার করেই আমরা নির্ভুল প্রত্যক্ষ থেকে ভ্রমপ্রত্যক্ষকে পৃথক করি। যথা, "এটা একটা সাপ" এ বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী অনুভবলব্ধ "এটার চোখ নেই, মুখ নেই", "এটা নড়তে চড়তে পারে না" এ সব বাক্যের মিল নেই বলে এ ক্ষেত্রে সর্পদর্শনকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে মনে করি। আবার, সংসক্তি মানদণ্ড প্রয়োগ করেই স্বপ্নকালীন অনুভবকে অগ্রাহ্য করি, স্বাপ্নিক অনুভব বলে বুঝতে পারি। জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানের সঙ্গে সংগতি নেই বলেই স্বপ্নে পাওয়া "জ্ঞান"কে অসত্য বলে মনে করি।

রাসেল্‌ সংসক্তিবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনিও বলেন যে: সংসক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যতা-মানদণ্ড, তবে কিছু সত্য বাক্য (নির্ভুল তথ্য, বা জ্ঞান) অর্জিত হলে তবেই অন্য বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের জন্য, সংসক্তি মানদণ্ডটি প্রয়োগ করা যায়।

(ঞ) উপসংহার

আমরা সংসক্তিবাদের সামর্থ্য বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সংসক্তিই একমাত্র মানদণ্ড, এবং "সংসক্তি" দিয়েই "সত্যতা"র সংজ্ঞা দেওয়া যায় —এ দাবী দুটি আমরা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করি। সংসক্তি সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ডগুলির অন্যতম, একমাত্র মানদণ্ড নয়। আর জ্ঞানের কিছু অগ্রগতি হলে, সংসক্তি-ভিন্ন-অন্য-উপায়ে কিছু সত্য বাক্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই, এ সত্য বাক্যগুলির সঙ্গে সংসক্তি আছে কি নেই তা দেখে, অন্য কোনো বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়। বিশুদ্ধ গণিত বা যুক্তিবিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংসক্তি একমাত্র মানদণ্ড বলে বিবেচিত হতে পারে না।

গণিতে সংসক্তিই একমাত্র মানদণ্ড বলে গণ্য —এ কথা মানা যায়। কিন্তু এমন কি গণিতেও সংসক্তি সত্যতার লক্ষণ বলে গণ্য হতে পারে না। অর্থাৎ গাণিতিক বাক্য সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায় না যে, সংসক্তির দরুণই বাক্যগুলি সত্য। যথা, "2+2=4 —এ বাক্য সত্য"—এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে: অন্যান্য গাণিতিক বাক্যের সঙ্গে এর সংসক্তি আছে। এ কথা বলার অর্থ হল: এ বাক্যে যা বলা হয়েছে তা একটা গাণিতিক ব্যাপার। 2+2=4 —এ বাক্য যে সত্য তার হেতু হল: ব্যাপারটা এমন যে দুই আর দুইতে চার হয়। যেকোনো গাণিতিক বাক্য ব-এর বেলাতে বলা যায় যে: ব সত্য, কেননা —ব্যাপারটা এমন যে ব।

6. আনুরূপ্যবাদী সত্যতত্ত্ব[1]

আনুরূপ্য সত্যতার লক্ষণ ও মানদণ্ড

আনুরূপ্যবাদীদের দুটি দাবী। প্রথমত, আনুরূপ্য হল সত্যতার লক্ষণ ; কোনো বাক্য ও কোনো ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য থাকলে বাক্যটি সত্য, অন্যথা বাক্যটি মিথ্যা। দ্বিতীয়ত, সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হল আনুরূপ্য ; কোনো বাক্যের সঙ্গে ঐ বাক্যবর্ণিত ব্যাপারের আনুরূপ্য আছে কিনা তা জানা যায়, এবং আনুরূপ্য আছে কি নেই তা দেখে বাক্যটির সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ আনুরূপ্যবাদীদের মতে আনুরূপ্য সত্যতার লক্ষণও বটে মানদণ্ডও বটে।

ধরা যাক, "এ কলমটা কাল"—এ বাক্য সত্য। আনুরূপ্যবাদী মতে : এ বাক্যটি সত্য, কেননা প্রকৃত ব্যাপারের সঙ্গে বাক্যটির মিল (আনুরূপ্য) আছে, প্রকৃতই কলমটি কাল। এ বাক্যটি সত্য, কেননা বাক্যটি বাক্য-বর্ণিত ব্যাপারের অনুরূপ।। আবার ধরা যাক, "ঐ কলমটি হলদে" —এ বাক্যটি মিথ্যা। আনুরূপ্যবাদীরা বলবেন, এ বাক্যটি মিথ্যা—এ কথা বলার অর্থ : বস্তুত কলমটি হলদে নয়, বাক্যটিতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তব ব্যাপারের মিল নেই। এ মতে কোনো বাক্যের সঙ্গে বাক্যবর্ণিত ব্যাপারটির আনুরূপ্য আছে কি নেই তা দেখেই জানা যায় বাক্যটি সত্য না মিথ্যা।

আনুরূপ্যবাদীদের মতে—

কোনো বাক্যের সঙ্গে যদি কোনো ব্যাপারের আনুরূপ্য থাকে তাহলে বাক্যটি সত্য আর যদি আনুরূপ্য না থাকে তাহলে বাক্যটি মিথ্যা। এদের মূল বক্তব্য হল : কোনো ব্যক্তি যা বিশ্বাস করে তার সত্যতা মিথ্যাত্ব ঐ ব্যক্তির বিশ্বাসকরণের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিশ্বাসের অতিবর্তী কোনো ব্যাপারের উপর। অর্থাৎ কোনো বিশ্বাসকে সত্য হতে হলে, বিশ্বাসের অতিরিক্ত কিছু, কোনো ব্যাপার, থাকার দরকার —যে ব্যাপারের দরুণ বিশ্বাসটি সত্য (বা মিথ্যা)। দ্বিতীয়ত, এ মতে কোনো বিশ্বাস (বা বাক্য) ও ব্যাপারের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকার দরুণ বাক্যটি সত্য (বা মিথ্যা) সে সম্বন্ধ হল আনুরূপ্য (বা আনুরূপ্যের অভাব)।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি সে ভাষায় এ মতবাদের সমর্থন মেলে। কাজেই আলোচ্য তত্ত্বটি লোকায়ত তত্ত্ব বলে গণ্য হতে পারে। আমরা বলি : তুমি যা বলছ তা সত্য, কেননা ব্যাপারটা আসলে এ রকম, ও যা বলেছে তা সত্য নয়, কেননা আসল ব্যাপারের সঙ্গে ওর কথার মিল নেই। আমরা আরও বলি : আমি যা বলছি তা সত্য, কেননা বাস্তব ব্যাপার, পরিস্থিতি বা অবস্থার সঙ্গে আমার কথার মিল আছে, সংগতি আছে, সাদৃশ্য আছে, সামঞ্জস্য আছে। উক্তরূপ বাক্যপ্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, কোনো বাক্য সত্য —এ কথা বলার অর্থ হল :

(ক) বাক্য ও বাক্য-বর্ণিত ব্যাপারের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, এবং

(খ) এ বিশেষ প্রকারের সম্বন্ধের নাম আনুরূপ্য (সংগতি বা অন্বয়)।

1. Correspondence Theory of Truth

(1) আনুরূপ্য সম্বন্ধের সম্বন্ধী : বাক্য ও ব্যাপার (ব্যাপার না ঘটনা ?*)

আনুরূপ্য সম্বন্ধটি কিসের মধ্যে খাটে—এ সম্বন্ধের সম্বন্ধীগুলি কী ? স্পষ্টতই একটি সম্বন্ধী হল বাক্য বা বিশ্বাস। অন্য সম্বন্ধটি কী ? আনুরূপ্যবাদীরা বলেন, অন্য সম্বন্ধীটি হল বাস্তব ব্যাপার, আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে—ব্যাপার। এখানে "ঘটনা" কথাটি ব্যবহার না করে "ব্যাপার" কথাটি ব্যবহার করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আনুরূপ্যবাদীরা এ কথা বলবেন না যে : ব সত্য, কেননা ব-এর সঙ্গে কোনো ঘটনার আনুরূপ্য আছে। তারা বলেন : ব সত্য, কেননা ব-এর সঙ্গে কোনো ব্যাপারের আনুরূপ্য আছে। যদি বলা হত যে, আনুরূপ্য সম্বন্ধ খাটে কোনো বাক্য ও ঘটনার মধ্যে, তাহলে নিম্নোক্ত সত্য বাক্যগুলি সম্পর্কে আনুরূপ্যবাদীদের বলতে হত :

সব মানুষ মর—এ সার্বিক বাক্যটি সত্য, কেননা এর অনুরূপ একটি সার্বিক ঘটনা আছে।

$2+2=4$ —এ অবশ্যম্ভব বাক্যটি সত্য, কেননা এর অনুরূপ একটি অবশ্যম্ভব ঘটনা আছে।

গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রপতি হন নি—এ অভাববাচক বাক্যটি সত্য কেননা এর অনুরূপ একটি অভাবাত্মক ঘটনা ঘটেছিল ॥

ব্যাপার ও ঘটনা : কিন্তু ঘটনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে —ঘটনামাত্রই বিশেষ, কোনো বিশেষ ক্ষণে ঘটে, এবং বিশেষ ক্ষণে এর সমাপ্তি হয়। কাজেই সার্বিক ঘটনা, অবশ্যম্ভব ঘটনা বা অভাবাত্মক ঘটনা বলে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না। যেমন, এ কথা বলা যায় না যে : গান্ধীর-ভারতের-রাষ্ট্রপতি-না-হওয়া ঘটনাটি ঘটেছিল বলেই, "গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন" এ বাক্যটি মিথ্যা। কোনো ঘটনা-না-ঘটা আবার ঘটনা বলে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু "সার্বিক ব্যাপার", "অবশ্যম্ভব ব্যাপার", "অভাবাত্মক ব্যাপার"—এসব কথা ব্যবহার করা যায়। যথা, আমরা বলতে পারি : বাস্তব ব্যাপার হল এমন যে গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রপতি হন নি। তাহলে, আনুরূপ্য সম্বন্ধের অন্য সম্বন্ধটি হল ব্যাপার। এ সম্বন্ধের একদিকে বাক্য, অন্যদিকে ব্যাপার।

(2) আনুরূপ্য সম্বন্ধের স্বরূপ

আনুরূপ্য সম্বন্ধের স্বরূপ সম্পর্কে আনুরূপ্যবাদীদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। আনুরূপ্যের যেসব লক্ষণ দেওয়া হয়েছে নিচে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

(ক) আনুরূপ্য হল : মূল ও তার প্রতিরূপ (প্রতিচ্ছবি বা অনুলিপি)[1]-র সম্বন্ধ।

যারা আনুরূপ্যের এ লক্ষণ দেন তাদের মতে—"বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য আছে"—এ কথার অর্থ হল : বাক্য ব্যাপারের প্রতিচ্ছবি, প্রতিরূপ বা অনুলিপি।

(খ) আনুরূপ্য হল : সম্বন্ধ দুটির উপকরণের মধ্যে "এক-এক সম্বন্ধ"[2]।

---

* ব্যাপার=fact, ঘটনা=event

1. copy 2. one-one relation

"এক-এক সম্বন্ধ" বলতে কী বোঝায়? দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনো বাড়ী ও তার নকশার সম্বন্ধটি লক্ষ করা যাক। নকশাটির প্রত্যেকটি চিহ্ন বাড়ীটির এক এক অংশ বোঝায়: নকশার ঐ দাগটি ঐ জানালার বদলে, এ দাগটি এ দরজার বদলে দেওয়া হয়েছে, ঐ বর্গক্ষেত্রটি শোবার ঘর বোঝায়, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে বলব বাড়ীটি ও এর নকশার মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ আছে। কোনো দেশের সঙ্গে তার মানচিত্রের সাদৃশ্য নেই। দেশে আছে গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, দেশনিসর্গ অসমতল; কিন্তু দেশটির মানচিত্রটি সমতল, দেশখণ্ডের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন, লাল নীল বহু রঙে চিত্রিত। কিন্তু মানচিত্রের প্রত্যেকটি অংশ দেশনিসর্গের বিভিন্ন অংশ বোঝায়: দেশনিসর্গে আছে একটি নদী, মানচিত্রে আছে একটি বক্ররেখা, ওখানে একটি পর্বত, এখানে তার বদলে একটি ত্রিভুজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বলা যায়: কোনো দেশের সঙ্গে তার সঠিক মানচিত্রের যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ হল এক-এক সম্বন্ধ। আনুরূপ্যের উক্ত লক্ষণ গ্রহণ করলে বলা যায়: কোনো গানের স্বরলিপির সঙ্গে গানটির আনুরূপ্য (এক-এক সম্বন্ধ), আছে। সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে বলতে পারি: দুটি বস্তুর, ক ও খ-এর, সম্বন্ধ যদি এমন হয় যে ক-তে যে কয়টি উপকরণ বা অংশ আছে খ-তেও ততগুলি উপকরণ বা অংশ আছে তাহলে বুঝতে হবে ক ও খ-এর মধ্যে আনুরূপ্য আছে। আরও একটি উদাহরণ:

1,	3,	5,	7,	9
2,	4,	6,	8,	10

এ দুটি সংখ্যামালার মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ বা আনুরূপ্য আছে।

(গ) আনুরূপ্য হল: উপকরণ-সংস্থানের অভিন্নতা[1]।

যারা এভাবে আনুরূপ্যের লক্ষণ দেন তারা বলেন দুটি বস্তুর মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ থাকলেই বলা যায় না যে এদের মধ্যে আনুরূপ্য আছে। যথা

1,	3,	5,	7,	9,	11
11,	9,	7,	5,	3,	1

এ সংখ্যামালা দুটির মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আনুরূপ্য নেই। দুটি বস্তুর ক ও খ-এর মধ্যে আনুরূপ্য থাকতে হলে ক-এর উপকরণগুলি যেভাবে (ক্রমে) বিন্যস্ত খ-এর উপকরণগুলিকে সেভাবে বিন্যস্ত হতে হবে।

(ঘ) আনুরূপ্য হল: এক-এক সম্বন্ধ ও গঠনের অভিন্নতা।

কোনো কোনো আনুরূপ্যবাদী বলেন যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে আনুরূপ্য

1. identity of structure

থাকতে হলে এদের মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ থাকার দরকার, আবার গঠনের অভিন্নতাও (বা উপকরণ-সংস্থানের অভিন্নতাও) থাকা দরকার* ।

(ঙ) আনুরূপ্য অবিশ্লেষণীয় ।

কোনো কোনো আনুরূপ্যবাদী মনে করেন যে ঃ আনুরূপ্য সম্বন্ধটি অনন্য, অবিশ্লেষণীয় । আনুরূপ্যের লক্ষণ দেওয়া যায় না—এ সম্বন্ধটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না ॥

(3) আনুরূপ্যের স্বরূপ ঃ সমালোচনা

(ক) প্রতিরূপবাদী আনুরূপ্যতত্ত্ব

বাক্য হল ব্যাপারের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ —এ মতবাদের সমালোচনা করে বলা যায় ঃ ব্যাপারের সঙ্গে বাক্যের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, কাজেই বাক্যকে ব্যাপারের প্রতিরূপ বলে গণ্য করা যায় না । যথা, "আমার কুকুরটি সাহসী ও প্রভুভক্ত"—এ বাক্যটি (ধরা যাক) সত্য, কেননা বস্তুত কুকুরটি সাহসী ও প্রভুভক্ত । কিন্তু এ বাক্যটির সঙ্গে সাহসী প্রভুভক্ত কুকুরটির কোনো সাদৃশ্য নেই । কোনো কুকুর সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে কুকুরটি সাহসী ও প্রভুভক্ত, কিন্তু বাক্য সম্বন্ধে এ জাতীয় কথা বলা যায় না । এ বাক্যটি সাহসী ও প্রভুভক্ত —এ কথা অর্থহীন ।

(খ) এক-এক-সম্বন্ধবাদী আনুরূপ্যতত্ত্ব

কোনো কোনো আনুরূপ্যবাদীদের মতে আনুরূপ্য হল বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ । কিন্তু আনুরূপ্যের এ লক্ষণ গ্রহণ করা যায় না । কেননা আনুরূপ্যের এ অর্থে, কোনো বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য থাকলেও বাক্যটি মিথ্যা হতে পারে । যথা

বাক্য ঃ "রাম শ্যাম-এর চেয়ে বড়"

ব্যাপার ঃ শ্যাম রাম-এর চেয়ে বড়

এখানে বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ আছে, ব্যাপারটির প্রত্যেক উপকরণের —রাম, শ্যাম-নামক-ব্যক্তি, "—এর চেয়ে বড়" যে সম্বন্ধ বোঝায় সে সম্বন্ধ— এদের সঙ্গে বাক্যটির উপকরণের "রাম", "শ্যাম", "—এর চেয়ে বড়"—এ কথাগুলির এক-এক সম্বন্ধ আছে । কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে ঃ "রাম শ্যামের চেয়ে বড়"—এ বাক্যটি সত্য কেননা ব্যাপারটা এমন যে শ্যাম রামের চেয়ে বড় । এ ক্ষেত্রে বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য (এক-এক সম্বন্ধ) আছে অথচ বাক্যটি মিথ্যা ; এ কথাও বলতে পারি এখানে ব্যাপারের সঙ্গে আনুরূপ্য থাকার ফলেই বাক্যটি মিথ্যা । সুতরাং আনুরূপ্য বলতে যদি এক-এক সম্বন্ধ বোঝায় তাহলে আনুরূপ্যবাদী সত্যতত্ত্ব অসত্য ।

*অর্থাৎ এ মতে ঃ দুটি বিষয়ের মধ্যে যদি একই সঙ্গে (খ)-তে বর্ণিত ও (গ)-তে বর্ণিত সর্ত খাটে তাহলেই বলা যাবে বিষয় দুটির মধ্যে আনুরূপ্য আছে ।

(গ) গঠন-অভিন্নতাবাদী আনুরূপ্যতত্ত্ব

কোনো কোনো আনুরূপ্যবাদীর মতে— আনুরূপ্য বলতে এক-এক সম্বন্ধ বোঝায় না ; "আনুরূপ্য" বলতে বুঝতে হবে ঃ বাক্য ও ব্যাপারের গঠনের মিল, এদের উপকরণ-বিন্যাসের অভিন্নতা। কিন্তু এ মতও গ্রহণ করা যায় না। কেননা, এমন হতে পারে যে ঃ কোনো ব্যাপারের উপকরণ-বিন্যাস ও কোনো বাক্যের উপকরণ-বিন্যাস (বা সংস্থান) অভিন্ন, অথচ বাক্যটি মিথ্যা। যথা

বাক্য ঃ "দার্জিলিং-এর চেয়ে কলকাতা সমুদ্রের বেশী কাছে"

—এ বাক্যের যেরূপ গঠন (উপকরণ-সংস্থান) নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলির গঠনও সে রকম।

ব্যাপার ঃ দিল্লীর চেয়ে পুরী সমুদ্রের বেশী কাছে
পাটনার চেয়ে হাওড়া কলকাতার বেশী কাছে

—এ ব্যাপারগুলির উপকরণ-বিন্যাসের আকার হল

ক-এর চেয়ে খ গ-এর বেশী কাছে

আর উক্ত বাক্যটির উপকরণ-বিন্যাসও ঠিক এরূপ। কিন্তু যদিও উক্ত বাক্যটির গঠন ও ব্যাপারগুলির গঠন একরূপ, তবু একথা বলা যায় না যে ঐ ব্যাপারগুলির সঙ্গে গঠনের অভিন্নতা (বা আনুরূপ্য) আছে বলেই বাক্যটি সত্য। যথা, বলা যায় না যে—

ব্যাপারটা এমন যে দিল্লীর চেয়ে পুরী সমুদ্রের বেশী কাছে,
∴ "দার্জিলিং-এর চেয়ে কলকাতা সমুদ্রের বেশী কাছে"—এ বাক্যটি সত্য।

(ঘ) এক-এক-সম্বন্ধ ও গঠন-অভিন্নতা, এবং আনুরূপ্যতত্ত্ব

এ মতও গ্রহণ করা যায় না যে আনুরূপ্য হল ঃ বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে এক-এক সম্বন্ধ ও এদের উপকরণ-বিন্যাসের অভিন্নতা। কেননা তাহলে আনুরূপ্যের তৃতীয় লক্ষণটির বিরুদ্ধে যে আপত্তি তোলা হয়েছে—এ লক্ষণটির বিরুদ্ধেও সে আপত্তি ওঠে। যথা

বাক্য ঃ "রাম শ্যাম-এর দক্ষিণে ও যদুর বামে"
ব্যাপার ঃ রাম হরির দক্ষিণে ও মধুর বামে

—এখানে বাক্যের উপকরণের সঙ্গে ব্যাপারের উপকরণের এক-এক সম্বন্ধ আছে এবং এদের বিন্যাসও অভিন্ন। তবু একথা বলা যায় না যে

ব্যাপোরটা এমন যে রাম হরির দক্ষিণে এবং মধুর বামে,
∴ "রাম শ্যাম-এর দক্ষিণে এবং যদুর বামে"—এ বাক্যটি সত্য।

ব্যাপারটা যদি প্রকৃতই এমন হয় তাহলে উক্ত বাক্যটি সত্য নাও হতে পারে।

(ঙ) আনুরূপ্য অবিশ্লেষণীয়

আমরা দেখেছি যে আনুরূপ্যের যেসব লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সে লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি আপত্তিকর। এজন্য কোনো কোনো আনুরূপ্যবাদী বলেন যে ঃ আনুরূপ্যের লক্ষণ দেওয়া যায় না। আনুরূপ্য সম্বন্ধটি এমন যে একে বিশ্লেষণ করা যায় না ॥

এ কথা ঠিক যে এমন বহু গুণ ও সম্বন্ধ আছে যাদের লক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। যথা "লাল" কথাটি কী আনুভবিক গুণ বোঝায় তা আমরা জানি, লাল-এর অনুভব হল কি হল না তা বুঝতে পারি, কিন্তু লাল-এর লক্ষণ দিতে পারি না। কিন্তু নীতিগতভাবে উক্তরূপ সমাধান প্রচেষ্টা (আনুরূপ্য অবিশ্লেষণীয়—এ কথা মনে করা) সাধারণভাবে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা যে ধারণাকে আমরা অবিশ্লেষণীয় মনে করছি প্রকৃতপক্ষে তার যে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কী? এমন ত হতে পারে, এখন পর্যন্ত স সম্বন্ধটি বিশ্লেষণ করতে পারি নি বলে মনে করছি যে স অবিশ্লেষণীয়; কিন্তু হয়ত স প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণযোগ্য, লক্ষণকরণযোগ্য।

তবে আনুরূপ্যের লক্ষণ দিতে না পারলেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে আনুরূপ্যবাদী সত্যতত্ত্ব পরিত্যাজ্য। লক্ষণ দিতে না পারলেও আমরা বলতে পারি: কোনো বাক্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ব্যাপারের সম্পর্ক থাকে বলেই বাক্যটি সত্য, এবং এ সম্বন্ধটিকে "আনুরূপ্যের সম্বন্ধ" বলে অভিহিত করা হয়। এ সম্বন্ধটি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না, ঠিক; কিন্তু সম্বন্ধটি কী তা বুঝতে পারি। যথা, সহজেই বুঝতে পারি

এ ফুলটি লাল

এ বাক্যের সঙ্গে

ব্যাপারটি এমন যে এ ফুলটি লাল

—এ বাক্যে যে ব্যাপার ব্যক্ত হয়েছে তার আনুরূপ্য আছে।

(4) আনুরূপ্য-মানদণ্ড: সমালোচনা

আনুরূপ্য ও ব্যাপারপ্রত্যক্ষ

আপত্তি: আমাদের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সংগতি না থাকলে আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ "ব্যাপার"কেও অগ্রাহ্য করি।

সংসক্তিবাদীরা বলেন: আমাদের প্রত্যক্ষে যে ব্যাপার পাই (ধরে নেওয়া যাক, ব্যাপার প্রত্যক্ষকরণ সম্ভব*) তা যদি আমাদের জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে খাপ না খায় তাহলে তা আমরা অগ্রাহ্য করে থাকি। যথা, প্রত্যক্ষে এ ব্যাপারটা পেলাম—ঐ রেললাইন দুটো ক্রমশ পরস্পরের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় মিশে গেছে। এ ব্যাপারের সঙ্গে "ঐ রেললাইন পরস্পরের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় মিশে গেছে" এ বাক্যের আনুরূপ্য আছে, অথচ ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করে আমরা বাক্যটিকে মিথ্যা বলে গণ্য করি। এরকম ক্ষেত্রে আনুরূপ্যবাদীদের ব্যাপারের উপর আমাদের কোনো আস্থা নেই। এর থেকে বোঝা যায়, আমরা আনুরূপ্য-মানদণ্ডের সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করি না। আনুরূপ্য যদি নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হত তাহলে আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ ব্যাপার অগ্রাহ্য করতাম না॥

*সংসক্তিবাদীদের মতে—বিশুদ্ধ ব্যাপার বলে কিছু নেই।

আপত্তিখণ্ডন ঃ এ আপত্তির উত্তরে বলা যায়—ধরা যাক, আপত্তিটি সঙ্গত, তাহলেও কিন্তু প্রমাণ হয় না যে কখনই সফলভাবে আনুরূপ্য মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় না। উক্ত আপত্তি যা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তা এই ঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুরূপ্য মানদণ্ডটি ব্যবহার করা যায় না। তারপর, প্রত্যক্ষে আমরা যে ব্যাপার পাই তার সঙ্গে অর্জিত (বৈজ্ঞানিক) জ্ঞানের অসংগতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষলব্ধ ব্যাপারকে অভ্রান্ত বলে মনে করি। যেমন, ধরা যাক, কোনো যাদুকর খালি টুপীর ভেতর থেকে সাদা পায়রা বের করল। আমাদের পূর্বার্জিত জ্ঞানের সঙ্গে এ অদ্ভুত ব্যাপারটি খাপ খায় না। কিন্তু আমাদের জ্ঞানমণ্ডলের সঙ্গে না মিললেও আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ ব্যাপারটি, যা দেখছি তা সাদা পায়রাই—এ ব্যাপারটি, অগ্রাহ্য করি না, সাদা পায়রা দেখাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ মনে করি না। মনে করি ঃ যা দেখছি তা প্রকৃতই সাদা পায়রা।

আনুরূপ্য ও আনুরূপ্য-যাচাইকরণ

আপত্তি ঃ কোনো বাক্যের সঙ্গে কোনো ব্যাপারের আনুরূপ্য আছে কিনা তা যাচাই করা যায় না।

আনুরূপ্যবাদবিরোধীরা বলেন ঃ বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য আছে কিনা তা যাচাইকরণের জন্য দরকার—একদিকে বাক্য অন্য দিকে বিশুদ্ধ ব্যাপার। এখন, যাচাইকরণের জন্য যে-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার দরকার সে প্রত্যক্ষকরণও বাচনিক[1], অর্থাৎ তথাকথিত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে ব্যাপারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় জ্ঞান, বাক্য (বচন) বা বাক্যসমষ্টি। কাজেই কোনো বাক্যের সঙ্গে বাক্যবর্ণিত ব্যাপারের আনুরূপ্য আছে কিনা, তার যাচাইকরণ সম্ভব নয়। যথা "এ ফুলটি লাল"—এ বাক্যটির সত্যতা নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা ফুলটি প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষে যা পেলাম তা ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে না; আসলে তা হল ঃ এ ফুলটি লাল—এ জ্ঞান বা "এ ফুলটি লাল" এ বাক্য। কাজেই কোনো বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের তুলনা করা যায়, কোনো বাক্যের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষলব্ধ বাক্যের সংগতি আছে কিনা তা দেখা যায়; কিন্তু বাক্যের সঙ্গে ব্যাপারের মিল আছে কিনা তা যাচাই করা যায় না। উক্ত আপত্তিটি নিম্নোক্ত যুক্তি-শৃঙ্খলের আকারে ব্যক্ত করা যায় ঃ

পর্যবেক্ষণের* ফলে যা পাওয়া যায় তা হল জ্ঞান, বা বাক্য (অন্য কিছু নয়);
∴ পর্যবেক্ষণে কোনো ব্যাপারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।
∴ যদি আনুরূপ্যবাদ সত্য হয় তাহলে কোনো বাক্যের সত্যতা যাচাই করা যায় না।
কিন্তু পর্যবেক্ষণ দিয়ে আমরা কোনো কোনো বাক্যের সত্যতা যাচাই করতে পারি,
∴ আনুরূপ্য তত্ত্বটি সত্য নয়।

---

1. propositional * পর্যবেক্ষণ = প্রত্যক্ষ

আপত্তিখণ্ডন ঃ উক্ত যুক্তির একটি হেতুবাক্য হল— পর্যবেক্ষণে কোনো ব্যাপারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সব ব্যাপার-পর্যবেক্ষণ প্রকৃতপক্ষে বাচনিক। এ হেতু-বাক্যের সত্যতা মেনে নিলেও এর থেকে এ কথা নিঃসৃত হয় না যে, আনুরূপ্য সত্যতার লক্ষণ নয় বা আনুরূপ্য দিয়ে সত্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। উক্ত হেতুবাক্যের বলে বড় জোর এ কথা বলা যায় ঃ সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসাবে আনুরূপ্য মানদণ্ডটি ব্যবহার করা যায় না, আনুরূপ্য দিয়ে সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায় না।

এবার উক্ত হেতুবাক্যটির যাথার্থ্য বিচার করা যাক। ধরা যাক, বাগানের দিকে না তাকিয়ে (হয়ত অনুমান করে) ক-ব্যক্তি বলল ঃ "এখন ঐ বাগানে শিউলি ফুল ফুটেছে"। এ উক্তির সত্যতা মিথ্যাত্ব পরীক্ষার জন্য বাগানে গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে প্রকৃতই শিউলি ফুল ফুটে আছে। এ ক্ষেত্রে আনুরূপ্যবাদীরা বলবেন ঃ উক্ত বাক্যের সঙ্গে ব্যাপারের (শিউলি-ফুল-ফুটে-থাকা ব্যাপারের) আনুরূপ্য আছে বলে বাক্যটি সত্য, এবং এ আনুরূপ্য দেখেই জানা গেল যে বাক্যটি সত্য। কিন্তু আনুরূপ্যবিরোধীরা, বিশেষত সংসক্তি-বাদীরা, বলেন ঃ এখানে পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপার পেলাম কোথায়? পেয়েছি ত একটি বাক্য—"এখন এ বাগানে শিউলি ফুল ফুটে আছে" —এ বাক্য। কাজেই এ ক্ষেত্রে ক-ব্যক্তির উক্তির সঙ্গে আমাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ বাক্যের মিল আছে কিনা কেবল তাই দেখা যায়, এবং বলা যায় ঃ বর্তমান ক্ষেত্রে ক-ব্যক্তির উক্তির (বাক্যের) সঙ্গে আমাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য আছে, সুতরাং ক-এর উক্তিটি সত্য।

প্রশ্ন ওঠে, ক-এর উক্তি ও আমাদের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান বা বাক্যের কি কোনো পার্থক্য নেই? অবশ্যই আছে। পার্থক্যটি এই ঃ ক-এর উক্তি প্রত্যক্ষ-ভিত্তিক নয়, আর আমাদের যাচাই-করা বাক্যের ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণ। আর পর্যবেক্ষণ করে যে বাক্যটি পেলাম তার বক্তব্য হল ঃ ব্যাপারটা এমন যে—। এ ব্যাপার না মানলে ক-এর উক্তি ও আমাদের প্রত্যক্ষলব্ধ (ক-এর উক্তির সমর্থক) বাক্যের মধ্যে কোনো ভেদ থাকত না। আনুরূপ্যবিরোধীরা বলেন ঃ পর্যবেক্ষণে কোনো ব্যাপারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত দৃষ্টান্তে যে আনুভবিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সে জ্ঞান ত কোন বিষয়ের জ্ঞান (ব্যাপারের জ্ঞান), জ্ঞানের জ্ঞান নয়, বা শূন্যের জ্ঞান নয়। এরকম ক্ষেত্রে জ্ঞানমাত্রই কোনো বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান। পর্যবেক্ষণে যে বাক্য লাভ করলাম তার বক্তব্য হল ঃ এটা ঠিক, এ ব্যাপারটা এমন। ব্যাপার বলে কিছুই নেই, ব্যাপার পর্যবেক্ষণে ধরা দেয় না —মনে হয়, এ সব উক্তি যুক্তিসহ নয়। তবে এ কথা মানতে বাধা নেই যে ঃ যাকে ব্যাপার বলা হয় তা সম্পূর্ণ মনোনিরপেক্ষ নয়, তা আসলে আমাদের জ্ঞান-অনুবিদ্ধ। দেশ, কাল, দ্রব্য, গুণ এ সব ধারণা না থাকলে, পূর্বার্জিত ধারণা প্রয়োগ না করলে, এ রকম উক্তি করা যেত না ঃ এটা একটা শিউলি ফুল, ঐ হাঁসটা সাদা।

কিন্তু "পূর্বার্জিত ধারণা ও অনুভব না থাকলে ব্যাপারের জ্ঞান হয় না"—এ উক্তি করা এক কথা, আর "ব্যাপার বলে কিছুই নেই", "পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপার বলে কিছু পাওয়া যায় না"—এ সব ভিন্ন কথা। প্রথম উক্তিটি সত্য। শেষোক্ত উক্তিগুলি মিথ্যা।

তারপর, আমরা কোনো ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করতে পারি না—এ উক্তি করলে আমাদের ভাষাবিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষায় এবং বৈজ্ঞানিক ভাষায় "ব্যাপার-পর্যবেক্ষণ" বলে একটা কথা আছে। বিজ্ঞানে হামেশা আমরা ব্যাপার পর্যবেক্ষণের কথা বলে থাকি। এবং "ব্যাপার-পর্যবেক্ষণ"—এ কথাটির মধ্যে কোনো অসংগতি বা স্ববিরোধিতা আছে বলে ত মনে হয় না। আর, এতদিন যারা ব্যাপার পর্যবেক্ষণের কথা বলে এসেছে, সবাই একটা যৌথ ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্তী হয়েছিল এবং কেবল সংসক্তিবাদীরাই এ যৌথ-ভ্রান্তি থেকে আমাদের মুক্তিবিধান করেছেন বা করবেন—এ সব কথা অসঙ্গত বলে মনে হয়। ব্যাপার-পর্যবেক্ষণ বলে কিছু না থাকলে আমাদের ভাষায় "ব্যাপার-পর্যবেক্ষণ" এ কথাও সম্ভবত থাকত না। বস্তুত এক বিশেষ প্রকারের অনুভব (ব্যাপার-পর্যবেক্ষণ) বর্ণনা করার জন্যই "ব্যাপার-পর্যবেক্ষণ" কথাটির উদ্ভাবন।

উপসংহার

আনুরূপ্যবাদী সত্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি ছিল: আনুরূপ্য সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধীর, ব্যাপারের, সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সুতরাং বাক্য ও ব্যাপারের আনুরূপ্যের কথা বলা অসঙ্গত। আবার, যেহেতু পর্যবেক্ষণে ব্যাপারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সেহেতু কোনো বাক্য ও তথাকথিত ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য আছে কি নেই তা নির্ণয় করা যায় না॥

এ আপত্তির উত্তরে আমরা বলতে চেয়েছি: যদি সাক্ষাৎ অনুভবে ব্যাপার ধরা নাও দিত, তাহলেও "বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য থাকে বলেই বাক্য সত্য"—এ মতবাদ, অর্থাৎ আনুরূপ্যই সত্যতার লক্ষণ, এ মত—মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হত না। আবার, বস্তুত বহু ক্ষেত্রে বাক্য ও বাক্যবর্ণিত ব্যাপারের মধ্যে আনুরূপ্য আছে কি নেই তা পর্যবেক্ষণ দিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব। সুতরাং, সব সময় না হলেও, বহু ক্ষেত্রে আনুরূপ্য-মানদণ্ড দিয়ে সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা সম্ভব॥

পঞ্চম অধ্যায়

দেশ ও কাল

1. ভূমিকা : জ্ঞানের পূর্বতসিদ্ধ সর্ত

আমাদের জ্ঞান কোনো কিছু বস্তু অথবা তাদের গুণ বা সম্বন্ধের জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রকেই কোনো না কোনো বিষয়ের জ্ঞান বলে মানতে হয়। এখন যে বিষয়গুলি প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ অথবা প্রত্যক্ষজ্ঞানে আশ্রিত হয়ে অনুমানগম্য হয়, সেই বিষয়গুলিকে "প্রাকৃত" বিষয় বলে। ঐরূপ বিষয় দিয়েই বিশ্ব-প্রকৃতি গঠিত বলে মনে হয়। অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়মাত্রকেই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগম্য অথবা তদাশ্রিত অনুমানগম্য হতে হবে, আর এই বিষয় যদি অপ্রত্যক্ষও থাকে তবু তার প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকা চাই। অতএব ঘট, পট, সূর্য, চন্দ্র, জল, বাতাস প্রভৃতি হলো প্রাকৃত বিষয় আর এই বিষয় ও তাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা প্রাকৃত বিজ্ঞানে দেখা যায়। এই বিচারে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত বিষয়। এই অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পর্কে যদি কোন জ্ঞানের সম্ভাবনা মানা হয় তাহলে সেই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষপূর্ব বা পূর্বতসিদ্ধ হতে হবে, পরতসিদ্ধ হবে না। কান্টের বিচারবাদী মতে এমন অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পর্কে মানুয়ের কোন জ্ঞান হয় না। এর কারণ হলো এই যে কোনো জ্ঞানই কান্টের মতে, পুরোপুরি পূর্বতসিদ্ধ নয়। উপাদান ছাড়া কোনো জ্ঞান হয় না, আর জ্ঞানের উপাদান, অন্তত মানুষের বেলা, কেবল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষেই সংগৃহীত হতে পারে। তবু কান্টের বিচারবাদী বিশ্লেষণে দেখান হয়েছে যে পরতসিদ্ধ প্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞানেও কিছু কিছু পূর্বতসিদ্ধ উপাদান থাকে। এর অর্থ হল, কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতি মানুষের জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না; ঐ অনুভূতিকে আবার পূর্বতসিদ্ধ-ধারণা-কবলিত হতে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে কোনো কোনো গুণধর্ম প্রত্যক্ষগোচর বস্তুমাত্রতেই থাকে বলে মনে হয়। অর্থাৎ এ রকমের কিছু গুণ না থাকলে বস্তু যেন প্রত্যক্ষগোচরই হতে পারে না। প্রাকৃত বিষয়সমূহের এ রকম ব্যাপক গুণের সঙ্গে অব্যাপক গুণের পার্থক্য করতেই হয়। অব্যাপক গুণ কোনো কোনো প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুতে থাকলেও সব প্রত্যক্ষগোচর বস্তুতে থাকে না। 'গন্ধ' গুণ ফুলে, ফলে, মাটিতে থাকলেও জলে নেই। প্রায় সব বস্তুর কিছু না কিছু বর্ণ থাকলেও, অন্ধকার দশায় বস্তু বর্ণহীন হয়ে পড়ে, অথচ অন্ধকারেও সে ত্বাচ্-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়মাত্রেই বর্ণ, গন্ধ, রূপ, রস, থাকতেই হবে এমন বলা চলে না। এই সব অব্যাপক গুণধর্মকেই আগে 'গৌণ' গুণ বলা হয়েছে। কিন্তু অল্পবিস্তর স্থানব্যাপ্তি বা দৈশিক গুণ না থাকলে কোনো বস্তুর পক্ষে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগোচর হওয়া অসম্ভব। জ্যামিতির বিমূর্ত বিন্দুর দেশব্যাপ্তি না থাকায় তা অপ্রত্যক্ষ। আবার সব

প্রাকৃত বিষয়কেই কোন না কোন কালে থাকতে হয়। কালগত হওয়াও প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুমাত্রেরই ব্যাপক ধর্ম। এই দেশব্যাপ্তি বা কালব্যাপ্তিরূপ ব্যাপক ধর্মগুলিকেই মুখ্য গুণ বলা হয়েছে। অতএব ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয়মাত্রেই মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য দেখা যায়। মুখ্যগুণগুলি (দেশ, কাল) ব্যাপক, আর গৌণগুণগুলি (বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি) অব্যাপক। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত বস্তুকে দেশ-কালের বাইরে কল্পনা করা অসম্ভব—যদিও অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতিকে দেশকালের বাইরে ভাবা যায়। এখন প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয় মাত্রেরই দৈশিক বা কালিক ধর্ম থাকতেই হবে বলে, দেশ ও কাল প্রত্যক্ষপূর্বতভাবেই সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ কোন বস্তুকে না দেখেও বলতে পারি যে ঐ বিশেষ বস্তুকে যদি মানুষের প্রত্যক্ষগোচর হতে হয় তা হলে তার দৈশিক বিস্তার ও কালব্যাপ্তি থাকতেই হবে। বস্তুর প্রত্যক্ষ হবার আগেই তার দেশকালগত ধর্ম থাকবে বোঝা যায় বলে, দেশকাল পূর্বতসিদ্ধ ধর্ম। বস্তুর রং বা গন্ধ কিরূপ তা কিন্তু প্রত্যক্ষ না করে বলা যায় না।

আবার কোনো প্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞান হতে হলেই তাকে ঘট বা পট হতে হবে এমন নিয়ম নেই—গাছ বা নদীকেও জানা যেতে পারে। ঠিক ঐভাবে গাছ বা নদীরও কোনো অবশ্যম্ভব বিষয়তা নেই, কেননা চাঁদ বা তারাকেও জানা যেতে পারে। কিন্তু কোনো প্রাকৃত বিষয়কে জানতে হলে তাকে অবশ্য অবশ্য কোন "গুণবান দ্রব্য" হতে হবেই। এই 'দ্রব্য-গুণ'-ভাব আবার বিষয়মাত্রেরই পূর্বতসিদ্ধ ধর্ম; বিষয়মাত্রকেই যখন গুণবান দ্রব্য হতে হবে তখন প্রত্যক্ষ না করেই বলতে পারা যায় যে যদি কিছুকে প্রত্যক্ষগোচর হতে হয় তবে তাকে গুণী দ্রব্য হতে হবে। আবার প্রত্যক্ষগোচর গুণী দ্রব্যমাত্রকেই কোন কার্যের কারণ বা কোন কারণের কার্যরূপে ভাবা যায়। আর আগেই বলেছি যে এগুলিকে দেশকালগত হতেই হবে। যে কোনো প্রত্যক্ষের সম্ভাবনার মূলে এই সব পূর্বতসিদ্ধ, অবশ্যম্ভব ধর্ম রয়েছে। ঘট পট বা লাল নীলকেই প্রত্যক্ষ করতে হবে এমন নিয়ম নেই; কিন্তু দেশকাল দ্রব্য-গুণ ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়। এই কারণে কাণ্ট্ বলেছেন যে দেশ-কাল, কার্যকারণ, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি হল প্রাকৃত বস্তুর প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ সর্ত। এরা না হলে প্রত্যক্ষই সিদ্ধ হতে পারে না।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই পূর্বতসিদ্ধ আকার যে কয়টি তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আমরা এই প্রাথমিক পুস্তকে দেশকাল, কার্যকারণ সম্বন্ধ ও দ্রব্যগুণ তত্ত্ব আলোচনা করব, কারণ এরাই সর্ববাদীসম্মত, অতিশয় প্রকট, ব্যাপক ধর্ম। প্রত্যক্ষজ্ঞানের অপরিহার্য সর্ত হিসাবে এদের স্বরূপালোচনা জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্গত হয়। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করা খুব সহজ নয়। অধিবিদ্যা যেহেতু কোন কিছু বাদ না দিয়ে সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ জানতে চায়, সেই হেতু এই ব্যাপকতম ধর্মগুলি অধিবিদ্যার আলোচ্য হয়ে পড়ে। মুখ্য গুণগুলি সব কিছুরই অন্তর্গত বলে সমগ্রের জ্ঞানে এরা অপরিহার্য। ব্যাপক ধর্মগুলিই দার্শনিকদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বস্তু।

এই ব্যাপক ধর্মগুলিকে ইংরাজীতে "ক্যাটিগরী" বা ব্যাপকতম বিধেয় বলা হয়েছে। এগুলি বিষয়মাত্রতেই বিধেয়রূপে প্রযোজ্য। জ্ঞান সর্বদা বিবৃতিমূলক বা বর্ণনামূলক বচনাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'ফুলটি লাল,' 'বরফ ঠাণ্ডা,' 'দুধ সাদা', 'মখমল নরম' প্রভৃতি বর্ণনামূলক বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান প্রকাশ পেলেও, প্রত্যেক বাক্যেই কোনো কিছু দ্রব্য সম্পর্কে কোনো গুণ বিধেয় রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। এ সব বচনে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় দ্রব্য-গুণ আকারে সাজানো রয়েছে, যথা "বরফ (দ্রব্য) ঠাণ্ডা (গুণ)" ইত্যাদি। আবার "যদি বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে ক্ষেত শষ্যপূর্ণ হয়", "ঘর্ষনে উত্তাপ সৃষ্টি হয়", "বিষপান করলে মৃত্যু হয়", "যদি জলপান কর তবে তৃষ্ণা দূর হবে" প্রভৃতি সর্তাধীন বাক্যে একই কার্যকারণরূপ আকার প্রকট হয়। যদিও এরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নির্দেশ দেয় তবু তারা সবাই কার্যকারণাকারে সাজানো রয়েছে; যথা; জল কারণ আর তৃষ্ণানিবারণ হল তার কার্য। কান্টের মতে একই রকমের বিভিন্ন বচনের মধ্যে ঐ বচনের আকার এক থাকে আর ঐ আকারক ধারণাগুলিকেই ক্যাটিগরী বা ব্যাপক বিধেয় বলা যায়। বিধেয় থাকলেই উদ্দেশ্য থাকে আর উদ্দেশ্য-বিধেয় আকার হলো বচনের ব্যাপকতম আকার।

2. দেশ ও কাল নিরপেক্ষ আধার

অসীমপ্রসার দেশ এবং কাল সম্পর্কে একটু অবহিত হয়ে চিন্তা করলে এত সব কঠিন সমস্যা হাজির হয় যে এই প্রাথমিক গ্রন্থে তাদের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সমাধান করা সম্ভব হবে না। তবু সমস্যাগুলি কিভাবে উপস্থিত হয় তা ভাবতে হবে। সাধারণের নির্বিচার চিন্তা প্রায়শঃই একটি রূপকের সাহায্যে দেশকালকে বুঝতে চায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক বস্তুসমূহের এক অসীমপ্রসার 'আধার'-রূপে দেশকে কল্পনা করা হয়েছে। কালকেও আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা প্রবাহের অথবা কালগত ঘটনা সমূহের 'আধার' বলে ভাবা হয়েছে। এই আধার-আধেয় রূপকটি দেশ কালের ক্ষেত্রে কতটা গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখতে হবে।

কালকে আবার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে নিয়ত প্রবহমান ধারার রূপকেতেও ভাবা হয়েছে বলে, কালগত ঘটনাবলীর অতিরিক্ত কোনো অসীমপ্রসার কালকে এক স্থির আধারের রূপকেতে ভাবা অত্যন্ত কঠিন। দেশকে অবশ্য দেশগত বস্তুগুলির এক স্থির আধাররূপে ভাবা যায়, যদিও সবিচার চিন্তাতে এ স্থলে আধার এবং তাতে আধেয় বস্তুগুলির মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কঠিন। এই আধেয় ভৌতিক বস্তুগুলির, 'বিস্তার,' 'আকার', 'আয়তন,' কম বেশী 'স্থানব্যাপ্তি' প্রভৃতি ধর্ম থাকে আর বস্তুর এই দৈশিক গুণগুলিকে অসীম অনন্ত দেশরূপ আধারেরই "অংশ" বলে ভাবতে হয়। তাই দেশরূপ আধার ও তাতে আধেয় বস্তুগুলির মধ্যে, তেল ও তেলের বাটির মত

ভিন্নতার সম্বন্ধ মানা যায় না। তাই দেশের ক্ষেত্রে 'আধার-আধেয়' রূপকটি একটু অসুবিধাজনক, আর কালের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা ব্যাপকতর।

তবুও বস্তুগত 'দৈশিক' গুণ ও সম্বন্ধগুলিকে বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গৌণ গুণের থেকে পৃথক করতেই হয়। বস্তুর 'বিস্তৃতি', 'আয়তন' প্রভৃতি দৈশিক গুণ এবং 'উপর-নীচ,' 'পূর্ব-পশ্চিম', 'দক্ষিণ-বাম' প্রভৃতি দৈশিক সম্বন্ধকে, এক বিরাট, অনন্তবিসারী দেশের 'অন্তর্গত' বলে ভাবা যায়; কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর লালবর্ণকে এক অখণ্ড, বিরাট লালের 'অন্তর্গত' বলে ভাবা যায় না। এই কারণেই বোধ হয় দৈশিক গুণ ও সম্বন্ধের অতিরিক্ত এক দেশরূপ আধার কল্পিত হয়েছে এবং কালকেও নানা ঘটনার আধার বলে বলা হয়েছে। সাধারণ বাগ্‌ব্যবহারও যেন এই মতকে সমর্থন করে। গাছ, নদী, পাহাড় ইত্যাদি 'দেশে আছে' আর পূর্বাপর ঘটনা 'কালে ঘটে' এমন বলায় দোষ নেই। 'আধার-আধেয়' রূপকের সাহায্যে, বস্তু বা ঘটনাবলীর অতিরিক্ত, এক অসীমপ্রসার দেশ ও এক অনন্ত কালের অস্তিত্বসূচক মতকে "নিরপেক্ষ দেশকালের মত" বলা যায়। এর অর্থ হল এই যে অসংখ্য ভৌতিক বস্তু ও চলমান ঘটনার আধাররূপে এক অনন্তবিসারী দেশ ও অসীম প্রবহমান কালকে দুটি নিরপেক্ষ বস্তু বলে কল্পনা করা হয়েছে—যদিও এই বস্তুকে কোন গুণাশ্রয় 'দ্রব্য' বলে ভাবার দরকার নেই। জি. ঈ. মূর বলেছেন যে সাধারণ মানুষেরা দেশ এবং কালকে দুই 'অদ্রব্য', খালি, শূন্য আধার বলে ভাবে, যার মধ্যে ভৌতিক দ্রব্যাদি ও ঘটনাবলী আধেয় হয়। তাই দেশকালের নিরপেক্ষ মতানুযায়ী এগুলিকে দ্রব্যত্বহীন নির্বস্তু বস্তুরূপেও কল্পনা করা যেতে পারে।

নিউটন্-সম্মত ভৌতিক জগতের ব্যাখ্যার জন্য, মহাকর্ষ নিয়মে সংবদ্ধ গ্রহ-উপগ্রহাদিকে বোঝার জন্য, ঐ নিরপেক্ষ দেশকালের প্রয়োজন ছিল। নিউটন্ বর্ণিত বস্তুর গতিশীলতার নিয়মাবলীর সম্ভাবনার জন্যও দেশকালের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব মানতে হয় বলে ভাবা হত। কিন্তু আধুনিক কালে আইন্‌স্টাইন্ যে পদার্থবিদ্যা প্রচার করেছেন তাতে দেশকালের নিরপেক্ষতার আর কোনো প্রয়োজন দেখা যায় না।

নিরপেক্ষ দেশকাল প্রত্যেকে এক একটি অনন্তবিসারী বস্তু বলে কল্পিত হয়েছে। দেশের 'মাত্রা' তিনটি; একটি সরলরেখা 'দক্ষিণ-বাম' মাত্রা নির্দেশ করে; একটি সমতল 'দক্ষিণ-বাম', 'উপর-নীচ' মাত্রাদ্বয় নির্দেশ করে; আর একটি ঘনবস্তু 'দক্ষিণ-বাম' 'উপর-নীচ' ও 'সম্মুখ-পশ্চাৎ' এই তিনটি 'মাত্রা' বা দিককেই নির্দেশ করে। কালের মাত্রা একটি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ধারায় কাল-প্রবাহ একাভিমুখী বলে মনে হয়। এক নিরপেক্ষ দেশ সর্বদিকে সীমাহীন ও অনন্ত বিস্তৃত। কোনো স্থানের সীমা নির্দেশ করলে ঐ কল্পিত সীমারেখার ভিতরে ও বাইরে দেশই থাকবে। অর্থাৎ দেশের কোনো সীমা হয় না; দেশমধ্যস্থ বস্তুরই সীমা হতে পারে। এই অসীম নিরপেক্ষ দেশ এক অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন নিরবকাশ বিস্তৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। দেশস্থ কোনো ভৌতিক বস্তু অন্য

কোন ভৌতিক বস্তুর থেকে ভিন্ন বলে, ঐ বস্তুগুলি যে যে দেশকে আশ্রয় করে থাকে তাদেরকে খণ্ড খণ্ড, সীমাবদ্ধ দেশ বলে মনে হয়; অথচ এক অখণ্ড, সর্বব্যাপক দেশ কখনও এমন খণ্ড খণ্ড দেশের যোগফল মাত্র নয়। বরং খণ্ড দেশকে পেতে হলে এক অখণ্ড দেশের মধ্যে কোনো বস্তুর—যেমন পাহাড়ের—পরিলেখ দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করতে হবে। এমন খণ্ড দেশগুলি দেশগত বস্তুসাপেক্ষ এবং ঐ বস্তুর উপাধি। নিরুপাধিক দেশ একান্তই অবিভক্ত ও অখণ্ড।

অনুরূপভাবে অসীম, নিরবধি কালও অখণ্ড, অনবকাশ, নিরবচ্ছিন্ন ধারা, যার অন্তর্গত সাবকাশ, খণ্ড খণ্ড কাল আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা নানা ঘটনাবলীর সাহায্যে গঠন করে নিই। অর্থাৎ পরশু যে ঘটনা ঘটেছিল আর আজ যা এইমাত্র ঘটল, এই দুই ঘটনা পৃথক বলে, তারা যে কালদ্বয় জুড়ে থাকে, সেই কালদ্বয় খণ্ড খণ্ড কাল বলে প্রতীয়মান হয়। অনন্ত, অখণ্ড কাল কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড কাল জুড়ে জুড়ে বা যোগ দিয়ে উৎপন্ন হয় না; আগে অখণ্ড এক কাল কল্পনা করে নিয়ে তবেই তার মধ্যে, খণ্ড ঘটনার আলোকে, সীমাবদ্ধ খণ্ড কাল পাওয়া যাবে। কালের সীমা তাই ঔপাধিক—খণ্ড ঘটনা তার উপাধি। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ কাল নিরুপাধিক।

নিরুপাধিক, নিরপেক্ষ দেশ এবং কাল যেমন প্রত্যেকে পরিমাণের দিক থেকে অনন্তবিসারী ও সীমাহীন; তেমনি তাদের অন্তর্গত ঔপাধিক দেশখণ্ড বা কালখণ্ডেরও অন্তহীন বিভাজ্যতা মানতে হয়। দেশের স্বরূপই বিস্তৃতি বলে যে কোন পরিলেখযুক্ত, সীমাবদ্ধ দেশখণ্ডকে দুভাগ করা যায়; আর ঐ দুই বিস্তৃত (অপেক্ষাকৃত ছোট) অংশকে পুনরায় দুভাগ করা যায়; আবার ঐ অংশের অংশকেও ভাগ করা চলে। বাস্তবে এই অবয়বের বিভাজন ক্রিয়া কোনো জায়গায় থেমে গেলেও, যেহেতু বিস্তৃতির অবয়ব চিরকালই বিস্তৃত থাকে, অন্ততঃ চিন্তায় ঐ বিভাজন অনন্তকাল ধরে চলতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো সীমাবদ্ধ কালখণ্ডের মধ্যে প্রবাহ থাকবে; ঐ কাল জুড়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ থাকবে আর তারও অন্তহীন বিভাজন চলবে; অন্তত ঐ অন্তহীন বিভাজনের কোনো ন্যায়গত অসঙ্গতি নেই। দেশকালের এই অন্তহীন বিভাজ্যতাকে ঔপাধিক বা সাপেক্ষ বলে না ভাবলে নানারূপ স্ববিরোধ দেখা দেয়। অর্থাৎ ঐরূপ বিভক্ত অংশগুলিকে বাস্তব বলে মনে করলে, কি করে যে অনন্ত খণ্ড বা অবয়ব দিয়ে একটি সীমাবদ্ধ দেশ বা কালখণ্ড গঠিত হয় তা বোঝা যায় না। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

3. দেশ ও কাল ঃ সাপেক্ষ মত

উপরে বর্ণিত নিরপেক্ষ দেশ কালের মতকে সমর্থন করা অত্যন্ত কঠিন। দেশাশ্রিত বস্তুগুলিকে বাদ দিয়ে 'কেবল দেশ,' অথবা কালে সংঘটিত ঘটনা-

বলীকে বাদ দিয়ে 'নিছক কাল' যে কি বস্তু, তা অবহিতভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে ঐ শুদ্ধ দেশকাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট; শেষ পর্যন্ত এই ধারণা শূন্যাকারে পর্যবসিত হয়। ভৌতিক বস্তু দিয়ে ঘেরা একটা খালি জায়গা আমরা ভাবতে পারি; ঐ সীমাবদ্ধ শূন্যস্থানে অন্যবস্তু না থাকলেও আপত্তি নেই। কিন্তু এই শূন্য বা খালি জায়গার চিন্তা করা যায় এই কারণে যে, ঐ শূন্যের পরিমণ্ডলে যে ভৌতিক বস্তুগুলো রয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বা দিগ্‌রূপ সম্বন্ধ আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু সমগ্র জগতের বাইরে বিস্তৃত 'দেশ' কি নিছক শূন্য নয়? বস্তুহীন, নিরাকার মহাশূন্য একান্ত শূন্যাকার আর কাণ্ট্ একে "কিছু না" বলতে বাধ্য হয়েছেন। তেমনি ব্যাপার বা ঘটনাহীন কালও শূন্য। নিরপেক্ষ মহাকাল বা বস্তুশূন্য সীমাহীন দেশ বিমূর্ত চিন্তায় অস্পষ্টভাবে ধরা গেলেও, তাদের বাস্তবতা স্বীকার করলে শূন্যকেই অস্তিত্ববান বলে মানতে হয়। এই শূন্য দেশ কালকে প্রত্যক্ষ করা যায় না—তদ্‌গত বস্তু বা ঘটনাবলীকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। তৎসত্ত্বেও সাধারণ মানুষের নির্বিচার চিন্তা, এমন কি কোনো কোনো বিজ্ঞানীরাও নিরপেক্ষ দেশকালের স্বীকার করতে চায় বলে দেখেছি।

আধুনিক কালের "সাপেক্ষ মত", দেশকাল সম্পর্কে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই মতে দেশকাল, দৈশিক ও কালিক বস্তুধর্ম ও তাদের মধ্যে দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধাদি ছাড়া আর কিছু নয়। দেশকাল তদ্‌গত বস্তু বা ঘটনার অতিরিক্ত উদ্ভট্ কোন শূন্যাকার বস্তু নয়—তারা দৈশিক ও কালিক বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে অভিন্ন। আধুনিক পদার্থবিদ্যা দেশকালের এই "সাপেক্ষ স্বরূপ" মতে বিশ্বাসী। এই মতে বস্তুর আকার, আয়তন, বিস্তার প্রভৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ও তাদের মধ্যে দূরত্ব বা নৈকট্য, বাম বা দক্ষিণ প্রভৃতি সম্বন্ধাদির সঙ্গে দেশকে একাত্ম বা অভিন্ন কল্পনা করা হয়। বিশুদ্ধ জ্যামিতির বাক্যগুলি অত্যন্ত সাধারণভাবে এই সমস্ত ধর্ম ও সম্বন্ধাদির বিবরণ দিয়ে থাকে। তেমনি এই "সাপেক্ষ-মতে" কালের স্বরূপ হলো সংঘটিত ঘটনাবলীর কালিক-ধর্ম ও তাদের পৌর্বাপর্য প্রভৃতি সম্বন্ধাদির সমাহার মাত্র। বিস্তার, আয়তন, পরিমাণ প্রভৃতি দৈশিক ধর্ম; দূরত্ব, পৌর্বাপর্য প্রভৃতি দেশকালের সম্বন্ধাদি আমাদের প্রত্যক্ষসাপেক্ষ বিষয়—তাদের স্বরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের উপরে নির্ভর করে। যে বস্তু আমার দক্ষিণে দেখি সে বস্তুকে তুমি তোমার বাঁয়ে দেখতে পার। আমাদের দেহের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশগত মাত্রাগুলিও পাল্টে যায়; এখন যা দক্ষিণে-বামে দেখি, পরে তাকেই সম্মুখে-পশ্চাতে দেখা যায়। এক অর্থে দেশকালকে মনোগত প্রত্যক্ষের আকার বলা যায়। প্রত্যক্ষলব্ধ বস্তুর কোনো নিরপেক্ষ আকার বা আয়তন নেই; ওগুলি আমার শরীরের দূরত্ব বা নৈকট্য সাপেক্ষ। বস্তুর প্রত্যক্ষগম্য আকার বা আয়তন আমার দেহের থেকে দূরত্ব বা নৈকট্যের উপরে নির্ভর করে। দেশকে নিরপেক্ষ ভাবলে কিন্তু তদাশ্রিত আকার বা আয়তনও স্থির এবং নিরপেক্ষ হতে বাধ্য; অথচ এমন স্থির আকারাদি প্রত্যক্ষগম্য নয়।

বিশপ্ বার্কলিও মুখ্যগুণের (বিস্তার ইত্যাদির) প্রত্যক্ষসাপেক্ষতার কথা বলেছেন। এই সাপেক্ষ মতানুযায়ী দেশস্থ কোন স্থির 'বিন্দু' বা কালস্থ কোন স্থির 'ক্ষণ' নেই। এগুলি কেবল বিমূর্ত চিন্তার সীমা নির্দেশ করে থাকে। বস্তুর অবয়ববিভাগ করে চলার পথে আমরা 'বিন্দুর' দিকে অগ্রসর হতে থাকি, কিন্তু কোনো বিস্তারহীন, আয়তনহীন বিন্দু কখনই পাই না। অনুরূপভাবে, কালের বিভাগ করতে করতে আমরা বিমূর্ত কালহীন 'ক্ষণের' দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে পারি কিন্তু ক্ষণকে পাই না।

এই মতে কোনো বস্তু, গ্রহ বা উপগ্রহের গতিকেও নিরপেক্ষ কল্পনা করা অনুচিত। কোনো বস্তুর গতি হলো অন্যবস্তুর তুলনায় তার অবস্থানের পরিবর্তন। রাস্তার দুইদিকে বাড়ীগুলির তুলনায় মোটরের স্থান পরিবর্তনই মোটরের গতি। 'আমি দিল্লী যাচ্ছি' বললে দিল্লীর তুলনায় আমার অবস্থান-পরিবর্তন বোঝাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারটাকে আমার তুলনায় দিল্লীর অবস্থান পরিবর্তন রূপেও ভাবা যায়। আমি দিল্লীর কাছে যাচ্ছি, না দিল্লী আমার কাছে আসছে? মোদ্দা কথাটা হলো গতির সাহায্যে আমার ও দিল্লীর মধ্যে দূরত্ব বা ব্যবধান ক্রমশঃ কমে আসছে। এই ব্যাপারটা আমি দিল্লী যাচ্ছি আর দিল্লী আমার কাছে আসছে—এই উভয়ভাবেই বোঝা যায়।

দেশকালের এই সাপেক্ষতাধর্মী মত আবার দেশকালের অসীমতা বা অনন্তবিস্তারের এক অভিনব ব্যাখ্যা দেয় আর ঐ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধগণিতেও স্বীকৃত হয়েছে। 'নিরপেক্ষ মত' যেন ধরে নেয় যে দেশের অনন্ত বিস্তার সব সময়েই বাস্তব হয়ে রয়েছে। 'সাপেক্ষ মত' এমন কোনো বাস্তব, অস্তিত্ববান অসীমতা স্বীকার করে না; এ মত বলতে চায় যে অসীমতা বস্তুর গতিসাপেক্ষ। 'অসীমতার' প্রকৃত অর্থ হলো কোনো সীমাবদ্ধ স্থান থেকে বা কোনো পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক বস্তু থেকে যাত্রা করে আমরা সবদিকেই অনন্তকাল ধরে চলতে পারব বলে ভাবতে পারি। কিন্তু ঐ চলা বা গতি যতক্ষণ না বাস্তবে সংঘটিত হচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু ঐ না-ঘটা গতির আশ্রয়রূপী দেশ বাস্তবে নেই—আছে কেবল বিমূর্ত চিন্তাতে। এই কারণে ভৌতিক জগত সীমাবদ্ধ হলেও তার অবাধ বিস্তারের সম্ভাবনাই তার অসীমতা। দেশকালের নিরন্তর বিভাজ্যতাও এইভাবে বিভাগের সম্ভাবনা মাত্র—বাস্তব নয়।

4. দেশকাল—আত্মগত না বিষয়গত?

এ কথা সহজেই স্বীকার করতে হয় যে প্রত্যক্ষলব্ধ সব বিষয়কেই দেশকালস্থ হতেই হয়। যে বস্তু বা গুণধর্ম দেশকালস্থ নয় তা আমাদের প্রত্যক্ষের বাইরে —যেমন ঈশ্বর বা চিদাত্মা। দৈশিক ও কালিক ধর্ম এক অর্থে ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়মাত্রেরই নিয়ত, সর্বব্যাপক, অবশ্যম্ভব, অপরিহার্য ধর্ম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যে বিশিষ্টতা ও বহুতা তারা দেশকালের উপর নির্ভর করে। দুইটি

বস্তু অন্যান্য সমস্ত গুণধর্মে এক হলেও দুই স্থানে থাকে বলে দুই ভিন্ন বস্তু হয়। তাই দেশ বহুতার পরিচায়ক। যা 'এখানে' (দেশ) ও 'এখন' (কাল) আছে তা 'ওখানকার' বা 'তখনকার' বিষয় থেকে ভিন্ন। মানুষের প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয়মাত্রই দেশকালাবচ্ছিন্ন অবশ্যই হয়—কিন্তু নীল বা ঠাণ্ডা নাও হতে পারে। মনুষ্যেতর প্রাণী বা অতিমানবীয় কোনো জ্ঞাতা কিভাবে প্রত্যক্ষ করে তা বলা কঠিন হলেও, এ কথা বলা যায় যে মানুষ সব কিছুই দেশকালে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য। এইভাবে দেশকাল প্রত্যক্ষমাত্রেই সমভাবে থাকে বলে তারা মনুষ্য প্রত্যক্ষের 'আকার' বলে বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষাশ্রিত অনুমিতির অপরিহার্য সর্ত হিসেবে দেশকালাকারকে মানতেই হয়। মানুষের জ্ঞানাকার হিসাবে দেশকালকে জ্ঞানবিদ্যা স্বীকার করে নেয়—তার স্বরূপ মানসসাপেক্ষ বা নিরপেক্ষ যাই হোক না কেন। অর্থাৎ দেশকাল মানসসাপেক্ষ আত্মগত ধারণা না মানসনিরপেক্ষ বিষয়গত সত্তা এই দার্শনিক বিবাদ অধিবিদ্যাগত। এই তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান না হলেও, জ্ঞানবিদ্যার দিক থেকে দেশকালকে প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয়ের অপরিহার্য আকার বলতে বাধা নেই। এখন দেশকাল যদি নিরপেক্ষ না হয়ে সাপেক্ষ অবভাস হয় তবে জ্ঞানের বিষয়রাজিকেও আবভাসিক বলতে হবে।

ভৌতিক বস্তুর প্রত্যক্ষে, দেশ এবং কাল উভয়েই অপরিহার্য। কোনো বর্ণ বা গন্ধ কোনো স্থানে বা ক্ষণে থাকলেই তা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কোনো কোনো দার্শনিক চেতন অবস্থা বা মনোবৃত্তির প্রত্যক্ষে কালকেই অপরিহার্য বলেন, দেশকে নয়। সুখদুঃখাদি মনোবৃত্তির প্রত্যক্ষজ্ঞানে বা অন্তর্দর্শনে, এই চেতনবৃত্তিগুলিকে কোনো না কোনো কালে আছে বলে গ্রহণ করি; কিন্তু তারা কোনো স্থানব্যাপ্ত করে বলে বোধ হয় না। অন্যেরা (স্যামুয়েল্ আলেক্জাণ্ডার প্রভৃতি) অবশ্য বলেছেন যে যা কালগত তা দেশগতও বটে। এর কারণ হলো দেশকাল উভয়ে মিলিত হয়ে এক অখণ্ড চতুর্মাত্রিক আকার। দেশকে ছাড়া কাল হয় না আর কালকে ছাড়া দেশও হয় না। এ রকম কিছু মতভেদ থাকলেও, মানুষের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সার্বিক আকার বলে দেশকালকে স্বীকার করতে কোনো আপত্তি হবার কথা নয়।

দেশকাল বিষয়গত

বস্তুবাদী দার্শনিকেরা দেশ এবং কালকে মানুষের প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বস্তু বলে স্বীকার করেন। দেশকালাশ্রিত বস্তু বা ঘটনাবলীর মানস নিরপেক্ষ অস্তিতা স্বীকার করতে হলে ঐ বস্তু বা ঘটনাগুলির দেশাধার ও কালাধারেরও মানস নিরপেক্ষ সত্তা মানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই বিষয়গত দেশকালকে মানুষের জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ববান পদার্থ বলে মানতে হয়। দেশকালের ঐই বিষয়তা 'নিরপেক্ষ' দেশকালকেই স্বীকার করে ও ঐ মতের সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আমরা আগেই বলেছি যে সাধারণের নির্বিচার

ভাবনায় দেশ ও কাল দুটি অসীমপ্রসার বস্তু বলে কল্পিত হয়। বস্তুবাদী ন্যায়দর্শনে দেশ এবং কালকে দুটি নিত্য আর বিভু বা সর্বব্যাপী দ্রব্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। ঐ দ্রব্যগুলি দৈশিক বা কালিক গুণের আশ্রয়। জি, ঈ, মূর বলেছেন যে এ গুলিকে অদ্রব্যাত্মক বস্তু বলেও মানা যায়। এগুলিকে দ্রব্যাদি বা ঘটনাবলীর আধাররূপে ভাবা যায়। দ্রব্যই হোক আর অদ্রব্যই হোক, এই সব মতে দেশকালের মানসনিরপেক্ষ সত্তা স্বীকৃত হয়; মানুষে জানুক বা নাই জানুক, দেশকাল স্বমহিমায় অস্তিত্ববান থাকে।

নিউটন্ ও গ্যালিলিও সম্মত পদার্থবিদ্যার অনুরোধেও দেশকালের বিষয়গত অস্তিতা মানতে হয়। এই বিজ্ঞানীরা অসীম দেশকালকে ভৌতিক জগতের অস্তিত্ববান কাঠামো বলেছেন, যার মধ্যে জড়বস্তুগুলি চলাচল করে ও পরিবর্তিত হয়। এই মতে দেশকাল তদাশ্রিত বস্তু বা ঘটনাবলী ছাড়া সব সময়েই এক থাকে। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে স্যামুয়েল্ আলেকজাণ্ডার এক অভিন্ন দেশ—কাল সংস্থাকে জগতের পরমতত্ত্ব বলে মেনেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দেশ, কাল এবং দেবসত্তা"*তে বলেছেন যে ঐ মূলীভূত, সর্বব্যাপী, অনবকাশ উপাদানের বিকার থেকেই অন্য সব কিছুর উদ্ভব হয়েছে। জড়, প্রাণ, মন এমনকি দেবসত্তা পর্যন্ত সব কিছুই ঐ মূল দেশকালের ক্রমবিকাশের ফল। আলেকজাণ্ডারের মতে কিন্তু দেশ এবং কাল দুইটি বিচ্ছিন্ন পরমতত্ত্ব নয়। দেশ ছাড়া কাল নেই আর কালছাড়া দেশও সম্ভব নয়। এক অসীম চতুর্মাত্রিক "দেশ-কাল"ই (দেশের তিন আর কালের একমাত্রা) হল পরমতত্ত্ব—জগতের মূল উপাদান।

সমালোচনা

আমরা পূর্বেই বলেছি যে 'নিরপেক্ষ' দেশকালের সত্তা বা বস্তু ও ঘটনার অতিরিক্ত আধাররূপী দেশকালের অস্তিত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। এই মতে যে রূপকটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তা সঙ্গত নয়। মানুষের প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ কোনো কিছুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করা অন্তত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কেননা প্রমাণ বা অপ্রমাণ হবার সাথে সাথে তারা মানসে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে। বার্কলি পদার্থের মুখ্য ধর্ম, দৈশিক ও কালিক গুণাবলীকে, মানুষেরই প্রত্যক্ষসাপেক্ষ বলে দেখিয়েছেন। বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গৌণ গুণের মতো বিস্তার, আয়তন প্রভৃতিও বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ও ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। তাই এরা পদার্থের নিরপেক্ষ ধর্ম হতে পারে না। এর অর্থ হল এই যে নিরপেক্ষ দেশ-কাল নেই। দ্রুতধাবমান রেলগাড়ী থেকে বাইরের গাছপালা, নদীনালা, পাহড়পর্বতের মধ্যে যে দৈশিক সম্বন্ধাদি দেখা যায়, রেললাইনের পাশে দাঁড়ানো কোনো নিশ্চল দর্শকের প্রত্যক্ষে ঐ সম্বন্ধাদি ভিন্নরূপে দেখা যাবে। রেলযাত্রী দেখবে গাছপালা ধাবমান আর

* Space, Time and Deity

বাইরে দাঁড়ানো দর্শক দেখবে রেলগাড়ীটাই ধাবমান, গাছপালা স্থির। তাই দেশকালাশ্রিত গতি কিছুরই নিরপেক্ষ ধর্ম নয়। আধুনিক বিজ্ঞানও দেশকালের এই সাপেক্ষতা স্বীকার করে।

দেশকাল আত্মগত

কাণ্ট্ দেশকালের আকারকে মানস সাপেক্ষ বা আত্মগত বলতে চেয়েছেন। বিখ্যাত 'ক্রিটিক' গ্রন্থে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিচার করতে গিয়ে কাণ্ট্ প্রমাণ করেছেন যে দেশ এবং কাল আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ পদার্থ নয়, আর অনুভব নিরপেক্ষ স্বয়ংসৎ বস্তুর ধর্ম বা সম্বন্ধাদিও নয়। এই মতে যখনই আমরা, মানুষেরা, কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখনই তাকে দেশ কালের আকারে দেখতে বাধ্য হই। এটা আমাদের জ্ঞানশক্তির ভিত্তিমূলে প্রোথিত এক সার্বিক নিয়ম, আর এই নিয়মেই আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়ে থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণী বা কোনো অতিমানবীয় জ্ঞাতাও দেশকালে প্রত্যক্ষ করে কি না আমরা বলতে পারি না; তবে এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে মানুষমাত্রকেই অন্তত দেশ-কালের মধ্যে সকল উপাত্তকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়জন্য বোধে যে শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি উপাত্ত গৃহীত হয়, তারা দেশকালের কাঠামোতে উপস্থিত হয় বলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অপরিহার্য, অবশ্যম্ভব সর্ত হল দেশ এবং কাল, আর এই সর্ত মানুষেরই জ্ঞানশক্তির নিয়ম। দেশকাল আকারে সজ্জিত হয়েই বিশেষ বিশেষ উপাত্তগুলির স্বরূপতঃ বহুতা সিদ্ধ হয়। এই অবশ্যম্ভব মনুষ্য-প্রত্যক্ষের নিয়ম পূর্বতসিদ্ধ। প্রত্যক্ষপূর্ব বলেই দেশকালাকার নিরপেক্ষ জগত থেকে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং আমাদের স্বরূপ থেকেই এদের প্রয়োগ। আমরাই "বাহির বা ভিতর (দেশ)," "এখন বা তখন" (কাল) ইত্যাদি আকার উপাত্তমাত্রেই প্রয়োগ করে তাদের গ্রহণ করি। আমাদের আত্মনিষ্ঠ প্রত্যক্ষের মূলগত এই নিয়ম বিষয়নিষ্ঠ নয়।

কাণ্ট্ দেখিয়েছেন যে দেশ এবং কাল মানুষের জ্ঞানের পূর্বতসিদ্ধ আকার। মনুষ্য প্রত্যক্ষের জন্য দেশকাল অবশ্যম্ভব ও অপরিহার্য। কল্পনায় কোনো সীমাবদ্ধ দেশকে একান্তই বস্তুহীন ভাবতে পারলেও সেই খালি দেশ বা স্থানের অনুপস্থিতি ভাবা অসম্ভব। এই ন্যায়গত অসম্ভাব্যতা দেশকালের ধারণাকে অবশ্যম্ভব করে, আর এরূপে যে ধারণা অবিরোধী, তাকে পূর্বতসিদ্ধ হতেই হয়। কাণ্ট্ আরও বলেন যে, প্রত্যক্ষের সাহায্যে দেশকালকে লাভ করা যায় না। 'বিস্তার,' 'আয়তন' প্রভৃতি জড় বস্তুর গুণ, 'দেশ'কে স্বীকার করেই সম্ভব; অর্থাৎ ঐ গুণগুলি অনন্ত প্রসার 'দেশের' খণ্ডিত ফলমাত্র। তাই বিস্তৃত ও আয়তন বিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ হবার পরে 'দেশের' ধারণা লাভ করতে হলে, আগে 'দেশকে' স্বীকার করেই এগোতে হয়। দেশই বস্তু প্রত্যক্ষকে সম্ভব করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেশকে সম্ভব করে না। অতএব দেশ প্রত্যক্ষ-পূর্ব আত্মনিষ্ঠ আকার। কালও তদনুরূপ।

নীল চশমা চোখে দিলে সব দৃশ্যমান বস্তুর বর্ণ একটু ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়; যেমন, সাদাকে দেখা যায় নীল, লালকে বেগুনী আর নীলকে ঘন নীল। এই চশমার সঙ্গে তুলনা করে 'দেশকাল' প্রত্যক্ষাকারকে বোঝা যেতে পারে। মনে করা যাক যে মানুষের সমস্ত বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়তে দেশকালের ঠুলি পরানো আছে। নীল চশমা আঁটা থাকলে যেমন ঐ চশমার মধ্য দিয়েই দেখব, তেমনি সব মানুষকেই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে দেশকালের মধ্যে উপাত্ত গ্রহণ করতে হয়। চশমার মধ্য দিয়ে দেখলে, দৃশ্যমান জগতের রং যেমন পাল্টে যায়, তেমনি দেশকালের ঠুলির মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করলে স্বয়ংসৎ জগতের পরিবর্তন হয়; অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের উপাত্তগুলির দৈশিক ও কালিক ধর্ম থাকলেও, জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বয়ংসৎ বস্তুতে ঐ ধর্ম থাকে না। নীল চশমার নীল যেমন সমস্ত দৃশ্য বস্তুতে আরোপিত হয়ে তাদেরকে একটু ভিন্ন রূপ দেয়, তেমনি মানবীয় প্রত্যক্ষের নিয়ম, দেশকাল, স্বয়ংসৎ, নিরপেক্ষ পদার্থে আরোপিত হয়ে, ঐ পদার্থের অবভাস আমাদের সম্মুখে উপাত্তরূপে উপস্থিত করে। দেশকাল তাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপাত্ত সম্পর্কে অবশ্য অবশ্য প্রযুক্ত হলেও, স্বয়ংসৎ বস্তু সম্পর্কে একেবারেই মিথ্যা। নীল চশমার মধ্য দিয়ে আমার দৃষ্টির বিকার যেমন আমরাই, বস্তুর নয় আর বিকৃত দৃষ্টিতে বস্তুর পরিবর্তিত বর্ণ যেমন আমারই দৃষ্টিসাপেক্ষ, বিষয়নিষ্ঠ নয়; তেমনি দেশকালাকারের প্রয়োগ মানুষেরই আত্মনিষ্ঠ ধর্ম; —দেশকাল বিষয়নিষ্ঠ নয়।

এই চশমার বিস্তৃত রূপকটি কিন্তু দেশকালের এক ক্ষেত্রে লাগে না। নীল চশমাটি ইচ্ছামত খুলতে ও পরতে পারি; চশমা দিয়ে ও না দিয়ে উভয়-ভাবেই জগতকে জানতে পারি বলে দৃশ্যমান বস্তুর বর্ণ পরিবর্তন সাক্ষাৎ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু সব মানুষের জন্মগত, অনিবার্য দেশকালের ঠুলি সারাজীবনেও খোলা যায় না বলে দেশকালের বাইরে স্বয়ংসৎ বস্তুর রূপ যে কি তা জানা যায় না। আমরা কেবল স্বয়ংসতের অবভাসকেই জানি অর্থাৎ দেশ ও কালে তার পরিবর্তিত রূপকেই জানি। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় একান্তই অজ্ঞাত থাকে। এক কথায় দেশ এবং কালের আকার আমাদের জ্ঞানশক্তির মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির মতো নিহিত থাকে; এই কারণে যখনই কোনো ইন্দ্রিয়ের উপাত্ত গ্রহণ করি তখনই আমাকে ও সব মানুষকে দেশকালাকারে ঐ উপাত্ত গ্রহণ করতেই হয়। অমানব বা অতিমানবেরা ঐ ধর্মের দাসত্ব করে কি না জানি না। কার্ল পিয়ারসন তার "গ্রামার অব সায়েন্স' গ্রন্থে কাণ্টের মত সমর্থন করে বলেছেন যে দেশকাল বিষয়গত নয়; বিবিধ বস্তুকে বিবিক্ত করে দেখবার জন্য আমাদেরই আত্মনিষ্ঠ কৌশল মাত্র। এ কৌশল আমাদের শিখতে হয় না—এ হলো প্রত্যক্ষপূর্ব ও পূর্বতসিদ্ধ, সহজাত মৌল বৃত্তি।

সমালোচনা

দেশকাল যে মানুষের মনের উপরে নির্ভরশীল, ঐ আকারগুলি যে পূর্বতসিদ্ধ এ কথা স্বীকার করেও তাদেরকে বিষয়নিষ্ঠ বলা অযৌক্তিক নাও

হতে পারে। কাণ্টের দর্শনে অবভাস ও স্বয়ংসৎ বস্তুর মধ্যে যে বৈজাত্য ও দূরত্ব কল্পনা করা হয়েছে তা মানা কঠিন। স্বয়ংসৎ বস্তু যদি প্রকৃতই অজ্ঞাত হয় তবে তাকে 'অজ্ঞাত'ও বলা যায় কিনা সন্দেহ। মানুষের জ্ঞান-নিষ্ঠ আকার ঐ জ্ঞানের বিষয় সমূহের আকারও বটে। মানুষের জ্ঞান পুরো-পুরি আত্মনিষ্ঠ নয়—বিষয়নিষ্ঠও বটে। কাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞানে ভাসমান যে 'অবভাস' তাই যদি একমাত্র তত্ত্ব হয়, তা হলে অবভাসের দেশকালকে তত্ত্বগত এবং মানুষের মনোগত উভয়ই বলতে আপত্তি নেই।

5. অনন্ত দেশকালের সমস্যা

দেশ এবং কালের অনন্ত প্রসারতা ও অনন্ত বিভাজ্যতা কতকগুলি অত্যন্ত দুরূহ দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি করে। বৈধ যুক্তির সাহায্যে দেশ এবং কালকে অসীম এবং সীমাবদ্ধ এতদুভয়ই প্রমাণ করা যায়; অথচ কোনো পদার্থ এই ভাবে স্ববিরোধী হতে পারে না। কিন্তু দেশ কালের বেলা যে কোনো বিকল্পই গ্রহণ করি না কেন, অকাট্য এবং বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কাণ্ট্ এমন কয়েকটি বিরোধী যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক জিনো ও আধুনিক ইংরাজ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লি, অনন্ত দেশকালের ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই যুক্তিগুলির দার্শনিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, যা স্ববিরোধী তা কখনো পরমার্থ তত্ত্ব হতে পারে না। হয় তাদেরকে অলীক বা মিথ্যা বলতে হয় অথবা দেশকালাতীত কোনো অলৌকিক পরমতত্ত্বের 'অবভাস' বলতে হয়। আমরা এই বিরোধী যুক্তির কিছু উদাহরণ দেব।

কাণ্টের যুক্তি হল বর্তমান ক্ষণের আগে যদি অনন্ত সময় পার হয়ে গিয়ে থাকে অথবা অনন্ত ঘটনা ধারা ঘটে গিয়ে থাকে, তা হলে বলতে হয় যে এক অনন্ত ধারা বর্তমান ক্ষণে এসে শেষ হয়ে গেছে। অতীতের দিকে তাকিয়ে কালের আরম্ভ পাই না বলে, এক অনন্তধারা আজ দুপুরে শেষ হয়েছে বলতে হয়। অথচ এইভাবে অনন্ত সময় বা অনন্ত পূর্বাপর ঘটনা যদি সমাপ্ত হয়, তা হলে কালকে অনন্ত ও সীমাবদ্ধ দুইই বলতে হয়। যুক্তি যেন বলে যে আজ দুপুরের আগে, অনন্ত ঘটনা প্রবাহ ঘটে গেছে, শেষ হয়ে গেছে; অথচ বাস্তবিক কোনো অনন্তধারা এভাবে শেষ হতে পারে না। আজ দুপুরের পরেও কালধারা চলেছে ও ঘটনাপ্রবাহ থেমে থাকে নি। এখন আজ দুপুরের আগের ঘটনাপ্রবাহকে যদি অতীতের দিকে বাস্তবিক 'অনন্ত' বলি, তা হলে সেই অনন্তকে আরও বৃহত্তর কালধারার অংশমাত্র বলতে হয়। কিন্তু প্রকৃত অনন্তধারার শেষ কল্পনা করা যায় কি? "সমাপ্ত এক অনন্তধারা" ব্যাপারটা অকল্পনীয় কারণ তা স্ববিরোধী। বিমূর্ত গাণিতিক সংখ্যা-ক্রমের মধ্যে এমন দেখা যায় যে এক অনন্ত ধারার অংশও অনন্ত, যথা :

(ক) 1, 2, 3, 4, 5, 6,........, অনন্ত।

(খ) 2, 4, 6, 8, 10, 12,........, অনন্ত।

এখন (খ) ধারা স্পষ্টতঃই (ক) ধারার অংশ; কিন্তু উভয়েই অনন্ত। অথচ ঐ সংখ্যার সবগুলির নাম পর পর করা অসম্ভব; অর্থাৎ অনন্ত গণনা অসম্ভব। পরন্তু এই বিমূর্ত সংখ্যা বাস্তবে অস্তিত্ববান নয়; গণিতে ঋণাত্মক সংখ্যা ($-1, -2$) কল্পনা করা গেলেও, ঋণাত্মক ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। তাই অনন্ত বিমূর্ত সংখ্যা কল্পনা করা গেলেও, অনন্ত ঘটনা যে বাস্তবিক বর্তমানের আগে ঘটে গিয়েছে, তার প্রমাণ হয় না। তাই বিশুদ্ধ গণিতের অনন্ত বিমূর্ত সংখ্যা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা দিয়ে আমাদের বাস্তব দেশকাল বোধ ব্যাখ্যা করা যাবে না। যদি বর্তমানের আগে অনন্ত ঘটনা বাস্তবিকই ঘটে থাকে, আর তার পরেও যদি ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে, তবে স্ববিরোধ এড়ান যায় না।

এখন যদি উপরোক্ত স্ববিরোধ এড়াতে গিয়ে বাস্তবিক যে ঘটনাধারা কালে ঘটে গেছে তাকে সীমাবদ্ধ বলি অথবা দেশস্থ ভৌতিক জগতকে সীমিত বলি এবং তথাপি যদি দেশ কালকে অসীমপ্রসার বলতে বাধ্য হই; তা হলে সীমিত ঘটনা-ধারার বাইরে শূন্য মহাকাল মানতে হয় আর সীমিত ভৌতিক পরিমণ্ডলের বাইরে শূন্য দেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই বস্তু বা ঘটনা নিরপেক্ষ শূন্য দেশকালের মতবাদ একান্তই অসম্ভব বলে আগেই বলা হয়েছে। শূন্য দেশ-কালের ধারণা একান্তই শূন্যাকার ও উদ্ভট্। অথচ যদি ঘটনাপ্রবাহ বা বস্তুজগতের সঙ্গে একাত্ম করে দেশকালকেও সীমিত বলে ভাবি, তাহলেও যেন ঐ কল্পিত সীমার বাইরে আরও দেশ—কাল মানতে বাধ্য হই। সুতরাং নিস্তার নেই।

উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করতে পারলে দেশকালকে বাস্তব পদার্থ বলা যেতে পারে। কাণ্টের যুক্তি অনুযায়ী আমরা যেন অতীত কালকে আজই সমাপ্ত এক অনন্তধারা বলে মানতে বাধ্য হচ্ছিলাম। কিন্তু ঐ অনন্তধারা বাস্তবিকই সংঘটিত হয়ে গেছে না বলে, যদি বলি যে ঐ অনন্তের সম্ভাবনা রয়েছে তা হলে অসুবিধা নাও হতে পারে। দেশকালের 'সাপেক্ষ' মতানুযায়ী অনন্তর অর্থ হল 'নির্বাধ'। অর্থাৎ যে কোনো সীমার পরেও যদি আমরা আরও অগ্রসর হতে চাই তো হতে পারব। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে ঐ অগ্রগমন বা বিস্তার বাস্তবে ঘটার আগে থেকেই শূন্য কাল বা দেশ কল্পিত সীমা ছাড়িয়ে ছিল। গতির সম্ভাবনা মানলে, যে দেশকালে ঐ গতি সম্ভব হবে তারও সম্ভাবনাই মানব; তাকে বাস্তব বলব কেন? তাই বাস্তব দেশকাল প্রকৃতই সীমাবদ্ধ; অথচ তা নির্বাধ, অর্থাৎ আরও বিস্তারিত হবার জন্যে জায়গার সম্ভাবনা সবসময়েই থাকে; দেশ ও কালের অসীমতা তাই একটা সম্ভাবনা। এই অসীমতা বাস্তবের বিস্তার বা গতি সাপেক্ষ। যতদূর পর্যন্ত গতি ততদূর দেশকালের সীমা; তবে আরও গতির সম্ভাবনা আছে বলেই দেশকালের সম্ভাবনাময় অসীমতা স্বীকার করি যা বাস্তব অনন্ত নয়। এইরূপ সম্ভাবনাময় অনন্ত স্বীকার করলে, বাস্তব অনন্তের সীমা স্বীকার করে, 'সমাপ্ত অনন্তের' স্ববিরোধ দূর করা যায়।

তা ছাড়া কালধারা যদি নিরবচ্ছিন্ন, নিরবকাশ, ছেদহীন ধরা যায় তা হলে অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিভাগ অবশ্যই ঔপাধিক হবে। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমরা কালের ভাগ চিন্তা করি ; প্রাতরাশ, দুপুরের খাওয়া, আর বিকেলের চা, পূর্বাপর খণ্ডকালে ঘটে বলে ধরে নি ; অথচ কালের কোনো বাস্তবিক ভাগ নেই। এখন যদি আমাদের প্রয়োজনে উপাধি লাগিয়ে 'দুপুর' নামক কালখণ্ড হয়, তাহলে তার আগেকার অনন্ত কালপ্রবাহের স্ববিরোধ ঔপাধিক হবে, কালের স্বরূপগত হবে না।

দেশকালের অনন্ত বিভাজ্যতার সাহায্যে জিনো এবং ব্র্যাড্‌লি যে স্ববিরোধ দেখিয়েছেন তার দু একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। আমরা দেখেছি যে কোনো সীমাবদ্ধ দৈশিক বিস্তার বা সীমাবদ্ধ কালধারাকে দুই খণ্ড, চার খণ্ড, আট খণ্ড ……অনন্ত খণ্ডে অনন্ত কল্পনায় ভাগ করা যায়—বাস্তবে অবশ্য এই অবয়ব বিভাগ কোনো পর্যায়ে থেমে যেতে বাধ্য। দেশকালের এই অনন্ত বিভাজ্যতাকে বাস্তব বলে মানলে, কি করে যে এক সীমাবদ্ধ দেশ বা কালখণ্ডের অনন্ত অবয়ব থাকে বোঝা যায় না। অনন্ত অংশ জড়ো করে সান্ত কিছু উৎপন্ন করা তো স্ববিরোধী। জিনো বলেছেন যে দেশকালের অনন্ত ভাগ মানলে ধনুকের থেকে নিক্ষিপ্ত তীর গতিশীল হতে পারবে না। কেননা সেই গতিশীল তীরকে অন্ততঃ কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হবে ; আর তা হলে ঐ পথের অর্ধেক, তার অর্ধেক, তার অর্ধেক,……এইভাবে অনন্ত অর্ধেক পার হতে গিয়ে তার গতি আরম্ভও হবে না, শেষও হবে না। তাই দেশের অনন্তবিভাজ্যতাকে বাস্তব বলে মানলে তীরের বেগ অচিন্তনীয়, অকল্পনীয় হয় ; আর যা অচিন্তনীয় তাই তো স্ববিরোধী। ব্রাড্‌লি এই স্ববিরোধ দেখিয়েছেন এই ভাবে ঃ দেশকালকে সম্বন্ধের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু বলাও যায় না, অথচ তা সম্বন্ধমাত্রও হতে পারে না। একই সঙ্গে সম্বন্ধ ও সম্বন্ধ নয় বলা তো স্ববিরোধী। 'দক্ষিণ—বাম', 'পূর্ব—পশ্চিম' প্রভৃতি দৈশিক সম্বন্ধ দেশের বিভিন্ন, বিস্তৃত অংশের মধ্যেই থাকতে পারে ; কেননা সম্বন্ধের কোন সম্বন্ধী থাকবেই। এই বিস্তৃত সম্বন্ধীগুলো একান্তই নিরেট—কেবল সম্বন্ধ নয়। দেশ যদি কেবল সম্বন্ধই হতো তা হলে সম্বন্ধের মধ্যে সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে আবার সম্বন্ধ, আবার তাদের সম্বন্ধ…এইভাবে অনবস্থা হতো। তথাপি কিন্তু দেশ সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যে বিস্তৃত, নিরেট অংশগুলিকে 'সম্বন্ধী' বলা হল, তারা আবার অনন্ত বিভাজ্য বলে তাদের শরীরের মধ্যেও পাশাপাশি, দক্ষিণবাম প্রভৃতি সম্বন্ধ পাবো ; আর ভাগ করতে করতে নিরেট কোনো বিস্তারই পাওয়া যাবে না ; সবটাই সম্বন্ধের সম্বন্ধে পর্যবসান হবে।

এই অনন্তবিভাজ্যতার স্ববিরোধের মোকাবিলা করতে হবে পূর্বের মতই। 'অনন্তবিভাজ্যতার' অর্থ এই নয় যে, কোনো সীমিত দেশকালখণ্ডের বাস্তবিক অনন্ত অংশ রয়েছে ; এর অর্থ হল অনন্ত অংশের সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ যতদুর ভাগ করি না কেন, অন্তত কল্পনায় আরও ভাগের সম্ভাবনা রইল।

এই সাপেক্ষ অনন্ত ভাগ কিন্তু বাস্তব নয়। তারা কেবল সম্ভাবনাপূর্ণ। আমরা কখনও কোন দেশখণ্ডের অনন্ত অংশ পেয়ে গেছি এমন বলতে পারি না। তা ছাড়া পূর্বেই আমরা দেশকালকে নিরবচ্ছিন্ন, অনবকাশ, ঘনসন্নিবিষ্ট বিস্তার বা ধারা বলেছি যার মধ্যে কোনো বাস্তব ছেদ নেই। ব্যবহারিক প্রয়োজনে তার মধ্যে আমরা ঔপাধিক বিভাগ করলেও, ঐ বিভাগ একান্তই আবভাসিক—দেশকালের প্রকৃত, বিষয়গত ধর্ম নয়। এই আবভাসিক বিভাগকে চরমতত্ত্ব বলে মানাতেই জিনোর নিক্ষিপ্ত তীর বেগবান হতে চায় না। অতএব মনে হয় যে দেশকালের অসীমতার সমস্যার সমাধান একান্ত অসাধ্য নয়।

6. উপসংহার : সাপেক্ষ তত্ত্ব

দেশকালের সাপেক্ষতাই গ্রহণযোগ্য, কেননা ঐ মতেই অনন্তের স্ববিরোধ দূর করা যেতে পারে। নিউটনের নিরপেক্ষ দেশকাল বিরোধী যে সাপেক্ষ তত্ত্ব আইনস্টাইন প্রচার করেছেন তাকে এডিংটন, আলেক্‌জাণ্ডার প্রমুখ দার্শনিকেরাও স্বীকার করে নিয়েছেন।

এই মতে দেশ এবং কাল পরস্পর বিবিক্ত দুটি পদার্থ নয়; বরঞ্চ 'দেশ-কাল' রূপ একটি চতুর্মাত্রিক সংস্থা। বেগবান ও গতিশীল বস্তুমাত্রেই দেশ এবং কালে থাকে; অর্থাৎ সেই বস্তু কতকটা সময়ে কতকটা দূরত্ব অতিক্রম করে। অর্থাৎ দেশ এবং কাল একই গতি বা ঘটনার দুই দিক বলে পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল। নিরবচ্ছিন্ন কালধারা দৈশিক বিস্তারের মধ্যে প্রবাহিত হলেই কালের সম্ভাব্য খণ্ডগুলির একত্রীকরণ সম্ভব। দৈশিক পটভূমিকা ছাড়া কাল কেবল এক ক্ষণে (বর্তমানে) পর্যবসিত হত। দেশগত বিস্তারকে আবার তদগত বিন্দুসমূহের পরপর সমাবেশেই বোঝা যায় আর বিন্দুসমূহের ঐ পরপর অবস্থান কালগত গণনার উপর নির্ভর করে। তাই 'দেশ—কাল' পরস্পর নির্ভরশীল একই সংস্থা।

এই সাপেক্ষ মতে আবার 'দেশ—কাল' সম্বন্ধ দ্রষ্টার গতির উপরে নির্ভর করে। পৃথিবীর উপরে অবস্থিত দর্শক যে ভাবে সৌর জগতকে দেখে, সূর্যে অবস্থিত দর্শক সেভাবে দেখে না। প্রথম দর্শক সূর্যকে গতিশীল দেখে ও দ্বিতীয় জনে পৃথিবীকে গতিশীল দেখে। এই সাপেক্ষ মতে যদিও দেশকাল খানিকটা দ্রষ্টার উপরে নির্ভরশীল তবু তাদেরকে বিষয়নিষ্ঠ বলতে আপত্তি নেই। আমাদের গতিসাপেক্ষ হলেও তারা মিথ্যা বা অলীক নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্রব্য ও জাতি

1. দ্রব্য ঃ দৃষ্টিবাদ বনাম বুদ্ধিবাদ

জ্ঞানগত জগতের সমস্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তুকেই আমরা গুণবান দ্রব্য বলে জানি আর এই 'দ্রব্যত্ব'কে, দেশকালের মতো, বস্তুজ্ঞানের এক পূর্বতসিদ্ধ আকার বলা যায়। কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে জানার আগেই বলা যায় যে, যদি তাকে জ্ঞানযোগ্য হতে হয় তবে তাকে গুণী দ্রব্য হতেই হবে। এটা জ্ঞানের এক অবশ্যম্ভব পূর্বতসিদ্ধ সর্ত। টেবিল, চেয়ার, দরজা, জানালা, ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি সাধারণ গুণবান দ্রব্য। রসায়ণ শাস্ত্রে আরও মৌলিক গুণবান দ্রব্যাদির কথা বলা হয়, যথা—সোনা, রূপা, লোহা, তামা, দস্তা ইত্যাদি। এক শতের কিছু বেশী সংখ্যক মৌলিক দ্রব্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে; এরা কিছু পরিমাণে সব বস্তুতেই থাকে। ঔজ্জ্বল্য, হলুদ বর্ণ, নমনীয়তা, আকার, আয়তন প্রভৃতি সোনার গুণ। অন্যান্য মৌলিক দ্রব্যের আবার অন্য গুণ থাকে। অত্যন্ত সাধারণভাবে সকল গুণীদ্রব্যের স্বরূপ নানা দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যাগুলির কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

যে দ্রব্যগুলি দিয়ে জগত গঠিত বলে মনে করা হয় সাধারণ বুদ্ধিতে তাদের নানা প্রকার গুণের ও ক্রিয়ার আশ্রয় মনে করা হয়। ভারতের বস্তুবাদী ন্যায় দর্শনও এই সাধারণ বুদ্ধিকে অনুসরণ করে দ্রব্যকে গুণাশ্রয় ও কর্মাশ্রয় বলে বর্ণনা করেছে। গুণীদ্রব্য গুণের আশ্রয় ও গতিশীল দ্রব্য কর্ম বা গতির আশ্রয়। প্রত্যেকটি দ্রব্য আবার অন্য দ্রব্য থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র; এরা নানারূপ সম্বন্ধে জড়িত হয়ে থাকে। কোনো দ্রব্যের গুণ বা অবস্থাসমূহ পাল্টে গেলেও দ্রব্যটি কিন্তু স্থির থাকে। কাঁচা আম পাকলে পরে তার পূর্বের বর্ণ, গন্ধ, রস পরিবর্তিত হলেও, আমটি যে একই আছে তা বলতে সাধারণ মানুষের দ্বিধা নেই। দ্রব্যকে তাই পরিবর্তনের স্থায়ী কেন্দ্র বলা যেতে পারে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিক দ্রব্যের গুণকে, মুখ্য ও গৌণ ভেদে, দ্বিবিধ বলতে চেয়েছেন। মুখ্য গুণগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলি না থাকলে কোনো দ্রব্যেরই দ্রব্যত্ব যেন সিদ্ধ হয় না; যথা বিস্তৃতি, আকার, আয়তন সংখ্যা প্রভৃতি। গৌণ গুণগুলি খানিকটা পরিবেশ ও প্রত্যক্ষের উপরে নির্ভর করে।

এখন সমস্যা হল এই যে দ্রব্য ও তার গুণধর্মগুলির মধ্যে সম্বন্ধটি কি ভাবে নির্ণীত হবে। দ্রব্যকে গুণাশ্রয় বলার মধ্যে কোনো সমস্যাই নেই বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত গুণ অবশ্যই ভিন্ন। যখন বলি 'চিনি মিষ্ট' তখন চিনি-রূপ দ্রব্য অবশ্যই তার মিষ্টতা গুণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হতে পারে না; কেননা মিষ্টতা ছাড়াও চিনির ওজন, আকার, আয়তন,

জলে-দ্রবণ প্রভৃতি অনেক গুণ থাকে। চিনির 'দ্রব্যত্ব' যদি এর কোনো একটি গুণের সঙ্গে অভিন্ন হত তাহলে "চিনি মিষ্ট" এই বাক্যের অর্থ হতো "চিনি চিনিই", আর এই অর্থ অসঙ্গত। এখন 'দ্রব্য' যদি শুধু নানা গুণের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় মাত্র হয় আর 'গুণ' যদি দ্রব্য থেকে অত্যন্ত ভিন্ন হয়, তা হলে গুণগুলিকে বর্জন করেই 'দ্রব্যত্বের' সন্ধান করতে হবে। চিনি যদি শ্বেতবর্ণের নাও হয় তো তার বিশেষ ক্ষতি হয় না ; চিনি লালও হতে পারে। কিন্তু আকার, আয়তন, ওজন, শ্বেতবর্ণ, মিষ্টতা, বিস্তার প্রভৃতি সমস্ত গুণ কল্পনায় বাদ দিয়ে দিলে একখণ্ড চিনির আর কি বাকী থাকে ? মাত্র গুণাধার বা গুণাশ্রয় রূপে 'দ্রব্য' কি শূন্যাকার বা বিমূর্ত নয় ? গুণের আশ্রয় যদি গুণাতিরিক্ত কিছু হয়, তা হলে ঐ অতিরিক্ত আশ্রয় গুণহীন হতে বাধ্য ; অথচ নির্গুণ দ্রব্য অর্থহীন।

সাধারণ বুদ্ধির উপরোক্ত অসুবিধা দার্শনিকদের মধ্যে বিচারসহ চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে। বুদ্ধিবাদী ও দৃষ্টিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে এ বিষয়ে তীব্র মত বিরোধ রয়েছে। দৃষ্টিবাদীরা 'দ্রব্য' বলতে কেবল গুণসমষ্টিকেই বুঝতে চেয়েছেন ; এর কারণ হলো বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণই কেবল প্রত্যক্ষগম্য আর তাদের কেন্দ্র বা আশ্রয়রূপী গুণহীন দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। পেঁয়াজ যেমন তার খোসা ছাড়া আর কিছু নয়, খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষপর্যন্ত যেমন আর কোন কেন্দ্রবিন্দু পেঁয়াজের মধ্যে পাওয়া যায় না ; ঠিক তেমনি কোন বস্তুর গুণগুলিকে ক্রমাগত সরিয়ে ফেললে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

অবশ্য দৃষ্টিবাদী জন্ লক্ গুণের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপে কোনো উপাদান বা দ্রব্যকে স্বীকার করেছেন, কেননা তিনি মনে করেন যে কেবল গুণ দিয়ে বস্তুজগতের ব্যাখ্যা হতে পারে না। গুণ দ্রব্যকে নির্দেশ করে আর কতকগুলি গুণকে আমরা প্রায়শঃই এক বিশেষ সমাবেশে থাকতে দেখি ; যেমন 'সোনাতে' দেখি হলুদবর্ণ, ঔজ্জ্বল্য, নমনীয়তা ইত্যাদি। আবার কাঁচের চাকচিক্য, নানাবর্ণ, ভঙ্গুরতা ইত্যাদি 'কাঁচেই' আছে, 'সোনাতে' নেই। এই কারণে লক্ মনে করতেন যে কোনো বিশিষ্ট সমাবেশের একাধিক গুণকে একত্র থাকতে হলে ওগুলিকে কোনো আধার বা অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করতেই হবে। তবে গুণগুলিকেই কেবল প্রত্যক্ষগম্য বলে জানা যায় ; গুণের অধিষ্ঠান-দ্রব্য অজ্ঞাত তত্ত্ব।

কিন্তু দৃষ্টিবাদী হয়ে জন লক্ ঐরূপ গুণাধিষ্ঠান অবশ্যই মানতে পারেন না, কেননা তার অস্তিত্বের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। লক্ বলেছিলেন যে একাধিক আল্‌পিন্‌কে একত্র রাখার জন্যে যেমন এক আল্‌পিনের গদি প্রয়োজন তেমনি একাধিক গুণের আসন চাই। কিন্তু উদাহরণের আল্‌পিন এবং আল্‌পিনের আসন উভয়েই দ্রব্য ; কিন্তু গুণ যেহেতু দ্রব্য নয়, গুণের ঐরূপ আসনের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

খাঁটি দৃষ্টিবাদী ডেভিড্ হিউম্ তাই লক্-সম্মত গুণাবলীর অজ্ঞাত অধিষ্ঠানকে সরাসরি অস্বীকার করে, 'দ্রব্য'কে গুণসমষ্টি ছাড়া আর কিছু বলতে সম্মত হন নি। এই গুণসমষ্টি ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন হয় বলে দ্রব্যও ভিন্ন ভিন্ন।

কোনো এক সমাবেশের মধ্যে বিভিন্ন গুণ (বর্ণ, গন্ধ) পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে এক সমষ্টি তৈরী করতে পারে। ঐ গুণসমষ্টির সম্ভাবনার জন্য অন্য কোনো আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। আধুনিক দৃষ্টিবাদী অধ্যাপক এ. জে. এয়ার বলেছেন যে, বাস্তব জগতের গুণ দ্রব্যকে নির্দেশ করে না ;- কেবল গুণের নাম (বিশেষণ) সাধারণ ভাষায় দ্রব্যের নামকে (বিশেষ্যকে) নির্দেশ করে। যখন বলি 'চিনি মিষ্ট', তখন প্রত্যক্ষগম্য মিষ্টতাকে ভাষায় বলতে গিয়ে কোনো দ্রব্যের নাম ('চিনি') বলতেই হয়। কিন্তু ভাষায় গুণভিন্ন দ্রব্যের 'নাম' থাকলেও, ঐ দ্রব্য-নামের অনুরূপ কোনো কিছু জগতে নেই—জগতে কেবল গুণ-সমষ্টিই রয়েছে। দ্রব্য-নামের অনুরূপ কিছু জগতে থাকতেই হবে এমন মনে করা একটা কুসংস্কার। ভাষার প্রত্যেক শব্দই যদি জগতের কোনো না কোনো উপাদানকে নির্দেশ করতো তা হলে 'মৎস্য-কন্যা'ও কোনো প্রকৃত প্রাণী নির্দেশ করত। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ হলো এক সমাবেশে অবস্থিত বিভিন্ন গুণের মধ্যেকার সম্বন্ধ : কোনো এক গুণের সঙ্গে গুণহীন দ্রব্যের সম্বন্ধ নয়।

অথচ হোয়াইট্‌হেড্‌ মনে করেন যে পরিবর্তনশীল, গুণধর্মগুলিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেওয়াই হল বিমূর্ত চিন্তার দাসত্ব করা। এক বা একাধিক গুণ কোনো এক বস্তুরই নানা দিক প্রকাশ করে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা তাই বলেন যে গুণ কখনো দ্রব্যকে আশ্রয় না করে দাঁড়াতে পারে না। দ্রব্যকে যদি প্রত্যক্ষে না পাওয়া যায় তাহলে তাকে পূর্বতসিদ্ধ ধারণারূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে হবে। বুদ্ধিবাদীরা বাস্তব দ্রব্য এবং গণের পার্থক্য এইভাবে বুঝেছেন ঃ দ্রব্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, অন্য কারোর সাহায্য ছাড়াই অস্তিত্ববান : দ্রব্যের ধারণার জন্য অন্য কিছর ধারণার প্রয়োজন নেই। গুণ কিন্তু দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, নিজে নিজেই দাঁড়াতে পারে না : গুণ পরাধীন। গুণ কখনো আলগা হয়ে ঝোলে না : থাকতে হলে তাকে দ্রব্যে থাকতে হবে। বুদ্ধিবাদী দেকার্ত আত্মা ও জড়কে পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ দ্রব্য স্বীকার করেও, তাদেরকে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট বলায়, তারা ঈশ্বরের অধীন হয়ে পড়ে। তাই স্পিনোজা স্বাধীন দ্রব্যকে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর-রূপে কল্পনা করেছেন। মানসিকতা ও জাড্য ঈশ্বরেরই গুণ বা ধর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু দ্রব্যের এই অদ্বৈতবাদ আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অসংখ্য গুণবান দ্রব্যকে অস্বীকার করে। আরিস্টটলের বস্তুবাদ ফল, ফুল, গাছ, লোহা, পাথর, সোনা প্রভৃতি বহু দ্রব্যই স্বীকার করে। পরন্তু দ্রব্য যদি স্বতন্ত্র, স্বাধীন আর গুণ যদি পরতন্ত্র ও দ্রব্যাধীন হয় তা হলে আবার দ্রব্য এবং গুণ অত্যন্ত বিবিক্ত হয়ে, দ্রব্যটি গুণহীন হয়ে পড়তে চাইবে। তা হলে 'দ্রব্যের' দিক থেকে গাছ, লোহা, পাথরের কোনো পার্থক্যই থাকবে না।

কাণ্ট্‌ হিউম্‌কে অনুসরণ করে বলেছেন যে বস্তুর গুণাবলীরই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। অথচ 'চিনি মিষ্ট', 'বরফ ঠাণ্ডা', 'লোহা কঠিন' প্রভৃতি সত্য বর্ণনায় দ্রব্য এবং গুণ উভয়েরই নির্দেশ থাকে। বাক্যগুলির উদ্দেশ্য দ্রব্যকে নির্দেশ করে ও বিধেয় করে গুণের নির্দেশ। এই দ্রব্য-গুণ ধারণা ও তাদের সম্বন্ধ অবশ্যই পূর্বতসিদ্ধ

ধারণা, কেননা দ্রব্য প্রত্যক্ষে গৃহীত হয় না। এই পূর্বতসিদ্ধ ধারণার সাহায্যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য উপাত্তগুলিকে বিশেষভাবে সংবদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট করে, জ্ঞাত বস্তুগুলিকে গঠিত করে থাকি। দ্রব্য-গুণ তাই, দেশকালের মতো, মানুষের জ্ঞানাকার মাত্র। এই নিয়মে গঠিত বস্তুগুলি 'অবভাস' কেননা স্বয়ংসৎ বস্তু আমাদের জ্ঞানাকারনিরপেক্ষ।

2. মূর্তদ্রব্যবাদ

বুদ্ধিবাদীদের গুণহীন দ্রব্য, আর দৃষ্টিবাদীদের দ্রব্যহীন গুণ কোনোটাই আমাদের বুদ্ধিকে তৃপ্তি দিতে পারে না। গুণহীন অধিষ্ঠানরূপে দ্রব্য সর্বত্রই এক, আর এইজন্য টেবিল, পাথর, সোনা, লোহার দ্রব্যরূপে পার্থক্য এই মতে অস্বীকৃত হয়। অতএব "আলপিনের আসন" মতবাদকে ছাড়তে হবেই। দ্রব্য কেবল গুণের অধিষ্ঠান নয়—তার শরীরের মধ্যেই গুণাদি উপাদানরূপে প্রবিষ্ট আছে। পরন্তু দ্রব্যহীন গুণও অসম্ভব, কেননা এক বা একাধিক গুণ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে। এর অর্থ এই নয় যে গুণ কোনো নির্গুণ অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করে; এর অর্থ হলো কোনো এক গুণ (পীতবর্ণ) অন্য গুণবান্ মূর্ত দ্রব্যকে (উজ্জ্বল সোনাকে) আশ্রয় করে। দ্রব্যহীন গুণ ও গুণহীন দ্রব্য উভয়েই বিমূর্ত ধারণা ও বিভ্রান্তির জনক। মূর্তদ্রব্যবাদ দ্রব্যকে কখনো গুণহীন ভাবে না। দ্রব্য সর্বদাই গুণসমন্বিত আর কোনো এক গুণ অন্য গুণসমবেত দ্রব্যাশ্রিত বলে বুঝতে হয়। এই মতে দ্রব্য ছাড়া গুণ নেই, গুণ ছাড়া দ্রব্য নেই। দ্রব্য-গুণ একই জটিল বস্তুর দুই দিক। গুণসমন্বিত দ্রব্য বা দ্রব্যসমবেত গুণাবলীই এক মূর্ত সত্তাবান সংস্থা। টেবিলের গুণাবলী থাকে টেবিলে, জলের গুণ থাকে জলে। একথা ঠিক হলে, ঐ গুণগুলি কোনো এক গুণহীন অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ে থাকতে পারে না; ভিন্ন গুণ ভিন্ন দ্রব্যে থাকবে। অথচ বুদ্ধিবাদ গুণের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানরূপে দ্রব্যকে কল্পনা করায়, 'দ্রব্য' সর্বত্র এক ও অভিন্ন হয়েছে এবং স্পিনোজার অদ্বৈতবাদে হাজির হয়েছে। মূর্তদ্রব্যবাদে দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সাপেক্ষ; একে অন্যকে ছাড়া সম্ভব নয়। এই মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

দৃষ্টিবাদীরা গুণসমষ্টি স্বীকার করেন—অর্থাৎ একাধিক গুণের মধ্যে সম্বন্ধাদি স্বীকার করেন। তা হলে কোনো এক বস্তুতে, একাধিক গুণ এবং তাদের সম্বন্ধের আনুকূল্যে গঠিত যে ঐক্য, এই উভয়কেই স্বীকার করতে হয়। দৃষ্টিবাদীরা তাহলে একমাত্র গুণকেই স্বীকার করছেন না—বস্তুর ঐক্যকেও স্বীকার করেন। মূর্তদ্রব্যবাদও দ্রব্যের ঐক্য এবং তদগত গুণের বহুতা স্বীকার করে—মূর্তদ্রব্য বলতে সমস্ত গুণের এক সুব্যবস্থিত তন্ত্র বা সংস্থাই নির্দিষ্ট হয়। কান্টের দর্শনে 'অবভাস' ও 'স্বয়ংসৎ' বস্তুর পার্থক্য দুর্বল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দ্রব্য-গুণের নিয়মানুযায়ী যে জগতকে আমাদের বুদ্ধি গঠন করে তাকেই যদি একমাত্র পরমার্থ-তত্ত্ব বলে মানি তাহলে আমাদের প্রত্যক্ষপূর্ব 'দ্রব্য-গুণ' ধারণাকে বিষয়নিষ্ঠ বলতে আপত্তি হবার কথা নয়।

3. জাতি বা সামান্য

সম্মুখস্থ কিছুকে ঘটরূপে জানতে হলে তাকে 'ঘটত্ব'বান বলে জানতে হয়, মানুষ বলে জানতে হলে 'মনুষ্যত্ব'বান বলে জানতে হয়। জ্ঞাত বস্তুর এই 'ঘটত্ব', 'মনুষ্যত্ব'রূপ ধর্মগুলি ঐ বস্তুগুলির শ্রেণীধর্ম; অর্থাৎ বস্তুগুলি যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণীগত সমানধর্ম। জ্ঞানে জ্ঞাতবিষয়ের শ্রেণীকরণ বুঝায় ও ঐ জ্ঞাত, বিশিষ্ট পদার্থে তার শ্রেণীধর্মের প্রয়োগ দেখা যায়। এই শ্রেণীধর্ম,—ঘটত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব প্রভৃতি—একই রকমের বহু বস্তুর সমানধর্ম। এই সমান-ধর্মকে 'সামান্য' বা 'জাতি' বলা হয়েছে আর এই ধর্ম বহু প্রকারের দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জগতে বহু বস্তুকে 'ঘট'-নামে অভিহিত করা যায়, বহু প্রাণী রয়েছে যাদের নাম 'গরু', অন্যদের আবার নাম হল 'ছাগল'। এখন অনেক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা প্রাণীকে একই নাম দেবার কারণ হলো এই যে তারা একই শ্রেণীর পদার্থ; আবার তারা যে একই শ্রেণীর এর অর্থ হল তাদের মধ্যে এমন কিছু সমানধর্ম রয়েছে যা ভিন্ন শ্রেণীগত পদার্থে নেই। সব বিশিষ্ট গরুতে 'গোত্ব'-রূপ সমানধর্ম থাকে যা ছাগলে থাকে না, আর সব ছাগলে 'ছাগত্ব' থাকে যা গরুতে থাকে না। ভাষাগত সব নামই 'রাম', 'শ্যাম', 'গঙ্গা'র মতো বিশেষ বস্তুর নাম নয়। "ঘট", 'পট' প্রভৃতি সাধারণ নাম একই কালে বহু বিষয়ে প্রযোজ্য হয়, কেননা বহু বস্তু একই শ্রেণীভুক্ত হতে পারে।

এক শ্রেণীভুক্ত বস্তুগুলি একজাতীয় বা সমজাতীয়। এমন বলা যায় না যে তারা কেবল নামেই এক আর অন্য সব দিক দিয়ে পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। আমরা তিনটি কলম, পাঁচটি নক্ষত্র ও ছটি মশাকে এক নামে ডাকি না। তাই একই নামের বহু বস্তুর অন্তর্গত অন্য কোনো বাস্তব সমানধর্ম থাকা প্রয়োজন আর শ্রেণীগত ঐ ধর্মকেই 'সামান্য' বা 'জাতি' বলা হয়েছে। এক শ্রেণীগত বস্তুর 'নাম'-রূপ সমানধর্ম তো মানুষের দেওয়া; তা কৃত্রিম এবং প্রকৃতপক্ষে বিষয়গত ধর্ম নয়। অর্থাৎ নামকে নয়—একই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগুলির অন্তর্গত বিষয়নিষ্ঠ সমানধর্মকেই জাতি বা সামান্য বলে। আলোচনার সুবিধার জন্য এখন থেকে আমরা একই শ্রেণীভুক্ত বিশেষ বিশেষ বস্তু বা প্রাণীকে ঐ শ্রেণীগত "ব্যক্তি" বলব, আর ঐ ব্যক্তিগুলির বিষয়নিষ্ঠ সমানধর্মকে 'জাতি' বা 'সামান্য' বলব। অনেক দার্শনিক বিষয়নিষ্ঠ 'গোত্ব' 'বৃক্ষত্ব', 'মনুষ্যত্ব' প্রভৃতি জাতি স্বীকার করেছেন আর অন্য দার্শনিকেরা ঐ মতের বিরোধিতা করেছেন।

এ কথা মনে করলে অবশ্য ভুল হবে যে, দেশকালাশ্রিত দ্রব্যগুলিই বিশেষ বিশেষ 'ব্যক্তি' আর তাদের গুণগুলি 'জাতি'। এমন মনে হতে পারে যে ঘটদ্রব্য একাধিক দেশে বা কালে থাকতে পারে না বলে 'ব্যক্তি', কিন্তু জাতি নয়; আর ফুলের রক্তবর্ণ (গুণ), কাপড়ে, কাগজে, কলমে, সিন্দুরে, অস্তগামী সূর্যে থাকতে পারে বলে তা জাতি। কিন্তু কোনো ব্যক্তিবিশেষের গুণ কেবল ঐ ব্যক্তিগত ও অন্য ব্যক্তিতে থাকে না। দুটি ফুলের বর্ণ একই রকমের হতে

পারে কিন্তু এক নয়। একই রকমের অসংখ্য দ্রব্যতে, যেমন ঘটে, থাকে ঘটত্ব জাতি। এইরূপ একই ধরণের বিভিন্ন গুণকে একই গুণজাতির দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যায়। হাল্কা বা গাঢ় নীল রঙ, এখানকার নীল ওখানকার নীল প্রভৃতি গুণ এক 'নীলত্ব' জাতির দৃষ্টান্ত মাত্র। তেমনি একজাতীয় সম্বন্ধগুলি এক সম্বন্ধ-সামান্যের দৃষ্টান্ত হতে পারে; এখানকার বা ওখানকার সংযোগ সম্বন্ধ এক 'সংযোগত্ব' জাতির দৃষ্টান্ত। তাই শ্রেণীগত সমানধর্ম বা জাতি দ্রব্য, গুণ বা সম্বন্ধ নয়; এই ধর্ম ব্যক্তিতে থাকবে, যখন ঐ ব্যক্তিকে কোনো শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা হয়।

বিজ্ঞানীরা বস্তুজগত ও প্রাণীজগতকে বুঝতে গিয়ে সামান্যীকরণের সাহায্যে অগ্রসর হন। বিভিন্ন প্রত্যক্ষগম্য বিশেষ বস্তুকে তাঁরা কোনো নিয়মের অধীনে সুসংহত করতে পারলে তৃপ্ত হন। বিশিষ্ট বস্তু বা ঘটনা দেশকালাশ্রিত হয়ে বিবিক্তরূপে থাকে; কিন্তু এই বিশেষ ব্যক্তিগুলিকে কোনো না কোনো সামান্য বা সার্বিক নিয়মের দৃষ্টান্তরূপে দেখাই হল বিজ্ঞানীর কাজ। "উত্তাপ বস্তুকে প্রসারিত করে", "আর্দ্রতা সংস্পর্শে লোহাতে মরিচা ধরে" প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে নানা দেশ ও কালের অসংখ্য উত্তাপ ও অসংখ্য লোহাকে সুসংবদ্ধ করা যায়—ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম তৎশাসিত অসংখ্য বস্তুর সমানধর্ম বা জাতি। এমন কোনো বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির জ্ঞান হতে হলে তাকে কোনো জাতির দৃষ্টান্ত বলে বুঝতে হয়। এই জাতির স্বরূপ এবং জাতি-ব্যক্তির সম্বন্ধ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বহু মতভেদ হয়েছে। আমরা অপেক্ষাকৃত প্রধান মতগুলিকে আলোচনা করব।

প্লেটোর মত

বস্তুবাদী গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সামান্য ও তার দৃষ্টান্ত ব্যক্তিসমূহ উভয়কেই স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে সামান্য বা জাতি ঠিক একই শ্রেণীভুক্ত বহু ব্যক্তির সমানধর্ম নয়। বরং সামান্য যেন এক আদর্শ সত্তা যা বুদ্ধিগ্রাহ্য; আর বিশেষ ব্যক্তিরা যেন ঐ আদর্শের কম বেশী অনুকরণ। অনুকরণের সাহায্যেই প্লেটো জাতি ব্যক্তির সম্বন্ধ বুঝতে চেয়েছেন। তিনি এক বুদ্ধিগ্রাহ্য আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা করেছেন আর দেশকালগত বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে ওই মানরূপী আদর্শ রাষ্ট্রের কমবেশী অনুকরণ বলেছেন। এইমতে জাতি বা সামান্যই আসল সত্তা আর ব্যক্তিরা হল তার নকল। প্লেটো আবার কোনো শ্রেণীর সারধর্ম বা স্বরূপধর্মকেই সামান্য বলেছেন, যথা 'মনুষ্যত্ব' হল মনুষ্যশ্রেণীর স্বরূপলক্ষণ। এই ধর্ম না থাকলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি যেন 'মানুষ' হয় না, আর বিভিন্ন ব্যক্তি ঐ স্বরূপ লক্ষণকে কমবেশী অনুকরণ করেই অস্তিত্ববান হতে পারে। বাস্তব জগতের কোনো মানুষই ঐ মনুষ্যত্বের কাষ্ঠা বা আদর্শে পৌঁছুতে পারে না; কমবেশী অনুকরণ করে। তেমনি গাণিতিক আদর্শ হলো সম্পূর্ণ দোষমুক্ত 'বৃত্ত', বা নৈতিক আদর্শ হলো চরমতম 'সততা'। এগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বাস্তবে অঙ্কিত বৃত্ত

সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হয় না, আর কোনো অনুষ্ঠিত নৈতিক কর্ম চরমতম সততার কমবেশী উপলব্ধি মাত্র। অথচ আমরা পূর্ণ বর্তুলতা বা চরমতম সততার ধারণা করতে পারি আর এরা ভৌতিক জগতের বাইরে অন্য কোনো লোকে বাস করে বলে প্লেটো মনে করতেন। এখন এই আদর্শ নমুনাটিও এক বিশিষ্ট পদার্থ আর বিশেষ ব্যক্তিরা তার কমবেশী অপর্যাপ্ত অনুকরণ। প্লেটো আসল সারধর্ম এবং নকল দৃষ্টান্তের দুই ভিন্ন জগত স্বীকার করেছেন। এখন আদর্শ স্বরূপধর্মকে যদি কমবেশীরূপে ব্যক্তিদের মধ্যে পাই, তাহলে ঐ ধর্ম সব ব্যক্তির মধ্যে এক, অভিন্ন সমানধর্ম হতে পারে না। এ কারণে আদর্শ ও তার বিশেষ অনুকরণগুলি উভয়েই বিশিষ্ট পদার্থ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ প্লেটোর জাতিও একটি ব্যক্তি বিশেষ। তাদের তাত্ত্বিক কোনো প্রভেদ নেই—কেবল একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অপরটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই মতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সামান্য শ্রেণীধর্মের দৃষ্টান্ত নয়।

প্লেটো কখনও কখনও বলেছেন যে ব্যক্তিগুলি এক সামান্যের 'ভাগীদার' হয়। একই চাদরের নীচে একাধিক মানুষ শয়ন করলে যেমন প্রত্যেকে একই চাদরের অংশগ্রহণ করে, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নাকি একই 'মনুষ্যত্বের' ভাগীদার হয়ে এক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু একাধিক ব্যক্তি এক চাদর গায়ে দিলেও, চাদরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তিকে আবৃত করে। তাই বিভিন্ন ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থে একই চাদর ভোগ করে না। আরও কথা হল মানুষগুলো যেমন বিশেষ চাদর ও তার অংশও তেমনি বিশিষ্ট—অর্থাৎ জাতি-ব্যক্তির তাত্ত্বিক পার্থক্য প্লেটোর মতে নষ্ট হয়।

প্লেটোর মতে ব্যক্তিরা অনিত্য, স্বরূপধর্ম বা আদর্শ নিত্য; ব্যক্তিরা আসে-যায়, উৎপন্ন-বিনষ্ট হয়; আদর্শ কিন্তু চিরস্থায়ী এবং প্রকৃত তত্ত্ব। স্বরূপ-ধর্মগুলিই প্রাথমিক ও আসল; নকল দৃষ্টান্তগুলি তাদের উপর নির্ভরশীল ও ঐ কারণে গৌণ পদার্থ। দেশকালের উর্ধে এক অলৌকিক জগতস্থ এই প্রাথমিক ও মুখ্য 'স্বরূপধর্মের' মতবাদ, আধুনিক 'অস্তিবাদে' তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে। (শেষ অধ্যায় দেখ)।

আরিস্টটলের মত

প্লেটোশিষ্য আরিস্টটলও বস্তুবাদী এবং তাঁরও মতে জাতি এবং ব্যক্তি জ্ঞাননিরপেক্ষভাবেই সৎ। আরিস্টটল্ কিন্তু প্লেটো সমর্থিত দুই-জগততত্ত্ব অস্বীকার করেছেন। যে অলৌকিক জগতে কেবল জাতি, সারধর্ম বা আদর্শ বাস করে তার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। আবার প্লেটো-বর্ণিত 'জাতি'গুলি ঠিক বহু ব্যক্তির সমানধর্ম নয়; আদর্শ বা নমুনা হিসাবে এরা প্রত্যেকে একপ্রকার অলৌকিক, বিশিষ্ট বস্তু আর তারা লৌকিক দৃষ্টান্তগুলির কাঠা মাত্র। আরিস্টটলের জাতিবাদই প্রকৃত জাতিবাদ। এই মতে 'জাতি' হল কোনো সরল বা জটিল সমানধর্ম যা বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে সমভাবে বর্তমান

থাকে। একই শ্রেণীর (যথা মানুষের) বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে পার্থক্য বাদ দিয়ে দিয়ে যে অবশিষ্ট সমানধর্মগুলি পাই, তাই হল 'মনুষ্যত্ব' জাতি; এই জাতি হল জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ সমানধর্ম। জাতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি নেই; আবার ব্যক্তি ছাড়া কোনো জাতি নেই। আরিস্টটলের মতে শ্রেণীগত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই সমানধর্ম থাকতে পারে; জাতি দৃষ্টান্তের মধ্যেই থাকে। প্লেটো বলতেন জাতি ব্যক্তির আগেই থাকে; কিন্তু আরিস্টটলের মতে ব্যক্তির বাইরে জাতির কোনো অস্তিত্ব নেই। 'মৎস্যকন্যাত্ব' কোনো জাতিধর্ম নয় কেননা তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই; অথচ মৎস্যকন্যার ধারণা আমরা অবশ্যই করতে পারি। জাতি কেবল ধারণা-মাত্র নয়—অস্তিত্ববান ব্যক্তিনিষ্ঠ সমানধর্ম।

সাধারণ বিচারে প্লেটোর তুলনায় আরিস্টটলের মতই বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তবু আরিস্টটলসম্মত জাতি বা সমানধর্ম এক, অভিন্ন হয়ে, কি করে যে বিভিন্ন দেশে কালে অবস্থিত দৃষ্টান্তে থাকে তা বোঝা কঠিন। এই কারণে দৃষ্টিবাদীরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তকেই সৎ বলেছেন আর তদ্‌গত এক, অভিন্ন জাতিকে অস্বীকার করেছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্মগুলি ব্যক্তিগত হতে বাধ্য; সমানধর্ম বলে যদি কিছু মানা হয় তবে তাও ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন হয়ে যাবে। সক্রেতিশের 'মনুষ্যত্ব' ও একটি তণ্ডকের 'মনুষ্যত্ব' কি এক ও অভিন্ন? সক্রেতিশ যে "বুদ্ধিবৃত্তির" অধিকারী তা কি সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে? তাছাড়া 'লাল', 'নীল', 'পীত', 'সবুজ' সকলকেই 'বর্ণ' বলা হয় বটে কিন্তু এদের মধ্যে কিছু সমানধর্ম পাওয়া যায় না। এমন কোনো সাধারণ বর্ণ নেই যা লাল, নীল, সবুজ, হলুদ সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়।

4. নামবাদ, ধারণাবাদ ও বস্তুবাদ

নামবাদ

জাতিবাদের উপরোক্ত সমালোচনা করে দৃষ্টিবাদীরা নিছক 'নাম'-বাদে উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের মতে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তগুলিই সৎ। এক শ্রেণীর বিশেষগুলিকে এক 'নামে' ডাকা হয় আর ঐ নামেই কেবল তাদের সমানধর্ম। বিশেষ ব্যক্তিদের কোনো নিরপেক্ষ, বিষয়নিষ্ঠ সমানধর্ম নেই; আমরা, মানুষেরা, ব্যবহারিক প্রয়োজনে ব্যক্তিদের ওপর নাম প্রয়োগ করি আর এই নাম-রূপ সমানধর্ম ঐ বিশেষ ব্যক্তিদের নিজস্ব ধর্ম নয়। কৃত্রিম, মনুষ্যসৃষ্ট 'মহিষ' নামটি কেবল সকল মহিষ-ব্যক্তির সমানধর্ম; তা ছাড়া তারা সকলেই অত্যন্ত ভিন্ন ব্যক্তিমাত্র।

এই চরম মত 'নামবাদ'ও যথাযথ হতে পারে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিদের আমরা এক 'নাম' দিই না, কোনো এক শ্রেণীর ব্যক্তিকেই এক নামে অভিহিত করা যায়। এই ব্যক্তিগুলির কোনো সমানধর্ম না থাকলে তারা এক শ্রেণীর ব্যক্তি হয় না। তাই আবার বিষয়নিষ্ঠ সমানধর্মে ফিরে যেতে হয়। অনেক দৃষ্টিবাদী বলতে চেয়েছেন যে, সদৃশ ব্যক্তিরা এক নামে অভিহিত হয় আর

ভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু অনেক ব্যক্তিগত সাদৃশ্যও এক প্রকার সমানধর্ম বা জাতি। উইট্‌গেনস্টাইন্‌ বিভিন্ন রকমের খেলার মধ্যে এক পারিবারিক সাদৃশ্য আছে বলেছেন। এর অর্থ হল এই যে, কতকগুলি খেলার মধ্যে যে সাদৃশ্য (যেমন, প্রতিযোগিতা ও বুদ্ধিপ্রয়োগ থাকে তাস খেলা, দাবা খেলার মধ্যে) তার খানিকটা থাকে অন্য খেলায়, সবটা নয় (যেমন, ফুটবল খেলায় প্রতিযোগিতা, ক্ষিপ্রতা থাকে, কিন্তু বুদ্ধিপ্রয়োগ নেই)। অন্য খেলাগুলির মধ্যে আবার পরস্পর-ব্যাপ্ত ও পরস্পর-অব্যাপ্ত সাদৃশ্য থাকে আর এইভাবে সব খেলার মধ্যে কমবেশী পারিবারিক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু দুই বা ততোধিক খেলার মধ্যে কোনো একটি সাদৃশ্য মানলেই বিষয়নিষ্ঠ সমানধর্ম স্বীকার করা হয়ে যায় বলে মনে হয়। ক, খ ও গ-য়ের মধ্যে যদি কোনো সাদৃশ্য থাকে তাহলে বলতে হয় যে কোনো ধর্মে তারা সমান আর অন্য ধর্মে তারা ভিন্ন। তাই সমানধর্ম ছাড়া সাদৃশ্যের উপপত্তি হয় না।

ধারণাবাদ

কোনো কোনো দার্শনিক (যথা, জন লক্‌) বলেছেন যে বাস্তবে কেবল বিশেষ ব্যক্তিগুলিই রয়েছে। তবে জাতি কেবলমাত্র ভাষাগত 'নাম' নয় কিন্তু মনোগত সামান্যধারণা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ ধর্মগুলিকে বাদ দিয়ে, বিমূর্ত চিন্তার সাহায্যে আমরা অবশিষ্ট সমানধর্মের ধারণা তৈরী করি। এই 'ধারণা' অমূর্ত ও মনোগত মাত্র—বিষয়নিষ্ঠ জাতি নয়। লকের এই ধারণাবাদের অসুবিধা হল এই যে, মনোগত এই ধারণা কার ধারণা, এ প্রশ্নের উত্তর নেই। মনের মধ্যে সামান্যধারণা অবশ্যই থাকতে পারে; কিন্তু এই ধারণা কি কোনো বস্তুগত সমানধর্মের ধারণা নয়? তা যদি না হয় তবে 'মনুষ্যত্ব' ও 'মৎস্যকন্যাত্ব' ধারণাদ্বয়ের পার্থক্য করা যাবে না। এদের পার্থক্য করতে হলে প্রথমটিকে বস্তুগত ও দ্বিতীয়টিকে মনোগত বলতে হয়। তাই প্রকৃত সামান্য ধারণা বিষয়নিষ্ঠ জাতির নির্দেশ দেয়।

বস্তুবাদ

আমরা দেখেছি যে প্লেটোর মতে সামান্যই সৎ আর তার বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ব্যক্তিরা অসৎ। নামবাদীর মতে বিশেষ ব্যক্তিরাই সৎ আর সমানধর্ম হল অসৎ। ধারণাবাদী সামান্যকে মনোগত বলেন—বিষয়গত নয়। বস্তুবাদী আরিস্টটল্‌ বিশেষ ও সামান্য, উভয়কেই জ্ঞাননিরপেক্ষ সৎ বলেন। জ্ঞান-গ্রাহ্য জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ বস্তুবাদই অধিকতর গ্রাহ্য মত বলে মনে হয়, যদিও ঐ মত একান্তই দোষমুক্ত নয়। জগতে 'নগরত্ব' বলে যদি কোনো সমানধর্ম না থাকত তবে, 'কলিকাতা এক নগর', 'লণ্ডন এক নগর', 'ন্যু ইয়র্ক এক নগর', 'ঢাকা এক নগর' প্রভৃতি বাক্যগুলি একযোগে সত্য হতে পারত না; এর কারণ হল এই যে, উক্ত বাক্যগুলির নির্দেশ হল কলিকাতা, লণ্ডন ইত্যাদিতে 'নগরত্ব' রয়েছে।

উপসংহার

কোনো কোনো ভাববাদী দার্শনিক (বোসাঙ্কোয়েট্) মূর্ত সামান্যের কথা বলেছেন। এই মতে বস্তুবাদীর শ্রেণীগত সমানধর্ম খানিকটা বিমূর্ত ; কারণ এই ধর্ম ব্যক্তির অন্তর্গত বিশেষ পার্থক্যকে বাদ দিয়ে পেতে হয়। কিন্তু বিশেষ ধর্ম থেকে সমানধর্মকে আলাদা করা যায় না—এখানে যোগ বা বিয়োগ চলে না। 'মূর্ত সামান্য' মতে ব্যক্তিদের পার্থক্য বাদ দিয়ে সামান্য নেই বা সামান্যকে বাদ দিয়েও বিশেষ ব্যক্তি নেই। সামান্য-বিশেষের সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। ব্যক্তিগত পার্থক্য বাদ দিলে, অনেক ব্যক্তি আর থাকে না ও তাদের সমানধর্মও নষ্ট হয়। সামান্য তখন এক বিশিষ্ট বস্তু হতে চায়। বিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটনাকে বুঝতে গিয়ে তাদেরকে কোনো এক সার্বিক নিয়মের দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। বিশেষকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করেই ঐ সামান্য নিয়ম পাওয়া যায়। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি অলীক নয়। নামবাদীও এদের অলীক বলতে পারেন না, কেননা তাঁরা যে বিশেষ ব্যক্তিদের স্বীকার করেন তাদের ব্যাখ্যায় ঐ সার্বিক নিয়মের প্রয়োজন। মহাকর্ষ জড় বস্তুর এক সাধারণ নিয়ম। জড়, প্রাণ ও মনের সাধারণ নিয়ম হল 'ক্রমবিকাশ'। বিজ্ঞান-আলোচনার পদ্ধতি জাতি-ব্যক্তিকে, সামান্য বিশেষকে, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলতে চায়, আর তাই মূর্ত সামান্যকেই যেন স্বীকার করে।

সপ্তম অধ্যায়

কারণ

1. কারণ ও সর্ত

আবশ্যিক সর্ত, পর্যাপ্ত সর্ত, পর্যাপ্ত-আবশ্যিক সর্ত*

কারণ বলতে কী বোঝায়? সাধারণ ভাষায় "কারণ" কথাটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় না, কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, আমরা বলি:

(1) সূর্যালোক তরুলতার জন্ম ও বৃদ্ধির কারণ

(2) অনাহার মৃত্যুর কারণ

(3) আণবিক চাঞ্চল্য উত্তাপের কারণ

(4) ব্যক্তিগত আক্রোশ হত্যার কারণ।

(নিচে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কারণকে ক দিয়ে এবং কার্যকে খ দিয়ে বোঝাব।)

প্রথম উদাহরণে: ক না থাকলে খ ঘটে না, সূর্যালোক ভিন্ন গাছপালার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু ক থাকলেই যে খ ঘটবে তা নয়, যেমন চাঁদের ওপরও সূর্যালোক পড়ে, কিন্তু চাঁদে তরুলতা জন্মায় না।

দ্বিতীয় উদাহরণে: ক ঘটলে খ ঘটে, কিন্তু ক ছাড়াও খ ঘটতে পারে; অনাহারে মৃত্যু হয়, কিন্তু অনাহার ছাড়াও মৃত্যু হয়।

তৃতীয় উদাহরণে: ক ঘটলে খ ঘটে, আবার ক না ঘটলে খ ঘটে না; অণুতে চাঞ্চল্য হলে উত্তাপ হয়, আবার অণুতে চাঞ্চল্য না হলে উত্তাপ সৃষ্টি হয় না।

চতুর্থ উদাহরণে: ক থাকলেও খ না ঘটতে পারে, আবার ক না থাকলেও খ ঘটতে পারে। ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে সব সময় হত্যাকাণ্ড হয় না, আবার ব্যক্তিগত আক্রোশ না থাকলেও রাম শ্যামকে খুন করতে পারে। আলোচ্য অর্থ "কারণ"-এর সব চেয়ে শিথিল অর্থ। এ অর্থে বিজ্ঞানীরা "কারণ" কথাটি ব্যবহার করেন না।

আবশ্যিক সর্ত (প্রথম উদাহরণ দ্রষ্টব্য): ক-কে খ-এর কারণ বলার অর্থ হল এ দাবী করা— ক না ঘটলে খ ঘটে না, কিন্তু ক ঘটলেও খ নাও ঘটতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে ক-কে খ-এর আবশ্যিক সর্ত বলা হয়। অর্থাৎ

ক খ-এর আবশ্যিক সর্ত = যদি ক না ঘটে তাহলে খ ঘটে না।

লক্ষণীয় যে— এ অর্থে ক-কে খ-এর কারণ বললে এ দাবী করা হয় না যে, ক ঘটলে খ-ও ঘটবে; কেবল এ দাবীই করা হয়: যদি ক না ঘটে তাহলে খ ঘটে না। (পরে দেখব হিউম্ "কারণ"-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কখনও কখনও "কারণ" কথাটি এ অর্থে ব্যবহৃত করেছেন।)

---

* যথাক্রমে: necessary condition, sufficient condition, necessary-and-sufficient condition

পর্যাপ্ত সর্ত (দ্বিতীয় উদাহরণ দ্রষ্টব্য) : ক-কে খ-এর কারণ বলার অর্থ হল এ দাবী করা— ক ঘটলে খ-ও ঘটে, কিন্তু ক না ঘটলেও খ ঘটতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে ক-কে খ-এর পর্যাপ্ত সর্ত বলা হয়। অর্থাৎ

ক খ-এর পর্যাপ্ত সর্ত = যদি ক ঘটে তাহলে খ ঘটে।

লক্ষণীয় যে— এ অর্থে ক-কে খ-এর কারণ বললে এ দাবী করা করা হয় না যে, ক না ঘটলে খ ঘটে না; কেবল এ দাবীই করা হয় যে: যদি ক ঘটে তাহলে খ ঘটে।

(মীল্ "কারণ" কথাটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন ; হিউমেও এ ব্যবহার দেখা যায়।)

পর্যাপ্ত-আবশ্যিক সর্ত (তৃতীয় উদাহরণ দ্রষ্টব্য) : ক-কে খ-এর কারণ বলার অর্থ হল এ দাবী করা যে— ক ঘটলে খ ঘটে এবং ক না ঘটলে খ ঘটে না। এরকম ক্ষেত্রে ক-কে খ-এর পর্যাপ্ত-আবশ্যিক সর্ত বলা হয়। অর্থাৎ

ক খ-এর পর্যাপ্ত-আবশ্যিক সর্ত = যদি ক ঘটে তাহলে খ ঘটে,
এবং যদি ক না ঘটে তাহলে খ ঘটে না।

লক্ষণীয় যে, এ অর্থে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ উভয়মুখী, এবং ফলে প্রকৃতই ক যদি খ-এর পর্যাপ্ত-আবশ্যিক সর্ত হয় তাহলে সঙ্গতভাবে বলতে পারি :

ক ঘটেছে ∴ খ ঘটবে। খ ঘটে নি ∴ ক ঘটবে না।
ক ঘটে নি ∴ খ ঘটবে না। খ ঘটেছে ∴ ক ঘটবে॥

আরও লক্ষণীয় যে, কারণ বলতে যদি পর্যাপ্ত আবশ্যিক সর্ত বোঝায় তাহলে

যদি ক খ-এর পর্যাপ্ত-আবশ্যিক সর্ত হয় তাহলে : ক-কে খ-এর কারণ, আবার খ-কে ক-এর কারণ বলতে বাধা থাকে না।

যথা, আমরা বলতে পারি : আণবিক চাঞ্চল্য উত্তাপের কারণ ; আবার এ কথাও বলতে পারি : উত্তাপ আণবিক চাঞ্চল্যের কারণ। "কারণ" কথাটি আলোচ্য অর্থে ব্যবহার করলে কার্য ও কারণের মধ্যে বিশেষ কোনো ভেদ থাকে না। সাধারণ ভাষায় "কারণ" কথাটি সাধারণত এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। দেখা গেল যে কারণ কথাটি অন্তত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয় :

কারণ হল আবশ্যিক সর্ত, কারণ হল পর্যাপ্ত সর্ত
কারণ হল পর্যাপ্ত-আবশ্যিক সর্ত।

এখানেই শেষ নয়। কারণ শব্দটি আরো দুটো ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় : নিচে এ অর্থ দুটি আলোচিত হল।

2. কারণ ও হেতু*

"কারণ" কথাটি অনেক সময় দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আমরা বলি :

রামের মৃত্যুর কারণ কর্কটরোগ।
রামের মৃত্যু হয়েছে কারণ রামের কর্কটরোগ হয়েছিল।
রাম মরণশীল কারণ সব মানুষ মরণশীল॥

* কারণ=cause হেতু=reason

এখানে প্রথম বাক্যটিতে "কারণ" বলতে বোঝাচ্ছে ঃ একটি পূর্ববর্তী ঘটনা ঘটার দরুণ একটি অনুবর্তী ঘটনা (মৃত্যু) ঘটেছে। আর শেষোক্ত বাক্য দুটিতে "কারণ" মানে হেতু, বাক্যের সমর্থক হেতু —দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে "কারণ" ব্যবহার না করে "কেননা" কথাটি ব্যবহার করা যেত। কিন্তু প্রথম বাক্যটিতে "কারণ" শব্দটির বদলে "কেননা" কথাটি ব্যবহার করলে বাক্যটি একটি অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হত।

প্রথম বাক্যটিতে— বলা হয়েছে, রামের মৃত্যু একটি ঘটনা, আর কর্কটরোগ হওয়াও একটা ঘটনা এবং ঘটনা দুটির মধ্যে আনুপূর্বের সম্পর্ক আছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে— বলা হয়েছে, অমুক বাক্য সত্য কেননা তমুক বাক্য সত্য, ভ বাক্যটি সত্য কেননা ব বাক্যটি সত্য।

কিন্তু "কারণ" শব্দটি হেতু অর্থে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা ঃ কার্যকারণ সম্বন্ধ হল কালিক সম্বন্ধ—পৌর্বাপর্যের সম্বন্ধ, কিন্তু হেতু (হেতুবাক্য) ও হেতুর দ্বারা সমর্থিত বাক্যের (সিদ্ধান্তের) মধ্যে কালিক পৌর্বাপর্য নেই। যথা

রামেরও মৃত্যু হবে (ভ) কেননা সব মানুষ মরণশীল (ব)

এ বাক্যে এ কথা বলা হয় নি যে পূর্বে ব ঘটেছে বলে তার অব্যবহিত পরে ভ ঘটনা ঘটবে। লক্ষণীয়, এখানে 'ব' ও 'ভ' ঘটনার বর্ণনা নয়, ব্যাপারের বর্ণনা। যথা, সব মানুষ মরণশীল—এটা একটা ব্যাপার, ঘটনা নয়। ঘটনামাত্রই কোনো কালে ঘটে, কিন্তু ব্যাপার, বা বাক্যের সত্যতা, কালাতীত।

তারপর, সাধারণত ব্যবহারিক জীবনে ও বিজ্ঞানে "কারণ" কথাটি নিমিত্ত-কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু হেতু নিমিত্তকারণ নয়। "-এর কারণ কী"? —এ প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য হল ঃ কোন্ ঘটনা ঘটার ফলে এ ঘটনাটি ঘটেছে? কিন্তু "-এর হেতু কী"?—এ প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য হল ঃ কিভাবে একে সমর্থন করবে, কোন্ যুক্তিতে এ কথা বলছ?

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ আর হেতুবাক্য-সিদ্ধান্তের, প্রতিপাদক-প্রতিপাদ্যের, সম্বন্ধ ভিন্ন জাতীয়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে কারণের মধ্যে কার্যের ব্যাখ্যা (অন্তত আংশিক ব্যাখ্যা) মেলে; কাজেই কারণকে হেতু বলতেও বাধা নেই। এটা হেগেল্, ব্রাড্লি প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের মত। কিন্তু বিজ্ঞানে "কারণ" কথাটি "কেননা" অর্থে ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় কালিক পূর্বগামী অর্থে।

3. সতত-সংযোগ তত্ত্ব[1]

হিউমের পূর্ববর্তী অনেক দার্শনিক মনে করতেন যে কোনো কার্য ও তার কারণের মধ্যে একটা অনিবার্য বা অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে, একটা আন্তর সম্বন্ধ আছে। ক ও খ-এর মধ্যে আন্তর ও অনিবার্য সম্বন্ধ বিদ্যমান —এ উক্তির বক্তব্য হল ঃ কারণ হল এমন ঘটনা যা ঘটলে কার্য না ঘটে পারে না, কারণ ঘটলে কার্য ঘটতে "বাধ্য", কারণ ঘটলে কার্য অবশ্যই ঘটবে।

1. Regularity Theory

হিউম্ বিশদভাবে দেখাতে চেষ্টা করেন যে কারণ ও কার্যের মধ্যে কোনো আন্তর বা অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ নেই। তিনি বলেন: প্রথমত, জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব, এবং ইন্দ্রিয়ানুভবে অবশ্যম্ভবতার জ্ঞান হয় না। অনুভবে পাই ক (কারণ) ঘটেছে এবং বস্তুত খ (কার্য) ঘটেছে। ক ঘটলে খ না ঘ'টে পারত না, ঘটতে বাধ্য, বা ক ঘটলে খ-কে অবশ্যই ঘটতে হবে—এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যুক্তি বা অনুমানের সাহায্যেও জানা যায় না যে ক ও খ-এর মধ্যে কোনো অবশ্যম্ভব বা আন্তর সম্বন্ধ বর্তমান ৷৷ (হিউমের মতে কোনো বাস্তব বিষয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ থাকতে পারে না।)

হিউমের যুক্তি হল এই: ক ও খ-এর মধ্যে যদি অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ থাকত তাহ্‌লে ক-কে বিশ্লেষণ করে খ পাওয়া যেত। আমরা জানি জলপান তৃষ্ণা নিবারণের কারণ। এখন জলপান ও তৃষ্ণা নিবারণের মধ্যে যদি অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ থাকত তাহলে—জলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই জানতে পারতাম যে: জলের ধর্ম হল তৃষ্ণা নিবারণ করা। কিন্তু জলের স্বরূপের জ্ঞান থেকেই এ জ্ঞান হয় না যে জল অবশ্যই তৃষ্ণা নিবারণ করবে। বস্তুত বাস্তব অনুভবের ফলেই আমরা জানতে পেরেছি যে জল তৃষ্ণা নিবারণ করে। প্রথম পুরুষ আদম্ কি জল দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে ঐ জল পান করলে তার তৃষ্ণা দূর হবে, জল দেখেই কি জানতে পেরেছিল—যে-জলে তার তৃষ্ণা দূর হয় সে জলেই শ্বাসরোধ হয়ে তার মৃত্যু হতে পারে? হিউমের মতে—কারণ ও কার্য পৃথক, স্বতন্ত্র ঘটনা; সুতরাং এদের মধ্যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ থাকতে পারে না। ক-এর প্রকৃতির জ্ঞান থেকে, ক যে খ-এর কারণ—এ জ্ঞান হয় না; কাজেই ক ও খ-এর মধ্যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ নেই।

হিউম্ যা বলতে চেয়েছেন তা সংক্ষেপে এই: ক খ-এর কারণ—এ আকারের বাক্য বা জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ নয়। ধরা যাক্, "ক খ-এর কারণ" এ বাক্য সত্য, তাহলেও "ক খ-এর কারণ নয়," "ক ঘটেছে অথচ খ ঘটে নি"—এসব বাক্য স্ববিরোধী নয়। ক ঘটলে বস্তুত খ ঘটে, কিন্তু এমন হতে পারে যে ক ঘটল কিন্তু খ ঘটল না, ক ঘটলে খ না ঘ'টে, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে পারত। যথা, জল তৃষ্ণা নিবারণ না করে দহন করতে পারত, অগ্নি দহন না করে শীতল করতে পারত। জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, অগ্নি দহন করে—এ সব পরতসাধ্য বাক্য বস্তুত সত্য, আপতিক সত্য; অবশ্যম্ভব সত্য নয়।

ওপরে হিউমের মতের যে সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হল তা হিউমের পূর্বপক্ষের সমালোচনা। হিউম নিজে কারণতা ব্যাখ্যা করেন নৈকট্য ও সংযোগের ধারণা দিয়ে। হিউমের নিজপক্ষ বক্তব্য হল: কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হল সতত সংযোগ সম্বন্ধ। দুটি ঘটনাকে সতত যুক্তভাবে ঘটতে দেখলে, ক-কে সব সময় খ-এর অব্যবহিত পূর্বে ঘটতে দেখলে, আমরা বলি—ক খ-এর কারণ। "কার্য কারণের জ্ঞান হওয়া" অর্থ: সতত-সংযোগের জ্ঞান হওয়া।

আমি জানি যে ক খ-এর কারণ

এ কথার অর্থ হল—

আমি জানি যে বস্তুত ক ও খ-এর মধ্যে সতত-সংযোগ আছে

আমি জানি যে বস্তুত খ-ঘটনা ক-ঘটনার অনুগামী ॥

হিউম্ আরও বলেন যে ঃ "ক খ-এর কারণ"— এ রকম বাক্যের সত্যতা ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়েই যাচাই করা যায়।

কেউ কেউ বলেন যে ঃ আমরা বহির্জগতে কার্যকারণের মধ্যে অবশ্যম্ভবতা প্রত্যক্ষ করি না, ঠিক; কিন্তু মনোজগতে আমরা কার্যকারণের মধ্যস্থিত অবশ্যম্ভবতা সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি। অনুভবে পাই যে আমার ইচ্ছা ও ইচ্ছাকৃত কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ বর্তমান। অগ্নিসংযোগ হলে দহন হতে বাধ্য —এ কথা বলতে পারি না, কেননা অগ্নিসংযোগের মধ্যে বাধ্যকরণ-ক্ষমতা দেখতে পাই না। কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে অঙ্গসঞ্চালন হয়, আমার ইচ্ছাই অঙ্গসঞ্চালনের নিয়ন্তা, ইচ্ছার দরুণই অঙ্গসঞ্চালন হয়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ইচ্ছার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ বা বাধ্যকরণ-ক্ষমতা সাক্ষাৎ অনুভবে প্রত্যক্ষ করি ॥ এর উত্তরে হিউম্ বলেন ঃ আমার ইচ্ছার ফলে হস্ত উত্তোলন হয়েছে—এ জাতীয় বাক্যও আপতিক, বস্তুত-সত্য বাক্য। আমার ইচ্ছার ফলেই যে হাত উঠেছে, ইচ্ছা যে হস্ত-উত্তোলনের কারণ —এ জ্ঞানও অনুভব থেকেই পেয়েছি। কেবল ইচ্ছার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেই জানতে পারতাম না যে, ইচ্ছা অঙ্গসঞ্চালনের কারণ। বস্তুত আমরা লক্ষ করেছি যে ইচ্ছা করলে হস্ত পদ সঞ্চালন করা যায়। আমাদের যদি এ জাতীয় জ্ঞান না হত তাহলে বলতে পারতাম না যে ইচ্ছার ফলে অঙ্গসঞ্চালন হয়। ইচ্ছা ও অঙ্গসঞ্চালনের সতত-সংযোগ দেখেছি বলেই বলতে পারি এদের প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণ। শিশু মনে করতে পারে যে সবই তার ইচ্ছাধীন, কিন্তু সে বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে পরে বুঝতে পারে যে ইচ্ছা করলেই সে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে না। যথা, সে বুঝতে পারে যে, ইচ্ছা করলেও সে গরুর মত কান নাড়তে পারে না, এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঐ হাতের কনুই স্পর্শ করতে পারে না ॥ তাছাড়া, হিউম্ বলেন, ইচ্ছা ও ইচ্ছাপূর্তির মধ্যে যদি অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ থাকত তাহলে

ক ইচ্ছা করলে খ-কর্ম ঘটে

এ বাক্যের ব্যতিক্রম থাকতে পারত না। কিন্তু পক্ষাঘাত হলে কী হয়? হাত নাড়তে গিয়ে দেখলাম আমার হাত পক্ষাঘাতে পঙ্গু। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা (কারণ) হল, অথচ তথাকথিত অবশ্যম্ভব-কার্য (হস্তসঞ্চালন) ঘটল না।

সতত-সংযোগ তত্ত্বের সমালোচনা

বহু দার্শনিক হিউমের সতত-সংযোগ তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেন। এ তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে দৃষ্টিবাদী ভিন্ন প্রায় সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক একতাবদ্ধ হয়েছেন। সমালোচকরা এ তত্ত্বটিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে

করেন। মনে করেন যে এ তত্ত্ব সত্য হলে বাস্তব জীবন ও বিজ্ঞান অসম্ভব হয়ে পড়ত। এ তত্ত্ব মেনে নিতে বাধা কোথায়, দেখা যাক।

(1) সতত-সংযোগ তত্ত্ব মেনে নিলে কারণ-কার্যের সম্বন্ধ থেকে, চিহ্ন-চিহ্নিতের সম্বন্ধকে বা হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধকে পৃথক করা যায় না। যথা, বিশেষ প্রকারের জ্বর (কাঁপুনি-দিয়ে-আসা জ্বর) থেকে বোঝা যায় ম্যালেরিয়া হয়েছে, কিন্তু জ্বর ম্যালেরিয়ার কারণ নয়। অথচ জ্বর ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে সতত-সংযোগ দেখতে পাই। আর একটা উদাহরণ : উইপোকা দেখা দিলে বৃষ্টি হয়, কিন্তু উইর আবির্ভাব বৃষ্টির কারণ নয়। অথচ উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে সতত-সংযোগ দেখা যায়।

(2) আরও বহু ক্ষেত্রে ক ও খ-এর সতত সংযোগ দেখা যায়, অথচ এ কথা বলা যায় না যে ক খ-এর কারণ। মনে করা যাক, সব কারখানায় সকাল ছয়টায় সাইরেণ বাজে, এবং সাইরেণ বাজার অব্যবহিত পরে শ্রমিকরা কারখানায় যায়। এখন, কলকাতার কারখানায় সাইরেণ বাজলে তার অব্যবহিত পরে (কেবল কলকাতার শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে না,) বোম্বাইর কারখানার শ্রমিকরাও কাজে যোগ দেয়। তাহলে কি বলব কলকাতার কারখানায় সাইরেণ বাজা (ক) বোম্বাইর কারখানার শ্রমিকদের কাজে যোগদানের (খ-এর) কারণ ? না, তা বলা যায় না। অথচ এ ক্ষেত্রে ক ও খ-এর মধ্যে সতত সংযোগ দেখা যায়, দেখা যায়—ক সততই খ-এর পূর্বগামী। আর একটি দৃষ্টান্ত। রাম প্রত্যহ সকাল আটটায় পড়তে বসে এবং তার অবব্যহিত পরে ঐ মন্দিরে ঘণ্টা বাজে। একজন লক্ষ করলেন যে যখনই রাম পড়তে বসে (ক) তখনই ঐ মন্দিরে ঘণ্টা বাজে (খ)। সতত-সংযোগ তত্ত্বে বিশ্বাস করলে এ ব্যক্তি বলতেন যে ক খ-এর কারণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ক-ঘটনাটি কি খ-ঘটনার কারণ বলে গণ্য ?

(3) সতত-সংযোগ তত্ত্ব মেনে মিলে কোনো ঘটনার (খ-এর) যে-কোনো অব্যবহিত পূর্বগ ঘটনাকে ঐ ঘটনার (খ-এর) কারণ বলে গণ্য করতে হত। কিন্তু সকল সতত-পূর্বগ ঘটনা কারণ বলে গণ্য হতে পারে না ; এদের কতকগুলিকে আমরা অবান্তর, (ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায়—) অন্যথাসিদ্ধ, বলে মনে করি। যাকে প্রকৃত কারণ বলে মনে করা হয় তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যাপার জড়িত থাকে ; এগুলি কার্যের দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক বা অন্যথাসিদ্ধ। যথা মাটির বিশেষ কোনো রঙ থাকা ঘটের কারণ নয়, এটা ঘটের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অন্যথাসিদ্ধ। হিউমের সতত-সংযোগ তত্ত্ব গ্রহণ করলে এ জাতীয় সতত-পূর্বগ অন্যথাসিদ্ধকেও কারণ বলে গণ্য করতে হত।

(4) ইউয়িং বলেন : মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রে সতত-সংযোগ তত্ত্বটি খাটে না। যথা, আমি বিশেষ কোনো হেতুতে কোনো কিছু বিশ্বাস করি। এ ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাসটি ঐ হেতুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু, ঐ হেতু স্বীকার ও আমার বিশ্বাসটির মধ্যে কেবল সতত-সংযোগ আছে—এ কথা বলা যায় না। যদি

এদের মধ্যে কেবল সতত-সংযোগ থাকত তাহলে বলা যেত না যে ঐ হেতু-স্বীকারই এ বিশ্বাসটির নিয়ন্তা। আমরা বলি : ঐ বিশ্বাসটি যুক্তিসঙ্গত। এর অর্থ : কোনো হেতুর (যুক্তির) স্বীকৃতি (ক) আমার বিশ্বাসটির (খ-এর) নিয়ন্তা। ক ও খ-এর মধ্যে যদি কেবল বাস্তব বা আপতিক সম্বন্ধ থাকত তাহলে এ কথা সঙ্গতভাবে বলা যেত না যে বিশ্বাসটি যুক্তিনির্ভর বা যুক্তিসঙ্গত।

ইউয়িং আরও বলেন : আমার ইচ্ছার ফলে যে কার্য সম্পাদিত হয় (যথা হস্ত উত্তোলিত হয়) তা আমার ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তা কেবল সততই আমার ইচ্ছাকরণের পরে ঘটে —এ কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

ইউয়িং আরও মনে করেন : স্মৃতির ক্ষেত্রে সতত-সংযোগ তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না। আমার ঘ-এর স্মরণ হয়েছে —এ কথার অর্থ এই নয় : ঘ ঘটনা পূর্বে ঘটেছিল এবং ঘ-এর জ্ঞান হয়েছিল, এবং এখন আমার মনে ঐ ঘটনার প্রতিরূপের আবির্ভাব হয়েছে। এ কথার অর্থ : ঐ পূর্ববর্তী ঘটনা ঘ-এর জ্ঞান আমার বর্তমান মনশ্চিত্র বা প্রতিরূপকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে বলা যেত না ঘ-এর স্মরণ হয়েছে, বলা যেত না খ-এর পূর্ববর্তী-জ্ঞান ঘ-স্মরণের কারণ।

লক্ষণীয়, উক্ত যুক্তিগুলির প্রধান বক্তব্য : কারণ ও কার্যের মধ্যে নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিতের সম্বন্ধ আছে —এ কথা না মানলে কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ বলতে বুঝি এমন ঘটনা যা কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। আর ক যদি খ-কে নিয়ন্ত্রিত করে তাহলে ক ও খ-এর মধ্যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ থাকার দরকার। যদি ক ও খ-এর সম্বন্ধ আপাতিক হত, ক ও খ স্বতন্ত্র অনপেক্ষ হত, তাহলে বলা যেত না এদের মধ্যে কার্য-কারণের সম্বন্ধ আছে; বলা যেত না, ক খ-এর কারণ।

(5) দুটি বিশেষ, অসাধারণ বা অদ্বিতীয় ঘটনার একটি অপরটির কারণ বা কার্য হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্বন্ধ সতত-সংযোগ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ধরা যাক আমরা মনে করি : হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণ (ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (খ-এর) কারণ। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই নয় যে : ক সতত খ-এর অব্যবহিত পূর্বগ ঘটনা। এ কথা বলা অর্থহীন যে যখনই হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করে তখনই (সতত) বিশ্বযুদ্ধ হয়, কেননা ঐ আক্রমণের ঘটনা একবারমাত্র ঘটেছিল। তাহলে এখানে সতত-সংযোগ কোথায়? আর সতত-সংযোগ নেই বলে কি বলতে পারব না যে হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ? আর একটা উদাহরণ। আমরা জানি মহাত্মা গান্ধী নিহত হন গড্‌সের গুলিতে। গান্ধী একবারই নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীহত্যা ও গড্‌সের গুলি—এদের মধ্যে সতত-সংযোগ কোথায়?

(6) হিউম জানতেন, একবারমাত্র-ঘটা ঘটনা সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারে। এজন্য হিউম কেবল সতত সংযোগ দিয়ে কারণতা ব্যাখ্যা করেন নি, কারণতা

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিউম্ সাদৃশ্যের কথাও বলেছেন। কারণের লক্ষণ দিতে গিয়ে হিউম বলেছেন ঃ

যদি ক-ঘটনা খ-ঘটনার পূর্বে ঘটে এবং যদি ক-সদৃশ সকল ঘটনা খ-সদৃশ ঘটনার পূর্বে ঘটে তাহলে ক খ-এর কারণ।

অর্থাৎ দুটি ঘটনা ক ও খ-এর মধ্যে ক কারণ এবং খ কার্য বলে গণ্য হবে, যদি

1. ক-এর অব্যবহিত পরে খ ঘটে
2. সর্বদা ক-সদৃশ ঘটনার অব্যবহিত পরে খ-সদৃশ ঘটনা ঘটে।*

কিন্তু সাদৃশ্য দিয়ে কার্য কারণের লক্ষণ দিলেও দুটি অদ্বিতীয় ঘটনার কার্য কারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে যে আপত্তি উঠেছে তা খণ্ডিত হয় না। "সাদৃশ্য" কথাটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। সাদৃশ্য বলতে কি (i) পূর্ণ সাদৃশ্য বুঝব? সদৃশ হতে হলে কি সকল-দিক-থেকে-সদৃশ বা অভিন্ন হতে হবে? নাকি (ii) দুটি ঘটনার মধ্যে যে কোনো মাত্রার সাদৃশ্য থাকলেই চলবে?

(i) সাদৃশ্য বলতে যদি পূর্ণ সাদৃশ্য বা অভিন্নতা বোঝায় তাহলে সাদৃশ্য দিয়ে কার্য কারণের লক্ষণ দেওয়া যায় না। কেননা কোনো ঘটনা ঘ-এর সঙ্গে ঘ ভিন্ন অন্য কিছুর পূর্ণ সাদৃশ্য বা অভিন্নতা থাকতে পারে না।

(ii) সাদৃশ্যের মাত্রাভেদ মানলে, যদি

ক খ-এর কারণ

—এ বাক্য সত্য হয়, তাহলেও

ক-সদৃশ ঘটনার পরে সর্বদা খ-সদৃশ ঘটনা ঘটে

—এ বাক্য মিথ্যা হতে পারে। ধরা যাক, প্রায়-অভিন্ন পরিস্থিতিতে একই চিকিৎসক দুজন যমজ ভ্রাতার, রাম ও শ্যামের, হৃৎপিণ্ডে একই অস্ত্রোপচার করলেন। এ ক্ষেত্রে রামের উপর অস্ত্রোপচার ও শ্যামের উপর অস্ত্রোপচার সদৃশ ঘটনা। কিন্তু এমন হতে পারে যে প্রথম ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের ফলে রাম আরোগ্য লাভ করল, আর দ্বিতীয় (সদৃশ) ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের ফলে শ্যামের মৃত্যু হল। উপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যাবে, সাদৃশ্য দিয়ে কারণ বা কার্যের লক্ষণ দেওয়া যায় না। এবং ফলে অদ্বিতীয় ঘটনার কার্য কারণ সংক্রান্ত আপত্তিটি (পঞ্চম আপত্তি) খণ্ডন করা হল না।

(7) মনে হয়, সতত-সংযোগ ও সাদৃশ্য দিয়ে কার্য কারণের লক্ষণ দেওয়ার দুর্বলতা সম্বন্ধে হিউম্ অবহিত ছিলেন। কেননা

যদি ক ঘটনা খ ঘটনার পূর্বে ঘটে এবং ক-সদৃশ সকল ঘটনা খ-সদৃশ ঘটনার পূর্বে ঘটে তাহলে ক খ-এর কারণ (1)

—এ কথা বলেই (সাদৃশ্য দিয়ে কারণের লক্ষণ দিয়েই) এর অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে হিউম্ বলেছেন

---

* হিউমের যে উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অবশ্য "অব্যবহিত" কথাটি নেই। কিন্তু "পূর্বে ঘটে" (বা "পরে ঘটে") বলতে হিউম্ বোঝেন ঃ অব্যবহিত পূর্বে (বা পরে) ঘটে।

অর্থাৎ কিনা, প্রথম ঘটনাটি (ক) যদি না ঘটত তাহলে দ্বিতীয় ঘটনাটির (খ-এর) আবির্ভাব হতে পারত না। (2)

লক্ষণীয় যে (2)-সংখ্যক বাক্যটি আর (1)-সংখ্যক বাক্য সমার্থক নয়। এমনকি প্রথম বাক্য থেকে দ্বিতীয় বাক্যটি নিঃসৃতও হয় না। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে বাস্তব (আপতিক) সংযোগের কথা। আর দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে অন্য কোনো দৃঢ়তর সংযোগের কথা, বলা হয়েছে: যদি ক ঘটনা না ঘটত তাহলে খ ঘটতে পারত না। যা বস্তুত ঘটে নি তা ঘটলে কী হত —তাই বলা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যটিতে। কিন্তু শেষোক্ত উক্তিটি (2-সংখ্যক উক্তি) দৃষ্টিবাদবিরোধী। কী ঘটলে কী ঘটতে পারত, কোন্ ঘটনা না ঘটলে অন্য ঘটনা ঘটত না —তার আনুভবিক জ্ঞান হতে পারে না। কাজেই বলা যায়: এখানে হিউম্ অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ স্বীকার না করলেও অন্তত এ কথা স্বীকার করেছেন যে— কেবল সতত সংযোগ দিয়ে কার্য কারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা যায় না, এ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে হলে আপতিক সংযোগের চেয়ে দৃঢ়তর কোনো সংযোগ প্রয়োজন।

যেজন্য হিউম্ তাঁর নিজের-দেওয়া কারণ-লক্ষণ [(1)-সংখ্যক-বাক্যকথিত লক্ষণ] সংস্কার করতে চেয়েছিলেন ঠিক সে কারণেই হিউম্-অনুগামী মীল্ কারণের লক্ষণ দিতে গিয়ে "অনপেক্ষ" বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। মীলের মতে: ক-কে খ-এর কারণ হতে হলে ক ও খ-এর মধ্যে কেবল সতত সংযোগ থাকলেই চলবে না। অনপেক্ষ সংযোগও থাকা চাই।* "অনপেক্ষ সংযোগ থাকা চাই" অর্থ: সকল সম্ভাব্য ও কল্পনীয় অবস্থায় সংযুক্ত থাকা চাই। অর্থাৎ

ক খ-এর কারণ = ক ও খ-এর মধ্যে অনপেক্ষ ও সতত সংযোগ আছে
= এমন কোনো অবস্থা কল্পনা করা যায় না যে-অবস্থায় ক ঘটেছে কিন্তু খ ঘটেনি।

যথা, দিন ও রাত্রির মধ্যে সতত-সংযোগ (পূর্বগামিতা-অনুগামিতা) আছে। কিন্তু অনপেক্ষ সংযোগ নেই, কেননা আমরা এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি যে অবস্থায় দিন ও রাত্রির মধ্যে সতত-সংযোগ থাকবে না (যথা, পৃথিবীর আর্বতন থেমে গেলে)। কাজেই দিন রাত্রির কারণ বলে গণ্য নয়।

লক্ষণীয় যে, কার্য ও কারণের লক্ষণ দিতে গিয়ে "অনপেক্ষ" বিশেষণটি ব্যবহার করার ফলে দৃষ্টিবাদী মীল্‌কে একটি দৃষ্টিবাদবিরোধী উক্তি করতে হয়েছে; স্বীকার করতে হয়েছে যে, ক ও খ-এর মধ্যে কারণ-কার্য সম্বন্ধ থাকতে হলে সকল বাস্তব, সম্ভাব্য ও কল্পনীয় অবস্থায় এদের মধ্যে সংযোগ থাকতে হবে— সকল অবস্থায় খ-কে ক-এর অবব্যাহিত পরে ঘটতে হবে। কিন্তু দৃষ্টিবাদী বিশ্লেষণের দাবী হল: বস্তুত কী ঘটেছে অনুভবে কী পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কার্য কারণ ব্যাখ্যা করা যায়; কী ঘটতে পারে না বা পারত না, কী ঘটা সম্ভব বা অসম্ভব —এসব প্রশ্ন না তুলেই কার্য কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। উপরে যা বলা হল

*মীল্‌প্রদত্ত লক্ষণ: কারণ হল এমন ঘটনা যা নিয়ত ও অনপেক্ষভাবে অন্য ঘটনার (কার্যের, অবব্যাহিত পরবর্তী ঘটনার) দ্বারা অনুসৃত হয়।

তার থেকে বোঝা যায় দৃষ্টিবাদীরা কার্য-কারণ সম্বন্ধের যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। দেখা গেল, কেবল মাত্র সতত-সংযোগ দিয়ে কার্য কারণের ব্যাখ্যা হয় না।

4. প্রসক্তিতত্ত্ব[1]

কেউ কেউ মনে করেন যে কার্যকারণ সম্বন্ধ একটি অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ। এ প্রসঙ্গে ব্রড্, ব্লান্‌সারড্ ও ইউয়িং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা মনে করেন যে

যদি ক খ-এর কারণ হয়

তাহলে ঃ ক ঘটলে খ অবশ্যই ঘটবে অর্থাৎ
ক ঘটলে খ না ঘ'টে পারে না ;
ক-এর মধ্যে খ-এর হেতু নিহিত আছে, অর্থাৎ
কারণের মধ্যে কার্যের ব্যাখ্যা মেলে ; এবং
যুক্তিবিজ্ঞানে প্রসক্তি সম্বন্ধ বলতে যা বোঝায় তেমন কোনো
সম্বন্ধে কার্য ও কারণ সম্বন্ধযুক্ত।

প্রসক্তিবাদীরা দাবী করেন যে প্রসক্তিতত্ত্বের সঙ্গে কার্যকারণ-সম্পর্কে-লোকায়ত মত-এর সামঞ্জস্য আছে, দাবী করেন যে এ মত লোকায়ত মতেরই উন্নততর রূপ। ইউয়িং বলেন, লোকায়ত মতের বক্তব্য নিম্নোক্ত চারটি বাক্যে ব্যক্ত করা যায় ঃ

(1) কার্য কারণের কেবল সতত সহগামী (বা অনুগামী) ঘটনা নয়, কার্য কারণের উপর নির্ভরশীল, কার্য ও কারণের মধ্যে আন্তর সম্বন্ধ বর্তমান।

(2) কারণ কার্য উৎপন্ন করে, কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে ; কিন্তু কারণ কার্যের দ্বারা উৎপন্ন বা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

(3) কারণের মধ্যে কার্যের ব্যাখ্যা মেলে। কারণ অনুসন্ধান করা অর্থ হেতু অনুসন্ধান করা ; এবং কারণের মধ্যে কার্যের অন্তত আংশিক হেতু বর্তমান ॥

(4) কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হল অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ। কারণ ঘটলে—কার্য অবশ্যই ঘটে, না ঘ'টে পারে না, ঘটতে "বাধ্য" ॥

উপরোক্ত চারটি বাক্যে যে মত ব্যক্ত হয়েছে তা লোকায়ত মত কিনা তা বিতর্কের বিষয় (স্পষ্টতই, মনে হয়, এটা লোকায়ত মত নয়)। কিন্তু প্রসক্তিবাদীরা দাবী করেন যে এ মতই প্রসক্তিবাদের ভিত্তি। প্রসক্তিতত্ত্ব অনুসারে— কারণ ও কার্যের মধ্যে একটা অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ, স্বগত বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ, বর্তমান। এ কথার অর্থ হল এই ঃ যদি ক খ-এর কারণ হয় তাহলে ক খ-কে ঘটতে "বাধ্য" করে, ক ঘটলে খ না ঘটে পারে না। প্রসক্তিবাদীরা কারণতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "নিয়ন্ত্রণ"-এর কথা বলেন, বলেন ক যদি খ-এর কারণ হয় তাহলে বুঝতে হবে ক খ-কে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা স্বীকার করেন যে, কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ আর যুক্তিবিজ্ঞানে যাকে প্রসক্তির (বা প্রতিপত্তির) সম্বন্ধ বলা হয় (যথা, বৈধ অবরোহের হেতুবাক্য সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ) সে সম্বন্ধ ঠিক অভিন্ন নয়। কিন্তু তারা দাবী করেন ঃ তাহলেও কারণ-কার্যের সম্বন্ধ অনেকটা প্রসক্তির সম্বন্ধের মত, হেতুবাক্য সিদ্ধান্তের সম্বন্ধের মত।

---

1. Entailment Theory

হিউম্ বলেন ঃ "ক খ-এর কারণ" এ আকারের সত্য বাক্য পূর্বতসিদ্ধ, অবশ্যম্ভব বা বিশ্লেষক বাক্য নয়, পরতসাধ্য আপাতিক বাক্য ; কেননা, কারণ ও কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব আন্তর সম্বন্ধ নেই। এজন্যই "ক খ-এর কারণ" এরূপ বাক্যের বিরুদ্ধ বাক্য, "ক ঘটেছে কিন্তু খ ঘটে নি"—এরূপ বাক্য, স্ববিরোধী নয়। প্রসক্তিবাদীরা এর উত্তরে বলেন ঃ অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ ব্যক্ত হলেই যে, কোনো বাক্যকে পূর্বতসিদ্ধ বা বিশ্লেষক হতে হবে —এমন কথা মানা যায় না। তারা বলেন ঃ "ক খ-এর কারণ" এরূপ বাক্যে ক ও খ-এর মধ্যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় ; কিন্তু এরূপ বাক্য পূর্বতসিদ্ধ বা বিশ্লেষক নয়। প্রসক্তিবাদীরা আরও বলেন যে কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুভবগোচর নয়, ঠিক ; কিন্তু এ সম্বন্ধ বুদ্ধিগম্য।

প্রসক্তিবাদী ইউয়িং আলোচ্য তত্ত্বের সমর্থনে দুটি যুক্তি উল্লেখ করেছেন।

(1) আমরা কারণ থেকে কার্য অনুমান করি। কিন্তু কারণ ও কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ না থাকলে, কারণের প্রকৃতি থেকে কার্য নিঃসৃত না হলে, এরূপ অনুমান সম্ভব হত না। এ কথা ঠিক যে, অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ (প্রসক্তি সম্বন্ধ) এ সম্বন্ধ ঠিক তেমন নয়। কিন্তু কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি-সদৃশ কোনো সম্বন্ধ না থাকলে কারণ থেকে কার্য অনুমান করা যেত না।

এ যুক্তির উত্তরে সততসংযোগবাদীরা, সাধারণভাবে দৃষ্টিবাদীরা, বলবেন ঃ কারণ থেকে কার্য অনুমান করে যে সিদ্ধান্ত পাই তা সম্ভাব্য, নিশ্চিত নয় (বস্তুত কোনো আরোহী সিদ্ধান্তই নিশ্চিত নয়)। কারণ ও কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ নেই বলেই কারণিক যুক্তির সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভবভাবে নিঃসৃত হয় না।

(2) "ক খ-এর কারণ"—এ কথার অর্থ ঃ ক খ-এর হেতু, খ ঘটেছে কেননা ক ঘটেছে, ক-তে খ-এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় —জানা যায়, কেন খ ঘটল। কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ যদি কেবল বাস্তব সংযোগ হত তাহলে এ কথা বলা যেত না যে ঃ ক-হেতুতে খ ঘটেছে, বলা যেত না ঃ ক-তে খ-এর ব্যাখ্যা মেলে। খ যদি ক-এর প্রকৃতির মধ্যে নিহিত না থাকে, খ যদি ক-এর প্রকৃতি থেকে নিঃসৃত না হয়, তাহলে বলা যায় না, ক খ-এর হেতু বা কারণ। কাজেই ক-কে খ-এর কারণ বলার অর্থ হল ঃ ক ও খ-এর মধ্যে যৌক্তিক-প্রসক্তিসদৃশ কোনো অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ বর্তমান।

এর উত্তরে সততসংযোগবাদীরা বলবেন এ যুক্তিটিতে হেতু ও কারণের, "কেননা—" ও "—কারণ" এর পার্থক্য অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হল কালিক সম্বন্ধ। কিন্তু হেতু ও তার পরিণতির সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রসক্তির সম্বন্ধ, অকালিক সম্বন্ধ। যথা, আমরা বলি ঃ রাম স্বার্থপর, কেননা সব মানুষ স্বার্থপর ; বলা বাহুল্য এখানে "কেননা"র পরবর্তী অংশে হেতু উল্লেখ করা হয়েছে —কারণ উল্লেখ করা হয় নি।

প্রসক্তিতত্ত্বের সমালোচনা

প্রসক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয় তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত আপত্তি দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(1) সততসংযোগবাদীরা বলেন যে, কারণ ও কার্যের মধ্যে যে প্রসক্তিসদৃশ সম্বন্ধের কথা বলা হয় সে সম্বন্ধ বাস্তব অনুভবে ধরা দেয় না। যথা, জলপান ও তৃষ্ণা নিবারণের মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভবে পাওয়া যায় না, জলপান যে তৃষ্ণা নিবারণের "হেতু" —এ "সত্য" অনুভবগম্য নয়। জলের তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা না থেকে যদি দহন করার ক্ষমতা থাকত তাহলেও কোনো অসঙ্গতি হত না।

প্রসক্তিবাদীরা স্বীকার করেন বহির্জাগতিক ঘটনার মধ্যস্থিত প্রসক্তি সম্বন্ধ অনুভবগম্য নয়। কিন্তু, তারা বলেন, মনোগত ঘটনার মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান তা অনুভবে পাওয়া যায়। তারা আরো বলেন যে, কার্য কারণের মধ্যস্থিত অবশ্যম্ভব সম্বন্ধের অনুভব হয় না —এর থেকে এ সম্বন্ধের অভাব প্রমাণিত হয় না। তারা বলেন ঃ

কার্যকারণের মধ্যে যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ আছে তা প্রত্যক্ষে জানা যায় না, (1)

কার্যকারণের মধ্যে যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ নেই তা প্রত্যক্ষে জানা যায় (2)

এ উক্তি দুটির পার্থক্য অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। যদি দৃষ্টিবাদীরা দেখাতে পারতেন যে কার্যকারণের মধ্যে যে প্রসক্তি সম্বন্ধ নেই —এটা অনুভবলব্ধ সত্য, তাহলে প্রসক্তিবাদ খণ্ডিত হত। কিন্তু তারা এ দাবী করতে পারেন না যে— কার্যকারণের মধ্যে যে প্রসক্তি সম্বন্ধের অভাব আছে এটা অনুভবসিদ্ধ।

(2) যে (অবরোহ) যুক্তিতে হেতু ও সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ বর্তমান সে যুক্তির সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অবশ্যম্ভবভাবে নিঃসৃত হয়। কিন্তু কার্য-কারণ অনুমানে—কারণ থেকে কার্যের, বা কার্য থেকে কারণের, অনুমানে—সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভবভাবে নিঃসৃত হয় না। এ জাতীয় অনুমানে কেবল এ দাবীই করা যায় যে ঃ হেতুবাক্যটি সত্য, সুতরাং সিদ্ধান্তটি সম্ভবত সত্য।

প্রসক্তিবাদীরা এ আপত্তির উত্তরে বলেন ঃ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভবভাবে নিঃসৃত হয় —কার্যকারণ অনুমানে এ দাবী করা যায় না, ঠিক ; কিন্তু কেন করা যায় না তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ব্যাখ্যাটি এই ঃ সাধারণত সমগ্র-কারণ আমরা জানতে পারি না, যাকে সাধারণত কারণ বলে গ্রহণ করা হয় তা পরিপূর্ণ কারণ নয়, কারণাঙ্গমাত্র, আর যাকে কার্য বলে মনে করা যায় তাও সমগ্র কার্য নয়, কার্যাঙ্গ। এখন প্রসক্তি সম্বন্ধ খাটে সমগ্র কারণ ও সমগ্র কার্যের মধ্যে, কাজেই আংশিক কারণ ও আংশিক কার্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ লক্ষ করা যায় না। এবং যেহেতু সমগ্র কারণ ও সমগ্র কার্য সাধারণত আমাদের জানা থাকে না সেজন্য কার্যকারণ অনুমানের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত নয়॥

এর উত্তরে দৃষ্টিবাদীরা বলতে পারেন ঃ যদি আংশিক কারণ বা আংশিক কার্যই জানা যায় এবং প্রসক্তি সম্বন্ধ যদি কেবল পূর্ণ কারণ ও পূর্ণ কার্যের মধ্যেই খাটে, তাহলে আর প্রসক্তির কথা বলা কেন ?

প্রসক্তিবাদী ইউয়িং স্বীকার করেন, বহির্জগতের ঘটনার মধ্যে যে অবশ্যম্ভবতার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন আছে (অর্থাৎ প্রসক্তি আছে) তা অনুভবে পাওয়া যায় না। কিন্তু, তিনি বলেন : মনোজগতের ঘটনার মধ্যে যে এরূপ সম্বন্ধ আছে তা অন্তর্দৃষ্টিতে জানা যায়। যথা, প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে শোক হবে, প্রিয়বিয়োগে কেউ আনন্দে উৎফুল্ল হবে না, এ সত্য অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা দেয়, প্রিয়জনের মৃত্যু নামক ঘটনার কথা ভাবলে অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝতে পারি যে প্রিয়জনের মৃত্যুর সঙ্গে শোকের অবিচ্ছেদ্য (অবশ্যম্ভব) সম্বন্ধ আছে।

ওপরে সততসংযোগবাদী ও প্রসক্তিবাদীদের বিতর্কের যে সারাংশ দেওয়া হল তা নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে মনে হয় : হিউমের দাবী খণ্ডন করা হয় নি। এটা ঠিক যে সততসংযোগতত্ত্ব গ্রহণ করার অনেক অসুবিধা। বস্তুত ব্যবহারিক জীবনে আমরা কার্যকারণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করি, মনে করি যে, ক যদি খ-এর কারণ হয় তাহলে ক ঘটলে খ অবশ্যই ঘটবে। কারণ ও কার্যের মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র না থাকলে বস্তুত বাস্তব জগতে কারণিক একরূপতা দেখি কেন? কাজেই সততসংযোগতত্ত্ব গ্রহণ করতে আমাদের বাধে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে অনুভবে যা পাই তা হল কেবল সংযোগ। এমনকি ক ও খ-এর মধ্যে যে সতত-সংযোগ আছে তাও অনুভবে পাই না। তারপর, ক যে খ-এর কারণ ক-এর প্রকৃতি বিচার করে তা বোঝা যায় না। এমনকি, আমাদের ইচ্ছার ফলেই যে হস্তসঞ্চালন কার্যটি ঘটে—এ জ্ঞানও অভিজ্ঞতালব্ধ। তারপর, "ক খ-এর কারণ" এ আকারের বাক্য আপাতিক সত্য, অবশ্যম্ভব সত্য নয়—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ক ও খ-এর মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে, অথচ উক্ত আকারের বাক্য আপাতিক বাক্য (বা সংশ্লেষক বাক্য)—এ কেমন কথা? কাণ্ট্ অবশ্য বিশ্বাস করেন যে অবশ্যম্ভব বাক্য হলেই তা বিশ্লেষক হবে এমন কথা নেই।

সর্বশেষে, প্রসক্তিবাদীরা কারণিক প্রসক্তি সম্বন্ধ সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোকপাত করতে পারেন না। তারা বলেন, কারণ ও কার্যের মধ্যস্থিত সম্বন্ধ ঠিক যৌক্তিক প্রসক্তি সম্বন্ধ নয়, ঠিক; তবে কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক-প্রসক্তি সদৃশ কোনো একটি সম্বন্ধ বর্তমান। যৌক্তিক প্রসক্তির সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধের সাদৃশ্য আছে—কেবল একথা বললেই কারণিক প্রসক্তি ব্যাখ্যা করা হয় না। এখানেই প্রসক্তিবাদী তত্ত্বের প্রধান দুর্বলতা।

5. কাণ্ট্ ও কারণতা

হিউমের কারণতা বিশ্লেষণ দেখে কাণ্ট্ খুব বিচলিত হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে : এ বিশ্লেষণ মানা যায় না, অথচ হিউমকে খণ্ডন করাও খুব সহজ নয়। কাণ্ট্ হিউমের এ উক্তি মেনে নেন যে : কার্যকারণ সম্বন্ধ যৌক্তিক সম্বন্ধ নয়। হিউমের এ কথাও কাণ্ট্ মেনে নেন যে : "ক খ-এর কারণ" এ আকারের বাক্য বিশ্লেষক বাক্য নয়। আবার কাণ্ট্ এ হিউমীয় উক্তিও স্বীকার করেন,

যে : কারণতা বা কারণের অবশ্যম্ভতা কোনো বস্তুগত ধর্ম নয়, এটা একটা মানসিক আরোপ। কিন্তু হিউমের মতের প্রতিবাদ করে কাণ্ট্ বলেন : অবশ্যম্ভবতা বস্তুগত ধর্ম নয় ঠিক, কিন্তু কার্যকারণের মধ্যে এক প্রকারের অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ বর্তমান। কাণ্টের মতে—জ্ঞাত কার্যকারণের মধ্যে যে অবশ্যম্ভতা আছে বলে বিশ্বাস করি সে অবশ্যম্ভবতার উৎস হল আমাদের বুদ্ধি ; এ অবশ্যম্ভবতা বুদ্ধিদত্ত। আমাদের বুদ্ধির প্রকৃতি বস্তুত যেমন, বুদ্ধি বস্তুত তেমন বলেই আমরা কালিক ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি ; বুদ্ধির প্রকৃতি অন্যরূপ হলে এ সম্বন্ধের বোধ হত না। কাণ্টের মতে কার্য কারণ আমাদের বুদ্ধির প্রকার, পূর্বতসিদ্ধ প্রকার। সংবেদনে যা পাই তাতে এ প্রকার প্রয়োগ করা না হলে প্রাকৃত জ্ঞান হতে পারে না।

দৃষ্টিবাদীদের মতের প্রতিবাদ করে কাণ্ট্ বলেন : অনুভব থেকে কার্যকারণের বোধ হয় না, কার্যকারণ প্রকার পূর্বেই বুদ্ধিস্থ বলেই আনুভবিক জ্ঞান (প্রাকৃত জ্ঞান) সম্ভব হয়। আবার বুদ্ধিবাদীদের মতের প্রতিবাদ করে কাণ্ট্ বলেন : অনুভব না হলে, ক খ-এর কারণ—এ জ্ঞান হতে পারে না। ক-এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এ কথা জানা যায় না যে ক ঘটলে খ ঘটবে॥ প্রসঙ্গত, হিউমের মত খণ্ডন করে কাণ্ট্ বলেন : সব কার্যের কারণ আছে —এ বাক্য পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্য।

যেহেতু কার্য ও কারণ বুদ্ধির প্রকার, সেজন্য জ্ঞাত বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্বন্ধ খাটে। কিন্তু অনুভব-অতিবর্তী জগতে, স্বয়ংসৎ বস্তুর ক্ষেত্রে, এ সম্বন্ধ খাটে কিনা তা জানা যায় না। কেননা বৌদ্ধিক প্রকার (যথা, কার্য কারণ) প্রয়োগ ছাড়া প্রাকৃত জ্ঞান হয় না, এবং বৌদ্ধিক প্রকার থেকে আমাদের মুক্তি নেই। চশমার মত বৌদ্ধিক প্রকারগুলি খুলে নিয়ে দেখা যায় না— প্রকৃতই জগতটা কেমন। যেহেতু কার্য ও কারণ বুদ্ধিরই প্রকার সেজন্য জ্ঞাত, অনুভব-বুদ্ধি-লব্ধ, জগতেই কার্যকারণ সম্বন্ধ খাটে।

6. কারণতা ও অদ্বৈতবাদী ভাববাদ (বা ব্রহ্মবাদ)

ব্রহ্মবাদীরা মনে করেন যে, কোনো কালিক পদার্থই সৎ, প্রকৃত সৎ, পদার্থ বলে গণ্য হতে পারে না। কাজেই কালিক সম্বন্ধের, সুতরাং কার্যকারণ সম্বন্ধের, জ্ঞান প্রকৃত সত্ত্বের জ্ঞান নয়, আবভাসিক বোধ। অর্থাৎ ক খ-এর কারণ এরূপ বাক্যে যা ব্যক্ত হয় তা অনপেক্ষ সত্য নয়, বলা যায়— কেবল আংশিক সত্য। পারমার্থিক (প্রকৃত) সত্তা হল ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সব কিছু—অনুভবলব্ধ দ্রব্য, গুণ, কার্য কারণ —এ সবই অবভাস, "স্ববিরোধী অবভাস"। পারমার্থিক সত্ত্বের ক্ষেত্রে, কার্য কারণ —এসব ধারণা অপ্রযোজ্য। তারপর, কার্যকারণসূত্র— 'সব কার্যের কারণ আছে' —এ সূত্র অনপেক্ষ সত্য নয়। এজন্য ব্রহ্মের কারণ কী ? ব্রহ্মের কার্য কী ? —এসব প্রশ্ন অসঙ্গত।

ব্রহ্মবাদীদের মতে কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্ববিরোধী। তারা এর স্ববিরোধিতা দেখাতে গিয়ে যেসব যুক্তি ও "কূটাভাস"[1]-এর উল্লেখ করেন ব্রাড্‌লিকে অনুসরণ করে তার কয়েকটি ব্যাখ্যা করা হল।

কার্যকারণ সম্বন্ধ অনবস্থাদোষে দুষ্ট

ব্রহ্মবাদীদের মতে কারণ হল হেতু, "কারণ"-এর প্রকৃত সমার্থক হল "কেননা"। এবং আমরা কারণ অনুসন্ধান করি কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য, তার হেতু আবিষ্কারের জন্য। ধরা যাক, ছ একটি কার্য। ছ কেন ঘটে? উত্তরে বলা হল: কেননা চ। কিন্তু চ-এর কারণ কী? ধরা যাক, চ-এর কারণ ঘ। আবার প্রশ্ন উঠবে—ঘ ঘটে কেন, এর কারণ কী? সহজেই বোঝা যায় যে এভাবে অগ্রসর হলে অনবস্থা দোষ হয়, অর্থাৎ কখনও কোথাও থামা যাবে না (বলা যাবে না, এ ঘটনার কারণ বা হেতু নেই)। কাজেই কখনও কোনো ঘটনার, যথা আমাদের ছ-এর, পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

আবার, কোনো কালখণ্ডকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডে, কালকণাতে বা মুহূর্তে, ভাগ করা যায়। কাজেই ক—স*এর মধ্যবর্তী কালিক ব্যবধানকেও অসংখ্য কালখণ্ডে ভাগ করা যায়। গ্রীক্ দার্শনিক জিনো বলেন: ক থেকে স-এর মধ্যে যে ব্যবধান তা দুরতিক্রম্য। এ কথার অর্থ— ক ঘটনা ঘটলেও তার দরুণ স ঘটনা ঘটবে —এমন কথা বলা যায় না। তারপর, ক যদি ক হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে স ঘটবে কেন? কাজেই কল্পনা করতে হয়, ক ব-তে পরিবর্তিত হয়েছে বলে স ঘটতে পেরেছে। তাহলে এ কালিক ক্রমটি পাই: ক—ব, ব—স। আবার, ক ব-তে রূপান্তরিত হল কেন? কেননা, ধরা যাক, ক-এর ফলে ঘ ঘটেছে এবং ঘ-এর ফলে ব ঘটেছে। তাহলে ক—স ক্রমটি এ ভাবে ব্যক্ত করা যায়: ক—ঘ, ঘ—ব, ব—স। এভাবে দেখানো যায় ক থেকে স-তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ক ও স-এর মধ্যবর্তী ব্যবধান কেবল দুরতিক্রম্য নয়, অনতিক্রম্য। এ কথার অর্থ দাঁড়ায়— কোনো ঘটনা অন্য ঘটনার কার্য (বা কারণ) বলে গণ্য হতে পারে না।

কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ সম্পর্কে দুটি বিকল্প সম্ভব: (1) কারণ ও কার্যের মধ্যে কালিক ব্যবধান আছে, (2) কারণ ও কার্যের মধ্যে কালিক ব্যবধান নেই। ব্রহ্মবাদীরা দেখাতে চেষ্টা করেন, এ বিকল্প দুটির কোনোটি গ্রহণযোগ্য নয়, ফলে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্ববিরোধী অবভাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

(1) ধরা যাক, কার্য ও কারণের মধ্যে ব্যবধান আছে, এদের সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্ন নয়। কারণ ও কার্যের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয় যে: কারণ কার্যের পূর্বে ঘটে, এবং কার্য কারণের অব্যবহিত অনুবর্তী ঘটনা। এখন, কারণ ও কার্যের মধ্যে কোনো ব্যবধান—সে ব্যবধান যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন—না

1. paradox

* ক কারণ, স কার্য।

থাকলে বলা যায় না যে, কারণ কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা। তাহলে ক-কে খ-এর কারণ হতে হলে ক ও খ-এর মধ্যে একটা ব্যবধান বা ফাঁক থাকার দরকার। কিন্তু ক-কারণ ও খ-কার্যের মধ্যে কালিক ব্যবধান থাকলে ঐ ব্যবধানে কোনো প্রতিবন্ধক ঘটনা ঘটতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাহলে বলা যায় না যে ক-এর ফলে খ ঘটেছে। যথা, আমরা জানি আর্সেনিক খেলে মৃত্যু হয়, এখন কাউকে আর্সেনিক খাইয়ে যদি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে খুন করা হয় তাহলে বলা যাবে না যে আর্সেনিকই মৃত্যুর কারণ। এভাবে দেখানো যায় যে প্রত্যেকটি কারণিক নিয়মই অসত্য।

তাছাড়া, ক-কারণ ও খ-কার্যের-এর মধ্যে ফাঁক থাকতে হবে—এটা যদি কারণতার আবশ্যিক সর্ত হয় তাহলে বলা যায় না ঃ ক খ-এর কারণ ; বলতে হয় ঃ ক + ফাঁক হল খ-এর কারণ। এবং সেক্ষেত্রে বলা যায় না— ক খ-র অব্যবহিত পূর্ববর্তী। আর যদি বলা হয় "ক + ফাঁক"—এ ক্ষেত্রে ফাঁকটি ক-মুখী দিক থেকে ক-এর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত, এবং ক + চ (চ প্রথম ফাঁকটিকে বোঝাচ্ছে) হল খ-এর কারণ, তাহলে আবার প্রশ্ন উঠবে ঃ (ক + চ)-কে খ-এর পূর্ববর্তী হতে হলে (ক + চ) ও খ-এর মধ্যে একটা ব্যবধান থাকার দরকার। সে ক্ষেত্রে বলতে হবে ঃ ক + চ + ফাঁক হল খ-এর কারণ। বলা বাহুল্য এভাবে কারণের পূর্ববর্তিতা দেখাতে গেলে অনবস্থা দোষ হয়। সুতরাং কারণ ক ও কার্য খ-এর মধ্যে ব্যবধান আছে, এদের সম্বন্ধ নিরবিচ্ছিন্ন নয় —এ কথা মানা যায় না।

(2) আবার, ধরা যাক, কারণ ও কার্যের মধ্যে কালিক ব্যবধান নেই, এদের সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্ন। এদের মধ্যে কালিক ব্যবধান নেই —এ কথার অর্থ ঃ এদের মধ্যে পৌর্বাপর্য নেই, আছে যৌগপদ্য। আর ক ও খ-এর মধ্যে যদি যৌগপদ্য থাকে (এরা যদি একই কালে ঘটে) তাহলে এদের কোনো একটিকে অন্যটির কারণ (বা কার্য) বলতে বাধা থাকে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কারণের যে লক্ষণ দেন সে লক্ষণ অনুসারে কারণ ও কার্যের মধ্যে পৌর্বাপর্য থাকা চাই। আবার, একটি নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহের কতটুকু অংশকে কারণ ও কতটুকু অংশকে কার্য বলব ? কোথায় কারণের শেষ, কোথায়ই বা কার্যের আরম্ভ ? কার্যকারণ নিরবচ্ছিন্ন এ কথা মানলে, কার্য—কারণ কালখণ্ডের যেকোনো প্রান্তকে কারণ বা কার্য বলা যায়। দেখা গেল, কার্য ও কারণের মধ্যে ব্যবধান নেই—এ কথা মানা যায় না।

আমরা দেখলাম, ব্রহ্মবাদীদের মতে ঃ কারণ ও কার্যের মধ্যে কালিক ব্যবধান আছে বা এদের মধ্যে কালিক ব্যবধান নেই —এ বিকল্প দুটির কোনোটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ রকম যুক্তি প্রয়োগ করে ব্রহ্মবাদীরা বলেন ঃ কার্য-কারণের ধারণা স্ববিরোধী। এ সব ধারণা দিয়ে ব্যবহারিক জীবনে বা বিজ্ঞানে কাজ চলে ঠিক, কিন্তু পরম সত্ত্বের ক্ষেত্রে এ সব ধারণা অপ্রযোজ্য। এ সব ধারণা দিয়ে পরম সত্ত্বের প্রকৃতি বোঝা যায় না ॥

6. কারণতা ও নিয়ন্ত্রণবাদ

কারণতা-নিয়মের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রায়শঃই আলোচিত হয়ে থাকে। জগতের সব ঘটনারই যদি কোনো না কোনো, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, কারণ স্বীকার করি, প্রতিটি প্রাকৃতিক ব্যাপারই যদি পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে মানুষের ইচ্ছা বা সংকল্পও তৎপূর্ববর্তী কারণের দ্বারা উৎপন্ন হবে। এই কারণ যে সব সময়ে জানা থাকবে এমন কথা নেই; আর কারণ যদি না জানা থাকে তবে আমার মনে হতে পারে যে আমি আমার ইচ্ছাক্ষেত্রে কোনো কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নই—আমি স্বাধীন। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে হয়তো আমার ইচ্ছার কারণ আবিষ্কার করা যাবে। নিয়ন্ত্রণবাদ কেবল বলে যে, মানুষের ইচ্ছাও কোনো না কোনো কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; আর ঐ কারণকূটকে যদি পরিপূর্ণভাবে জানা যেত তাহলে কোনো বিশেষ মানুষের ভবিষ্যৎ ইচ্ছা বা কর্মপন্থা আগে থাকতেই বলে দেওয়া যেত। কোনো নিক্ষিপ্ত বস্তুর নিয়ম জানি বলে, কোন্ কোন্ কারণে (মাধ্যাকর্ষণ, বেগ, বস্তুর ভর) কামানের গোলার গতি নিয়ন্ত্রিত হয় জানি বলে, ঠিক কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে, কি ভাবে, কতদূরের লক্ষ্য ভেদ করা যাবে তা অভ্রান্তভাবে বলে দেওয়া যায়। ঠিক তেমনি মানুষের অকারণে কোনো ইচ্ছা হয় না। সচেতনভাবে সে যে সংকল্প গ্রহণ করে, যে আদর্শ অনুসরণ করে, তারও কারণ নির্দেশ করা যায়। ঐ কারণ ও তার সমস্ত খুঁটি-নাটি সর্তাদি জানতে পারলে মানুষের কর্মপন্থারও ভবিষ্যৎবাণী করা হয়তো অসম্ভব হবে না। এখন মানুষের ছোট-বড়, সাধারণ-অসাধারণ, সমস্ত কর্মেরই প্রতিটি খুঁটিনাটি সর্তের প্রতি আমরা সমানভাবে আগ্রহী নই বলে, আর অনেক সময়েই দৈনন্দিন সাধারণ কার্যাদির কারণ উপেক্ষা করি বলে, আবার কোনো কোনো সময়ে কারণ জানি না বলে, মনে হতে পারে যে আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্মধারা কোনো কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু একান্তই অকারণ, স্বাধীন কর্মধারা অসম্ভব। মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পকে সর্বগত কারণতা-নিয়মের ব্যতিক্রম বলা চলে না।

অদৃষ্টবাদ

মানুষের কর্মধারা সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণবাদের কথা উপরে বলা হল তা কিন্তু 'অদৃষ্টবাদ' নয়। প্রকৃত অদৃষ্টবাদ কখনই গ্রহণ করা চলে না। অদৃষ্টবাদও বলে যে সকল কর্ম বা ঘটনাই পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই মতের অতিরিক্ত কথা হল, কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যা ঘটবার তা ঘটবেই, তাকে মানুষের কর্মশক্তি কখনো বাধা দিতে পারবে না; আর যা না ঘটবার তা কখনো ঘটবে না, মানুষের ইচ্ছা তা ঘটাতেও পারবে না। অর্থাৎ 'অদৃষ্টবাদ' মানুষের ইচ্ছা বা সংকল্পকে ঘটনাচক্রের নিয়ন্ত্রণধারায় একান্ত ব্যর্থ ও নিষ্ফল বলতে চায়। ধরা যাক যে যুদ্ধকালে বোমারু বিমান কোনো সহরে বোমাবর্ষণ করছে।

অদৃষ্টবাদী হয়তো যুক্তি করতে পারেন, বোমার আঘাতে হয় মরব না হয় মরব না। অদৃষ্টে মরণ থাকলে কেউ ঠেকাতে পারবে না; তাই ভূগর্ভস্থ নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়েও লাভ নেই। আর অদৃষ্টে যদি মরণ না থাকে তবে আশ্রয় নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই কারণে মানুষের কোনো কাজই ঘটনাচক্রের নিয়ন্ত্রণে ফলপ্রদ নয়। এই অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, অনেক-সময়ে দেখা গেছে যে ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে থাকার জন্য মানুষের প্রাণরক্ষা হয়েছে। অবশ্য বোমাবর্ষণের সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়েও মানুষ প্রাণ হারিয়েছে আর কখনো বা ফাঁকা জায়গায় থেকেও বেঁচে গেছে। তবু ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা অনেক বেশী। মানুষ যদি বোমারু বিমান তৈরী না করত, উপর থেকে যদি সে বোমা বর্ষণ না করত, তা হলে আক্রান্ত মানুষ মরত না। তাই মানুষের কর্মধারাও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব জাগতিক ঘটনাচক্রের মধ্যে মানুষের ইচ্ছা বা সংকল্পের কোনো নিয়ন্ত্রণাধিকার নেই—'অদৃষ্টবাদের' এই কথা ঠিক নয়। হয়তো যত্ন নিয়ে পড়াশুনা করলেই ছাত্রটি প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারত; তাই সে যদি অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বসে থাকে, তাহলে তাকে "অলস ছাত্র" ছাড়া আর কি বলা যায়?

কিন্তু নিয়ন্ত্রণবাদ ঠিক অদৃষ্টবাদ নয়। নিয়ন্ত্রণবাদ শুধু বলে যে, মানুষের কর্মাদি যেহেতু জাগতিক ঘটনা সেহেতু তারা কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; একেবারে অকারণে ঘটতে পারে না। ইচ্ছার স্বাধীনতার অর্থ যদি এই হয় যে ঐ ইচ্ছা জাগে অকারণে, তা হলে তা অর্থহীন। কিন্তু এই মতে কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, কারণ ভিন্ন হলে মানুষের ইচ্ছাও ভিন্ন রূপ নিতে পারে। মানুষের ইচ্ছা, সংকল্প এমনকি সকল ঘটনাই আপতিক; কারণ অন্য রকমের হলে তারাও অন্য রকমের হতে পারত। জগতে কোথাও কোনো অবশ্যম্ভব, অনিবার্য ঘটনা নেই—মানুষের ইচ্ছারও কোনো অনিবার্যতা নেই। অদৃষ্টবাদ কিন্তু সব কিছুই অবশ্যম্ভব বা অনিবার্য বলতে চায়। এই মতে ঘটনাচক্র যা তাই; তার একচুলও এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই অদৃষ্ট-বাদ একান্তই ভ্রমাত্মক।

অনিয়ন্ত্রণবাদ

এই মতে জগতের সমস্ত কিছুই কারণের দ্বারা সাধিত বা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, কেননা তাহলে মানুষের ইচ্ছা বা কৃতির কোনো স্বাধীনতা থাকে না। সমগ্র ভৌতিক জগতে এমন কি জীব জগতেও কিছু না কিছু কারণের দ্বারা কার্যের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করলেও, দেকার্ত ও অন্যান্য দার্শনিকেরা আত্মার রাজত্বে ও তদগত ইচ্ছার রাজত্বে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় যে কি করব তা আগে থাকতে বলে দেওয়া যায় না। পূর্ববর্তী সমস্ত কারণ বা সর্তাদি হয়তো আমাকে ক-কর্ম করতে তাগিদ বা প্রেরণা দিচ্ছে

অথচ আমি খ-কর্ম করতে পারি। এখানেই আমার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। নৈতিক বিরোধিতা ও সংগ্রামস্থলে এই স্বাধীনতা উদ্দেশ্য নির্বাচন বা মনোনয়নের মধ্যে প্রকট হয়। একই সময়ে দুই বা ততোধিক বিরুদ্ধ কর্মপন্থা কৃতিমান পুরুষের সম্মুখে থাকতে পারে, আর এদের সবগুলিই একত্রে সাধিত হতে পারে না। এরূপ দুটি বিরোধী কর্মপন্থার মধ্যে একটিকে হয়তো কর্তা কর্তব্য বলে বোঝেন, কিন্তু অপরটির প্রতি হয়তো তার স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। চরিত্রানুযায়ী কর্তার তীব্র আকাঙ্খা তৎকালে দ্বিতীয়টির প্রতি থাকলেও, একথা বুঝতে কষ্ট নেই যে, কৃতিমান পুরুষ কর্তব্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে, দ্বিতীয় কর্মধারা অনুসরণ না করে প্রথমটির সাধন করতে প্রবৃত্ত হতে পারেন। এই কর্তব্যবোধে প্রেরিত হয়ে প্রথমটিকে মনোনীত করতে 'পারার' মধ্যে, তীব্রতম আকাঙ্খার প্রতিবাদ করার 'সামর্থ্যের' মধ্যে, অথবা দুই বিরুদ্ধ কর্মধারার মধ্যে নির্বাচন করতে 'সমর্থ হওয়ার' মধ্যে, আমার স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই রয়েছে বলে মনে হয়। কাণ্ট্‌ও বলেন যে 'কৃতিসাধ্যতা' বা 'সামর্থ্যের' মধ্যেই মানুষের স্বাধীনতা। আমি আমার শরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ নই ; ঐ কাজ আমার সাধ্যাতীত বলে ওখানে আমার স্বাধীনতা নেই। আবার কৃতকর্মের জন্য নৈতিক দায়িত্ব-বোধের মধ্যেও ইচ্ছার স্বাধীনতার স্ফুরণ দেখা যায়। কোনো ব্যক্তি যদি জোর করে, প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে, আমাকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করে, তাহলে সেই কাজের জন্য আমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব থাকতে পারে না। অর্থাৎ যে কাজ আমার সাধ্যের মধ্যে, যে কাজ আমি নিজে, স্বেচ্ছায় করেছি, অথচ না করলেও পারতাম, তার প্রতিই কেবল আমার নৈতিক দায়িত্ব থাকে, কারণ এখানেই আমার স্বাধীনতা।

কৃতিসাধ্যতা বা সামর্থ্য স্বীকার না করলে কোনো কর্ম সম্পর্কে উচিতার্থক বা অনুচিতার্থক নৈতিক বিধি অর্থহীন হয়ে পড়ে। 'ক-কর্ম তোমার করা উচিৎ, খ-কর্ম অনুচিত' এই রকম নৈতিক বিধি বা অনুজ্ঞা তখনই সম্ভব হয়, যখন 'ক' বা 'খ' কর্ম করতে তুমি 'সমর্থ'। তোমার সাধ্যাতীত কর্ম সম্পর্কে নৈতিক বিধি অর্থহীন, যথা—'তোমার শরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি করা উচিত বা অনুচিত !! তাই কৃতিসাধ্যতা, সামর্থ্য বা ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার না করলে নৈতিক বিধি সম্ভব নয়। কাণ্ট্‌ বলেছেন "ক-কর্ম করা তোমার উচিত" মানেই হল "ক-কর্ম করা তোমার সাধ্য"।

সমালোচনা

কিন্তু নিয়ন্ত্রণবাদী বলতে পারেন যে কোনো বিশেষ স্থলে কোনো ঘটনার কারণ হয়তো আমরা নির্ণয় করতে পারি না ; কিন্তু তাই বলে, কারণ ছাড়াই কোনো কার্য হতে পারে, এমন মানা যায় না। কোনো ঘটনার কারণ 'থাকা—না থাকা' অধিবিদ্যাগত সমস্যা ; কোনো ঘটনার কারণ 'জানা—না জানা' জ্ঞানবিদ্যাগত সমস্যা। প্রথমটির সম্পর্কে "সকল ঘটনারই কারণ থাকবে"

এটা আমাদের প্রত্যক্ষপূর্ব নিশ্চয়। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে কোনো কারণকে নাও জানতে পারি। কারণকে না জানার অর্থ এই নয় যে ঘটনাটি কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে জানা। 'অনিয়ন্ত্রণবাদ' যদি সর্বগ্রাসী কারণতা নিয়মের বিরোধী হয় তা হলে তা অর্থহীন।

ইচ্ছার বিশেষ ক্ষেত্রে যদি অনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতে হয় তাহলে অন্য ভৌতিক ক্ষেত্রেই বা কারণের অস্তিত্ব মানবো কেন? অথচ অলৌকিক কোনো ঘটনাকেও আমরা অকারণ বলি না—হয় অতিপ্রাকৃত, না হয় অজ্ঞাত কারণসম্ভূত বলে মনে করি। মনে কর যে তোমার বন্ধু গাড়ী চালাতে চালাতে হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। তুমি অবাক হয়ে লক্ষ করলে যে তোমার বন্ধু একটুও বিচলিত না হয়ে গাড়ীতে ঠায় বসে রইল; ইঞ্জিনের ঢাকা খুলে যন্ত্রপাতির মধ্যে, গাড়ী বন্ধ হবার কারণ অনুসন্ধান করল না বা অন্য কোনো যন্ত্রবিদকে আনাবার চেষ্টা করল না অথবা তেল ফুরিয়েছে কিনা তাও দেখল না। তুমি হতচকিত হয়ে তোমার বন্ধুর নিশ্চেষ্টতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে, তোমার বন্ধু গাড়ী বন্ধ হয়েছে স্বীকার করল ঠিকই, কিন্তু বলল যে, কোনো কারণে গাড়ী বন্ধ হয় নি! তুমি ভদ্রতা করে হয়তো বললে "তা ভাই, তুমি হয়তো কারণটা জান না"। কিন্তু তোমার বন্ধু উত্তরে বলল, "জানা না জানার প্রশ্ন নেই; গাড়ী অকারণে বন্ধ হয়েছে"। এবারে তুমি অবশ্যই বুঝবে যে, তোমার বন্ধুর বাক্য এবং বিশ্বাস তত্ত্বগতভাবে অর্থহীন।

এখন ভৌতিক জগতে কারণের দ্বারা কার্যের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেও, যদি মানুষের ইচ্ছা ও নির্বাচনের বিশেষ ক্ষেত্রে 'অনিয়ন্ত্রণবাদ' স্বীকার করি, তাহলে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। যদি তোমার কোনো কর্ম একেবারে অকারণ হয়, তাহলে তা তোমার চরিত্র বা তোমার ব্যক্তিত্ব দিয়েও নিয়ন্ত্রিত হবে না। এখন তোমার চরিত্র বা অর্জিত অভ্যাসগুলি যদি তোমার কর্ম বা উদ্দেশ্য মনোনয়নের কারণ না হয়, তোমার ইচ্ছা বা সঙ্কল্পও যদি তোমার কর্মের পূর্ববর্তী সর্ত না হয়, তাহলে ঐ কর্ম যে কিভাবে "স্বেচ্ছাকৃত" হয় তা বোঝা যায় না। কোনো বিশেষ অর্থে তুমি যদি তোমার কর্মের কারণ না হও, তা হলে ঐ কর্ম তোমার দ্বারা সাধিত নয়; এবং ঐ অকারণ, ভুঁইফোড় কর্মের জন্য তোমার কিছুমাত্র নৈতিক দায়িত্ব থাকতে পারে না। এই মতে, আমি যদি কোন গর্হিত কাজ করি তা হলে আমি কেন নিন্দার্হ হব? সুতরাং নিয়ন্ত্রণবাদই, অর্থাৎ স্বনিয়ন্ত্রণ, নৈতিক দায়িত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে, অনিয়ন্ত্রণবাদ নয়। আমরা দেখেছি যে নৈতিক দায়িত্বের জন্যই ইচ্ছার প্রকৃত স্বাধীনতার প্রয়োজন। পূর্ববর্তী ইচ্ছা, চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের দ্বারা কর্মের নিয়ন্ত্রণ, সেই প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধী হয় না।

'নিয়ন্ত্রণ' কথাটির মধ্যে একটু বাধ্য-বাধকতার ভাব আছে বলে স্বাধীনতাকামী দার্শনিক ঐ কথাটি পরিহার করতে চান। "তোমার সমস্ত কর্মেরই 'কারণ' আছে" বললে যতটা আপত্তি উঠবে, তার থেকে তীব্রতর আপত্তি হবে যদি

বলি "তোমার সমস্ত কর্মই 'নিয়ন্ত্রিত'।" এই দ্বিতীয় বাক্যের 'নিয়ন্ত্রণ' কথাটিতে যেন এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমাদের কর্মধারার মধ্যে আমাদের নিজেদের কিছু করণীয় নেই ; আমরা চাই বা না চাই, কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হবেই। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে এই মিথ্যা 'অদৃষ্টবাদই' নিয়ন্ত্রণবাদ নয়। নিয়ন্ত্রণবাদ কেবল বলে যে, সকল ঘটনার মতো আমাদের কর্মগুলিরও পূর্ববর্তী কারণ রয়েছে। কিন্তু কার্যকারণের মধ্যে বলপ্রয়োগ, বাধ্য-বাধকতার ভাব থাকে না ; এমন বলা যায় না যে "অগ্নি 'বলপ্রয়োগ করে' দাহ উৎপন্ন করে", "কুঁড়ি 'সবলে' ফুল ফোটায়" !! কার্যকারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যায় কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কার্য নিয়তই কারণের পরে ঘটে (অগ্নিসংযোগের পরে দাহ), এবং কারণের সাহায্যে কার্যের ব্যাখ্যা হয় মাত্র। কারণ কার্যে প্রসক্ত বলে ঘটনার কারণ জানতে পারলে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্ত হয়। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ, বাধ্যবাধকতা অর্থবান হয়। অত্যাচারী একনায়কতন্ত্র সাধারণ মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করতে পারে এবং ক্রীতদাসের কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমার নিজের সংকল্প বা ইচ্ছা আমার কর্মের কারণ হলে, উপরোক্ত অর্থে কোনো বলপ্রয়োগ থাকে না এবং কর্মের স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ কারণের দ্বারা 'নিয়ন্ত্রিত' হওয়ার অর্থ এই নয় যে বলপ্রয়োগের দ্বারা বাধ্য হওয়া। একমাত্র বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা যদি আমার কর্ম সর্বদা চালিত হয় তবেই আমার স্বাধীনতা ব্যাহত হয় ; যথা ক্রীতদাসের কাজ প্রভুর অনুজ্ঞায় চালিত হয়। অতএব কেবল নিয়ন্ত্রণবাদ স্বাধীনতার বিরোধী নয়। "আমিই আমার কর্মের কারণ" আর "আমার কর্ম আমার দ্বারা কৃত বা উৎপন্ন হয়" এই দুই বাক্যের পার্থক্য নেই—প্রথম বাক্য স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক, দ্বিতীয় বাক্য নিয়ন্ত্রণের। অতএব কর্মের স্বাধীনতার অর্থ হল এই যে, আমার কর্ম-সাধনায় বাইরের কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না। এই নৈতিমূলক অর্থ ছাড়াও ইতিমূলক অর্থ হলো কতকগুলি কাজ করার 'ক্ষমতা' বা 'সামর্থ্য' আমার থাকে। আমার গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করার ক্ষমতা হয়তো আমার নেই ; কিন্তু আমার মনোনীত কর্ম করার ক্ষমতা আমার অবশ্যই রয়েছে। এখন তুমি যদি তোমার কর্মের কারণ হও, তা হলে বাইরের প্রতিবন্ধক থাকবে না। তাই কারণতা নীতি বা নিয়ন্ত্রণবাদ স্বাধীনতার পরিপন্থী হয় না।

এখন আমার কোনো বিশেষ সংকল্প যদি আমার বিশিষ্ট কর্মের কারণ হয় তাহলে সর্বগত কারণতা নীতি অনুযায়ী আমার সংকল্পেরও কারণ থাকতে হবে। আমার অভিলাষই আমার সংকল্পের কারণ হলে হয়তো আমার স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয় না। কিন্তু আমার ইচ্ছা বা অভিলাষও তো আমার চরিত্র, অর্জিত অভ্যাসাদির উপর নির্ভর করবে। আমার চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব আবার আমার বংশগতি ও পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বংশগতি ও পরিবেশের উপরে আমার নিজের কোনো প্রভাব না থাকায়, শেষ পর্যন্ত আমার মনোনয়ন ও কর্মপন্থা-নির্বাচন বাইরের প্রভাবেই পরিচালিত বলা চলে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা যে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন এ কথা বলতে না পারলেও আমরা এক প্রকার সীমিত স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে পারি। আত্মসংযমের দ্বারা, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আমাদের তীব্রতম আকাঙ্খাকেও ক্বচিৎ কখনো জয় করা সম্ভব। বহুদিনের ধূমপানের অভ্যাসের দাসত্বকেও মানুষ ছেড়ে দিতে পারে। যুদ্ধের সময়ে দেখা গেছে যে, শত্রুর হাতে বন্দী শহীদেরা, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করে সঙ্গীদের আস্তানা বলে দেয় নি। এই আত্মসংযম কারুর হয়তো বেশী কারুর হয়তো কম; কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের স্বাধীনতা নেই এমন বলা যাবে না।

অনিয়ন্ত্রণ বনাম স্বনিয়ন্ত্রণ

মানুষ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীব ও তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কখনও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। বাইরের শক্তি, প্রতিবন্ধক ইত্যাদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে পরিচালিত করলেও, অন্যক্ষেত্রে সে নিজেই নিজের কর্মকে প্রভাবিত করতে পারে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে স্বাধীনতাতত্ত্ব বা সর্বগত কারণতত্ত্বের কোনোটারই বিরোধ নেই। মানুষের কর্মক্ষেত্রে স্বনিয়ন্ত্রণবাদ, তাই একদিকে অহেতুক অনিয়ন্ত্রণবাদ ও অন্যদিকে বহিঃশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণবাদের সমন্বয় সাধন করতে পারে। অতএব স্বনিয়ন্ত্রণ-বাদই যুক্তিযুক্ত মত বলে মনে হয়। আধুনিক 'অস্তিবাদ' মানুষের কর্মের স্বাধীনতাকে চরমতম গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঐ স্বাতন্ত্র্যকে অযৌক্তিক ও একান্ত অ-নিয়ন্ত্রিত বলতে চেয়েছে। (শেষ অধ্যায় দেখ)। 'অদৃষ্টবাদ' আবার মানুষকে একান্তই পরবশ বলতে চেয়েছে। এই উভয় মতই একদেশদর্শী বলে মনে হয়। কোনো কোনো তত্ত্ববিদ্যার অদ্বৈতবাদও সমগ্র বিশ্বসংসারকে এক, অভিন্ন পরমতত্ত্বের অনিবার্য ফলস্বরূপ 'অবভাস' বলে বর্ণনা করাতে, সেই মতে জগতের কোথাও কোনো স্বাধীনতার নামগন্ধও থাকে না; যা কিছু হয়েছে বা হচ্ছে তা ঐ পরমতত্ত্বেরই অপরিবর্তনীয়, অনিবার্য ফলমাত্র। অদ্বৈতবাদের আলোচনায়, পরে দেখা যাবে যে, এইরূপ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবাদ এক অতিশয়োক্তি মাত্র।

অষ্টম অধ্যায়

দৃষ্টিবাদ, বুদ্ধিবাদ, বিচারবাদ ও স্বজ্ঞাবাদ

১. ভূমিকা ঃ দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদ

জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আমরা মুখ্যত দুটি বিবদমান মতবাদের সাক্ষাৎ পাই ঃ বাচনিক দৃষ্টিবাদ ও বাচনিক বুদ্ধিবাদ* (সংক্ষেপে, দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদ)। দৃষ্টিবাদের প্রধান পূর্বপক্ষ হল বুদ্ধিবাদ আর বুদ্ধিবাদের প্রধান পূর্বপক্ষ দৃষ্টিবাদ। এ মতবাদ দুটির একটি অন্যটিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করে, আর একটি যা খণ্ডন করার চেষ্টা করে অন্যটি ঠিক তাই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

দৃষ্টিবাদ ঃ এ সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য।। দৃষ্টিবাদের মূল বক্তব্য হল ঃ সমস্ত জ্ঞানের, অন্তত বাস্তব জগৎ সংক্রান্ত জ্ঞানের, একমাত্র উৎস হল অনুভব। এবং দৃষ্টিবাদীরা অনুভব বলতে বোঝেন ইন্দ্রিয়ানুভব বা প্রত্যক্ষ। বুদ্ধিবাদীরা এ মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেন; তাঁদের মতে ঃ সকল জ্ঞান অনুভবলব্ধ বা অনুভবলভ্য—এ কথা মানা যায় না। এ কথা মানলে সার্বিক ও অবশ্যম্ভব জ্ঞান অসম্ভব হয় পড়ে, যথা সে ক্ষেত্রে বলা যায় না যে—

আমরা জানি ঃ সব মানুষ মরণশীল

আমরা জানি ঃ প্রত্যেক কার্যের অবশ্যই একটা কারণ থাকবে।

কেননা (প্রথম দৃষ্টান্তে) অনুভবের সাহায্যে রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতির মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু এ জ্ঞান হতে পারে না যে—সব মানুষ মরণশীল। ব্যক্তিবিষয়ক বাক্যে বা আংশিক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় তা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যেতে পারে, যথা অনুভবে জানা যেতে পারে

রাম ছয় ফুট লম্বা, কতক ফুল লাল;

কিন্তু অনুভবের সাহায্যে সার্বিক জ্ঞান—অর্থাৎ সার্বিক বাক্যে যে-জ্ঞানের দাবী করা হয় সে জ্ঞান—লাভ করা যায় না। অর্থাৎ সব জ্ঞান যদি অনুভবলভ্য হত তাহলে কোনো সার্বিক বাক্য ব (যথা, সব মানুষ মরণশীল) সম্বন্ধে

* Propositional Empiricism ও Propositional Rationalism

বলা বাহুল্য, যে-সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা বাচনিক দৃষ্টিবাদ গ্রহণ করেন তাঁরা ধারণাবিষয়ক দৃষ্টিবাদও গ্রহণ করেন, আর যাঁরা বাচনিক বুদ্ধিবাদ সমর্থন করেন তাঁরা ধারণাবিষয়ক বুদ্ধিবাদও সমর্থন করেন। উক্ত মতবাদ দুটির প্রত্যেকটির উপর গুরুত্ব দেবার জন্য দৃষ্টিবাদের দুটি রূপ ও বুদ্ধিবাদের দুটি রূপ পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হল। এ অধ্যায়ে "দৃষ্টিবাদ" বলতে এর বাচনিক রূপ, আর "বুদ্ধিবাদ" বলতে বাচনিক বুদ্ধিবাদ বুঝতে হবে।

বলতে পারতাম না যে ঃ আমরা জানি যে ব। আবার ভ যদি অবশ্যম্ভব বাক্য হয় (যথা, প্রত্যেক কার্যের কোনো না কোনো কারণ আছে) তাহলেও বলা যেত না যে ঃ আমরা জানি যে ভ। কেননা, অবশ্যম্ভবতার জ্ঞান—কোনো ব্যাপার যে অন্যরূপ হতে পারত না, যথা শ্বেত পুষ্পটি যে অশ্বেত বর্ণের হতে পারত না, এ জ্ঞান— অনুভবে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুদ্ধিবাদীরা এ সিদ্ধান্তে আসেন ঃ এ কথা স্বীকার করা যায় না যে— সব জ্ঞান অনুভবগম্য।

বুদ্ধিবাদ ঃ এ সম্বন্ধে দৃষ্টিবাদীদের বক্তব্য ॥ বুদ্ধিবাদীরা বলেন ঃ সব জ্ঞান, অন্তত সার্বিক ও অবশ্যম্ভব সত্যের জ্ঞান, বুদ্ধিগম্য। যথা, বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যেই গাণিতিক সত্যের ও অপরাপর অবশ্যম্ভব সত্যের জ্ঞান হয়। যেমন, কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যেই জানা যায় যে—

$2+2=4$

সব লাল ফুল হল লাল

এ পুষ্পটি শ্বেত বর্ণের অথবা অশ্বেত বর্ণের

ত্রিভুজ মাত্রই তিনবাহুবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র

যদি রাম কনিষ্ঠ পুত্র হয় তাহলে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছে বা ছিল ॥

কোনো কোনো বুদ্ধিবাদী "জ্ঞান" কথাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন; তাঁরা "প্রকৃত জ্ঞান"-এর কথা বলেন। তাঁরা বলেন, কোনো বাক্য ব সুনিশ্চিত বা নিঃসন্দিগ্ধ না হলে বলা যাবে না যে—ক জানে যে ব। এখন, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ (যথা, এ ফুলটা লাল —এ জ্ঞান) তা নিঃসন্দিগ্ধ বা ভ্রান্তিসম্ভাবনারহিত নয়। কাজেই বুদ্ধিবাদীদের মতে এরূপ "জ্ঞান" প্রকৃত জ্ঞান নয়। "প্রকৃত জ্ঞান" হল নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান, এবং এরূপ জ্ঞান কেবল বুদ্ধিগম্য।

দৃষ্টিবাদীরা উক্ত মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেন; তাঁদের কেউ কেউ বলেন ঃ বুদ্ধিবাদীরা প্রকৃত জ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে যে সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন সে সব জ্ঞানও অনুভবগম্য, যথা অনুভবেই জানা যায় যে $2+2=4$। এ জাতীয় জ্ঞান ব্যাখ্যা করার জন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা বলে কোনো স্বতন্ত্র জ্ঞান-উৎস মানবার দরকার নেই (পরে দেখব, এটা যুক্তিবিজ্ঞানী মীল্-এর মত)। অন্য এক গোষ্ঠীর দৃষ্টিবাদী (হিউম্ ও হিউম্-অনুগামীরা) বলেন ঃ জ্ঞান বলতে যদি বাস্তব জগতের জ্ঞান বুঝি তাহলে বলা যায়— বুদ্ধিবাদীরা যে সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন সে সব জ্ঞানের দৃষ্টান্তই নয়। যথা,

সব লাল ফুল হল লাল

—এ বাক্যে কোনো বাস্তব ব্যাপার, জাগতিক ব্যাপার, ব্যক্ত হয় নি; এতে কোনো ফুল সম্বন্ধেই উক্তি করা হয় নি। এটি একটি বিশ্লেষক বাক্য— এতে কেবল "লাল ফুল" কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কাজেই এ জাতীয় বাক্যে প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয় না। এরা "বন্ধ্যা" বাক্য। এ জাতীয় বাক্যে

যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় সে জ্ঞান হল ভাষাসংক্রান্ত জ্ঞান, জাগতিক ব্যাপার সংক্রান্ত নয়[1]।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টিবাদীরা বলবেনঃ জাগতিক বিষয়ের জ্ঞানের, কেবল-ভাষাবিষয়ক-নয়-এমন জ্ঞানের, একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে জগৎ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না॥ এ শ্রেণীর দৃষ্টিবাদীরা বলেন—

আমরা বলিঃ অন্য বিষয় সম্বন্ধে, যেমন যুক্তিবৈজ্ঞানিক সূত্র বা গাণিতিক সূত্র সম্বন্ধে, যা-ই বল না কেন, বাস্তব-ব্যাপার-সংক্রান্ত জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। অর্থাৎ কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে বা ছিল, কোনো ঘটনা ঘটেছে বা ঘটেছিল, কোনো পরিস্থিতি বর্তমান, বাস্তব ব্যাপারটি বস্তুত অমুক রকম —এ জাতীয় জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। অনুভব ভিন্ন কখনই এ আকারের জ্ঞান হতে পারে না॥

সংশয়বাদঃ দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদের ঐকমত্য॥ এতক্ষণ দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদের বিরোধের কথা বলা হল। কিন্তু একটি বিষয়ে এ বিবদমান সম্প্রদায় দুটির মধ্যে সাদৃশ্য ও ঐকমত্য আছে। দুটি মতবাদেরই একটি পূর্বপক্ষ হল (চরম) সংশয়বাদ, উভয়ই সংশয়বাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করে। সংশয়বাদ[2] জ্ঞানের সম্ভাবনাই অস্বীকার করে; এ মতে কোনো কিছুই নিশ্চিত নিঃসন্দিগ্ধ নয়, কাজেই কোনো বিষয়েই জ্ঞান হতে পারে না। সংশয়-বাদীরা বলেন যে, ব যদি নিঃসন্দিগ্ধ না হয় তাহলে বলা যায় না যেঃ আমি জানি যে ব, এবং কোনো বাক্যই নিঃসন্দিগ্ধ নয়; সুতরাং জ্ঞান অসম্ভব।

দৃষ্টিবাদী ও বুদ্ধিবাদী এ দু শ্রেণীর দার্শনিকরাই মনে করেন যে জ্ঞান সম্ভব। বুদ্ধিবাদীরা বলেন, "জানা" কথাটি যদি এমন সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে ব সন্দেহাতীত না হলে বলা যায় না যে—আমি জানি যে ব, তাহলেও জ্ঞান সম্ভব। এদের মতে গাণিতিক ও যৌক্তিক বাক্য সন্দেহাতীত ও ভ্রান্তিসম্ভাবনারহিত। কাজেই এ জাতীয় বাক্যের বেলায় বলা যায়—আমি জানি যে———।

দৃষ্টিবাদীরা এ কথা মানবেন না যেঃ ব সুনিশ্চিতভাবে সত্য না হলে বলা যাবে না যে— আমরা জানি যে ব। যদি এমন হয় যে, এটা সত্য হওয়া খুবই সম্ভব যে ব (যথা, সব মানুষ মরণশীল) তাহলেও বলা যায়ঃ আমরা জানি যে ব। কিন্তু "জানা" কথাটির সংজ্ঞা যদি এমনভাবে দেওয়া হয় যে, ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য হলে তবেই বলা যাবে "আমি জানি যে ব" তাহলেও, দৃষ্টিবাদীদের অনেকের মতে, জ্ঞান সম্ভব। এ'রা বলেন, কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবেও সুনিশ্চিত বা অসংশোধনীয়[3] সত্য পাওয়া যায়।

---

1. ভাষাও জাগতিক বা বাস্তব ব্যাপার, এ কথা ঠিক। তবে এখানে জাগতিক বা বাস্তব ব্যাপার বলতে বুঝতে হবে ভাষাবিষয়ক-নয়-এমন ব্যাপার।
2. "সংশয়বাদ" ("scepticism") বলতে এ বিভাগে চরম সংশয়বাদ বুঝতে হবে।
3. অর্থাৎ ভ্রান্তিসম্ভবনারহিত। ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই বলে বা সুনিশ্চিত বলেই সংশোধনের কথাও ওঠে না। অসংশোধনীয়=incorrigible=যাকে সংশোধন করার কথা ওঠে না।

এবার আমরা আরও বিশদভাবে দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদ আলোচনা করব।

2. দৃষ্টিবাদ

বুদ্ধিবাদীরা বলেন, কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞান হতে পারে না। দৃষ্টিবাদ হল এ মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডন-প্রচেষ্টা। এটা দৃষ্টিবাদের নেতিবাচক দিক। দৃষ্টিবাদীদের উত্তরপক্ষীয় বক্তব্য হল: সব জ্ঞানের, অন্তত বাস্তব বিষয়ের জ্ঞানের, একমাত্র উৎস হল অনুভব। এটা দৃষ্টিবাদের ন্যূনতম লক্ষণ ; সর্বপ্রকারের দৃষ্টিবাদ সম্পর্কে এ লক্ষণ খাটে।

"সর্বপ্রকারের 'দৃষ্টিবাদ" বলার তাৎপর্য হল এই: দৃষ্টিবাদের নানান রূপ— নরমপন্থী ও চরমপন্থী, গতানুগতিক ও নব্য দৃষ্টিবাদ। যাকে অমিতবাদী বা চরমপন্থী দৃষ্টিবাদ বলা হয় তার সঙ্গে মিতবাদী বা নরমপন্থী দৃষ্টিবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রসঙ্গত, প্রথম মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন মীল্, আর দ্বিতীয় মতের হিউম্। আবার একদিক থেকে আমরা গতানুগতিক দৃষ্টিবাদ (যথা, লক্-এর মতবাদ) ও আধুনিক দৃষ্টিবাদ (হিউম্-এর মতবাদ)-এর পার্থক্যের কথা বলতে পারি। আধুনিক দৃষ্টিবাদের সাম্প্রতিক রূপটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবাদ বা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিবাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকলেও কয়েকটি মৌলিক তত্ত্বের ব্যাপারে এদের মধ্যে ঐকমত্য আছে। সর্বপ্রকারের দৃষ্টিবাদী স্বীকৃত এ তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল দৃষ্টিবাদীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ। এ তত্ত্ব থেকে আরো কয়টি দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব নিঃসৃত হয়: যুক্তি-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিজ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব, অধিবিদ্যাবিরোধী তত্ত্ব, মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সংশয়বাদবিরোধী তত্ত্ব। দৃষ্টিবাদের পরিপূর্ণ রূপটি বুঝতে হলে প্রত্যেকটি তত্ত্বের পৃথক আলোচনা দরকার।

(1) জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ

ইন্দ্রিয়ানুভব ভিন্ন বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান হতে পারে না, বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর নির্ভরশীল। এখানে "ইন্দ্রিয়" বলতে অন্তরিন্দ্রিয়ও বুঝতে হবে, অর্থাৎ যাকে অন্তর্দর্শন বলি তাও ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রকারভেদ বলে গণ্য। ধরা যাক, দাবী করা হয়েছে— ব কোনো বাস্তব ব্যাপারের বর্ণনা, এবং ধরা যাক ইন্দ্রিয়ানুভবের সাহায্যে জানা যায় না যে ব (যথা, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান)। তাহলে, আলোচ্য মতে, এ কথা বলা যাবে না যে: অমুক জানে যে ব। কেননা, জানবার অন্য কোনো উপায় নেই, বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞানের ক্ষেত্রে "জানা" অর্থ: ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া। কাজেই ব যদি বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত বাক্য হয়, তাহলে এ কথা বলা যাবে না যে:

> আমি জানি যে ব, কিন্তু 'ব' যে সত্য তা ইন্দ্রিয়ানুভবের সাহায্যে জানা যায় না।

ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যায়, আলোচ্য মতে— জাগতিক কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রাকৃত বিজ্ঞান যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সে পদ্ধতির—নিরীক্ষণ (ইন্দ্রিয়ানুভব) ও সামান্যীকরণ পদ্ধতির—উপর নির্ভর করতে হয়। এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে প্রাকৃত-বৈজ্ঞানিক সত্য বা ব্যবহারিক-জীবন-সংক্রান্ত সত্য লাভ করা যায় না।

উপরোক্ত মতটি নরমপন্থী দৃষ্টিবাদীদের মত। এ মতে: কোনো আপতিক বা পরতসাধ্য বাক্য ব সত্য,—এ জ্ঞান অনুভব ছাড়া হতে পারে না। কিন্তু, অবশ্যম্ভব বা পূর্বতসিদ্ধ বাক্য ভ সত্য—এ জ্ঞান অনুভবের উপর নির্ভশীল নয়। এ মতে ইন্দ্রিয়ানুভব কেবল বাস্তব বিষয়ের জ্ঞানের উৎস। চরমপন্থী দৃষ্টিবাদীরা কিন্তু বলেন—

ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া যে কেবল বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান হতে পারে না তা নয়। ইন্দ্রিয়ানুভব ভিন্ন কোনো জ্ঞানই সম্ভব নয়। এ মতে—

$2+2=4$

ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল দুই সমকোণ

—এ সব গাণিতিক সত্যও অনুভবগম্য। ব পূর্বতসিদ্ধ হোক কি পরতসাধ্য হোক অনুভব ছাড়া এ কথা বলা যায় না যে: আমি জানি যে ব। প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়মগুলি যেমন আরোহলব্ধ সিদ্ধান্ত, পূর্বতসিদ্ধ বাক্যও (যথা, $2+2=4$) —গাণিতিক ও যুক্তিবৈজ্ঞানিক বাক্যও, সেরূপ আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায়।

দৃষ্টিবাদ ও অবশ্যম্ভবতা[1] : একটি প্রশ্ন

ধরা যাক, ব-এর আকার হল এ রূপ:

অমুক বস্তু এমন, অমুক বস্তুতে ঐ গুণ আছে, অমুক ঘটনা ঘটেছে,
ব্যাপারটা এমন যে———।

ব যদি উক্ত আকারের বাক্য হয় তাহলে না হয় (মেনে নিলাম,) এ কথা বলা যায়: অনুভব দিয়ে জানি বা জানা যায় যে ব। কিন্তু

অমুক বস্তু অমুক রকম না হয়ে পারে না, এটা অনিবার্যভাবে সত্য,
অমুক বস্তু ঐ রকম না হয়ে পারত না

—এ আকারের জ্ঞান অনুভবে পাওয়া যাবে কেমন করে? যেমন, ধরা যাক অনুভবে পেলাম যে

দুটি বস্তু আর দুটি বস্তু একত্র করলে চারটি বস্তু হয়
রাম শ্যামের চেয়ে লম্বা এবং শ্যাম রামের চেয়ে খাট।

কিন্তু

দুটি বস্তু আর দুটি বস্তু একত্র করলে অবশ্যই চারটি হবে,
অন্যরূপ হতে পারে না, পারত না

1. necessity

রাম শ্যামের চেয়ে লম্বা হলে, শ্যাম রামের চেয়ে খাট না হয়ে পারে না বা পারত না —এরূপ বাক্য যে অনিবার্যভাবে সত্য, অবশ্যম্ভব সত্য, তা অনুভব দিয়ে জানব কেমন করে ? ব অনিবার্যভাবে সত্য —এ কথা বলতে আর যাই বোঝাক না কেন, অন্তত এটুকু বোঝায় যে : ব অতীতে সত্য ছিল, বর্তমানেও সত্য, ভবিষ্যতেও সত্য থাকবে —সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালেই সত্য। আবার কোনো কোনো বাক্য অনিবার্যভাবে মিথ্যা, অবশ্যম্ভব মিথ্যা —সর্বকালেই মিথ্যা। যথা

এ সমগ্র ফুলটা লাল এবং লাল নয়

শ্যাম কনিষ্ঠ পুত্র কিন্তু তার কোনো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নেই বা ছিল না

এ সব বাক্য সর্বকালেই মিথ্যা, অবশ্যম্ভব মিথ্যা। এখন, ইন্দ্রিয়ানুভব ত কেবল বর্তমান ও বিশেষ বস্তুর জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে : ইন্দ্রিয়ানুভবই যদি জ্ঞানের একমাত্র উৎস হয়, তাহলে কোনো বাক্য ব অবশ্যম্ভব সত্য (বা মিথ্যা)—এ জ্ঞান হয় কেমন করে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দৃষ্টিবাদীরা কেবল দুটি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন ; অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাঁরা বলতে পারেন : অবশ্যম্ভব বলে কিছু নেই, সব কিছুই আপতিক[1]। সত্য বাক্য মাত্রই বস্তুত-সত্য, এবং মিথ্যা বাক্য মাত্রই বস্তুত-মিথ্যা, সুতরাং অনুভবগম্য॥ চরমপন্থী মীল্ এ পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি অবশ্যম্ভবতা বলে কিছু স্বীকার করেন না। তাঁর মতে : "2+2=4" আর "সব কাক কাল" —এ দুটি বাক্যের মধ্যে গুণগত ভেদ নেই, দুটিই অনুভব ও সামান্যীকরণের ফল, দুটিই আরোহী সিদ্ধান্ত। নরমপন্থী দৃষ্টিবাদীরা দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে কোনো কোনো বাক্য অনিবার্যভাবে সত্য (বা মিথ্যা)। অনিবার্যতা বা অবশ্যম্ভবতা মেনে নিয়ে, তাঁরা দৃষ্টিবাদের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে— কি করে অবশ্যম্ভব সত্যের জ্ঞান হয় তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এ ব্যাখ্যা নিচে আলোচিত হল।

(2) যুক্তিবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

হিউম্ ও হিউম্-অনুসারী নব্য দৃষ্টিবাদীদের মতে বাক্য দু প্রকার, হিউমের ভাষায় : (ক) ধারণার সম্বন্ধ সংক্রান্ত বাক্য, ও (খ) বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত বাক্য। প্রথম প্রকারের বাক্য হল পূর্বতসিদ্ধ অবশ্যম্ভব বাক্য, আর দ্বিতীয় প্রকারের বাক্য পরতসাধ্য বা আপতিক। যুক্তিবিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ গণিতের সূত্র ও এদের দৃষ্টান্ত হল প্রথম প্রকারের বাক্য, ধারণার সম্বন্ধ সংক্রান্ত বাক্য। যথা :

ক + খ = খ + ক $2+3=3+2$

সব কখ হল ক   সব লাল-ফুল হল লাল

যদি ক খ-এর সমান হয় তাহলে খ ক-এর সমান।

স্পষ্টতই এসব অবশ্যম্ভব সত্য। আর ব্যবহারিক জীবনে কোনো বাস্তব ব্যাপার

1. contingent

সম্বন্ধে যে উক্তি করি সে উক্তি এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়ম হল দ্বিতীয় প্রকারের বাক্য —বাস্তব-ব্যাপার-সংক্রান্ত বাক্য। এসব পরতসাধ্য বাক্য। যথা ঃ

এ ফুলটা লাল। এটা একটা গোলাপ ফুল।
অগ্নি দহন করে। জল তৃষ্ণা নিবারণ করে।
জড়বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে॥

যুক্তিবিজ্ঞানের আর একটি বাক্য-বিভাগ অনুসারে —বাক্য দু রকম ঃ বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক। কোনো কোনো নব্য দৃষ্টিবাদী এভাবে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বাক্যের লক্ষণ উল্লেখ করেন ঃ

> যে বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নিরূপণের জন্য অনুভবের প্রয়োজন হয় না, এবং যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ পরীক্ষা করলেই বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা জানা যায় তাকে বলে বিশ্লেষক বাক্য। আর যে বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নিরূপণের জন্য অনুভবের দরকার, এবং বাক্যটির অন্তর্গত শব্দের অর্থ বিচার করেই বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা জানা যায় না সে বাক্য সংশ্লেষক।

যথা, "সব", "লাল", "ফুল", "হল"—এ প্রতীকগুলির অর্থ জানা থাকলেই এ কথাও জানা যাবে যে

সব লাল ফুল হল লাল —এ বাক্য সত্য।

কিন্তু "এ", "ফুলটা", "লাল" এ শব্দগুলির অর্থ বিচার করেই

এ ফুলটা লাল

—এ বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা জানা যায় না; এ ক্ষেত্রে অনুভবের প্রয়োজন হয়। কাজেই প্রথম বাক্যটি বিশ্লেষক আর দ্বিতীয়টি সংশ্লেষক। ওপরে বিশ্লেষক বাক্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় যে ঃ বিশ্লেষক বাক্যে কোনো বাস্তব ব্যাপার বর্ণিত হয় না; যদি হত, তাহলে কেবল শব্দার্থ পরীক্ষা করেই বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা জানা যেত না। অপরপক্ষে, সংশ্লেষক বাক্য হল কোনো বাস্তব ব্যাপারের বর্ণনা। এজন্যই অনুভব ছাড়া, বাস্তব জগতের পর্যবেক্ষণ ছাড়া, এ জাতীয় বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায় না। এখন, নব্য দৃষ্টিবাদীদের যুক্তিবৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি আমরা নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করতে পারি-ঃ*

পূর্বতসিদ্ধ[1] বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক আর পরতসাধ্য[2] বাক্যমাত্রই সংশ্লেষক,
কোনো পূর্বতসিদ্ধ বাক্য সংশ্লেষক হতে পারে না। তারপর,
'পূর্বতসিদ্ধ' = 'অবশ্যম্ভব', ∴ অবশ্যম্ভব বাক্য মাত্রই বিশ্লেষক।
এখন, বিশ্লেষক বাক্যে কোনো বাস্তব ব্যাপার ব্যক্ত হতে পারে না
∴ অবশ্যম্ভব বাক্যে কোনো বাস্তব ব্যাপার ব্যক্ত হতে পারে না॥

---

* যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটি আরও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়, তৃতীয় বিভাগ দ্রষ্টব্য।

1. a priori 2. a posteriori

নব্য দৃষ্টিবাদীদের উক্ত মতবাদের তাৎপর্য হল এই ঃ
অবশ্যম্ভব বাক্যে যদি কোনো বাস্তব ব্যাপার বর্ণিত না হয়, তাহলে এ প্রশ্নও উঠতে পারে না —"অনুভব দিয়ে অবশ্যম্ভব সত্য পাওয়া যায় কেমন করে?" কেননা, এ মতে অবশ্যম্ভবতা কোনো বাস্তব ব্যাপার নয়। এবং দৃষ্টিবাদ এ দাবী করে না যে— ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে সর্বপ্রকারের জ্ঞান লাভ করা যায়। এ মতবাদ কেবল এ দাবীই করে যে—সব বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান অনুভবগম্য। অবশ্যম্ভবতা বাস্তব ব্যাপার নয়, কাজেই ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে অবশ্যম্ভবতা জানার কথাও ওঠে না। "অনুভব দিয়ে অবশ্যম্ভবতার জ্ঞান হয় না"—এ বুদ্ধিবাদী উক্তির সঙ্গে তাহলে নব্য দৃষ্টিবাদের বিরোধ নেই ॥

(3) **বিজ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব**

পরতসাধ্য বাক্যমাত্রই আপাতিক, এ জাতীয় বাক্য অবশ্যম্ভবতা দাবী করতে পারে না। আর পূর্বতসিদ্ধ বাক্য অবশ্যম্ভব সত্য, কিন্তু বিশ্লেষক বলে এ জাতীয় বাক্য "বন্ধ্যা" বা অ-তথ্যজ্ঞাপক ॥ এ তত্ত্ব থেকে এ কথাও নিঃসৃত হয় যে ঃ

কেবল দু প্রকারের বিজ্ঞান সম্ভব ঃ (ক) প্রাকৃত বিজ্ঞান ও (খ) বিমূর্ত বিজ্ঞান—(ক) যে বিজ্ঞানের নিয়মগুলি পরতসিদ্ধ ও অনুভবলব্ধ বাক্য বা এ জাতীয় বাক্যের ভিত্তিতে সামান্যীকরণ করে পাওয়া বাক্য, (খ) যে বিজ্ঞানের সূত্রগুলি স্বীকৃত পূর্বতসিদ্ধ বাক্য বা এ জাতীয় বাক্য থেকে অবরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাওয়া বাক্য ॥ প্রথম প্রকারের বিজ্ঞান হল প্রাকৃত বিজ্ঞান, যথা ঃ উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিজ্ঞান হল যুক্তিবিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ গণিত। প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়মগুলি অনুভবলব্ধ ঃ ইন্দ্রিয়ানুভবের বা ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ বস্তু বিষয়ক বাক্যের, ভিত্তিতে আরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়ম পাওয়া যায়। অপর-পক্ষে, যুক্তিবিজ্ঞানে ও বিশুদ্ধ গণিতে পাই সংখ্যা, পরিমাণ, শ্রেণী, বাক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষক বাক্য —ঐ ক্ষেত্রে এ জাতীয় একাধিক বাক্য যুক্ত করে, অবরোহী যুক্তি প্রয়োগ করে আরও বহু বিশ্লেষক বাক্য লাভ করি। উক্ত দু প্রকারের বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনো তৃতীয় প্রকারের বিদ্যা সম্ভব নয়, সুতরাং অধিবিদ্যাও সম্ভব নয়। এজন্য হিউম্ বলেছেন ঃ

> গ্রন্থাগারে গিয়ে কোনো বই (যথা, ধর্মবিষয়ক বা অধিবিদ্যাবিষয়ক বই) নিয়ে দেখ, গ্রন্থটিতে সংখ্যা বা পরিমাণ সম্বন্ধে কোনো বিশুদ্ধ (অবরোহী) যুক্তি আছে কিনা —অর্থাৎ গ্রন্থটিতে পূর্বতসিদ্ধ, বিশ্লেষক বাক্য আছে কিনা। দেখলে, নেই। তাহলে দেখ, এতে কোনো অনুভবভিত্তিক (আরোহী) যুক্তি আছে কিনা —অর্থাৎ পরতসাধ্য, তথ্যজ্ঞাপক বাক্য আছে কিনা। দেখলে, নেই। তাহলে গ্রন্থটিকে অগ্নিতে আহুতি দাও, কেননা সে ক্ষেত্রে গ্রন্থটিতে ভ্রান্তি ও কূটতর্ক ভিন্ন আর কিছুই থাকতে পারে না ॥

প্রাকৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টিবাদীদের আর একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল এই :

প্রাকৃত বিজ্ঞান কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না, কেবল বর্ণনাই করতে পারে।

এটা ঠিক যে : প্রাকৃত বিজ্ঞান কোনো বিশেষ বস্তু বা ঘটনা বর্ণনা করে না, নিয়ম রচনা করে —অর্থাৎ প্রাকৃত বিজ্ঞানের সার্বিক বাক্যগুলিতে প্রাকৃতিক নিয়মানুগামিতা ব্যক্ত হয়। কিন্তু দৃষ্টিবাদীদের মতে "নিয়মানুগামিতা" অর্থ হল বাস্তব সহগামিতা, যথা, অগ্নি দহন করে—এ নিয়মের বক্তব্য এই নয় যে : অগ্নির প্রকৃতির মধ্যে দহনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, অথবা অগ্নিসংযোগ ও দহনক্রিয়ার মধ্যে কোনো অনিবার্যতার বা অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ আছে, অথবা অগ্নির প্রকৃতি এমন যে অগ্নি দহন না করে থাকতে পারে না। এ নিয়মের বক্তব্য হল : বস্তুত আমরা অগ্নিসংযোগ ও দহনক্রিয়ার সাহচর্য দেখি, বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অগ্নিসংযোগের অব্যবহিত পরেই (বা প্রায় সমকালেই) দহনকার্য ঘটে, কাজেই আমরা এ আশা (বা আশঙ্কা) করতে পারি যে ভবিষ্যতেও অগ্নি ও দহনের সাহচর্য দেখতে পাব। দৃষ্টিবাদীরা কারণ ও কার্যের মধ্যে কোনো অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। এঁদের মতে : কারণের মধ্যে কার্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কারণকে কার্যের (যৌক্তিক) হেতু বলা যায় না। "কারণ" ও "কেননা" (বা "যেহেতু") সমার্থক শব্দ নয়।

খ-ঘটবার কারণ ক-ঘটা

এ কথার সমার্থক হিসাবে বলা যাবে না যে

খ ঘটেছে, কেননা ক ঘটেছে

অথবা যেহেতু ক ঘটেছে সেহেতু খ ঘটেছে।

দৃষ্টিবাদীদের মতে :

ক খ-এর কারণ = ক একটি পূর্বগ আর খ একটি অনুগ ঘটনা, এবং ক-জাতীয় ঘটনাকে ও খ-জাতীয় ঘটনাকে উক্ত ক্রমে যুক্ত হতে দেখা যায়।

প্লেটো ও তাঁর অনুগামী বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন : বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল ব্যাখ্যাকরণ —কোনো প্রকারের ঘটনা কেন ঘটে, কোনো প্রকারের বস্তুতে কেন অমুক প্রকারের গুণ দেখা যায় তার উত্তর দেওয়া। কিন্তু দৃষ্টিবাদীরা বলেন : প্রাকৃত বিজ্ঞানের লক্ষ্য ব্যাখ্যাকরণ নয়, বর্ণনাকরণ। আর প্রাকৃত বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা প্রাকৃত জগত হল আপাতিক, এর মধ্যে কোনো অবশ্যম্ভবতা নেই, সুতরাং ব্যাখ্যা করবারও কিছু নেই। বিজ্ঞানের করণীয় হল : দ্রব্য, গুণ বা ঘটনার সাহচর্য অনুসন্ধান, কোন্ প্রকারের ঘটনার সঙ্গে অন্য কোন্ প্রকারের ঘটনার সহগামিতা আছে— এ সব অনুসন্ধান করা।

(4) অধিবিদ্যাবিরোধী তত্ত্ব : অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব*

আমরা জানি, নব্য দৃষ্টিবাদীদের মতে বাক্য দু প্রকার : পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য ও পরতসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য। অন্য কোনো তৃতীয় প্রকারের বাক্য এরা স্বীকার করেন না। এদের মতে অন্য প্রকারের "বাক্য" অর্থহীন। নব্য দৃষ্টিবাদীরা আরো বলেন :

ব সংশ্লেষক বাক্য = ব অনুভবে যাচাইযোগ্য

এবং ব অনুভবে যাচাইযোগ্য = ব-এর অর্থ আছে।

মানে, কোনো "সংশ্লেষক বাক্য" ব-এর যাচাইযোগ্যতা থাকলে তবেই বলা যায় যে ব-এর অর্থ আছে। ব যদি যাচাইযোগ্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে ব অর্থহীন শব্দসমষ্টি। আলোচ্য মতে—

যে নির্দেশক বাক্য বিশ্লেষকও নয় এবং যার সত্যাসত্য অনুভবে যাচাইও করা যায় না সে বাক্য অর্থহীন।

অর্থাৎ কেবল দু রকম বাক্যের অর্থ থাকতে পারে : বিশ্লেষক বাক্য, আর অনুভবে-যাচাই-করা-যায়-এমন বাক্য। এখন, আমরা অধিবিদ্যায় যে সব বাক্যের সাক্ষাৎ পাই, যথা

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাই তাই ভ্রান্ত, "আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন"

—এ সব বাক্য বিশ্লেষকও নয় আবার যাচাইযোগ্যও নয়। কাজেই এ জাতীয় বাক্য অর্থহীন। এখন, অধিবিদ্যায় কেবল উক্তরূপ বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারের বাক্যের সাক্ষাৎ পাই না। সুতরাং অধিবিদ্যা হল অর্থহীন বাক্যসমষ্টি।

মূল্যবিষয়ক বাক্য : একটি প্রশ্ন

তথ্যজ্ঞাপক (পরতসাধ্য, সংশ্লেষক) এবং বিশ্লেষক —এ দু রকম বাক্য ছাড়াও আমরা আরও এক প্রকারের বাক্য প্রয়োগ করি। এ বাক্য হল মূল্যবিষয়ক বাক্য। এ জাতীয় বাক্যে কোনো কিছুর মূল্যবিচার ব্যক্ত হয়। "এ ফুলটা লাল" আর "ঐ ফুলটা সুন্দর" —এ বাক্য দুটি তুলনা করলেই তথ্যজ্ঞাপক বা বর্ণনাকারী বাক্য থেকে মূল্যবিষয়ক বাক্যের পার্থক্য বোঝা যাবে। লাল গুণটি যেভাবে ঐ ফুলে (সমবেত) আছে, সৌন্দর্য ঠিক সেভাবে ঐ ফুলটার গায়ে লেগে নেই। যখন বলি "এ কবিতাটি সুন্দর" তখন আমরা কবিতাটির প্রশংসা করি, কিন্তু "কবিতাটি অমুক তারিখে প্রকাশিত হয়েছে" বললে কোনো প্রশংসা করা হয় না, মূল্যবিচার করা হয় না; কেবল একটি বাস্তব তথ্য জ্ঞাপন করা হয়। সেরূপ : এ পৃষ্ঠাটি বাংলাতে লেখা, এ লেখাটি নীল কাগজে মুদ্রিত হয় নি —এসব বাক্যে কেবল তথ্য পরিবেশন করা হয়, আমাদের প্রশংসা, নিন্দা, পছন্দ, অপছন্দ ব্যক্ত হয় না। কিন্তু : সত্য কথা

* এ তত্ত্বটি (the verifiability theory of meaning) যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ প্রসঙ্গে আরও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়, সপ্তম বিভাগ দ্রষ্টব্য।

বলা ভাল, মিথ্যা কথা বলা অনুচিত —এসব বাক্যে কোনো বাস্তব ব্যাপার বর্ণিত হয় না ; এ সব মূল্যবিষয়ক বাক্য। মূল্য হল আমাদের প্রশংসা, নিন্দা, পছন্দ, অপছন্দ, অনুমোদন, অননুমোদনের বিষয়।

সুন্দর অসুন্দর, ভাল মন্দ, শুদ্ধ অশুদ্ধ,
উচিত অনুচিত, বৈধ অবৈধ, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট

এ সব বিশেষণ মূল্য বিচারের বেলাতেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই বলতে পারি যে-বাক্যে এসব বিশেষণ বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় সে বাক্য হল মূল্য-বিষয়ক।

এখন প্রশ্ন হলঃ অনুভব দিয়ে কি মূল্যের জ্ঞান হয়? ধরা যাক, 'ব' একটি মূল্যবিষয়ক বাক্য। অনুভবে কি এ জ্ঞান হয় যে ব (যথা কাজটি ভাল, কবিতাটি সুন্দর)? এ প্রশ্নটাই অন্যভাবে উত্থাপন করা যায়ঃ "লাল" "নীল"—প্রভৃতি শব্দ বাস্তব গুণ নির্দেশ করে, কিন্তু "ভাল", "মন্দ", "সুন্দর" "অসুন্দর" প্রভৃতি শব্দও কি বাস্তব ধর্ম বোঝায়? সৌন্দর্য অসৌন্দর্য, উৎকর্ষ অপকর্ষ, ঔচিত্য অনৌচিত্য—এসবও কি কোনো বস্তু বা আচরণের ধর্ম? যদি বল এ জাতীয় শব্দও বাস্তব জগতের কোনো না কোনো ধর্ম বোঝায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠেঃ এ জাতীয় ধর্ম কি অনুভবে ধরা দেয়? দৃষ্টিবাদীরা স্বীকার করবেন যেঃ 'ব' যদি মূল্যবিষয়ক বাক্য হয় তাহলে কেবল অনুভবে জানা যায় না যে ব। অনুভবে ব-এর যাচাইকরণ সম্ভব নয় এবং মূল্য-বিষয়ক ব বিশ্লেষকও নয়। তাহলে কি বলব যে মূল্যবিষয়ক বাক্য অর্থহীন? বলব কি, যে-বিদ্যা মূল্য নিয়ে আলোচনা করে, যথা নীতিবিদ্যা, তা অধিবিদ্যার মতই অসম্ভব? দৃষ্টিবাদীরা কিভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেন তা নিচে আলোচিত হল।

(5) মূল্যবিষয়ক তত্ত্ব

ধরা যাক, 'ব' কোনো মূল্যবিষয়ক বাক্য। প্রশ্ন ওঠেঃ ইন্দ্রিয়ানুভবে কি জানা যায় যে ব? দৃষ্টিবাদীরা এভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেন। দৃষ্টিবাদীরা বলেনঃ যা অনুভবগম্য নয় তার বাস্তব সত্তা নেই ; যথা, অবশ্যম্ভবতা ইন্দ্রিয়ানুভবে ধরা দেয় না, সুতরাং বাস্তব জগতে অবশ্যম্ভবতা বলে কিছু নেই। সেরূপ, মূল্য অনুভবগম্য নয়, সুতরাং মূল্যের বাস্তব সত্তা নেই। তাহলেঃ মূল্যের জ্ঞান হয় কি করে? অনুভব দিয়ে না বুদ্ধি দিয়ে? —এ প্রশ্নও ওঠে না॥ কিন্তু মূল্য-বিষয়ক বাক্য কি অর্থহীন? এ জাতীয় বাক্যে কি কিছুই ব্যক্ত হয় না? নব্য দৃষ্টিবাদ এ প্রশ্নের নানান রকম জবাব দেয়। নিচে একটি জবাব উল্লেখ করা হল।

তথাকথিত মূল্যবিষয়ক বাক্য প্রকৃতপক্ষে কোনো বাক্যই নয় —অর্থাৎ এ জাতীয় বাক্যে কোনো উক্তি করা হয় না, বিবৃতি ব্যক্ত হয় না, এসব বচন বলে গণ্য নয়। মূল্যবিষয়ক বাক্য আসলে অনুজ্ঞাবোধক। এ মতে

মিথ্যা কথা বলা দোষ = মিথ্যা কথা বলবে না
সত্য কথা বলা ভাল = সদা সত্য কথা বলবে।

ওখানে বসো, দরজাটা বন্ধ করে দাও—এসব বাক্যে কোনো জ্ঞান ব্যক্ত হয় না। কাজেই, তুমি কি করে জানলেঃ ওখানে বসো? "ওখানে বসো" সত্য?—এসব প্রশ্ন অর্থহীন। ঠিক সেরকম, "কি করে জানলে মিথ্যা কথা বলা দোষ?"—এ প্রশ্নও অর্থহীন।*

(6) মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

গতানুগতিক দৃষ্টিবাদের একটি ভিত্তি-স্তম্ভ হল এর মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। গতানুগতিক দৃষ্টিবাদীদের রচনায়, বিশেষত লক্-এর রচনায়, মনোবৈজ্ঞানিক উক্তি অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে; এমনকি হিউম্ ও মাখ্-এর রচনায়ও মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনার স্থান নগণ্য নয়। দৃষ্টিবাদীদের মতে—

(ক) সব ধারণা ও জ্ঞান অনুভবলভ্য, এবং আমাদের মনে কোনো পূর্বতসিদ্ধ ধারণা বা জ্ঞান থাকতে পারে না। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন—সব, অন্তত কোনো কোনো, ধারণা বা জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ। দৃষ্টিবাদীরা এ বুদ্ধিবাদী মতের তীব্র বিরোধিতা করেন। দর্শনের ইতিহাসে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিবাদী তত্ত্বটি সহজাত-ধারণা-খণ্ডন তত্ত্ব নামে খ্যাত। তারপর,

(খ) গতানুগতিক দৃষ্টিবাদীরা বিশুদ্ধ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞা বলে কোনো স্বতন্ত্র বোধ বা মানস শক্তি স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ জ্ঞান; "পরোক্ষ" এ অর্থেঃ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ছাড়া সাক্ষাৎভাবে কোনো ধারণা বা জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে না। বোধ বা অনুভব মাত্রই ইন্দ্রিয়নির্ভর। বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক বোধ—প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞা—বলে কিছু নেই। আর একটি দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব হলঃ

(গ) মন নিষ্ক্রিয় গ্রাহক—স্বতন্ত্র সরল ধারণা-অণুর (লক্-এর মত) বা ছাপের (হিউম্-এর মত) গ্রাহক। গৃহীত ধারণাগুলিকে নানানভাবে সংযোজন ও বিন্যাসকরণ করার বেলাতেই মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। মনের আনকোরা সাদা কাগজে প্রকৃতি যে ধারণাগুলি মুদ্রিত করে সেগুলির প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন বা স্বতন্ত্র—এ তত্ত্ব থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় তাকে বলে মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদ। এ মতবাদ অনুসারে—

(ঘ) বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞানের উপকরণ হল ধারণা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন এ ধারণাগুলির কোনোটি থেকে অন্য কোনোটি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কয়েকটি জড় পরমাণু যুক্ত হলে যেমন স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুর সৃষ্টি হয়, সেরূপ দুই বা ততোধিক ধারণা-পরমাণু যুক্ত হলে জটিল ধারণা বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

* যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়, পঞ্চম বিভাগ দ্রষ্টব্য।

(7) সংশয়বাদবিরোধী তত্ত্ব

চরম সংশয়বাদীরা বলেন, কোনো বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধে যদি নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় কেবল তাহলেই বলা যায়ঃ আমরা জানি যে ———। কিন্তু কোনো ব্যাপার সম্বন্ধেই নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞান সম্ভব নয়। এর উত্তরে দৃষ্টিবাদীরা বলেন, ব বাক্যটি যদি সম্ভাব্য সত্যও হয় তাহলেও বলা যায়ঃ আমি জানি যে ব। ধরা যাক, "জানা" কথাটি সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হল। এ অর্থে— কোনো ব্যাপার সম্বন্ধে সংশয়ের সম্ভাবনা থাকলে বলা যাবে নাঃ আমরা জানি যে —। অনেক দৃষ্টিবাদী বলেন, এ সংকীর্ণ অর্থেও বলা যায়ঃ অনুভবে বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান হতে পারে। এ শ্রেণীর দৃষ্টিবাদীরা বলেন—কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবেও নিঃসন্দিগ্ধ বা "অসংশোধনীয়" সত্য পাওয়া যায়। যথা

এখানে ব্যথা (দেহের অংশ বিশেষ নির্দেশ করে বলা হল)

ওখানে লাল (কোনো বস্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হল)

এ জাতীয় বাক্যে যা বলা হয় তা অসংশোধনীয়, ভ্রান্তিসম্ভাবনারহিত। সুতরাং বলা যায়ঃ আমার এ জ্ঞান হয়েছে যে এখানে ব্যথা, বা ওখানে লাল। প্রসঙ্গত, উক্তরূপ বাক্যকে মৌল বাক্য* বা অক্ষোপাত্ত-বাক্য** বলে। ধরা যাক, আমার উপলব্ধি এভাবে ব্যক্ত করলামঃ

আমার হৃৎপিণ্ডে ব্যথা ঐ গোলাপটি লাল।

এ ক্ষেত্রে আমার ভুল হতে পারে। কেননা এ জাতীয় বাক্যে কেবল অনুভূত বিষয় ব্যক্ত হয় না: এসব ক্ষেত্রে, অনেকের মতে, অনুমানও প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। কিন্তু

এখানে ব্যথা ওখানে লাল

এ জাতীয় বাক্যে কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়ই ব্যক্ত হয়। কাজেই এরূপ বাক্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য, এদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সংশয় সম্ভব নয়। ব যদি এরূপ কোনো বাক্য বোঝায় তাহলে "জানা"র সংকীর্ণতম অর্থেও বলা যায়ঃ আমি জানি যে ব।

মনে রাখার দরকার, সব দৃষ্টিবাদী এ মত গ্রহণ করেন না। অনেকে মৌল, "অসংশোধনীয়" বাক্যের, অক্ষোপাত্ত-বাক্যের, সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। শেষোক্ত মতে ইন্দ্রিয়ানুভবে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করতে পারে না।

3. দৃষ্টিবাদের সমালোচনা

"অনুভব"-এর দ্ব্যর্থতা

বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত সব জ্ঞানের উৎস হল অনুভব —এ মত আপাতদৃষ্টিতে অভ্রান্ত বলে মনে হয়। মতটি এমন অভ্রান্ত বলে মনে হয় যে, প্রশ্ন জাগেঃ

* মৌল বাক্য=basic proposition

** অক্ষোপাত্ত-বাক্য=ostensive proposition

বুদ্ধিবাদীরা এ মতের বিরোধিতা করেন কোন্ যুক্তিতে? কিন্তু উক্ত মতের আপাতযৌক্তিকতার মূলে আছে "অনুভব" কথাটির দ্ব্যর্থতা। "অনুভব" শব্দটি দুটি ভিন্ন পর্যায়ের উপলব্ধি বোঝায়, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনো বোধ হওয়াকেও অনুভব বলা হয়, আবার ইন্দ্রিয়-বুদ্ধির যুক্ত ক্রিয়াকেও অনুভব বলা হয়। ব্রাড্‌লি প্রথম প্রকারের অনুভবের নাম দিয়েছেন বোধ, আর দ্বিতীয় প্রকারের অনুভবকে সম্বন্ধমূলক চিন্তা নামে অভিহিত করেছেন। যখন কোনো সরল গুণের, যথা লাল রঙের, অনুভবের কথা বলি তখন 'অনুভব' কথাটি প্রধানত প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর যখন কোনো ব্যাপারের অনুভবের কথা বলি, যথা এ ফুলটি যে লাল এ ব্যাপারের অনুভবের কথা বলি, তখন 'অনুভব' কথাটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করি। দ্বিতীয় প্রকারের অনুভব নিছক ইন্দ্রিয়ানুভব নয়, সম্বন্ধমূলক চিন্তা, ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধির যুক্ত ক্রিয়া। বোঝার দরকার, নিছক ইন্দ্রিয়ানুভবের সাহায্যে, ধারণা প্রয়োগকরণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রদত্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তের যুক্তকরণ, প্রদত্তের তাৎপর্য উদ্ধারকরণ প্রভৃতির —এক কথায় বুদ্ধির, সাহায্য ছাড়া ব্যাপারবিষয়ক জ্ঞান হতে পারে না। শেষোক্ত উক্তিটি নিচে ব্যাখ্যা করা হল।

জ্ঞানমাত্রই প্রজ্ঞানুবিদ্ধ*

বুদ্ধিবাদীরা "জানা" কথাটি "ইন্দ্রিয়ানুভবে-পাওয়া"র সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু জ্ঞান মাত্রই ইন্দ্রিয়ানুভবে-পাওয়া —এ কথা মানা যায় না। জ্ঞান নানান আকার ধারণ করে। "ক হল খ" —এ আকারের জ্ঞানের কথাই ধরা যাক। এ আকারের জ্ঞান হলঃ যা বস্তুত যে প্রকারের তা সে প্রকারের —এ অনুভব; যেমন, শ্বেত পুষ্পটি সম্বন্ধে —এ অনুভবঃ ফুলটিতে শ্বেতত্ব আছে। এখন কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এ বোধ হতে পারে না যেঃ ফুলটি শ্বেতবর্ণের। শ্বেতত্ব একটি সামান্য ধারণা (সেরূপ, পুষ্পত্বও একটি সামান্য ধারণা)। কাজেই শ্বেত সম্বন্ধে (এবং পুষ্পত্ব সম্বন্ধে) ধারণা না থাকলে এ জ্ঞান হতে পারে না যে পুষ্পটি শ্বেতবর্ণের।

দার্শন-অনুভবে কিছু একটা পাওয়া যায়। কিন্তু সে গৃহীত (বা "প্রদত্ত") "কিছু"তে যে শ্বেতত্ব পুষ্পত্ব ধর্ম আছে তা কেবল চোখ দিয়ে জানা যায় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা পাওয়া গেল তাকে "জ্ঞান" পদবাচ্য হতে হলে, তার থেকে "ওটি একটি শ্বেত পুষ্প" বা "ফুলটি সাদা"—এ জ্ঞান হতে হলে বুদ্ধি প্রজ্ঞা, মনন বা চিন্তনের সাহায্য প্রয়োজন। বুদ্ধি গৃহীত ইন্দ্রিয়োপাত্তের তাৎপর্য উদ্ধার করে, পূর্বার্জিত ধারণার সঙ্গে তুলনা করে, বিশেষ শ্রেণীতে একে অন্তর্ভুক্ত করে, পূর্বজ্ঞাত নাম ব্যবহার ক'রে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে চিহ্নিত করে—এক কথায় "প্রদত্ত"-কে আকারিত প্রকারিত করে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইন্দ্রিয়োপাত্তের শ্রেণীকরণ, নামকরণ, আকারীকরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়; এজন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। এজন্য কাণ্ট্ বলেনঃ ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া বাস্তব জ্ঞান

* এ অধ্যায়ের পঞ্চম বিভাগে (142 পৃষ্ঠায়) কাণ্টের সবিচারবাদ দ্রষ্টব্য।

হতে পারে না, ঠিক ; কিন্তু কেবল ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে (বাস্তব ব্যাপারের) জ্ঞান হতে পারে না। ইন্দ্রিয়ানুভবের সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত হলে তবেই জ্ঞান সম্ভব।

দৃষ্টিবাদী প্রত্যক্ষতত্ত্ব (লৌহ-যবনিকা তত্ত্ব[1])
ও অহংসর্বস্ববাদ[2]

দৃষ্টিবাদী প্রত্যক্ষতত্ত্বের, বিশেষত লক্-এর প্রতিফলন তত্ত্ব ও হিউমের মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের, অবাঞ্ছিত পরিণাম হল অহংসর্বস্ববাদ। এ মতগুলি গ্রহণ করলে জ্ঞাতার ব্যক্তিগত মনোগত জগতের বাইরেও যে একটা সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুজগৎ আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। লক্ বলেছেন: সরাসরি কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইন্দ্রিয়ানুভবে বা প্রত্যক্ষে যা পাই তা হল বস্তুর প্রতিরূপ বা প্রতিফলন ("ধারণা")। আমাদের নিজস্ব ধারণা ভিন্ন মনে আর কিছু থাকতে পারে না, কোনো বাস্তব পদার্থ সাক্ষাৎভাবে মনে ধরা দেয় না॥ এ প্রত্যক্ষতত্ত্বকে নব্য দৃষ্টিবাদী এয়ার "লৌহ-যবনিকা তত্ত্ব" বলে অভিহিত করেছেন। আবার হিউম্ বলেছেন: অনুভবে আমরা সাক্ষাৎভাবে পাই "ছাপ"—কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, অসংবদ্ধ ছাপ—যেন কতকগুলি মনোগত পরমাণু। এ কথা সহজবোধ্য যে দৃষ্টিবাদী লৌহ-যবনিকা তত্ত্ব ও মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদের চরম পরিণতি হল অহংসর্বস্ববাদ—আমার মনোগত "ধারণা" বা "ছাপ" ভিন্ন অন্য কিছু আছে কিনা জানি না—এ মতবাদ। লক্ ও হিউম্ প্রচারিত দৃষ্টিবাদ মেনে নিলে এ কথাও মানতে হয় যে: আমার ব্যক্তিমনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বজনগ্রাহ্য বহির্জগৎ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আমার মনের অতিবর্তী কোনো জগৎ আছে কিনা তাও জানতে পারি না। সেক্ষেত্রে কোনো বক্তা অন্য ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে না। এবং ফলে দার্শনিক আলাপ আলোচনার সম্ভাবনাও থাকে না॥

দৃষ্টিবাদ ও অবশ্যম্ভবতা

দৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি সাধারণত উত্থাপন করা হয় তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল এ আপত্তিটি: অবশ্যম্ভব বা পূর্বতসিদ্ধ বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় দৃষ্টিবাদ সে জ্ঞানের উৎস বা স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এ আপত্তি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটি খণ্ডন করতে না পারলে দৃষ্টিবাদের বিশাল সৌধ ভূলুণ্ঠিত হবে; এয়ার বলেন: সেক্ষেত্রে "আমরা বুদ্ধিবাদীদের কাছে হার মানতে বাধ্য হব"।

এ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে চরমপন্থী মীল্ অবশ্যম্ভব ও আপতিক বাক্যের, প্রজ্ঞাসিদ্ধ সত্যের ও ব্যাপারবিষয়ক সত্যের, পার্থক্য অস্বীকার করেছেন। মীল্ বলেছেন: "সব কাক কাল", "সব মানুষ মরণশীল"—এ সব বাক্য যেমন

---
1. Iron-curtain Theory 2. Solipsism

আরোহলব্ধ সিদ্ধান্ত, সেরূপ গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের তথাকথিত অবশ্যম্ভব সূত্রগুলি আরোহী প্রক্রিয়ার ফল, সুতরাং অনুভবলব্ধ।

মীল্-এর এ অতি-উগ্র মত উৎকটভাবে অসংগত। প্রথমত, গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের সূত্র যে অবশ্যম্ভব বাক্য এ কথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এ জাতীয় বাক্য যদি আপতিক হয় তাহলে প্রায় সকলেই এদের অবশ্যম্ভব মনে করে কেন তারও ব্যাখ্যার দরকার। দ্বিতীয়ত, অবশ্যম্ভব বাক্যগুলি আরোহলব্ধ সিদ্ধান্ত—এ উক্তির মধ্যেও এ স্বীকৃতি নিহিত আছে যে কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবে অবশ্যম্ভব বা সার্বিক সত্য ধরা দেয় না। কেননা, যখনই অনুমান করা হয় তখনই ইন্দ্রিয়ানুভব অতিক্রম করে যাওয়া হয়। বুদ্ধি, প্রজ্ঞা বা মনন ভিন্ন অনুমান সম্ভব নয়, তা সে অনুমান আরোহী হোক কি অবরোহী হোক। তৃতীয়ত, যাকে পূর্বতসিদ্ধ বাক্য বলা তা যদি প্রকৃতপক্ষে আপাতিক বাক্য হত তাহলে প্রাকৃত বিজ্ঞানের বাক্যের মত, এসব অবশ্যম্ভব-বলে-গণ্য বাক্যও মিথ্যা হতে পারত, অন্তত এরূপ বাক্য মিথ্যা —এ কল্পনা করা যেত। কিন্তু এ জাতীয় কোনো বাক্য ব মিথ্যা এ কথা অচিন্তনীয়। এ জাতীয় বাক্য ব-এর বিরুদ্ধ বাক্য স্ববিরোধী। যথা

ঐ লাল ফুলটি লাল

একটি অবশ্যম্ভব বাক্য, এর বিরুদ্ধ বাক্য—

ঐ লাল ফুলটি লাল নয়

অর্থাৎ ঐ বস্তুটি একটি লাল ফুল এবং ঐ বস্তুটি লাল ফুল নয়*

—এ বাক্যগুলি স্পষ্টতই স্ববিরোধী। কিন্তু কোনো আপাতিক বাক্য ভ মিথ্যা —এ উক্তি করলে স্ববিরোধী উক্তি করা হয় না। যথা, ধরা যাক "রাম বুদ্ধিমান" এ বাক্যটি সত্য। কিন্তু যদি বলি "রাম বুদ্ধিমান নয়" তাহলে যা বলা হল তা মিথ্যা, কিন্তু স্ববিরোধী নয়। এর থেকে বোঝা যায় যে অবশ্যম্ভব বাক্য ও আপাতিক বাক্যের মধ্যে গুণগত ভেদ আছে। এদের ভেদ কেবল পরিমাণগত —মীলের এ মত গ্রাহ্য নয়।

নব্য দৃষ্টিবাদীরা অবশ্যম্ভবতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে, তার সমালোচনা করা হবে। নবম অধ্যায়, (9) বিভাগ দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টিবাদ, বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা

দৃষ্টিবাদীদের বিজ্ঞানবিষয়ক মতবাদ সম্বন্ধেও আপত্তি ওঠে। নরমপন্থী দৃষ্টিবাদীদের মতে বিজ্ঞান দু প্রকার। বিমূর্ত অবরোহী বিজ্ঞান (গণিত ও যুক্তি-বিজ্ঞান) এবং প্রাকৃত বিজ্ঞান। এ মতে বিমূর্ত বিজ্ঞানের বাক্যগুলি বিশ্লেষক —এ জাতীয় বিজ্ঞান বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে কোনো উক্তি করে না, কোনো তথ্য জ্ঞাপন করে না। কিন্তু বিমূর্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জগতের কোনো সম্পর্ক নেই —এ মত অসঙ্গত বলে মনে হয়। বিমূর্ত বিজ্ঞানের উক্তিগুলি যদি অ-তথ্য

* এ বাক্যে দুটো "ঐ" একই ফুলকে বোঝাচ্ছে।

জ্ঞাপক হয় তাহলে এ বন্ধ্যা সূত্রগুলি প্রয়োগ করে বাস্তব সমস্যা সমাধান করা যায় কেমন করে? বস্তুত গাণিতিক ও যুক্তিবৈজ্ঞানিক সূত্র প্রয়োগ করে বাস্তব জগতের অনেক সমস্যার যে সমাধান হয় তা অনস্বীকার্য।*

নব্য দৃষ্টিবাদীরা অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতার কথা বলেন; তাঁদের মতে আধিবিদ্যক বাক্য মাত্রই অর্থহীন। অধিবিদ্যার-অসম্ভবপরতা-তত্ত্বের ভিত্তি হল: অর্থের যাচাইযোগ্যতা তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুসারে— যে বাক্য অবশ্যম্ভবও (বিশ্লেষকও) নয় আবার যাচাইযোগ্যও নয় তা অর্থহীন। কিন্তু যা যাচাইযোগ্য নয় তাই যদি অর্থহীন হত তাহলে: কেবল আধিবিদ্যক বাক্য নয়, যে কোনো সার্বিক বাক্য, সুতরাং বৈজ্ঞানিক নিয়মজ্ঞাপক বাক্যও, অর্থহীন হয়ে পড়ত। যথা: অগ্নি সর্বদা দহন করে, জল সর্বদা তৃষ্ণা নিবারণ করে, সব মানুষ মরণশীল—প্রভৃতি সার্বিক বাক্যের সত্যতা ইন্দ্রিয়ানুভবে যাচাই করা যায় না; কাজেই এ সব বাক্যও অর্থহীন হয়ে পড়ত।†

সংশয়বাদ খণ্ডন করতে গিয়ে নরমপন্থী দৃষ্টিবাদীরা বলেন যে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান সম্ভব। তবে এ জ্ঞান যুক্তিবিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ গণিতেই সীমাবদ্ধ। বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান সম্ভব নয়। এ মত সংশয়বাদীদের দাবীর একাংশ মেনে নেয়। মেনে নেয় যে, বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়। আর লক্ ও হিউমের দৃষ্টিবাদ মানলে ত অহংসর্বস্ববাদও মেনে নিতে হয়। কোনো কোনো নব্য দৃষ্টিবাদী এজন্য বলেন যে পরতসিদ্ধ আপতিক বাক্যও সুনিশ্চিত হতে পারে। তারা বলেন— মৌল বাক্যগুলি বাস্তব-ব্যাপার-বিষয়ক হলেও নিঃসন্দিগ্ধ।**

4. বুদ্ধিবাদ

দৃষ্টিবাদীরা বলেন— সব জ্ঞানের, অন্তত বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞানের, উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। বুদ্ধিবাদ এ মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডন প্রচেষ্টা। এটা বুদ্ধিবাদের নেতিবাচক দিক। এ দিকের উপর জোর দিয়ে কেউ কেউ বলেন যে বুদ্ধিবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব সম্পর্কে "দার্শনিক অনাস্থা"। বুদ্ধিবাদের উত্তরপক্ষীয় বক্তব্য হল: সব জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য নয়, বুদ্ধিও একটি স্বতন্ত্র বোধ এবং ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে বুদ্ধি (বা প্রজ্ঞা) অধিকতর নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎস।

এটা বুদ্ধিবাদের ন্যূনতম লক্ষণ; সর্বপ্রকারের বুদ্ধিবাদ সম্পর্কে এ লক্ষণ

---

* এ প্রসঙ্গে নবম অধ্যায় ষষ্ঠ ও নবম (3) বিভাগ দ্রষ্টব্য। ওখানে দৃষ্টিবাদী বিজ্ঞানতত্ত্ব আরো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

† নবম অধ্যায়, ষষ্ঠ বিভাগ দ্রষ্টব্য। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ প্রসঙ্গে আরও বিশদভাবে আলোচ্য মতবাদ সমালোচিত হয়েছে।

** যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ প্রসঙ্গে দৃষ্টিবাদী মূল্যতত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়, পঞ্চম বিভাগ দ্রষ্টব্য।

খাটে। "সর্বপ্রকারের বুদ্ধিবাদ" বলার তাৎপর্য হল এই : বুদ্ধিবাদের নানান রূপ, যথা নরমপন্থী ও চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ। আবার, অন্য এক দিক থেকে তিন প্রকারের বুদ্ধিবাদের কথা বলা হয় : (ক) আধিবিদ্যক বুদ্ধিবাদ—এ মতের প্রধান মুখপাত্র প্লেটো ও হেগেল্, (খ) গাণিতিক বুদ্ধিবাদ—এ মতের প্রধান প্রবক্তা দেকার্ত্, স্পিনোজা ও লাইবনিট্‌স্, (গ) আকারপ্রধান বুদ্ধিবাদ—এ মতের উদ্ভাবক হলেন কাণ্ট্। কাণ্টের বুদ্ধিবাদকে কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদ বলে গণ্য করা যায় না, এ মতবাদ হল দৃষ্টিবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয়-প্রচেষ্টা। এ জন্য কাণ্টের মতবাদটি সবিচারবাদ (বা বিচারবাদ) নামে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়।

গ্রীক্ দার্শনিক পারমেনাইডিস্, জার্মান দার্শনিক ভলফ্ ও আধুনিক কালের ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লি চরমপন্থী বুদ্ধিবাদের সমর্থক। এঁদের মতে : ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা-ই পাওয়া যায় তাই ভ্রান্ত, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভ্রমপ্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। যাকে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলা হয় তা হল, ব্রাড্‌লির ভাষায়, স্ববিরোধী অবভাস। চরমপন্থীদের মতে বুদ্ধিই একমাত্র জ্ঞান-উৎস। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকদের মধ্যে বুদ্ধির সামর্থ্য ও ইন্দ্রিয়ানুভবের দৌর্বল্য সম্বন্ধে বিস্ময়কর ঐকমত্য দেখা যায়। এঁরা সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদের সমর্থক। হেরাক্লিটাস্ ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি ও অক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন : চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির সাক্ষ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় — বুদ্ধি বলে কিছু না থাকলে এদের কথিত "ভাষা"ই বোঝা যেত না। অর্থাৎ চোখ কান প্রভৃতির সাহায্যে যা পাই, বুদ্ধি দিয়ে তার যাথার্থ্য বিচার না করলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। ইলিয়াটিক্ সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা বলেন : কেবল বুদ্ধি দিয়েই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয় হল ভ্রমপ্রত্যক্ষের জনক। ডেমোক্রিটাস্ ও প্লেটোর মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ— ডেমোক্রিটাস্ জড়বাদী আর প্লেটো ভাববাদী ; কিন্তু এদের মধ্যেও একটা ঐকমত্য দেখি : উভয়েই বলেন—ইন্দ্রিয়ানুভব নয়, বুদ্ধিই সত্যের (জ্ঞানের) উৎস, একমাত্র উৎস।

আধুনিক কালের বুদ্ধিবাদী দেকার্ত, লাইবনিট্‌স্ প্রভৃতি এরূপ চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ প্রচার করেন না, ঠিক। কিন্তু তাঁরাও মনে করেন ইন্দ্রিয়ানুভবের জ্ঞান-দান সামর্থ্য আছে কিনা তা বুদ্ধি দিয়ে নির্ণয় করার দরকার। প্রকৃত নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী হলেন কাণ্ট্।

বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধিবাদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও কয়েকটি মৌল তত্ত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবাদীর মধ্যে ঐকমত্য আছে। বলা বাহুল্য, সর্বপ্রকারের বুদ্ধিবাদ স্বীকৃত এ তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল এদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ। এ জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদই বুদ্ধিবাদের ন্যূনতম লক্ষণ। এ মতবাদ থেকে আরও কয়েকটি বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব নিঃসৃত হয় : যুক্তিবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, বিজ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব, আধিবিদ্যক তত্ত্ব, মূল্যবিষয়ক তত্ত্ব, মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সংশয়বাদবিরোধী তত্ত্ব। বুদ্ধিবাদের পরিপূর্ণ রূপের যথার্থ ধারণা পেতে হলে

এ তত্ত্বগুলির প্রত্যেকটির পৃথক আলোচনার দরকার। তত্ত্বগুলি পর পর আলোচনা করা হল।

(1) জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ

বুদ্ধিবাদীরা বলেন: বুদ্ধি, মনন বা প্রজ্ঞা একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানোৎস। এবং বুদ্ধির সাহায্যে আমরা এক বিশেষ প্রকারের সত্য (জ্ঞান) লাভ করি। এ সত্য বাস্তব-ব্যাপার-বিষয়ক সত্য থেকে ভিন্ন, এবং উন্নততর॥

বুদ্ধির বা প্রজ্ঞার সাহায্যে যে সত্য পাওয়া যায় তাকে বলে প্রজ্ঞাসিদ্ধ সত্য। প্রজ্ঞাসিদ্ধ সত্য বাস্তব-ব্যাপার-বিষয়ক সত্য থেকে উন্নততর সত্য। এ রূপ সত্য কেবল বস্তুত-সত্য নয়; অনিবার্য, অবশ্যম্ভব সত্য। আলোচ্য মতে অন্তর্দৃষ্টি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে এ জাতীয় সত্য বাক্যের স্বতঃপ্রকাশতা বা অবশ্যম্ভতা "দেখা"ই সত্যাসত্য নির্ণয়ের মানদণ্ড। গাণিতিক বাক্য স্বতঃপ্রকাশ, প্রজ্ঞাসিদ্ধ এবং অবশ্যম্ভবভাবে সত্য। যথা, "2 + 2 = 4", "যদি ক = খ হয় তাহলে খ = ক" —এ জাতীয় বাক্যের সত্যতা স্বপ্রকাশ। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এদের সত্যতার উপলব্ধি হয়।

ওপরে যা বলা হল তা নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী জ্ঞানতত্ত্ব। চরমপন্থীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন: সব সত্যই প্রজ্ঞাসিদ্ধ, সব প্রকৃত জ্ঞানই প্রজ্ঞা-লব্ধ ও প্রজ্ঞালভ্য। গণিতই জ্ঞানের আদর্শ। গণিত চর্চা করে যে স্বপ্রকাশ, অবশ্যম্ভব জ্ঞান লাভ করি তাই জ্ঞান। বাস্তব-জগত-সংক্রান্ত 'জ্ঞান' প্রকৃত জ্ঞান বলে গণ্য নয়। গাণিতিক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, গণিত ভিন্ন অন্য 'বিজ্ঞান' প্রকৃত বিজ্ঞান নয়—এ মতবাদকে বলে গাণিতিক বুদ্ধিবাদ। দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিট্স্— এরা সকলে গাণিতিক বুদ্ধিবাদের সমর্থক।

(2) যুক্তিবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

চরমপন্থী বুদ্ধিবাদের একজন প্রবক্তা হলেন ভল্‌ফ্। ইনি বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক বাক্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেন। এঁর মতে— সব বাক্যকেই প্রজ্ঞাসিদ্ধ বাক্যে, সব সত্যকে প্রজ্ঞাসিদ্ধ সত্যে, সব জ্ঞানকেই প্রজ্ঞাসিদ্ধ জ্ঞানে, রূপান্তরিত করা যায়। এ মতবাদ অনুসারে— জ্ঞানমাত্রই প্রজ্ঞাসিদ্ধ।

বুদ্ধিবাদী লাইবনিট্স্ সত্যকে দু ভাগে ভাগ করেছেন: ব্যাপারবিষয়ক সত্য ও প্রজ্ঞাসিদ্ধ সত্য। নরমপন্থী বুদ্ধিবাদীরা লাইবনিট্স্-কৃত এ পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁরা এ কথা মানেন যে, ব্যাপারবিষয়ক জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসিদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন জাতের জ্ঞান। নরমপন্থীরা এ কথা বলেন না যে— জ্ঞানমাত্রই প্রজ্ঞা-সিদ্ধ। তাঁরা স্বীকার করেন যে, ব্যাপারবিষয়ক জ্ঞানকে প্রজ্ঞাসিদ্ধ জ্ঞানে রূপান্তরিত করা যায় না। দার্শনিক হিউম্‌ও লাইবনিট্স্-এর মত দু রকম জ্ঞান বা বাক্যের কথা বলেন: বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত বাক্য ও ধারণার সম্বন্ধ সংক্রান্ত বাক্য*। (হিউমের ধারণার সম্বন্ধ সংক্রান্ত বাক্য = লাইবনিট্স্-এর প্রজ্ঞাসিদ্ধ বাক্য।)

* সংক্ষেপে, ধারণাসংক্রান্ত বাক্য।

কিন্তু দৃষ্টিবাদী হিউমের মতেঃ ধারণাসংক্রান্ত বাক্য বা প্রজ্ঞাসিদ্ধ বাক্য মাত্রই বিশ্লেষক, এ জাতীয় বাক্য বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে কোনো তথ্য জ্ঞাপন করে না। বলা বাহুল্য, কোনো বুদ্ধিবাদী—নরমপন্থী কি চরমপন্থী—এ মত গ্রহণ করতে পারে না। বুদ্ধিবাদী মতে হয় (1) একমাত্র ধারণাবিষয়ক বাক্যেই প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয় (চরমপন্থী মত), নতুবা (2) ধারণাবিষয়ক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় তা, ব্যাপারবিষয়ক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় তার চেয়ে উন্নততর জ্ঞান (নরমপন্থী মত)।

(3) বিজ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব

প্লেটো থেকে লাইবনিট্স্ পর্যন্ত সব বুদ্ধিবাদী বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন তা এভাবে ব্যক্ত করা যায়ঃ

(ক) প্রকৃত জ্ঞান হল অবশ্যম্ভব সত্যের জ্ঞান, প্রজ্ঞাসিদ্ধ বা পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান। যাকে বাস্তব জগত সংক্রান্ত জ্ঞান বলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে "বিশ্বাস" (চরমপন্থী মত)। কিন্তু বিশ্বাস প্রকৃত জ্ঞান নয়; বিশ্বাস ও জ্ঞানের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বর্তমান। বিশ্বাস অনিশ্চিত, সংশয়যোগ্য ও সংশোধনীয়; কিন্তু জ্ঞান (প্রকৃত জ্ঞান) সুনিশ্চিত, নিঃসন্দিগ্ধ ও অসংশোধনীয়।

(খ) প্রকৃত বিজ্ঞান হল অবরোহী। প্রকৃত বিজ্ঞানের সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলি বিশুদ্ধ "অবরোহী তন্ত্র"-এর* আকারে সুবিন্যস্ত হতে পারে। এরূপ অবরোহী তন্ত্রের হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে, স্বতঃসিদ্ধ ও উপপাদ্যের মধ্যে, প্রসক্তি বা সংসক্তির সম্বন্ধ বর্তমান। এরূপ বিজ্ঞানের সূত্র ও উপপাদ্যের সত্যতা এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি বা বৌদ্ধিক স্বজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞাত হতে পারে।

(গ) বিজ্ঞানের আদর্শ হল গণিত। (নির্ভুল) গাণিতিক বাক্যেই প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয়। প্রাকৃত বিজ্ঞানে, যথা প্রাণিবিদ্যায়, উদ্ভিদবিদ্যায়, চিকিৎসাবিদ্যায়, যে সব উক্তি করা হয় তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য নয়। কাজেই এ জাতীয় বিজ্ঞান "প্রকৃত বিজ্ঞান" আখ্যায় অভিহিত হবার অযোগ্য।

(4)—(5) অধিবিদ্যা, অবশ্যম্ভবতা ও মূল্য

চরমপন্থী বুদ্ধিবাদের আধিবিদ্যক তত্ত্ব হল এইঃ যাকে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগৎ বলি তার চরম সত্ত্ব নেই। এ জগৎ সম্পূর্ণরূপে সৎ নয়। এ জগৎ ব্রহ্মের অবভাস, এবং শেষ পর্যন্ত অসৎ। এ জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকতে পারে, কিন্তু চরম সত্তা বা পারমার্থিক সত্তা নেই।

এবং এ-জগৎ-সংক্রান্ত বাক্যে, বাস্তব-ব্যাপার-বিষয়ক বাক্যে, প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয় না। এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না, চরম সত্ত্বের জ্ঞান দিতে পারে না॥

---

* অবরোহী তন্ত্র—deductive system

বুদ্ধিবাদীরা যে চরম সত্তের কথা বলেন সে সত্ত্ব হল বিশুদ্ধ চৈতন্য; ব্যক্তি চৈতন্য নয়, সার্বিক চৈতন্য।* বুদ্ধিবাদীদের মতেঃ অধিবিদ্যা হল বস্তুর 'সার' বা মর্মের আলোচনা। বিজ্ঞান বাস্তবজগতের বহিরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে, সুতরাং প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। কিন্তু অধিবিদ্যা অবভাসের অতিবর্তী যে পরম সত্ত্ব তা অনুসন্ধান করে।

নরমপন্থী বুদ্ধিবাদীদের মতে অবশ্যম্ভবতা ও মূল্য হল বস্তুগত ধর্ম। দৃষ্টিবাদীদের সমালোচনা করে এ'রা বলেন যে অবশ্যম্ভবতা বিষয়ীগত ব্যাপার নয়, বা আমাদের ভাষাসংক্রান্ত বিধান অবশ্যম্ভবতার উৎস নয়। আবার মূল্য বলতে কেবল আমাদের পছন্দ অপছন্দ, অনুমোদন অননুমোদন বোঝায় না। মূল্য ও অবশ্যম্ভবতা বিষয়গত ধর্ম, কিন্তু ইন্দ্রিয়গম্য নয়। কেবল বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাতেই মূল্য ও অবশ্যম্ভবতা ধরা দেয়।

(6) মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

বুদ্ধিবাদীদের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দু দিক। প্রথমত, বুদ্ধিবাদীরা সহজাত ধারণার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বিভাগে; এর প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ এ প্রসঙ্গে পঠনীয়।) দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিবাদীরা মনে করেনঃ ইন্দ্রিয়ানুভব ও সাধারণ চিন্তাশক্তি ছাড়াও বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা, তাদের ভাষায়—"বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা", বলে আমাদের একটি স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি বা সামর্থ্য আছে। এরা বলেন, প্রকৃত জ্ঞানের, অবশ্যম্ভব জ্ঞানের, ভিত্তি হল স্বপ্রকাশ সত্যের বৌদ্ধিক অবধারণ। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন যে, স্বজ্ঞা ছাড়া সামান্য (ধারণা) বা বিশুদ্ধ আকারের বোধ ব্যাখ্যা করা যায় না।

(7) সংশয়বাদবিরোধী তত্ত্ব

বুদ্ধিবাদী ও দৃষ্টিবাদী—এ দু সম্প্রদায়ের দার্শনিকরাই সংশয়বাদের তীব্র বিরোধিতা করেন।

বুদ্ধিবাদীরা মনে করেনঃ গাণিতিক বাক্য অবশ্যম্ভবভাবে সত্য। কাজেই—সব কিছুই সংশয় করা যায়; নিঃসন্দিগ্ধ, সুনিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়—এ মতবাদ বুদ্ধিবাদীরা মানতে পারেন না। তারপর, কোনো কোনো বুদ্ধিবাদী মনে করেনঃ কেবল গাণিতিক বাক্যই নয়, বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধেও নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে-সত্য বাক্য পাওয়া যায়। দেকার্ত বলেনঃ তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম যে সব কিছুই সন্দেহ করা যায়। ধরা যাক, আমি সব কিছুই সন্দেহ করছি। কিন্তু, তাহলে, সন্দেহ যে করছি—এ ব্যাপারে আর কোনো সংশয় হতে পারে না। কাজেই, 'আমার সন্দেহ হয়'—এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে আমি, সংশয়ী ব্যক্তি, আছি। এজন্য দেকার্ত বলেনঃ চিন্তয়ামি তস্মাৎ অস্মি, cogito ergo sum—আমি চিন্তা করি (বা সংশয় করি) কাজেই আমি

* ব্রহ্মবাদী হেগেলের মত দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত, হেগেল্ আধিবিদ্যক বুদ্ধিবাদী।

আছি। দেকার্তের এ উক্তির তাৎপর্য হল: আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আত্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞানের প্রমাণ, আমার আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কোনো হেতুর দরকার হয় না। কাজেই আর কিছু যদি নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে নাও জানতে পারি, অন্তত এটুকু আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানি যে আমি আছি॥ সুতরাং কোনো কিছু সম্বন্ধে সংশয়াতীতভাবে জ্ঞান হতে পারে না —এ চরম-সংশয়বাদী উক্তি গ্রাহ্য নয়।

5. সবিচারবাদ[1]

কাণ্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ সবিচারবাদ (বা বিচারবাদ) নামে খ্যাত। কাণ্টের মতে: বুদ্ধিবাদ ও দৃষ্টিবাদ —এ মতবাদ দুটির কোনোটিই জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। দুটি মতই একদেশদর্শী, নির্বিচারী মতবাদ॥ কাণ্ট বলেন: কেবল অনুভবের দ্বারা জ্ঞান হয় না, আবার কেবল বুদ্ধির দ্বারাও জ্ঞান হয় না। তবে অনুভব ও বুদ্ধি দুই জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত— ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া জ্ঞান হয় না (দৃষ্টিবাদী মতের আংশিক সমর্থন), আর বুদ্ধি ব্যতিরেকেও জ্ঞান হয় না (বুদ্ধিবাদী মতের আংশিক সমর্থন)।

বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন যে কেবল বুদ্ধিক্রিয়ার ফলেই জ্ঞান হতে পারে। বুদ্ধিবাদীদের এ দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কাণ্ট্ বলেন: ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া (প্রাকৃত) জ্ঞান হতে পারে না (অনুভব না হলে জ্ঞানের উপাদান পাব কি করে?)। এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাণ্ট্ দৃষ্টিবাদীদের মূল কথা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু দৃষ্টিবাদীরা কেবল এ দাবী করেন না যে, ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে জ্ঞান হতে পারে না; তারা এ দাবীও করেন যে: কেবল ইন্দ্রিয়ানুভব থেকেই জ্ঞান হয়। এ শেষোক্ত উক্তির প্রতিবাদ করে কাণ্ট্ বলেন: কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারাই জ্ঞান হয় না। অনুভব জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত হলেও পর্যাপ্ত সর্ত নয়॥ একটা উদাহরণ: এ পাতাটা সবুজ —এ বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয়েছে তা কি কেবল অনুভব দিয়েই পাওয়া যায়? সবুজ পাতাটির দিকে তাকালে কেবল চোখ দিয়ে, কেবল অনুভবে, কিছু একটা পাই ঠিক। যা পাই তাকে বলে আভাস বা, হালের দার্শনিকদের ভাষায়, ইন্দ্রিয়োপাত্ত। কিন্তু কেবল চোখ দিয়ে কি জানা যায় যে —এটা একটা পাতা, পাতাটি সবুজ?* পাতা, সবুজ —এসব সামান্য ধারণা। স্পষ্টতই কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই, সামান্যের জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞান হতে গেলে বুদ্ধির প্রয়োজন। বুদ্ধি অনুভবলব্ধ আভাসগুলিকে সুসংবদ্ধ করে, বুদ্ধির

1. Criticism

* এ পাতাটি সবুজ —এ জ্ঞান কেন কেবল-ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না, তার বিশদ ও অসাধারণ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার জন্য অবশ্য দ্রষ্টব্য: রাসবিহারিদাস-কৃত কাণ্টের দর্শন, 27-29 পৃ:।

ক্রিয়া (সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি) ছাড়া অনুভব জ্ঞানে পরিণত হতে পারে না। এখানে কাণ্ট্ বুদ্ধিবাদী মত অংশত সমর্থন করছেন।

কাণ্টের মতে—ইন্দ্রিয়দত্ত আভাস সুসংবদ্ধ না হলে জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হতে পারে না। এখন কেবল বুদ্ধিই আভাসাবলীকে সুসংবদ্ধ করতে পারে। সুতরাং বলা যায় বুদ্ধিই জ্ঞানের বিষয় সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে যা পাই (আভাস) তাতে আমাদের জ্ঞান হয় না, আমাদের ভেতর থেকেও কিছু (বুদ্ধিদত্ত প্রকার) দিতে হয়। আমাদের বুদ্ধিক্রিয়া ব্যতীত ইন্দ্রিয়ানুভব কখনই জ্ঞানে পরিণত হতে পারে না। সংক্ষেপে, কাণ্টের বক্তব্য হল ঃ শুধু ইন্দ্রিয়ানুভব দ্বারাই জ্ঞান হয় না এবং শুধু বুদ্ধির দ্বারাও জ্ঞান হয় না ; জ্ঞানের জন্য দুইই আবশ্যক। "জ্ঞান হওয়া" মানে ঃ কেবল বাইরের থেকে কিছু পাওয়া নয়, বুদ্ধির নিজে থেকেও কিছু দেওয়া।* কাণ্ট্ বলেন জ্ঞানশক্তির দুটি প্রকার ঃ সংবেদনশক্তি ও বোধিশক্তি (বা বুদ্ধি)। সংবেদন শক্তির দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ের সাক্ষাৎকার বা অনুভব হয় (সংবেদনজন্য সাক্ষাৎকারকেই অনুভব বলে)। এ শক্তি পরতঃক্রিয়, অর্থাৎ এ শক্তি নিজে থেকে কোনো জ্ঞান, এমন কি আভাস, সৃষ্টি করতে পারে না, কেবল কিছু নিতে পারে। কোনো বাহ্য বস্তুর ক্রিয়ার ফলে আমাদের কোনো ইন্দ্রিয় উদ্দীপ্ত হলে তবেই সংবেদন হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি স্বতঃক্রিয়, অর্থাৎ বুদ্ধি নিজে থেকে কিছু দিতে পারে। বুদ্ধির ক্রিয়া নিজে থেকেই হয় বলে বুদ্ধিকে স্বতঃক্রিয় বলা যায়। সংবেদনলব্ধ আভাসগুলিকে বুদ্ধি নানানভাবে সম্বদ্ধ করে, প্রকারিত করে। এবং ফলে জ্ঞান সম্ভব হয়।

কাণ্ট্ জ্ঞানের আকার ও উপাদানের কথা বলেন। জ্ঞানের উপাদান আসে অনুভব থেকে আর আকার আসে বুদ্ধি থেকে। অনুভবেরও দুটি পূর্বতসিদ্ধ আকার আছে ঃ দেশ ও কাল। অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ দেশপরিচ্ছিন্ন ও কালপরিচ্ছিন্ন হয়েই আমাদের অনুভবে আসে। দেশবোধ ও কালবোধ পদার্থের অনুভব থেকে আসে না, আমাদের দেশবোধ ও কালবোধ পূর্বতসিদ্ধ, সকল প্রকার অনুভবের আগেই আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে।* এখন অনুভব লব্ধ পদার্থ বৌদ্ধিক প্রকারে প্রকারিত হলে তবেই জ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে। বৌদ্ধিক প্রকার বলতে বোঝায়—দ্রব্য, গুণ, কারণ, এক, বহু —এসব প্রকার। বৌদ্ধিক প্রকারে প্রকারিত না হলে অনুভূত পদার্থ অনেকটা অনির্বাচ্য ও অনির্দেশ্য অবস্থায় থাকে। তাকে এক বা বহু, কার্য বা কারণ কিছুই বলা যায় না। বৌদ্ধিক প্রকারের প্রয়োগ ছাড়া, বুদ্ধিক্রিয়া ছাড়া, কেবল অনুভবের দ্বারা কোনো প্রাকৃত জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞানের বিষয় বুদ্ধিদত্ত দ্রব্যগুণাদি প্রকার নিয়েই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।*

দৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ হল এই যে দৃষ্টিবাদ জ্ঞানের অবশ্যম্ভবতা ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোনো কোনো বাক্যে যে পূর্বতসিদ্ধ

* কাণ্টের দর্শন : রাসবিহারি দাস, পৃঃ 10, 30, 57।

অবশ্যম্ভব জ্ঞান ব্যক্ত হয় তা অস্বীকার করা যায় না। (বস্তুত মীল্‌ হেন দু একজন অতি-উগ্র দৃষ্টবাদী ছাড়া কেউ একথা অস্বীকার করেন না।) যথা, (কাণ্ট্‌ প্রদত্ত উদাহরণ ঃ) সব জড়পিণ্ডের বিস্তার আছে, সব কার্যের কারণ আছে—এ সব পূর্বতসিদ্ধ বাক্য। অবশ্যম্ভবতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃষ্টবাদী হিউম বলেন ঃ পূর্বতসিদ্ধ (অবশ্যম্ভব) বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক, কাজেই এ জাতীয় বাক্যে কোনো প্রাকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয় না, এ জাতীয় বাক্যে কোনো জাগতিক ব্যাপার বর্ণিত হয় না। সুতরাং অনুভবে অবশ্যম্ভবতা পাওয়া যায় না—এ অভিযোগ উঠতে পারে না॥ হিউমের মতে পূর্বতসিদ্ধ (অবশ্যম্ভব) বাক্যে কেবল কোনো শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়, ভাষাবিষয়ক উক্তি করা হয়। হিউমের এ মত মানলে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলতে যা বুঝি তা, অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে অবশ্যম্ভব জ্ঞান, সম্ভব নয়। কাণ্ট্‌ কিন্তু মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই জ্ঞানের আদর্শ, আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সার্বিক ও অবশ্যম্ভব, এবং এ জ্ঞান ব্যক্ত হয় পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্যে। পূর্বতসিদ্ধ বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক —এ উক্তির সমালোচনা করে কাণ্ট্‌ বলেন ঃ কোনো বাক্য পূর্বতসিদ্ধ হলেই তা বিশ্লেষক হবে—এ কেমন কথা? প্রাকৃত জগত সম্বন্ধে এমন বহু উক্তি করা যায় যা সংশ্লেষক ও পূর্বতসিদ্ধ। কাণ্টের মতে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় যেসব সত্য বাক্যের সন্ধান পাই তা পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক, যথা ঃ

$5+7=12$

সরল রেখা হল দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম দূরত্ব

প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে

এ সব বাক্য যে পূর্বতসিদ্ধ ও সংশ্লেষক—এ সম্বন্ধে কাণ্টের কোনো সংশয় নেই। কিভাবে এ জাতীয় বাক্য (বা জ্ঞান) সম্ভব—এটাই কাণ্টের সমস্যা। বস্তুত তাঁর "বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার" নামক গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বিষয়বস্তু হল উক্ত সমস্যা।

এ কথা দৃষ্টবাদীরাও মানবেন যে গাণিতিক বাক্য পূর্বতসিদ্ধ। কিন্তু এসব বাক্য কি বিশ্লেষক? কাণ্টের উত্তর ঃ না, অবশ্যই এসব বিশ্লেষক নয়, এসব সংশ্লেষক। একটা উদাহরণ ঃ $5+7=12$, এখানে '$5+7$' উদ্দেশ্য আর '12' বিধেয়। কিন্তু উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করে বিধেয়টি পাওয়া যায় না। 5, 7 বা $5+7$-এর মধ্যে 12 খুঁজে পাওয়া যায় না; পাঁচ, সাত ও যোগের কল্পনাতেই বারো-এর কল্পনা এসে যায় না। সেরকম, একথা বলা যায় না যে "সরল রেখা হল দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম দূরত্ব" এ বাক্যে কেবল "সরল রেখা" কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ব্যক্যের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বিধেয়টি পাওয়া যায় না, "সরলরেখা"র লক্ষণার্থের মধ্যে "......হ্রস্বতম দূরত্ব"-এর অর্থ নিহিত নেই। 'রেখার সরলতা' বলতে বুঝি এক গুণ, আর 'দূরত্বের হ্রস্বতা' বলতে অন্য গুণ।

6. স্বজ্ঞাবাদ[1]

দৃষ্টিবাদীদের মতে জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব, বুদ্ধিবাদীদের মতে—বুদ্ধি। আর কাণ্ট্ বলেন, ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধি—এ দুয়ের সহযোগিতা ছাড়া জ্ঞান হতে পারে না। আবার কেউ কেউ বলেনঃ কোনো কোনো জ্ঞানের উৎস হল স্বজ্ঞা বলে এক বিশিষ্ট প্রকারের বোধ। যারা এ মত পোষণ করেন তাদের বলে স্বজ্ঞাবাদী।

তাহলে জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা চারটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাইঃ দৃষ্টিবাদী, বুদ্ধিবাদী, দৃষ্টি-বুদ্ধিবাদী (বা বিচারবাদী) আর স্বজ্ঞাবাদী। মনে রাখতে হবে, এ মতবাদগুলির সব কয়টি পরস্পরবিরোধী নয়। যেমন, বুদ্ধিবাদীরা সাধারণভাবে এক বিশেষ প্রকারের স্বজ্ঞাবাদী মত সমর্থন করেন, কেননা তারা মনে করেন স্বজ্ঞা এক বিশিষ্ট প্রকারের বুদ্ধি; এবং এজন্য তারা "বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা"র কথা বলেন। অপরপক্ষে, অনেক স্বজ্ঞাবাদী (যথা বের্গসোঁ) বুদ্ধিবাদের ঘোরতর বিরোধী।

"স্বজ্ঞা"র বিভিন্ন অর্থ

"স্বজ্ঞা" কথাটি নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমনকি "স্বজ্ঞা" বলতে অনেক সময় ইন্দ্রিয়ানুভবও বোঝায়। এজন্য অনেক সময় "আনুভবিক স্বজ্ঞা"র কথা বলা হয়। কাজেই প্রথমেই "স্বজ্ঞা" শব্দটির বিভিন্ন অর্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

ব্যাপকতম অর্থে 'স্বজ্ঞা' বলতে বোঝায়ঃ সাক্ষাৎ প্রতীতি বা অপরোক্ষ অনুভব। এ রকম ব্যাপক অর্থে ইন্দ্রিয়ানুভবও স্বজ্ঞা বলে গণ্য। 'প্রতীতি' বা 'অনুভব' বলতে সংবেদন, জ্ঞান, মরমিয়াদের* একাত্মবোধ প্রভৃতি বিজাতীয় মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থা বোঝায়, কাজেই এসবও 'স্বজ্ঞা' পদবাচ্য। বস্তুত কাণ্ট্ সংবেদনজন্য জ্ঞানকে, আবার দেশকালের জ্ঞানকেও, স্বজ্ঞা বলে অভিহিত করছেন। "স্বজ্ঞা" শব্দটিকে এমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে স্বজ্ঞা সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে প্রায় কিছুই বলা যায় না—এ অর্থে সংবেদনও স্বজ্ঞা, মরমিয়াদের একাত্মবোধও স্বজ্ঞা। বস্তুত "স্বজ্ঞা" শব্দটি আরও অনেক সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহলেও শব্দটির অন্তত চারটি ভিন্ন অর্থ লক্ষিত হয়।

(1) স্বজ্ঞা বলতে বোঝায় অহেতুক (অ-সমর্থনযোগ্য) সত্য বিশ্বাস, অন্ধ নিশ্চিতিবোধ—যে বিশ্বাস বা বোধের কোনো কারণ বা হেতু খুঁজে পাই না। এ অর্থে স্বজ্ঞা একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট নিশ্চিতিবোধ মাত্র। যথা, ক ব্যক্তির "মন বলে" যে খ ঘটনাটি ঘটেছে বা ঘটবে (অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বা হবে) এবং বস্তুত ঘটনাটি ঘটল; এ রকম ক্ষেত্রে বলা হয়—ক স্বজ্ঞায় জানতে পেরেছিল যে অমুক ঘটনা ঘটবে বা ঘটেছে। উক্তরূপ স্বজ্ঞা জ্ঞানতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়; কেননা এ জাতীয় স্বজ্ঞার ফলে যে বিশ্বাস হয় তা সত্য হলেও জ্ঞান বলে বিবেচিত হয় না। কাজেই "স্বজ্ঞা"র এ অর্থ বা এ প্রকারের স্বজ্ঞা নিয়ে আমরা আর আলোচনা করব না।

---

1. Intuitionism * মরমিয়া=mystics

(2) স্বজ্ঞা বলতে বোঝায়ঃ সামান্যের অপরোক্ষ জ্ঞান। এখানে "অপরোক্ষ জ্ঞান" মানেঃ যে জ্ঞান থাকলেও জ্ঞাত-সামান্যের লক্ষণ দেওয়া যায় না— এমন জ্ঞান। যারা "স্বজ্ঞা" কথাটি এ-অর্থে ব্যবহার করেন তারা বলেন যে সামান্যের জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে হলে স্বজ্ঞা বলে একটা বিশেষ বোধ মেনে নেওয়া দরকার। তাদের মতেঃ স্বজ্ঞাতে সামান্যের জ্ঞান হতে পারে, যথা রক্তবর্ণের বস্তু দেখলে রক্তত্বের স্বজ্ঞা হয়, রক্তবর্ণ বস্তুকে (বা রক্তত্বকে) শ্বেতবর্ণ বস্তু (বা শ্বেতত্ব) থেকে পৃথক করতে পারি, অথচ রক্তত্ব শ্বেতত্বের লক্ষণ দিতে পারি না।

(3) স্বজ্ঞা বলতে বোঝায়ঃ অপরোক্ষ বাচনিক জ্ঞান। এখানে অপরোক্ষ মানেঃ অনুমানগম্য-নয় এমন। "স্বজ্ঞা হল বাচনিক জ্ঞান" এ কথার অর্থ স্বজ্ঞাগত জ্ঞানের আকার এরূপ— আমি স্বজ্ঞায় জানি যে ব। যারা স্বজ্ঞা কথাটি এ অর্থে ব্যবহার করেন তাদের মতে—পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়োপাত্ত, মনোবৃত্তি প্রভৃতি সংক্রান্ত সাক্ষাৎ বাচনিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করার জন্য স্বজ্ঞা বলে এক বিশিষ্ট বোধ স্বীকার করার দরকার।

সব কার্যের কারণ আছে, যদি ক খ-এর সমান হয় এবং খ গ-এর সমান হয় তাহলে ক গ-এর সমান, আমার বুকে ব্যথা, ওখানটা লাল দেখায় —এ সব বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় তা আলোচ্য অর্থে 'স্বজ্ঞা' বলতে যা বোঝায় তার দৃষ্টান্ত। আরিস্টটল্‌ বলেনঃ প্রত্যেক বস্তুর একটা আকার একটা উপাদান আছে। আকার বা সামান্য ধরা দেয় বৌদ্ধিক স্বজ্ঞাতে। একটি লাল ও একটি নীল দাগ প্রত্যক্ষ করলে কেবল এ জ্ঞান হয় না যে— এ দাগটি ঐ দাগ থেকে ভিন্ন; সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞানও হয় যে—সব লাল দাগ সব নীল দাগ থেকে ভিন্ন॥ আরিস্টটলের মতে শেষোক্ত জ্ঞানের উৎস হল বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা। প্রসঙ্গত, এভাবে সামান্যের জ্ঞান লাভ করাকে আরিস্টটল্‌ স্বজ্ঞাগত-সামান্যীকরণ[1] বলে অভিহিত করেছেন।

(4) স্বজ্ঞা বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়-বুদ্ধির অগম্য কোনো পদার্থের অপরোক্ষ অবাচনিক-জ্ঞান[2]। এ অর্থে "ক পদার্থের স্বজ্ঞা হওয়া" অর্থঃ ক-কে জানা— ক-কে ইন্দ্রিয়ানুভব বা বুদ্ধির অতিরিক্ত কোনো বোধে জানা। এ অর্থে স্বজ্ঞা বস্তুজ্ঞান, ব্যাপারজ্ঞান (বা বাচনিক জ্ঞান) নয়।* মরমিয়ারা যখন স্বতঃ উদ্ভাসিত স্বপ্রকাশিত জ্ঞানের কথা বলেন, তখন তারা আসলে স্বজ্ঞার কথাই বলেন; এ অর্থেই তারা মানুষের ঈশ্বরস্বজ্ঞার কথা বলেন। বের্গসেঁা এ অর্থেই কালবিস্তারের, চিরচঞ্চল-গতির বা প্রাণচাঞ্চল্যের স্বজ্ঞার কথা বলেন। এ অর্থেই ফিস্‌টে অতিবর্তী-অহং-এর স্বজ্ঞার কথা বলেন, আর হুসারল্‌ বস্তুর সারধর্মের স্বজ্ঞার কথা বলেন।

আলোচ্য অর্থে স্বজ্ঞা—কোনো অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট নিশ্চিতিবোধমাত্র (প্রথম অর্থ) নয়, সামান্যের জ্ঞানও (দ্বিতীয় অর্থ) নয়, আর গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের

1. intuitive induction 2. non-propositional knowledge
* তৃতীয় অধ্যায়, 26-27 পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পূর্বতসিদ্ধের জ্ঞানও (তৃতীয় অর্থ) নয়। এ স্বজ্ঞা এক প্রকারের অন্তর্দৃষ্টি বের্গসোঁর ভাষায়, এক প্রকারের 'বৌদ্ধিক সহানুভূতি'—যার সাহায্যে আমরা পদার্থের অন্তরে প্রবেশ করতে পারি, পদার্থের অন্তঃসত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারি। এ স্বজ্ঞা হল সাক্ষাৎ তত্ত্বদর্শন।

আমরা স্বজ্ঞার তিনটি দার্শনিক অর্থের কথা বলেছি (শেষোক্ত তিনটি অর্থ)। তিনটি অর্থের কথা না বলে, বলতে পারতাম: তিনটি বিভিন্ন হেতুতে স্বজ্ঞা মানা হয়। এ কথাও বলা যায়—স্বজ্ঞাবাদীদের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায় বা মতবাদ দেখতে পাই: সামান্য স্বজ্ঞাবাদী, বাচনিক স্বজ্ঞাবাদী ও সত্ত্বস্বজ্ঞাবাদী মতবাদ (বা সম্প্রদায়)।

সামান্য স্বজ্ঞাবাদীদের দাবী হল: সামান্যের জ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য স্বজ্ঞা বলে একটা বোধ মেনে নেবার দরকার।

বাচনিক স্বজ্ঞাবাদীরা দাবী করেন: কোনো কোনো বাচনিক জ্ঞান, বিশেষত গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্বতসিদ্ধের জ্ঞান, ব্যাখ্যার জন্য স্বজ্ঞা মেনে নেবার দরকার।

আর সত্ত্বস্বজ্ঞাবাদীরা বলেন: বুদ্ধি বস্তুপ্রকৃতি বিকৃত করে, বুদ্ধি দিয়ে পদার্থের অন্তঃসত্তায় অনুপ্রবেশ করা যায় না; কেবল স্বজ্ঞাতে বস্তুর অন্তঃসত্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আমরা এ দাবীগুলি পর পর আলোচনা করব।

(1) সামান্য ও স্বজ্ঞা

সামান্য সম্বন্ধে তিনটি মতবাদের সাক্ষাৎ পাই: নামবাদ, ধারণাবাদ ও বস্তুবাদ; আরও বিশদভাবে বলতে গেলে—নামসর্বস্ববাদ, ধারণাগঠনবাদ ও সামান্যসত্ত্ববাদ।[1]

নামসর্বস্ববাদীদের মতে সামান্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। দুটি (এক জাতীয়) বস্তুর মধ্যে "সামান্যগত একত্ব আছে" মানে নামের একত্ব আছে। যেহেতু সামান্যের কোনো বাস্তব সত্ত্ব নেই, সেহেতু সামান্যের জ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য স্বজ্ঞা বলে কিছু মানবারও দরকার নেই।

নামসর্বস্ববাদীদের মত, ধারণাগঠনবাদীরাও মনে করেন যে বস্তু মাত্রই বিশেষ, সামান্য বলে কোনো বাস্তব পদার্থ নেই। কিন্তু ধারণাগঠনবাদীরা মনে করেন—সামান্য নাম নয়, জ্ঞাতার মনের সৃষ্টি, ধারণা। এ মতেও সামান্যের জ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য ধারণাগঠনক্ষমতা বা বিমূর্তনক্ষমতা, ভিন্ন অন্য কোনো পৃথক বোধ মানার দরকার নেই।

সামান্যসত্ত্ববাদীরা কিন্তু মনে করেন: সামান্যের বাস্তব সত্ত্ব আছে, সামান্যও বিশেষের মত মনোনিরপেক্ষ বাস্তব পদার্থ। এরা আরও মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভব বা বুদ্ধি দিয়ে সামান্যের জ্ঞান হয় না, বৌদ্ধিক স্বজ্ঞাতেই সামান্যের

1. যথাক্রমে: nominalism, conceptualism ও realism (বা conceptual realism) ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় বিভাগ দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান সম্বন্ধ। প্লেটো, আরিস্টটল্ এবং সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদীরা সামান্য প্রসঙ্গে বৌদ্ধিক স্বজ্ঞার কথা বলে থাকেন।

নামসর্বস্ববাদের পরিণত রূপ হল ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদ। এ মতবাদই সঙ্গত বলে মনে হয়। সামান্যের স্বজ্ঞা বলে কোনো বোধ আছে—এ কথা এ মতবাদ মানে না। সামান্য সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদটি এরূপ। ধ সামান্যের সঙ্গে পরিচয় বা "ধ-এর স্বজ্ঞা" বলতে বোঝায়ঃ "ধ" শব্দটি ব্যবহার করার ক্ষমতা। এ মতে যে ব্যক্তি "ধ" শব্দটি (যথাঃ রক্তবর্ণ, সাদা, কলম, গোলাপ —প্রভৃতি শব্দ) ব্যবহার করতে পারে তার সম্বন্ধেই বলা যায় তার ধ-এর ধারণা আছে। যারা সামান্যের স্বজ্ঞার কথা বলেন তাদের মতে ভাষা শেখবার, শব্দ ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করতে পারার পূর্বে আমাদের শ্বেতত্ব, রক্তত্ব, বৃক্ষত্ব, গোত্ব প্রভৃতির বোধ থাকে এবং ভাষা শেখানোর লক্ষ্য হল এ সব পূর্বতসিদ্ধ বোধের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ শব্দের অনুষঙ্গ সৃজন করা। ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদ এ জাতীয় কোনো পূর্বস্থ বোধ স্বীকার করে না। এ মতে "ক ব্যক্তির স সামান্যের জ্ঞান বা স্বজ্ঞা আছে" অর্থঃ ক ব্যক্তি 'স' শব্দটি ব্যবহার করতে শিখেছে। সাধারণভাবে ধারণাগঠনবাদী মত অনুসরণ করে আমরা বলিঃ অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হল এই যে মানুষ ধারণা গঠন করতে জানে; বা স্বজ্ঞাবাদী মতে বলিঃ মানুষের সামান্য-স্বজ্ঞা হয়। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক মতে, মানুষ ও অন্যান্য জানোয়ারের পার্থক্য হল এইঃ মানুষ ভাষা ব্যবহার করতে জানে, অন্যান্য জন্তুরা তা জানে না।

ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদ যদি সত্য হয় তাহলে বলা বাহুল্য সামান্য ব্যাখ্যার জন্য স্বজ্ঞা বলে কোনো বিশিষ্ট বোধ মেনে নেবার দরকার নেই। আর যদি সমান্যসত্ত্ববাদই গ্রহণ করি তাহলেই বা স্বজ্ঞার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে কেন? এ কথা কি বলা যায় না যে মনোনিরপেক্ষ বস্তুগত সামান্য সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভবেই ধরা দেয়? বস্তুত নৈয়ায়িকরা বলেনঃ যে ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় সে ইন্দ্রিয় দিয়েই সে বস্তুস্থিত সামান্যের প্রত্যক্ষ হয়।

(2) বাচনিক জ্ঞান ও স্বজ্ঞা

বাচনিক স্বজ্ঞাবাদীরা বলেন—

যদিঃ ব সত্য হয়

'ব সত্য' এ সত্য বিশ্বাস করা ক-এর পক্ষে সঙ্গত হয় এবং

ব-এর সম্বন্ধে কারও সংশয় হলে তা নিরসনের কোনো উপায় না থাকে

তাহলেঃ বলা যায়— ক স্বজ্ঞায় জানে যে ব।

এ মতে, ব যদি কোনো পূর্বতসিদ্ধ বাক্য হয় অথবা বক্তার মনোবৃত্তি বা অনুভব সংক্রান্ত উত্তম পুরুষের বাক্য হয় তাহলে বলা যায়— আমি স্বজ্ঞায় জানি ব।

স্বজ্ঞাগম্য জ্ঞানের নানান ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রিয়োপাত্তের বা মনোবৃত্তির জ্ঞান—যথা 'এটা সাদা', 'এখানে ব্যথা' এ জাতীয় জ্ঞানের উৎসের

কথা বলতে গিয়ে ঐন্দ্রিয়ক স্বজ্ঞা বা আনুভবিক স্বজ্ঞার কথা বলা হয়। আর পূর্বতসিদ্ধ বাক্য প্রসঙ্গে বৌদ্ধিক স্বজ্ঞার কথা বলা হয়। আরিস্টটল্ ও তাঁকে অনুসরণ করে দেকার্ত প্রভৃতি বুদ্ধিবাদীরা, সাক্ষাৎ বাচনিক জ্ঞানের উৎস দেখাতে গিয়ে স্বজ্ঞা বলে এক বিশেষ প্রকারের মানস সামর্থ্যের কথা বলেন। তবে অনেকটা উগ্র বুদ্ধিবাদী মত গ্রহণ করেছিলেন বলে, দেকার্ত মনে করতেন যে— ঐন্দ্রিয়ক স্বজ্ঞা থেকে যা পাওয়া যায় তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। কাজেই দেকার্ত স্বজ্ঞা বলতে বৌদ্ধিক স্বজ্ঞাই বুঝেছেন।

দৃষ্টিবাদীরা মনে করেন যে পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যা করার জন্য বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা বলে কোনো স্বতন্ত্র মানস শক্তি মানবার দরকার নেই। তাঁদের, বিশেষত নব্য দৃষ্টিবাদীদের, মতে পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান মাত্রই বিশ্লেষক, এ জাতীয় জ্ঞান আয়ত্ত করা মানে— ভাষাবিধানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। যথা 'সব কার্যের কারণ আছে' এ কথা জানা মানে— 'কার্য', 'কারণ' এ শব্দগুলির অর্থ জানা ; এদের অর্থ জানলেই, এ শব্দগুলি নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে শিখলেই, এ কথাও জানা হয়ে যায় যে সব কার্যের কারণ আছে। এ ব্যাখ্যা ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নামে খ্যাত।

বুদ্ধিবাদীরা নব্য দৃষ্টিবাদীদের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সমালোচনা করে বলেন ঃ এ কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল পূর্বতসিদ্ধ ব বাক্যটি সত্য, এ কথা স্বীকার না করলে ভাষাগত প্রথা বা বিধান অগ্রাহ্য করা হয়। যথা, "লাল নীল থেকে পৃথক" এ কথা না মানলে "লাল" ও "নীল"-এর প্রথাগত অর্থ অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল "লাল" ও "নীল" সম্বন্ধে যে প্রথাগত বিধান ("লাল" "ও নীল" এ শব্দ দুটি একই বাক্যের বিধেয় হতে পারবে না —এ বিধান) তা যে সঠিক বিধান তা বুঝব কেমন করে ? যদি এমন ভাষাবিধান থাকত যে 'একই বাক্যে যুগপৎ "লাল", "নীল" প্রভৃতি বর্ণজ্ঞাপক শব্দ বিধেয়রূপে ব্যবহার করা যায়' তাহলে কি আমরা এ বিধান মেনে নিতাম? নিতাম না। কেননা, ভাষা আয়ত্ত করবার পূর্বেকার জ্ঞানের ভিত্তিতেই ভাষা বিধান মেনে নেওয়া হয়। ভাষাবিধান গ্রহণ করবার পূর্বেই আমরা জানি যে ঃ একই বস্তু সম্পূর্ণরূপে যুগপৎ লাল ও নীল হতে পারে না। ভাষা ব্যবহার করেই বর্ণবিরোধিতা সংক্রান্ত জ্ঞানটি ব্যক্ত হল। কিন্তু এ জ্ঞান ভাষা-প্রয়োগ-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, ভাষা ব্যবহার করতে না পারলেও এ জ্ঞান হতে পারে। বুদ্ধিবাদীরা, অর্থাৎ বুদ্ধিবাদ সমর্থক স্বজ্ঞবাদীরা, বলেন

> ক-ব্যক্তি যদি ব জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করতে নাও শেখে তাহলেও বলা যায় যে— ক জানে যে ব।

বুদ্ধিবাদীদের এ দাবী, ভাষাপূর্ব জ্ঞানের দাবী, মেনে নিলে স্বজ্ঞা সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মানা যায় না।

উইট্‌গেন্‌স্টাইন্, রাইল্ প্রভৃতি নব্য চেষ্টিতবাদী[1] দার্শনিকরা কেবল যে ভাষা-

1. behaviourist

পূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন তা নয়, তারা বলেন "জানা" কোনো মানসিক ক্রিয়া নয়, জ্ঞান বা স্বজ্ঞা বলতে কোনো মানস শক্তি বা অবস্থা বোঝায় না। "আমি জানি যে—" বক্তার মনের অবস্থা বোঝায় না। "ক জানে যে ব"—এ কথার অর্থঃ ক বিশেষ অবস্থায় ব বাক্যটি প্রয়োগ করবে।

চেষ্টিতবাদীদের মতামত গ্রহণ করি বা না করি, পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ প্রকারের বোধ মেনে নেবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। মনে হয়, বুদ্ধি এবং ভাষাসংক্রান্ত জ্ঞান দিয়েই পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যা করা যায়।

(3) অবাচনিক জ্ঞান, স্বজ্ঞা ও সাক্ষাৎকার

কোনো কোনো স্বজ্ঞাবাদী 'স্বজ্ঞা' বলতে বোঝেন অবাচনিক সাক্ষাৎকার[1]। তাদের মতে প পদার্থের সাক্ষাৎকার বা স্বজ্ঞা বলতে বোঝায় প-এর অবাচনিক বোধ। এরূপ বোধে প সম্বন্ধে কোনো তথ্য জ্ঞাত হয় না, প সম্বন্ধে 'প হল খ', 'প হল গ' এ আকারের কোনো জ্ঞান হয় না। স্বজ্ঞাবাদীরা বলেন—স্বজ্ঞায় বস্তুর অন্তঃসত্তার সাক্ষাৎ পাই, কাজেই স্বজ্ঞা আবশ্যিকভাবেই অ-বাচনিক ; কেননাঃ সামান্যধারণা প্রয়োগ করে, ভাষা ব্যবহার করে যে জ্ঞান হয় তা বাচনিক, কিন্তু এ জাতীয় জ্ঞান স্বজ্ঞা বলে গণ্য নয়। এ রূপ জ্ঞানে পদার্থের স্বরূপ বিকৃত হয়, জ্ঞাত পদার্থ বিশিষ্ট রূপে ধরা দেয় না, জ্ঞাত পদার্থ তার বিশিষ্টতা হারিয়ে কতকগুলি সামান্যের সংযোগস্থল রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়॥ যথা, আমরা যদি জানিঃ এ বস্তুটি গোলাকার হলদে, নরম, মসৃন—তাহলে জ্ঞেয় বস্তুটিকে বিশিষ্ট বস্তুরূপে জানতে পারলাম কই ? গোলাকার, হলদে রঙ ইত্যাদি ধর্ম ত অসংখ্য বস্তুতে বর্তমান। এ মতের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা বের্গসোঁ। তিনি বলেনঃ বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হয় তা অসম্পূর্ণ—বিমূর্ত, আপেক্ষিক ও বহিরঙ্গবিষয়ক। কেবল স্বজ্ঞাতেই পদার্থের অন্তঃসত্তার সাক্ষাৎকার হয়। স্বজ্ঞাতে যা পাই তা অবাচনিক, অনির্বচনীয়॥

আলোচ্য স্বজ্ঞাবাদের সমালোচনা করে বলা যায়ঃ স্বজ্ঞায় প-এর অবাচনিক বোধ (বস্তুজ্ঞান) হয় অথচ প সম্বন্ধে কোনো বাচনিক জ্ঞান হয় না, "প এমন এমন" এ আকারের কোনো জ্ঞান হয় না—এ কথা মানা যায় না। এরকম কোনো কেবল-পদার্থ-জ্ঞানের সন্ধান পাই না, এ রকম জ্ঞান সম্ভব কিনা তাও ভাববার বিষয়। যখন কোনো কিছুকে জানি, যথা রামকে জানি (চিনি অর্থে) তখনও রাম সম্বন্ধে কিছু না কিছু বাচনিক জ্ঞান হয়। বাচনিক জ্ঞান না হলে কেবল শুদ্ধপদার্থের জ্ঞানও হতে পারে না। এ কথার অর্থ, কোনো পদার্থের অবাচনিক স্বজ্ঞাও হতে পারে না।

স্বজ্ঞা বলে কোনো বিশিষ্ট বোধ যদি থাকেও বা, তাহলে তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত ও অসাধারণ বোধ। ফলে স্বজ্ঞার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ

1. সাক্ষাৎকার=acquaintance

বিজাতীয় জ্ঞান দাবী করতে পারে। বস্তুত বিভিন্ন স্বজ্ঞাবাদী সত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন, এমন কি বিরুদ্ধ, উক্তি করে থাকেন। বের্গসোঁর স্বজ্ঞায় যে সত্ত্ব ধরা দেয় তা অনবচ্ছিন্ন পরিবর্তন, প্রাণচাঞ্চল্য বা কালপ্রবাহ, মরমিয়াদের স্বজ্ঞায় যে সত্ত্ব ধরা দেয় তা এক অখণ্ড আত্মিক সত্তা। আবার সব মরমিয়াই যে স্বজ্ঞায় একই রূপ সত্ত্বের সাক্ষাৎ পান তাও নয়।

স্বজ্ঞা বলে কোনো বিশেষ বোধ (বা শক্তি) থাক বা না থাক, স্বজ্ঞা জ্ঞান পদবাচ্য নয়, কেননা জ্ঞান মাত্রই বুদ্ধি-অনুবিদ্ধ। স্বজ্ঞা জ্ঞান্ নয়, কাজেই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়।

মানবিক বুদ্ধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাণ্ট্ বৌদ্ধিক স্বজ্ঞার কথা তুলেছেন। কাণ্টের মতেঃ মানুষের বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা বলে কোনো বোধশক্তি নেই। আমাদের জ্ঞান হতে গেলে সংবেদন ও বুদ্ধি—এ দুয়েরই দরকার। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবল বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান হয় না। হয়ত ঈশ্বরের কেবল বুদ্ধি জন্য বা স্বজ্ঞাজন্য জ্ঞান হতে পারে॥ কিন্তু স্বজ্ঞা বলে যদি কোনো বোধশক্তি মানুষের থাকত তাহলে আমাদের জ্ঞান কী রূপ গ্রহণ করত কাণ্ট্ তা ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের যদি বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা বলে কোনো বোধ থাকত তাহলেঃ সংবেদন ও বুদ্ধির মধ্যে যে বিভেদ দেখা যায় তা থাকত না, বস্তুত আমাদের জ্ঞানে বিশেষ ও সামান্যের মধ্যে যে ভেদ দেখা যায় সে ভেদ থাকত না। এবং তাহলে বৌদ্ধিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সব কিছু জানা হয়ে যেত। কিন্তু বস্তুত সংবেদন ছাড়া জ্ঞান হয় না, জ্ঞানের আকার ও উপাদানের পার্থক্য অগ্রাহ্য করা যায় না। কাজেই আমাদের বৌদ্ধিক স্বজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি বলে কোনো বিশিষ্ট বোধশক্তি নেই।

নবম অধ্যায়

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ (দৃষ্টসত্ত্ববাদ)*

1. ভূমিকা : ভিয়েনা চক্র

দৃষ্টিবাদ আলোচনাকালে আমরা এ মতবাদটির নব্যরূপের কথা উল্লেখ করেছি। এ রূপটি এখন আরও বিশদভাবে আলোচনা করব। দৃষ্টিবাদের নব্য রূপটি নানান নামে অভিহিত হয়, যথা : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবাদ, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ, সংগতিপূর্ণ দৃষ্টিবাদ ও যৌক্তিক দৃষ্টসত্ত্ববাদ**। এ সব সমার্থক নামের মধ্যে আমরা প্রধানত যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ নামটি ব্যবহার করব। বলা বাহুল্য, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদকে দৃষ্টিবাদের নব্যরূপ বলে বর্ণনা করার অর্থ এই : যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ প্রাচীন দৃষ্টিবাদের পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিণত রূপ।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ মুখ্যত "ভিয়েনা চক্র" নামক দার্শনিক গোষ্ঠীর মতবাদ। উনিশ শ' বাইশ সালে মরিট্‌স্‌ শ্লিক্‌ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরোহী বিজ্ঞানের দর্শন'-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন (প্রসঙ্গত, এর পূর্বে এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রখ্যাত দৃষ্টসত্ত্ববাদী মাখ্‌)। চব্বিশ সালে শ্লিক্‌-কে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় "ভিয়েনা চক্র"। এ গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন : হানস্‌ হান্‌, নয়রাথ্‌, ফিলিপ্‌ ফ্রাঙ্ক্‌, হ্বেইস্‌মান্‌, গেডেল্‌, বের্গ্‌মান্‌ ও ফাইগ্‌ল্‌। এদের সঙ্গে যুক্ত হলেন কারনাপ্‌—যিনি অচিরেই এ দলের মধ্যমণি ও প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠলেন।

কারনাপ্‌, হানস্‌ হান্‌ ও নয়রাথ্‌ "বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি : ভিয়েনা চক্র" নামে যে মেনিফেস্টো রচনা করেন তাতে, বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা কী করে ভিয়েনা চক্রকে প্রভাবিত করে তা বলতে গিয়ে, বলা হয় যে :

হিউম্‌, মীল্‌ ও মাখ্‌-এর মত দৃষ্টিবাদী, হেলম্‌হোলট্‌স্‌, পঁয়েকার ও আইনস্টাইন্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিবিদ্‌, লাইবনিট্‌স্‌ থেকে রাসেল্‌ পর্যন্ত বিভিন্ন আকারী যুক্তিবিদ্‌, এপিকিউরাস্‌ থেকে মীল্‌ পর্যন্ত বিভিন্ন উপযোগবাদী নীতিবিদ্‌, ফয়েরবাখ্‌, মার্কস্‌, হারবার্ট স্পেনসার প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌—এদের চিন্তাধারা সমন্বিত হয়েছে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদে॥ উইট্‌গেন্‌স্টাইন্‌-এর চিন্তাধারা ভিয়েনা চক্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু উইট্‌গেন্‌স্টাইন্‌ কখনও এ চক্রের সভ্য ছিলেন না। তবে ভিয়েনা চক্রের সভ্যরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। বস্তুত উইট্‌গেন্‌স্টাইনের "ট্রেক্‌টেটাস্‌ লজিকো-ফিলোসফিকাস্‌" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল ভিয়েনা গোষ্ঠীর "বাইবেল"।

---

* দৃষ্টসত্ত্ববাদ=positivism : দৃষ্টিবাদ=empiricism

** যথাক্রমে : Scientific Empiricism, Logical Empiricism, Consistent Empiricism ও Logical Positivism

ধীরে ধীরে ভিয়েনার বাইরে এ চক্রের মতবাদ প্রসার লাভ করে—বিভিন্ন দেশে বহু দার্শনিকের সমর্থন লাভ করে, যথা আমেরিকায় মরিস্ ও নেগেল-এর, ইংলণ্ডে স্টেবিং, উইস্‌ডম্ ও রাইল্ এবং এয়ার-এর। এয়ার ভিয়েনা চক্রের আলোচনা সভাতেও যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজি-ভাষী জগতে এয়ারই যৌক্তিক দৃষ্টবাদের সব চেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় প্রবক্তা। আমরা প্রধানত এয়ারকে অনুসরণ করেই যৌক্তিক দৃষ্টবাদের সারসংক্ষেপ করব।

ত্রিশ-ছত্রিশ সালের মধ্যে ভিয়েনা চক্রে ধীরে ধীরে ভাঙ্গন ধরতে সুরু করে। রাজনীতিক বিপর্যয়ের ফলে এ গোষ্ঠীর সভ্যরা নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েন। আর ছত্রিশ সালে জনৈক মানসিকব্যাধিগ্রস্থ ছাত্রের গুলিতে ভিয়েনা চক্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্লিক্ নিহত হন। জনৈক ছাত্রের নীতিশাস্ত্রবিষয়ক একটি গবেষণা-প্রবন্ধ অনুমোদন করেন নি বলে ছাত্রটি শ্লিককে গুলি করে হত্যা করে।

ওপরে যা বলা হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে যে প্রধানত তিনটি দার্শনিক চিন্তাধারা যৌক্তিক দৃষ্টবাদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে: (ক) হিউম্, মীল্, মাখ্-এর দৃষ্টবাদী চিন্তা, (খ) হেলম্‌হোলট্‌স্, মাখ্, পঁয়েকার, আইন্‌ষ্টাইন্—এঁদের অনুমোদিত ও অনুসৃত বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিবিজ্ঞান, (গ) ফ্রেগে, হোয়াইটহেড্, রাসেল্, উইটগেন্‌ষ্টাইন্—এঁদের দ্বারা পরিবর্ধিত সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান, এবং এদের অনুমোদিত ভাষার-যৌক্তিক-বিশ্লেষণ।

ভিয়েনা চক্রের মূল লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারকরণ, বিজ্ঞানের একীকরণ ও অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা বা অর্থহীনতা প্রতিপাদন। এবং এ উদ্দেশ্যে সিদ্ধির উপায় হিসাবে এরা গ্রহণ করেন: বাক্যার্থনির্ণয় ও ভাষাবিশ্লেষণ। এখানেই প্রাচীন দৃষ্টবাদীদের সঙ্গে নব্যদের পার্থক্য। যথা, প্রাচীন দৃষ্টবাদীরাও ছিলেন অধিবিদ্যাবিরোধী, তাঁদের যুক্তি ছিল: আধিবিদ্যক জল্পনা-কল্পনার যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না—এ সবের কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেন আধিবিদ্যক বাক্য প্রসঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথাই ওঠে না, এ জাতীয় বাক্য অর্থহীন। তারপর, প্রাচীন দৃষ্টবাদীরা জ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দৃষ্টবাদী সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নব্য দৃষ্টবাদের ভিত্তি যৌক্তিক বিশ্লেষণ (মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়), বিশেষত ভাষাবিশ্লেষণ ও বাক্যার্থনির্ণয় পদ্ধতি।

যৌক্তিকদৃষ্টিবাদী তত্ত্বসমূহ

নির্দেশক বাক্য দু প্রকার: পূর্বতসিদ্ধ ও অ-পূর্বতসিদ্ধ (বা পরতসাধ্য*)। প্রত্যেক ভাষায় আরও এক তৃতীয় প্রকারের বাক্য দেখা যায়—মূল্যবিষয়ক বাক্য।

* এখানে সরল নির্দেশক বাক্যের কথা বলা হচ্ছে। সরল নির্দেশক বাক্য যুক্ত করে, 'এবং', 'অথবা' 'যদি—তাহলে' প্রভৃতি সংযোজক দিয়ে যুক্ত করে, যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। নির্দেশক বাক্যের প্রকারভেদ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে যৌগিক বাক্য সম্বন্ধেও তাই খাটে।

শেষোক্ত প্রকারের বাক্যের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে একে পূর্বতসিদ্ধ বা পরতসাধ্য —এ শ্রেণী দুটির কোনোটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উক্ত তিন প্রকারের বাক্যের প্রত্যেকটি প্রকার সম্বন্ধে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা এক একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। নিচে বাক্যপ্রকার ও আনুষঙ্গিক তত্ত্বের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

পূর্বতসিদ্ধ বাক্য —পূর্বতসিদ্ধবাক্যের বৈশ্লেষিকতা[1] তত্ত্ব

অ-পূর্বতসিদ্ধ বাক্য —অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব[2]

মূল্যবিষয়ক বাক্য —আবেগসর্বস্বতত্ত্ব[3]

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা মনে করেন যে প্রথম তত্ত্ব দুটি মেনে নিলে অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা তত্ত্বটিও মেনে নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে ঃ অধিবিদ্যা না হয় (মেনে নিলাম) অসম্ভব, দর্শনও কি অসম্ভব? অধিবিদ্যা ও দর্শন কি অভিন্ন? যদি না হয়, দর্শন যদি সম্ভব হয় তাহলে দর্শনের কাজ কী? পরে দেখতে পাব যে, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মতে দর্শনের কাজ হল বিশ্লেষণ, ভাষাবিশ্লেষণ। আমরা এ তত্ত্বগুলি আলোচনা করব। অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব প্রসঙ্গে "অর্থ" বলতে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা কি বোঝেন তাও আলোচনা করব। এ তত্ত্বগুলি আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত ক্রম অনুসরণ করব।

(ক) পূর্বতসিদ্ধ বাক্যের বৈশ্লেষিকতা তত্ত্ব (খ) "অর্থ"-এর বিভিন্ন অর্থ (গ) আবেগসর্বস্বতত্ত্ব (ঘ) অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব (ঙ) অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা (চ) দর্শনের কাজ —ভাষাবিশ্লেষণ ॥

3. পূর্বতসিদ্ধ বাক্যের বৈশ্লেষিকতা তত্ত্ব

দৃষ্টিবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে*। বর্তমান প্রসঙ্গে পূর্বতসিদ্ধ ও পরতসাধ্য বাক্যের সম্বন্ধ সম্পর্কে আরও দু একটি কথা বলা হবে।

পূর্বতসিদ্ধ বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক—এটা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদের একটি মুখ্য তত্ত্ব। বিশ্লেষক বলে পূর্বতসিদ্ধ (বা অবশ্যম্ভব) বাক্য বন্ধ্যা, অ-তথ্যজ্ঞাপক। অর্থাৎ এ জাতীয় বাক্যে জাগতিক কোনো ব্যাপার সম্বন্ধে, কোনো বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধে, কোনো উক্তি করা হয় না; ভাষাতিরিক্ত কোনো বিষয়ে কোনো তথ্য পরিবেশন করা হয় না।

এ জাতীয় বাক্যে কেবল ভাষাবিষয়ক উক্তি করা হয় —শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয় বা শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। যে বাক্যে কোনো বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধে উক্তি করা হয় তাকে বলে বর্ণনামূলক, তথ্যজ্ঞাপক বা বাস্তব-

1. analyticity of a priori propositions 2. Verification Theory of Meaning
3. Emotive Theory (of meaning)

* অষ্টম অধ্যায় 2(2)-সংখ্যক বিভাগ, 127-'28 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে ঐ অংশটি আবার পড়ে নাও। এবং এ আলোচনার প্রথমাংশ হিসাবে সংযোজন করে নাও।

বিষয়ক। এ জাতীয় বাক্যের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি পূর্বতসিদ্ধ বাক্য অ-বর্ণনা-মূলক, অ-তথ্যজ্ঞাপক ও অ-বাস্তববিষয়ক। উদাহরণ ঃ

ফুলটি লাল অথবা ফুলটি লাল নয়
এখন বৃষ্টি হচ্ছে অথবা এখন বৃষ্টি হচ্ছে না
রাম এসেছে অথবা রাম আসে নি

—এ সব পূর্বতসিদ্ধ বাক্যে "অথবা" এবং "নয়" ("না", "নি")-এর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এদের প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ; বাস্তব জগত সম্বন্ধে কোনো তথ্য পরিবেশন করা হয় নি। এজন্য এসব বাক্য সত্য কিনা তা ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে যাচাই করার দরকার হয় না। যে ব্যক্তি "অথবা, "নয়" ("না", "নি") এ শব্দগুলির অর্থ জানে সেই বুঝবে বাক্যগুলি সত্য, এদের সত্য না হয়ে উপায় নেই। আর একটা উদাহরণ।

কোনো সমগ্র বস্তু যুগপৎ লাল এবং নীল হতে পারে না

—এ বাক্য কোনো বস্তুধর্মের বর্ণনা নয়। এ বাক্যে বলা হয় নি যে—কোনো বস্তু লাল ও নীল এ বাধক ধর্ম দুটি গ্রহণ করতে পারে না। বলা হয়েছে ঃ "লাল", "নীল" এ শব্দগুলি এমন যে এদের একই বাক্যের বিধেয় হিসাবে প্রয়োগ করা যাবে না। কাজেই উক্ত বাক্যটি ব্যাপারবিষয়ক উক্তি নয়, এটি একটি ভাষাবিধান।

কোনো পরতসাধ্য (বা আপতিক) বাক্য সত্য কিনা তা জানতে হলে বাক্যটির সঙ্গে বাক্য-বর্ণিত ব্যাপারের আনুরূপ্য আছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হয় ; আনুরূপ্য থাকলে বাক্যটি সত্য নতুবা বাক্যটি মিথ্যা। কিন্তু (যেহেতু পূর্বতসিদ্ধ বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক সেহেতু) কোনো পূর্বতসিদ্ধ বাক্য সত্য কি মিথ্যা বাক্যটির আকার দেখেই তা বোঝা যায়, বাক্যে ব্যবহৃত যৌক্তিক শব্দগুলির অর্থ লক্ষ করলেই বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা জানা যায়। যথা, যে ব্যক্তি "এবং" ও "নয়" এর অর্থ জানে সে এ কথাও জানতে পারবে যে

রাম বুদ্ধিমান এবং রাম বুদ্ধিমান নয়
শ্যাম সত্যবাদী এবং শ্যাম সত্যবাদী নয়

এসব বাক্য, এবং এ আকারের যে কোনো বাক্যই মিথ্যা। বাক্যের আকার দেখেই জানা যায় যে

ব অথবা ~ব

এ আকারের বাক্য অবশ্যম্ভবভাবে সত্য, আর

ব এবং ~ব

এ আকারের বাক্য অবশ্যম্ভবভাবে মিথ্যা। উক্ত আকারের বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব কোনো ব্যাপারের সঙ্গে আনুরূপ্যের উপর নির্ভর করে না (কেননা এ জাতীয় বাক্যে কোনো ব্যাপারই বর্ণিত হয় না)। এজন্য দু রকম সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা বলা হয় ঃ বাস্তবিক (আপতিক) সত্যতা মিথ্যাত্ব, আর যৌক্তিক (অবশ্যম্ভব) সত্যতা মিথ্যাত্ব। যথা,

এ ফুলটা লাল* —বাস্তবিকভাবে (আপাতিকভাবে) সত্য
এ ফুলটা হলদে* —বাস্তবিকভাবে (আপাতিকভাবে) মিথ্যা
এ লাল ফুলটা লাল —যৌক্তিকভাবে (অবশ্যম্ভবরূপে) সত্য
এ লাল ফুলটা লাল নয়—যৌক্তিকভাবে (অবশ্যম্ভবরূপে) মিথ্যা।

পূর্বতসিদ্ধ (বা বিশ্লেষক) বাক্য তাহলে দু রকম: যৌক্তিকভাবে সত্য (যথা, 'ব অথবা ~ব' আকারের বাক্য)—এ জাতীয় বাক্যকে বলে স্বতসত্য[1] বাক্য; আর যৌক্তিকভাবে মিথ্যা (যথা, 'ব এবং ~ব' আকারের বাক্য)—এ জাতীয় বাক্যকে বলে স্ববিরোধী বা স্বতমিথ্যা[2] বাক্য।

লক্ষণীয় যে, "বিশ্লেষক" বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা ঠিক তা বোঝেন না, তাঁরা "বিশ্লেষক" কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। আমরা জানি: যে বাক্যের বিধেয়ের লক্ষণার্থ উদ্দেশ্যের লক্ষণার্থের অন্তর্গত সে বাক্য বিশ্লেষক, আর যে বাক্যের উদ্দেশ্যের লক্ষণার্থ বিশ্লেষণ করে বিধেয়ের লক্ষণার্থ পাওয়া যায় না তা সংশ্লেষক বাক্য। এ অর্থে—

সব মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী
সব মানুষ হল প্রাণী
লাল রঙ হল একটা রঙ

এ সব বাক্য, আরও সাধারণভাবে,

কখ হল কখ
কখ হল ক
কখ হল খ

—এ আকারের বাক্য বিশ্লেষক। কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা পূর্বতসিদ্ধ বা বিশ্লেষক বাক্যের যে সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন সে বাক্যগুলি, যথা:

ব অথবা ~ব   ব এবং ~ব

—এ আকারের বাক্য, যেমন

রাম এসেছে অথবা রাম আসে নি
এখন বৃষ্টি হচ্ছে এবং এখন বৃষ্টি হচ্ছে না

—এ বাক্যগুলি উক্ত অর্থে বিশ্লেষক নয়। কেননা এ বাক্যগুলি উদ্দেশ্য-বিধেয় আকারের বাক্য নয়, কাজেই উদ্দেশ্যের লক্ষণার্থ বিশ্লেষণ করে বিধেয়ের লক্ষণার্থ পাওয়ার কথা ওঠে না।

বস্তুত, পূর্বতসিদ্ধ বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক —এ তত্ত্ব প্রতিপাদন করার জন্য যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা "বিশ্লেষক" কথাটি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। যথা, এয়ার বলেন

---

* ধরা যাক, একটি লাল ফুলকে নির্দেশ করে এ উক্তি দুটি করা হয়েছে।

1. স্বতসত্য=স্বতঃসত্য=**tautologous**

2. স্বতমিথ্যা=স্বতঃমিথ্যা=**self-contradictory or inconsistent**

যে বাক্যের অন্তর্গত (যৌক্তিক) শব্দগুলির অর্থ পরীক্ষা করেই বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা জানা যায় তাকে বলে বিশ্লেষক বাক্য।

পূর্বতসিদ্ধ বাক্যের বৈশ্লেষিকতা তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল ঃ কোনো পূর্বতসিদ্ধ বাক্য সংশ্লেষক হতে পারে না। আর পূর্বতসিদ্ধ বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারের বাক্যের অবশ্যম্ভব সত্যতা থাকতে পারে না। সংশ্লেষক বাক্য বর্ণনামূলক, তথ্যজ্ঞাপক। এবং যা বর্ণনামূলক বা তথ্যজ্ঞাপক তা অবশ্যম্ভবরূপে সত্য হতে পারে না। আলোচ্য মতে—

পরতসাধ্য (তথ্যজ্ঞাপক) বাক্য সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করতে পারে না, অবশ্যম্ভবতা দাবী করতে পারে না। এ তত্ত্ব থেকে নিম্নোক্ত তত্ত্বটিও নিঃসৃত হয় ঃ

প্রাকৃত বিজ্ঞানের কোনো বাক্যই সুনিশ্চিত নয়, কেবল সম্ভাব্য। তবে এ জাতীয় বাক্যে আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি হয়। অপরপক্ষে, বিশুদ্ধ গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের বাক্য অবশ্যম্ভব সত্য, তবে এসব বাক্য অ-তথ্যজ্ঞাপক, স্বতসত্য বাক্য।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা আরো বলেন যে

পরতসাধ্য —অর্থাৎ সংশ্লেষক, তথ্যজ্ঞাপক কিন্তু অনিশ্চিত বা সংশোধনযোগ্য
ও পূর্বতসিদ্ধ —অর্থাৎ বিশ্লেষক, অ-তথ্যজ্ঞাপক কিন্তু সুনিশ্চিত

এ দু রকমের বাক্য ভিন্ন তৃতীয় প্রকারের কোনো অর্থবহ বাক্য নেই। অর্থাৎ আলোচ্য মতে—কোনো বাক্য পূর্বতসিদ্ধ-সংশ্লেষক হতে পারে না। এ মতে—

"ব অর্থবহ" এ কথার অর্থ ঃ ব পূর্বতসিদ্ধ-বিশ্লেষক, অথবা ব পরতসাধ্য-সংশ্লেষক। "ব-এর অর্থ আছে" এ কথা বললে বুঝতে হবে ঃ

ব যৌক্তিকভাবে সত্য (বা মিথ্যা), অথবা
ব বাস্তবিকভাবে সত্য (বা মিথ্যা) ॥

4. "অর্থ"-এর বিভিন্ন অর্থ

যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেন, পূর্বতসিদ্ধ (বিশ্লেষক) আর পরতসাধ্য (সংশ্লেষক) —এ দু রকম বাক্য ভিন্ন অন্য সর্ব প্রকারের বাক্য অর্থহীন। কিন্তু তাঁরা স্বীকার করেন যে "অর্থ"-এর বিশেষ অর্থে অন্য প্রকারের বাক্যকে অর্থবহ বলা যায়, যথা, "অর্থ"-এর কোনো অর্থে মূল্যবিষয়ক বাক্যকে অর্থবহ বলা যায়। বলা যায়— কাব্য-বাক্যেরও অর্থ আছে। স্পষ্টতই যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা "অর্থ"-এর অর্থভেদ স্বীকার করেন। "অর্থ" বলতে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা কী বোঝেন তা নিচে আলোচিত হল।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা প্রধানত দু রকম অর্থের কথা বলেন ঃ নির্দেশী ও অনির্দেশী। তাদের মতে নির্দেশী অর্থ আবার দু প্রকার ঃ বস্তুগত ও আকারগত। তাহলে "অর্থ" কথাটি অন্তত তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নির্দেশী অর্থ ॥ এ ফুলটা লাল, সব মানুষ মরণশীল, $2+2=4$ —এ সব বাক্যের অর্থ বলতে যা বুঝি তাকে বলে নির্দেশী অর্থ। একে তাত্ত্বিক অর্থ,[1] বাচ্য-অর্থ, জ্ঞানীয় অর্থ[2], আরও সাধারণভাবে, আক্ষরিক অর্থ[3] বলে।

যে বাক্যে কোনো তথ্য ব্যক্ত হয় বা কোন স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃঅসিদ্ধ উক্তি করা হয় সুতরাং যে বাক্য সত্য বা মিথ্যা বলে গণ্য হতে পারে—সে বাক্যের যে অর্থ তাকে বলে আক্ষরিক বা জ্ঞানীয় অর্থ।

যথা, "এ ফুলটা লাল"—এ বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ আছে, কিন্তু "আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে"—এ বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ নেই। সেরূপ প্রশ্ন বা অনুজ্ঞা বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ নেই। মনে রাখতে হবে, "অর্থ" বলতে এখানে বাক্যের অর্থের কথা বলা হচ্ছে, শব্দের অর্থের কথা নয়। কেননা প্রায়* প্রত্যেক আভিধানিক শব্দেরই জ্ঞানীয় বা আক্ষরিক অর্থ আছে, কিন্তু আক্ষরিক-অর্থবহ শব্দ যুক্ত করে এমন বাক্য গঠন করা যায়—যার জ্ঞানীয় অর্থ নেই (যথা, "আমি যদি.........কালে")। এখন,

যে বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ থাকে তাকে বলে জ্ঞানীয় বাক্য বা প্রকৃত বিবৃতি : যদি কোনো বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ থাকে তাহলে বাক্যটির সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ভর করে—

(ক) বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির (জ্ঞানীয়) অর্থের উপর, বা

(খ) বাক্যে বর্ণিত ব্যাপারের উপর।

(1) বস্তুগত বা বাস্তবিক অর্থ[4] ॥ যদি কোনো বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব উপরোক্ত (ক) এবং (খ)—এ দুটি সর্তের উপর নির্ভর করে তাহলে বলা হয় : বাক্যটির বাস্তবিক-অর্থ আছে, এবং এরূপ বাক্য ব্যাপারবিষয়ক, উপাদানবিষয়ক বা সংশ্লেষক বাক্য বলে অভিহিত হয়। যথা "এ ফুলটা লাল"—এ বাক্যের অর্থ হল বস্তুগত অর্থ, এবং বাক্যটি ব্যাপারবিষয়ক।

(2) আকারগত বা যৌক্তিক অর্থ ॥ যদি কোনো বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব কেবল (ক)-সর্তটির উপর— বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থের উপর—নির্ভর করে তাহলে বলা হয় : বাক্যটির যৌক্তিক অর্থ আছে। এবং এরূপ কোনো বাক্য যদি সত্য হয় তাহলে বাক্যটিকে যৌক্তিকভাবে-সত্য বাক্য বা স্বতসত্য বাক্য বলে, আর এরূপ কোনো বাক্য যদি মিথ্যা হয় তাহলে বাক্যটি যৌক্তিকভাবে-মিথ্যা বা স্ববিরোধী বা স্বতমিথ্যা বাক্য বলে অভিহিত হয়।

(3) অনির্দেশী অর্থ : আবেগব্যঞ্জক[5] অর্থ ॥ যে বাক্যে কোনো আবেগ-অনুভূতি কামনা, বাসনা, অনুজ্ঞা, অনুমোদন-অননুমোদন —এ সব ব্যক্ত হয় সেসব বাক্যও

---

1. theoretical meaning 2. cognitive meaning 3. literal meaning
4. factual meaning 5. আবেগব্যঞ্জক (আবেগবহ) অর্থ=emotive meaning

* 'প্রায়' বলা হল এ জন্য যে যাদের মূল্যবিষয়ক শব্দ বলা হয়, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মতে, তাদের জ্ঞানীয় অর্থ নেই ; যথা "সুন্দর", "অসুন্দর", "ভাল", "মন্দ" এ সবের জ্ঞানীয় অর্থ নেই।

অর্থবহ। তবে এ জাতীয় বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ নেই, এদের যে অর্থ তাকে বলে অনির্দেশী অর্থ। অনির্দেশী বলতে আবার বিভিন্ন প্রকারের অর্থ বোঝায়। এদের মধ্যে আবেগসংক্রান্ত অর্থ, আবেগবহ অর্থ, বা আবেগব্যঞ্জক অর্থই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(যে বাক্যে কোনো আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত হয় বা উদ্রেক করার চেষ্টা হয় তার যে অর্থ সে অর্থকে বলে আবেগব্যঞ্জক অর্থ।)

যথা, কাব্য-বাক্যের অর্থ হল আবেগব্যঞ্জক অর্থ। যেমন,

নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে যার নাম লেখা রহিয়াছে
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে

—এ বাক্য নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়, তবে এর যে অর্থ তা জ্ঞানীয় অর্থ নয়, আবেগবহ অর্থ। আবার এমন হতে পারে যে কোনো বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থও আছে আবার অবেগবহ অর্থও আছে। যথা,

তোমায় ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে তখনও আমের বনে গন্ধ ছিল

—এ বাক্যে দুটি অর্থই বর্তমান। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যে সব বাক্য প্রয়োগ করি অনেক সময় তাতেও জ্ঞানীয় অর্থের সঙ্গে আবেগব্যঞ্জক অর্থ মিশ্রিত থাকে। যথা ঃ ওটা একটা গুণ্ডা, ঐ বাবরী-ওয়ালা ছোঁড়াটা একটা সমাজবিরোধী, আমাদের জোয়ানরা এখন পাকিস্থানের সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত—এ সব বাক্য নিছক তথ্যজ্ঞাপক নয়, আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও এদের অন্য ব্যঞ্জনা (আবেগবহ অর্থ) আছে।

যে বাক্যের কেবল আবেগব্যঞ্জক অর্থ আছে অথচ বাক্যটির জ্ঞানীয় অর্থ আছে বলে দাবী করা হয়, বা জ্ঞানীয় অর্থ আছে বলে ভ্রম হয়, তাকে বলে ছদ্ম-বিবৃতি।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা মনে করেন যে আধিবিদ্যক বাক্যমাত্রই ছদ্ম-বিবৃতি।

কেবল আবেগ অনুভব জ্ঞাপক বাক্যই নয়, যে বাক্যে আমাদের পছন্দ অপছন্দ, নিন্দা প্রসংশা ব্যক্ত হয় সে বাক্যও, ব্যাপক অর্থে, আবেগসংক্রান্ত। এদের অর্থও আবেগব্যঞ্জক অর্থ। পরে দেখব যে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মতে মূল্যবিষয়ক বাক্যের কোনো জ্ঞানীয় অর্থ নেই। এ জাতীয় বাক্যে আমাদের পছন্দ অপছন্দ, নিন্দা প্রশংসা, বা অনুমোদন অননুমোদন ব্যক্ত হয়। সুতরাং এদের কেবল আবেগ-ব্যঞ্জক অর্থ আছে, জ্ঞানীয় অর্থ নেই।

5. আবেগসর্বস্ব তত্ত্ব[1]

বাক্য দুরকম—পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক আর পরতসাধ্য সংশ্লেষক। পরতসাধ্য বাক্য মাত্রই বাস্তব ব্যাপারবিষয়ক, বর্ণনামূলক এবং কেবল সম্ভাব্য। মূল্যবিষয়ক বাক্য বিশ্লেষক নয়। তাহলে এ জাতীয় বাক্য কি ব্যাপারবিষয়ক? 'এ ফুলটা লাল', 'মানুষ মরণশীল'—এ সব বাক্যের মতই বর্ণনামূলক? "সুন্দর,"

1. Emotive Theory

"অসুন্দর"—এসব কি "লাল" ,"মরণশীল" প্রভৃতির মত বাস্তব গুণ বোঝায় ? "ফুলটা সুন্দর"-এর সঙ্গে "ফুলটা লাল"-এর পার্থক্য নেই কি ? যদি থাকে, তাহলে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের দ্বিকোটিক বিভজন তত্ত্ব— বাক্যমাত্রই হয় বিশ্লেষক নয়ত ব্যাপারবিষয়ক, বর্ণনামূলক —এ তত্ত্ব মানা যায় না। তৃতীয় এক প্রকারের বাক্য স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা তৃতীয় প্রকারের বাক্য স্বীকার করেন না।

মূল্যবিষয়ক বাক্য সম্বন্ধে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের নানান মত। তবে সবাই স্বীকার করেন যে তথাকথিত মূল্যজ্ঞাপক শব্দ—"ভাল" "মন্দ" ,"সুন্দর" "অসুন্দর" এ সব গুণবোধক শব্দ নয়। এদের জ্ঞানীয় অর্থ নেই। মূল্যবিষয়ক ধারণা প্রকৃত ধারণা নয়, ছদ্ম-ধারণা। কোনো বাক্যে কোনো তথাকথিত মূল্য জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। যথা, এয়ার বলেন—

তুমি টাকা চুরি করে অন্যায় করেছ

এ কথা যদি বলি, তাহলে

তুমি টাকা চুরি করেছ

এ কথা বলার চেয়ে বেশী কিছু বলা হয় না। দ্বিতীয় বাক্যে যা ব্যক্ত হয়েছে প্রথম বাক্যে তার অতিরিক্ত কোনো ব্যাপার ব্যক্ত হয় নি। কাজেই জ্ঞানীয় অর্থের দিক থেকে বাক্য দুটির মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তবে প্রথম বাক্যটিতে আমার আবেগ (ঘৃণা, নিন্দা) প্রকাশ পেয়েছে। ঐ বাক্য থেকে বোঝা যায় আমি চুরি করা ঘৃণা করি। "অন্যায়" কথাটি ব্যবহার না করেও আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারতাম —পারতাম ঘৃণাসূচক কোনো শব্দ ব্যবহার করে, কোনো দৈহিক অভিব্যক্তি দিয়ে, বা বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহার করে। যথা, লিখতে পারতাম—

তুমি টাকা চুরি করেছ— ছি ছি

বা

তুমি টাকা চুরি করেছ !!!

কোনো কোনো যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মূল্যবিষয়ক বাক্যকে নির্দেশক বাক্য বলেই স্বীকার করেন না ; তারা বলেন—এ জাতীয় বাক্য আসলে অনুজ্ঞাবোধক। অর্থাৎ মূল্যবিষয়ক বাক্যে—কেবল আমাদের আবেগ প্রকাশ পায় তা নয়, অন্যের আবেগ উদ্দীপ্ত করারও চেষ্টা হয়, অন্যকে কোনো কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে বা কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করা হয় ; এক কথায়, অনুজ্ঞা ব্যক্ত হয়। এ মতে—

মিথ্যা কথা বলা দোষ = মিথ্যা কথা বলো না

নরহত্যা গর্হিত কাজ = নরহত্যা করো না

আবার কখনও কখনও বলা হয় যে মূল্যবিষয়ক বাক্যে আমাদের পছন্দ অপছন্দ, নিন্দা প্রশংসা, অনুমোদন অননুমোদন —এসব ব্যক্ত হয়। যথা,

মিথ্যা কথা বলা অন্যায়

এ কথার অর্থ ঃ

আমি মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করি না, অনুমোদন করি না।

সেরূপ,

নরহত্যা গর্হিত কাজ

এ কথার অর্থ ঃ

আমি নরহত্যা অনুমোদন করি না, যে নরহত্যা করে তাকে ঘৃণা করি।
এ মতে মূল্যবিষয়ক বাক্য এক প্রকারের বর্ণনামূলক বাক্য (সুতরাং এদের জ্ঞানীয় অর্থ আছে), তবে এ জাতীয় বাক্যে এদের বৈয়াকরণ উদ্দেশ্য পদ যা বোঝায় তার বর্ণনা থাকে না। এ জাতীয় বাক্যে বক্তারই মানসিক অবস্থা, প্রবণতা বা অনুভূতির কথা বলা হয়। ধরা যাক, রাম বলল ঃ

কবিতাটি সুন্দর, প্রবঞ্চনা গর্হিত কাজ।

আলোচ্য মতে রামের উক্তিগুলি রামেরই মানসিক প্রবণতার, পছন্দ অপছন্দের, বর্ণনা। এসব উক্তিতে কবিতা বা প্রবঞ্চনা বর্ণিত হয় নি, এদের কোনো গুণ নির্দেশিত হয় নি।

মূল্যবিষয়ক বাক্যমাত্রেই বক্তার আবেগ অনুভূতি প্রকাশিত হয় বা বর্ণিত হয়, অথবা মূল্যবিষয়ক বাক্যমাত্রই অনুজ্ঞাবোধক —এ মতকে মূল্য সম্বন্ধে আবেগ-সর্বস্ব তত্ত্ব বলা হয়। উক্তরূপ তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হিউম্। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের হাতে হিউম্ প্রচারিত তত্ত্বটি চরম পরিণতি লাভ করে। এ তত্ত্ব প্রণয়নের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। যদি মূল্যবিষয়ক বাক্য বলে তৃতীয় প্রকারের বাক্য স্বীকার করা হত তাহলে প্রশ্ন উঠত ঃ এরূপ বাক্য কি বিশ্লেষক? যদি না হয়, তাহলে এ জাতীয় বাক্য কি অনুভবে যাচাইযোগ্য? তা যদি না হয়, তাহলে এসব কি আধিবিদ্যক বাক্য, অর্থহীন বাক্য? যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা স্বীকার করবেন, মূল্যবিষয়ক বাক্য বিশ্লেষক নয়, আবার অনুভবে যাচাইযোগ্যও নয়। অথচ এদের সঙ্গে আধিবিদ্যক বাক্যেরও পার্থক্য আছে। কাজেই এদের আধিবিদ্যক বলাও সঙ্গত নয়। এখন যদি বলা হয়, মূল্যবিষয়ক বাক্য অনুজ্ঞাবোধক, তাহলে এ সব যাচাইযোগ্য কিনা, এদের জ্ঞানীয় অর্থ আছে কিনা, এ সব বিশ্লেষক কিনা —এসব প্রশ্ন ওঠে না। ফলে বাক্যের দ্বিকোটিক বিভাজন তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে না। আর যদি বলা হয়, মূল্যবিষয়ক বাক্য বক্তার আবেগ অনুভূতির, অনুমোদন অননুমোদন ক্রিয়ার, বর্ণনা তাহলে এ জাতীয় বাক্য ব্যাপার-বিষয়ক (সংশ্লেষক) বা বর্ণনামূলক বাক্য বলে গণ্য। কাজেই দ্বিকোটিক বিভাজন সমর্থন করে বলা যায় ঃ বাক্যমাত্রই হয় বিশ্লেষক বা ব্যাপারবিষয়ক (সুতরাং যাচাইযোগ্য), এ ছাড়া অন্য কোনো বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ নেই।

"সত্য", "মিথ্যা" অপরিহার্য শব্দ নয়।। এ কথা না হয় মেনে নিলাম যে ঃ "ক বস্তুটি সুন্দর (বা অসুন্দর)"—এ জাতীয় নন্দনতাত্ত্বিক বাক্যে, "খ কাজটি ভাল (বা মন্দ), উচিত (বা অনুচিত)"—এ জাতীয় নীতিতাত্ত্বিক বাক্যে আমাদের পছন্দ, অপছন্দ, অনুমোদন, অননুমোদন, নিন্দা, প্রশংসা, অথবা

কোনো অনুজ্ঞা ব্যক্ত হয়। কিন্তু "সত্য", "মিথ্যা"ও ত মূল্যজ্ঞাপক শব্দ বলে পরিগণিত হয়। কাজেই প্রশ্ন ওঠে ঃ

ব বাক্যটি সত্য ভ বাক্যটি মিথ্যা

এ জাতীয় বাক্যেও কি পছন্দ অপছন্দ, অনুমোদন অননুমোদন, বা কেবল অনুজ্ঞা ব্যক্ত হয় ?

অনেক যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী (যথা এয়ার) এ প্রশ্নের জবাবে বলেন— "সত্য", "মিথ্যা" এ শব্দগুলি কোনো গুণ, ব্যাপার বা সম্বন্ধ নির্দেশক নয়, এসব স্বীকৃতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক। যথা, রাম বলল ঃ "সব মানুষ মরণশীল" —এ বাক্য সত্য। এ কথার অর্থ— রাম স্বীকার করে যে (বিশ্বাস করে যে) ঃ সব মানুষ মরণশীল। শ্যাম বলল ঃ "সব মানুষ স্বার্থপর"—এ বাক্য মিথ্যা। এ কথার অর্থ— শ্যাম স্বীকার করে না যে (বিশ্বাস করে না যে) ঃ সব মানুষ স্বার্থপর। এয়ার বলেন—

> কোনো নির্দেশক বাক্যের পূর্বে "এ কথা সত্য যে" বা "এ কথা মিথ্যা যে", বা পরে "সত্য" বা "মিথ্যা"—এ কথাগুলি যোগ করলে বাক্যটির বা তার বিরুদ্ধ বাক্যের যা বক্তব্য তার অতিরিক্ত কিছু বলা হয় না।

যথা ঃ "রাম বুদ্ধিমান" এ বাক্য সত্য = রাম বুদ্ধিমান

এ কথা মিথ্যা যে শ্যাম বুদ্ধিমান = শ্যাম বুদ্ধিমান নয়।

তুলনীয় ঃ তুমি চুরি করে অন্যায় করেছ = তুমি চুরি করেছ।

আলোচ্য মতে "সত্য", "মিথ্যা" এ বিশেষণ দুটি অপরিহার্য নয়, এদের বাদ দিলেও আমাদের ভাষার কিছু ক্ষতি হত না। এ সব অপ্রয়োজনীয়, পরিহার্য, শব্দ। এ মতে—

ব বাক্যটি সত্য = ব

ব বাক্যটি সত্য = ব্যাপারটা এমন যে ব

ব বাক্যটি মিথ্যা = এমন নয় যে ব

এ কথা মিথ্যা যে ব = ব্যাপারটা এমন নয় যে ব

এখানে "ব"-এর বদলে যেকোনো নির্দেশক বাক্য বসাতে পার।

তবে "সত্য", "মিথ্যা" পরিহার্য শব্দ হলেও অনেক সময় ভাষার বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে, বা জোরের সঙ্গে কোনো উক্তিকরণের জন্য, এ শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়। যথা

সব মানুষ মরণশীল (ক)

এ কথা না বলে আমরা বলতে পারি

এ কথা সত্য যে সব মানুষ মরণশীল। (খ)

আবার, যদি রাম বলে

সব মানুষই স্বার্থপর

তাহলে জোরের সঙ্গে রামের উক্তির প্রতিবাদ করে বলতে পারি

(না,) একথা সত্য নয় যে সব মানুষই স্বার্থপর। (গ)

কিন্তু রামের কথার প্রতিবাদ করে শুধু এ কথাও বলতে পারতাম

সব মানুষই স্বার্থপর নয় (ঘ) *

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মতে এখানে (ক) আর (খ)-এর মধ্যে বা (গ) আর (ঘ)-এর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই, জ্ঞানীয় অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই।

6. অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব

অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা প্রতিপাদনই যাচাইকরণ তত্ত্বের মূল লক্ষ্য। সংশয়বাদীরা, অজ্ঞেয়বাদীরা ও প্রাচীন দৃষ্টসত্ত্ববাদীরাও অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতার কথা বলেন। তাদের যুক্তি হল : জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয়গম্য এবং ফলে অতীন্দ্রিয় বা আধিবিদ্যক বিষয়ের জ্ঞান মানুষের পক্ষে অনধিগম্য, অথবা অতীন্দ্রিয় বা অ-দৃষ্টসত্ত্ব পদার্থ বলে কিছু নেই। কাজেই আধিবিদ্যক বাক্য অসত্য, অথবা এ জাতীয় বাক্য সত্য কিনা তা জানবার উপায় নেই।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন যুক্তিতে অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতার কথা বলেন ; তারা বলেন আধিবিদ্যক বাক্য সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, এ জাতীয় বাক্য অর্থহীন। এখানে "অর্থহীন" বলতে বোঝায় : জ্ঞানীয়-অর্থ-নেই-এমন। আধিবিদ্যক বাক্যের আবেগব্যঞ্জক অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু জ্ঞানীয় অর্থ নেই। এ জাতীয় বাক্য অর্থহীন* কেননা : অনুভব দিয়ে এদের যাচাইকরণ সম্ভব নয়, আর যা অনুভবে যাচাইযোগ্য নয়, তার জ্ঞানীয় অর্থ নেই। এ প্রসঙ্গে উইট্‌গেনস্টাইন-এর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয় :

কোনো বাক্যের অর্থ হল তার যাচাইকরণপদ্ধতি।

কিন্তু পদ্ধতি আবার বাক্যের অর্থ বলে গণ্য হতে পারে কেমন করে ? উক্ত উক্তির বক্তব্য হল এই :

কোনো বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব কি করে নির্ণয় করতে হবে (কি পদ্ধতিতে যাচাই করতে হবে)** যদি তা কোনো ব্যক্তির জানা থাকে তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি বাক্যটির অর্থ বোঝে। আর যদি কোনো বাক্য এমন হয় যে এমন কোনো যাচাইকরণ পদ্ধতি নেই যা দিয়ে বাক্যটির সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে বাক্যটি অর্থহীন। যথা,

ভারতের রাষ্ট্রপতির বসবার ঘরের মেঝে সোনা-দিয়ে-মোড়া

---

* অন্যরূপ বলা না হলে এ বিভাগে "অর্থ" বলতে জ্ঞানীয় অর্থই বুঝতে হবে।

** "যাচাই (করণ)" কথাটি দু অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে—

ব বাক্যটি যাচাই করা হয়েছে=ব সত্য নাকি মিথ্যা তা নির্ণয় করা হয়েছে

আর সংকীর্ণ অর্থে

ব বাক্যটি যাচাই করা হয়েছে=ব সত্য বলে নির্ণীত হয়েছে।

যারা "যাচাইকরণ" কথাটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন তাদের ভাষায়—ব বাক্যটি মিথ্যা বলে নির্ণীত হলে বলা যাবে না : ব-কে যাচাই করা হয়েছে, বলতে হবে : ব মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এঁরা "যাচাইযোগ্যতা" ও "মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্যতা" এ দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন।

এ বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব আমি এখনও নির্ণয় করি নি ঠিক, কিন্তু কিভাবে নির্ণয় করতে হবে জানি। কিন্তু

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, গতিই সৎ, স্থিতি অলীক

—এ সব বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারি নি তা নয়, কি পদ্ধতিতে এদের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায় তাও জানি না। শুধু তাই নয়, যারা এ জাতীয় উক্তি করেন তারা এমন কোনো যাচাইপদ্ধতির কথা বলতে পারেন না যা প্রয়োগ করে এদের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়। সুতরাং উক্তরূপ বাক্য অর্থহীন।

আমরা যখন কোনো সংশ্লেষক বাক্য প্রয়োগ করি তখন প্রচ্ছন্নভাবে একটা সত্যাসত্য নির্ণয় পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়ে থাকি। যথা, 'চিনিকণা জলে মিশে যায়' এ উক্তির সঙ্গে এ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকেঃ চিনির কণা জলে ফেললে দেখবে কণাগুলি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। "সব মানুষ স্বার্থপর"—এ উক্তির সঙ্গে এ ইঙ্গিত থাকেঃ যদি কোনো একজন নিঃস্বার্থ মানুষ দেখাতে পার তাহলে জানব যে আমার উক্তিটি মিথ্যা। কিন্তু আধিবিদ্যক বাক্যে এ জাতীয় কোনো পদ্ধতির ইঙ্গিত থাকে না। যথা, কি করে "এ জগৎ অলীক" এ জাতীয় বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যাবে বক্তা তার কোনো ইঙ্গিত দেন না।* কিন্তু তিনি যদি কী যাচাইকরণ পদ্ধতিতে এ বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাবে তা বলতে না পারেন এবং আমরা কেউ যদি এরূপ কোনো পদ্ধতির সন্ধান না পাই তাহলে, যৌক্তিক-দৃষ্টিবাদী মতে, বাক্যটি অর্থহীন। যারা উক্তরূপ উক্তির সত্যতা দাবী করেন তারা বলেন না কী হলে 'ব্রহ্মই সত্য', 'গতিই সৎ' —এসব বাক্য মিথ্যা হত বা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা যেত।

বিখ্যাত যৌক্তিক-দৃষ্টিবাদী এয়ার এভাবে যাচাইকরণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন।

কিভাবে ব বাক্যটি যাচাই করা হবে—এর সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করতে হবে, তা যদি জানা থাকে, তাহলে ব-এর অর্থ আছে, নতুবা ব অর্থহীন।

এখানে একটা কথা। যাচাইকরণ তত্ত্বটি কেবল অ-পূর্বতসিদ্ধ (অ-বিশ্লেষক) বাক্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পূর্বতসিদ্ধ (বিশ্লেষক) বাক্যের বেলায় যাচাইকরণের কথা ওঠে না, কেননা এ সব বাক্যে কোনো ব্যাপার বর্ণিত হয় না। যাচাই না করেই (আর যাচাই করাও যায় না) এ সব বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব জানতে পারি। আমাদের বিশেষ ভাষাবিধানের ফলে, বিশেষ বিশেষ যৌক্তিক শব্দ বিন্যাসের ফলে, এ সব বাক্য সত্য বা মিথ্যা। যথা, "এবং" আর "নয়" বিশেষভাবে ব্যবহার করি ও যুক্ত করি বলেই "রাম বুদ্ধিমান এবং রাম বুদ্ধিমান নয়"—এ বাক্য এবং এ আকারের বাক্য মিথ্যা ; আবার "অথবা" আর "নয়" বিশেষভাবে ব্যবহার করি ও যুক্ত করি বলে "রাম বুদ্ধিমান অথবা রাম বুদ্ধিমান নয়"—এ বাক্য এবং এ আকারের সব বাক্য সত্য। কাজেই বিশ্লেষক বাক্য প্রসঙ্গে যাচাইকরণের কথা ওঠে না —এ সব যৌক্তিকভাবে সত্য অথবা যৌক্তিকভাবে মিথ্যা। এবং এ জাতীয় বাক্যের

* বলা যেতে পারে, এ জাতীয় বাক্যের সত্যতা অনুমান দিয়ে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অনুমানের হেতুবাক্য সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন উঠবে—হেতুবাক্যগুলি কি যাচাইযোগ্য ?

জ্ঞানীয় অর্থ আছে। প্রশ্ন হল : অন্যরূপ বাক্যের অর্থ আছে কি নেই—তা কী করে নির্ণয় করব। উত্তরে বলতে পারি—

যদি : (1) ব বিশ্লেষক বাক্য হয়, অথবা

(2) ব যাচাইযোগ্য বাক্য হয়

তাহলে এবং কেবল তাহলে ব-এর জ্ঞানীয় অর্থ আছে ;

নতুবা, ব অর্থহীন বাক্য ; ছদ্ম বিবৃতি, প্রকৃত বিবৃতি নয় ॥

বাস্তব যাচাইযোগ্যতা ও নীতিগত যাচাইযোগ্যতা[1] : যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেন—কেবল যাচাইযোগ্য বাক্যের (আর বিশ্লেষক বাক্যের) জ্ঞানীয় অর্থ আছে। "যাচাইযোগ্য" বলতে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী কী বোঝেন তা বুঝে নেবার দরকার।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেন—যাচাইযোগ্যতা দু রকম : ব্যবহারিক (বাস্তবিক) যাচাইযোগ্যতা, আর নীতিগত (তত্ত্বগত) যাচাইযোগ্যতা। যাচাইযোগ্যতা বলতে যদি কেবল ব্যবহারিক যাচাইযোগ্যতা বোঝাত তাহলে অর্থযুক্ত বলে স্বীকৃত বহু সংশ্লেষক বাক্যকে, যথা

চাঁদের অপর পৃষ্ঠে পাহাড় আছে

—এ বাক্যকে, অর্থহীন বলে গণ্য করতে হত ; কেননা এরকম বাক্য বাস্তবিক পক্ষে যাচাইযোগ্য নয়। উক্ত বাক্যের সত্যতা এখন পর্যন্ত যাচাই করতে পারি নি কেননা এখনও চাঁদের অন্য পিঠে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু কিভাবে এ বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায় তা আমরা জানি ; জানি যে চাঁদের অন্য পিঠে পৌঁছাতে পারলে চাক্ষুষ অনুভব দিয়ে বাক্যটির সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যেত। অর্থাৎ আমরা বাক্যটির সত্যতা মিথ্যাত্ব যাচাই করতে পারি নি বটে, কিন্তু কিভাবে এ রকম বাক্যের যাচাইকরণ সম্ভব তা জানি। এ রকম ক্ষেত্রে বলা হয়—বাক্যটির নীতিগত যাচাইযোগ্যতা আছে, কাজেই বাক্যটির অর্থ আছে। সুতরাং বলা যায়, ব যদি অবিশ্লেষক বাক্য হয় তাহলে :

যদি ব-এর নীতিগত বা ব্যবহারিক যাচাইযোগ্যতা থাকে

তাহলে ব-এর অর্থ আছে।

কিন্তু যে অবিশ্লেষক বাক্যের নীতিগত যাচাইযোগ্যতাও নেই তার অর্থও নেই ; যথা, 'জগৎ মিথ্যা', 'অনুভূত বস্তুমাত্রই ধারণা' এ সব বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব যে কখনও নির্ণয় করতে পারি নি তা নয়—কী রকম পর্যবেক্ষণ দিয়ে এদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যেত তাও জানি না। সুতরাং এ জাতীয় বাক্যের, অর্থাৎ আধিবিদ্যক বাক্যের, জ্ঞানীয় অর্থ নেই।

সবল ও দুর্বল যাচাইযোগ্যতা[2] : কোনো কোনো যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী, যথা এয়ার, আবার দু রকম যাচাইযোগ্যতার কথা বলেন : সবল যাচাইযোগ্যতা ও দুর্বল যাচাইযোগ্যতা। তারা বলেন—কোনো কোনো বাক্য সবলভাবে বা নিশ্চিতরূপে যাচাইযোগ্য, আর কোনো কোনো বাক্য দুর্বলভাবে বা সম্ভাব্যরূপে যাচাইযোগ্য।

1. verifiability in practice ও verifiability in principle।
2. strong and weak verifiability।

যে বাক্যের উক্ত দু প্রকারের মধ্যে কোনো প্রকারের যাচাইযোগ্যতা আছে তার অর্থ আছে ॥ সবল ও দুর্বল যাচাইকরণের যে লক্ষণ দেওয়া হয় সে লক্ষণ অনুসারে—

ব সবলভাবে যাচাইযোগ্য = অনুভবে ব-এর সত্যতামিথ্যাত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়, জানা যায় যে ব নিশ্চিতভাবে সত্য

ব দুর্বলভাবে যাচাইযাগ্যে = অনুভবে ব-এর সম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন হয়।

ধরা যাক—এ বাক্সটির মধ্যে এক শ'টি রঙিন কাচের মার্বেল (ছোট বল) আছে, এবং আমি এ মার্বেলগুলির পঁচাত্তরটি পরীক্ষা করার সুযোগ পেলাম এবং দেখলাম যে] এ মার্বেলগুলির প্রত্যেকটি লাল। এ ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে: "এ বাক্সের এক শ'টি মার্বেলই লাল রঙের"—এ বাক্যের সবল যাচাইকরণ হল; কেবল বলা যাবে: এ বাক্যটি দুর্বলভাবে যাচাইকৃত হল।

অনেক যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মনে করেন—যে বাক্য সবলভাবে, নিশ্চিত-রূপে যাচাইযোগ্য কেবল তাই অর্থবহ। কিন্তু এ কথা মানা যায় না। এ কথা মানলে, এয়ার বলেছেন, এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে: ব্যাপারবিষয়ক (সংশ্লেষক) সার্বিক বাক্য মাত্রই অর্থহীন। যথা: সব মানুষ মরণশীল, আর্সেনিক খেলে সব সময় মৃত্যু হয়—এ সব বাক্যও অর্থহীন; কেননা, সার্বিক বাক্য সবলভাবে যাচাইযোগ্য নয়—এমন কোনো অনুভব হতে পারে না যার ফলে সার্বিক বাক্যের সত্যতা মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। এখন, যে বাক্য নিশ্চিতরূপে যাচাইযোগ্য কেবল তারই অর্থ আছে, অন্যান্য বাক্য অর্থহীন —এ মত গ্রহণ করলে (কোনো কোনো যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী বস্তুত এ মত প্রচার করেন) কেবল আধিবিদ্যক বাক্যেরই অর্থহীনতা প্রতিপন্ন হত না, একথাও প্রতিপন্ন হত যে: সার্বিক বাক্য মাত্রই, সুতরাং সব বৈজ্ঞানিক বাক্য, (নিয়ম জ্ঞাপক বাক্য,) অর্থহীন। বস্তুত জনৈক যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী (শ্লিক্) এ দুঃসাহসিক উক্তিও করেছেন: হাঁ, আমাদের গৃহীত সবল যাচাই-যোগ্যতা মানদণ্ড থেকে এ কথা নিঃসৃত হয় যে বৈজ্ঞানিক বাক্য অর্থহীন। হাঁ, এ জাতীয় বাক্য অর্থহীন। তবে কিনা বৈজ্ঞানিক বাক্যের অর্থহীনতা আর অন্যান্য অর্থহীন বাক্যের (যথা আধিবিদ্যক ব্যাক্যের) অর্থহীনতা একরূপ নয়। বৈজ্ঞানিক বাক্যের অর্থহীনতা হল "গুরুত্বপূর্ণ অর্থহীনতা"॥ কিন্তু কোন্ প্রকারের অর্থহীনতা গুরুত্বপূর্ণ আর কোন্ প্রকারের অর্থহীনতার গুরুত্ব নেই তা আবার নির্ণয় করব কেমন করে? এজন্য দুর্বল যাচাইযোগ্যতা তত্ত্বের সমর্থকরা, যথা এয়ার, বলেন—

"ব বাক্যটি অর্থযুক্ত" এ কথার অর্থ: ব সবলভাবে যাচাইযোগ্য অথবা দুর্বলভাবে যাচাইযোগ্য।

এখন, যে বাক্য সবলভাবে যাচাইযোগ্য তা অবশ্যই দুর্বলভাবেও যাচাইযোগ্য —যে বাক্য সুনিশ্চিতভাবে সত্য তার সম্বন্ধে বলতে পারি, বাক্যটির সম্ভাব্যতা আছে। তাছাড়া, প্রায় সব যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মনে করেন যে কোনো অবিশ্লেষক বাক্য সুনিশ্চিত হতে পারে না। কাজেই মনে হয় সবল যাচাই-

যোগ্যতা মানদণ্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। আবার, যা বাস্তবিকভাবে যাচাইযোগ্য তার অবশ্যই নীতিগত যাচাইযোগ্যতাও থাকবে। তাহলে যাচাই-যোগ্যতা মানদণ্ডটি এভাবে ব্যক্ত করা যায় —

(যদি ব বিশ্লেষক বাক্য হয়, অথবা)
যদি ব নীতিগতভাবে বা দুর্বলভাবে যাচাইযোগ্য হয়
তাহলে বুঝতে হবে ব-এর জ্ঞানীয় অর্থ আছে।

দুর্বল যাচাইযোগ্যতা মানদণ্ডটি এয়ার নিম্নোক্তরূপেও ব্যক্ত করেছেন। ধরা যাক আমাদের সমস্যা হল ঃ ব বাক্যটির অর্থ আছে কি ? অর্থাৎ, ব দুর্বলভাবে যাচাইযোগ্য কি ? উত্তরে এয়ার বলেন—

যদি ব অন্য কোনো বাক্য, বা বাক্য-সমষ্টি, ভ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে তার থেকে, অর্থাৎ "ব এবং ভ"—এ হেতুবাক্য থেকে, ম নিঃসৃত (অবরোহিত) হয়, এবং যদি ম বাক্যটি কেবল ব থেকে বা কেবল ভ থেকে অবরোহণীয় না হয়, এবং যদি ম একটি প্রত্যক্ষ-বাক্য* হয়

তাহলে ঃ বুঝতে হবে ব দুর্বলভাবে যাচাইযোগ্য, সুতরাং অর্থযুক্ত।

ধরা যাক, আমাদের সমস্যা ঃ "সব লাল ফুল গন্ধহীন" (ব)—এ বাক্যটিকে কি দুর্বলভাবে যাচাই করা যায় ? উল্লিখিত মানদণ্ড অনুসারে—

সব লাল ফুল গন্ধহীন (ব)
এবং এ ফুলটা লাল (ভ)
∴ এ ফুলটা গন্ধহীন (ম)

এ যুক্তিতে ব-কে অন্য একটি বাক্য ভ-এর সঙ্গে যুক্ত করে ম সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা হয়েছে, এবং ম একটি প্রত্যক্ষ-বাক্য (এবং ম কেবল ব থেকে বা কেবল ভ থেকে নিঃসৃত হয় না)। সুতরাং মূল ব বাক্যটি দুর্বলভাবে যাচাইযোগ্য বলে গণ্য। আলোচ্য মানদণ্ডের তাৎপর্য হল এই ঃ যাচাইযোগ্য (অর্থযুক্ত) বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো বাক্য থেকে প্রত্যক্ষ-বাক্য বা যাচাইযোগ্য বাক্য নিঃসৃত হতে পারে না। সুতরাং যে বাক্য থেকে প্রত্যক্ষ-বাক্য নিঃসৃত হয় সে বাক্য নিশ্চই যাচাইযোগ্য।**

---

*প্রত্যক্ষ-বাক্য=observation statement=যে বাক্যে কেবল প্রত্যক্ষলব্ধ বা প্রত্যক্ষলভ্য ব্যাপার ব্যক্ত হয় সে বাক্য।

** এয়ারকে অনুসরণ করে আমরা সবল ও দুর্বল যাচাইযোগ্যতার কথা বলেছি। কেউ কেউ যাচাইযোগ্যতার প্রকারভেদের কথা না বলে, "যাচাইযোগ্যতা" ("verifiability") "সমর্থনযোগ্যতা" ("confirmability") এ দুটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করেন। এঁরা বলেন :
ব বাক্যটি যাচাইযোগ্য=ব যে সত্য (বা মিথ্যা) তা নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করা যায়
ব বাক্যটি সমর্থনযোগ্য=ব যে সম্ভবত [illegible] মিথ্যা) তা দেখানো যায়।
লক্ষণীয়, আলোচ্য পরিভাষা অনুসারে—
(এয়ার-কথিত) সবল যাচাইযোগ্যতা=যাচাইযোগ্যতা
(এয়ার-কথিত) দুর্বল যাচাইযোগ্যতা=সমর্থনযোগ্যতা।

7. অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা

অধিবিদ্যা ও আধিবিদ্যক বাক্যের লক্ষণ :

যৌক্তিক-দৃষ্টিবাদী মত

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা অধিবিদ্যার অসম্ভপরতা, অধিবিদ্যাখণ্ডন বা অধিবিদ্যা দূরীকরণ-এর কথা বলেন। আধিবিদ্যক বাক্যমাত্রই অর্থহীন, সুতরাং অধিবিদ্যা অসম্ভব —এটা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

অধিবিদ্যা বলতে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বোঝেন —অতীন্দ্রিয়বিষয়ক, অনুভব-অগম্য, বাস্তব জগতের অতিবর্তী কল্পিত কোনো জগৎ, সম্বন্ধে আলোচনা। অধিবিদ্‌রা এ লক্ষণ মানবেন না, ঠিক; কিন্তু অধিবিদ্যা খণ্ডন করতে গিয়ে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা উক্তরূপে লক্ষণকরণ করে অগ্রসর হন। আর যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা আধিবিদ্যক বাক্যের, অর্থাৎ অধিবিদ্যায় যে জাতীয় উক্তি করা হয় যে জাতীয় উক্তির, লক্ষণ দেন এভাবে—

> যে বাক্য বিশ্লেষকও নয়, যাচাইযোগ্যও নয় (সুতরাং ব্যাপারবিষয়ক নয়) অথচ যে বাক্যে কোনো ব্যাপারবিষয়ক উক্তি করা হয়েছে বলে দাবী করা হয় সে বাক্যকে বলে আধিবিদ্যক বাক্য।

এরূপ বাক্যের জ্ঞানীয় অর্থ নেই। আধিবিদ্যক বাক্য অর্থহীন—এ তত্ত্ব নিঃসৃত হয় নিম্নোক্ত মতবাদ দুটি থেকে :

বাক্য দু প্রকার—পূর্বতসিদ্ধ-বিশ্লেষক ও পরতসাধ্য-সংশ্লেষক,
যে অবিশ্লেষক বাক্য অনুভবে যাচাইযোগ্য নয় তা অর্থহীন।

অর্থাৎ, আধিবিদ্যক বাক্য অর্থহীন ; কেননা : এ জাতীয় বাক্য বিশ্লেষকও নয় আবার যাচাইযোগ্যও নয়, এবং যা বিশ্লেষকও নয় যাচাইযোগ্যও নয় তা অর্থহীন।

অধিবিদ্যার উৎপত্তি

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা এভাবে আধিবিদ্যক বাক্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন। তাদের মতে, অধিবিদ্‌রা বাক্যের ভাষাগত সাদৃশ্য দেখে বিভ্রান্ত হন। এজন্য এয়ার ঘোষণা করেন—

ভাষাগত বিভ্রান্তিই অধিবিদ্যার মূল উৎস।

এয়ারকে অনুসরণ করে এ উক্তিটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। একটা উদাহরণ। অধিবিদ্‌রা "দ্রব্য"-এর কথা বলেন, এবং "দ্রব্য" বলতে বোঝেন, গুণের ধারক বাহক, গুণের আধার। কিন্তু হিউম্‌ প্রমুখ দৃষ্টিবাদী থেকে এয়ার পর্যন্ত সব দৃষ্টিবাদী মনে করেন—দ্রব্যের কল্পনা নিরর্থক, মনে করেন : অনুভবে পাই কেবল ইন্দ্রিয়োপাত্ত—লাল, নীল, শক্ত, নরম এসব গুণ। তারা বলেন গুণের অতিরিক্ত দ্রব্য বলে কিছু নেই, দ্রব্যের ধারণা আধিবিদ্যক ধারণা। এ ধারণার উৎপত্তি হয় কি করে ? যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা এর উত্তরে বলেন—

আমাদের ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য (এবং এ বৈশিষ্ট্য একটা আপতিক ব্যাপার) হল এই যে কোনো গুণ সম্বন্ধে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে কোনো

বিশেষ্য বা সর্বনাম বাক্যের উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। যথা, (টেবিলের) বাদামী রঙের কথা বলতে হলে বলার দরকার—

এ টেবিলটা বাদামী, এটা বাদামী (টেবিলটি দেখিয়ে)।

এখন, অধিবিদ্‌রা মনে করেন, প্রত্যেক বিশেষ্য বা সর্বনাম কোনো না কোনো বস্তু বোঝায়। প্রসঙ্গত, এয়ারের মতে : প্রত্যেক শব্দের একটা বাচ্যার্থ আছে—এটা একটা আদিম কুসংস্কার, এবং অধিবিদ্‌রা এ কুসংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি। কাজেই তারা মনে করেন যে, "টেবিল" শব্দটি কোনো দ্রব্য বোঝাচ্ছে, "এটা" গুণের আধার নির্দেশ করছে। যদিও অনুভবে "টেবিল" বা "এটা"র বাচ্যার্থের সাক্ষাৎ পাই না তবু তারা মনে করেন—যেহেতু "টেবিল" বা "এটা" একটি বাক্যের উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে সেজন্য এ শব্দগুলি কোনো অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় দ্রব্য নির্দেশ করছে। কিন্তু : বাদামী, কঠিন, অভেদ্য, মসৃণ—এসব শব্দ যে গুণ বোঝায় সে গুণগুলি ছাড়া টেবিল বলে কোনো দ্রব্য ত অনুভবে (বা বৈধ অনুমানে) পাই না। অধিবিদ্‌রা এ কথা বুঝতে পারেন না, বা বুঝতে চান না, যে "টেবিল" কথাটি আসলে কতকগুলি গুণের সমষ্টির সংক্ষিপ্ত নাম। (৩)

আর একটা উদাহরণ।

মানুষ স্বার্থপর, (জল তরল, কুকুর প্রভুভক্ত)

—এ সব বাক্য যেমন প্রয়োগ করি, সেরকম

প্রেত অলীক (আকাশকুসুম অসৎ, শশকশৃঙ্গ অবাস্তব)

—এ জাতীয় বাক্যও ব্যবহার করি। অধিবিদ্‌রা বুঝতে পারেন না যে : উক্ত বাক্য দুটির (বা বাক্যগুচ্ছ দুটির) মধ্যে ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকলেও বাক্য দুটি (বা গুচ্ছ দুটি) যৌক্তিক বিভাজনের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের বাক্য। প্রথমোক্ত প্রকারের বাক্য সঙ্গত, আর শেষোক্ত প্রকারের বাক্য অসঙ্গত—যুক্তিসিদ্ধ ব্যাকরণের দিক থেকে অসঙ্গত ॥

মানুষকে স্বার্থপর হতে হলে, "মানুষ স্বার্থপর" এ বাক্যকে সত্য হতে হলে, মানুষ বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকার দরকার, কুকুরকে প্রভুভক্ত হতে হলে কুকুর বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকার দরকার। অনুরূপ হেতুতে অধিবিদ্‌রা মনে করেন : প্রেতকে অলীক হতে হলে প্রেত বলে কিছুর অস্তিত্ব থাকার দরকার; "আকাশ কুসুম অসৎ" এ বাক্য সত্য, সুতরাং আকাশকুসুম বলে কিছু একটা পদার্থের অস্তিত্ব আছে। প্রেত, আকাশকুসুম বলে যদি দেশকালে কিছু নাও থাকে তাদের অবশ্যই অন্য কোনো প্রকারের সত্ত্ব আছে। অধিবিদ্‌রা বলবেন : নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছু সম্বন্ধে উক্তি করা হয় এবং যার সম্বন্ধে উক্তি করা হয় তাকে বলে উদ্দেশ্য পদার্থ। এখন "প্রেত অলীক", "আকাশকুসুম অসৎ" এসব বাক্যের উদ্দেশ্য পদ যদি কোনো সৎ বস্তু না বোঝায় তাহলে প্রশ্ন ওঠে—এ বাক্যগুলিতে কার সম্বন্ধে উক্তি করা হয়েছে? কিসের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে— অমুক অলীক, অমুক অসৎ? সুতরাং উক্ত বাক্যগুলিকে সত্য হতে হলে

(বস্তুত এসব সত্য) প্রেত ও আকাশকুসুম বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকার দরকার (এবং বস্তুত এদেরও সত্ত্ব আছে) ॥

আবার উল্লিখিত বাক্যগুলির বৈয়াকরণ সাদৃশ্য দেখে অধিবিদ্‌রা মনে করেন, স্বার্থপরতা, প্রভুভক্তি—এ সব যেমন গুণ, অনুরূপভাবে অলীকতা, অসত্ত্ব, অবাস্তবতা এসবও গুণ। "অলীক", "অসৎ"—এসব যদি বাস্তব গুণ না বোঝাত তাহলে "প্রেত অলীক", "— অসৎ", "— অবাস্তব" এ ধরণের বাক্যের বিধেয় পদ অর্থহীন হত, সুতরাং এ জাতীয় বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ত ॥

আমরা পরে দেখতে পাব "অলীক", "অসৎ" এসব প্রকৃত বিশেষণ নয়, এমন কি "অলীক", "অসৎ"—এসব উক্ত বাক্যগুলির প্রকৃত বিধেয় পদও নয়।

আরও কয়টি উদাহরণ।

মানুষ মরণশীল	ঈশ্বর অস্তিত্বশীল
মানুষের বুদ্ধি আছে	আত্মার অস্তিত্ব আছে
রাম বিত্তবান	ঈশ্বর সত্ত্ববান
রামের বিত্ত আছে	টেবিলটার অস্তিত্ব আছে
জীবন দুঃখময়	জগৎ অলীক ॥

লক্ষণীয় যে প্রত্যেক সারির বাক্য দুটির বৈয়াকরণ আকার অভিন্ন। কিন্তু দেখা যাবে ঃ বাক্য দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন যৌক্তিক-প্রকারের বাক্য ; এমনকি, যুক্তিসিদ্ধ ব্যাকরণের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রত্যেকটি বাক্যাকার অসঙ্গত। সর্বশেষ সারির বাক্য দুটি নেওয়া যাক। দুঃখময়তা একটা গুণ ; কিন্তু, দেখা যাবে অলীকতা কোনো গুণ নয়। উক্ত বাক্যগুলির ভিন্নতা অগ্রাহ্য করেন বলে অধিবিদ্‌রা মনে করেন—দুঃখ নিয়ে যেমন দার্শনিক আলোচনা হতে পারে, সেরকম অলীকতা বা কেবল-অস্তিত্ব বা সত্ত্ব (দ্বিতীয় স্তম্ভের অন্য বাক্যগুলি লক্ষণীয়) নিয়েও দর্শন গড়ে তোলা যায়। বস্তুত অধিবিদ্‌শিরোমণি প্লেটো বলেছেন, দার্শনিক হল সর্বকাল ও সর্বসত্ত্বের দ্রষ্টা। কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেন ঃ অস্তিত্ব, সত্ত্ব, (সুতরাং) অনস্তিত্ব, অসত্ত্ব, এসব গুণ বলে গণ্য হতে পারে না। হিউম্‌ ও হিউম্‌-সমালোচক কাণ্ট্‌ বলেছেন ঃ অস্তিত্ব বিধেয় (পদার্থ) নয়। বলা বাহুল্য, যৌক্তিক দৃষ্টবাদী উক্তিটি হিউম্‌-কাণ্টীয় উক্তিটির প্রতিধ্বনি। যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেন—

আমরা কোনো কিছু সম্বন্ধে যখন কোনো উক্তি করি তখন প্রচ্ছন্নভাবে ধরে নেওয়া হয় যে বস্তুটির অস্তিত্ব আছে, যথা "মানুষ স্বার্থপর" বলতে বুঝি অস্তিত্বশীল মানুষ স্বার্থপর, "ঈশ্বর পরম করুণাময়"-এর বক্তব্য— অস্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর পরম করুণাময়। এখন "অস্তিত্বশীল", "সত্ত্ববান" এসব কথা যদি বিধেয় পদ হিসাবে ব্যবহার করি তাহলে, যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেন, এ আজগুবি কথাও মানতে হবে যে

ক সৎ, ক-এর অস্তিত্ব আছে —এ আকারের বাক্যমাত্রই স্বতসত্য

ক অসৎ, ক-এর অস্তিত্ব নেই —এ আকারের বাক্যমাত্রই স্বতমিথ্যা ;

কেননা সে ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে যে -

ক-এর অস্তিত্ব আছে = অস্তিত্বশীল ক-এর অস্তিত্ব আছে
যথা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে = অস্তিত্বশীল ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে
আর, ক-এর অস্তিত্ব নেই = অস্তিত্বশীল ক-এর অস্তিত্ব নেই
যথা, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব নেই = অস্তিত্বশীল প্রেতাত্মার অস্তিত্ব নেই।

আমরা বলেছি, যদি "সৎ", "অসৎ", "অস্তিত্বশীল" ইত্যাদি শব্দ বাক্যের বিধেয় পদ হয়, বা গুণ বোঝায়, তাহলে মানতে হয় যে '— সৎ', '— অসৎ' ইত্যাদি আকারের বাক্য স্বতসত্য বা স্বতমিথ্যা (অর্থাৎ বিশ্লেষক)। কিন্তু উক্ত আকারের বাক্য বিশ্লেষক—স্বতসত্য বা স্বতমিথ্যা—এ কথা মানা যায় না, যথা "টেবিলটির অস্তিত্ব আছে", "ভূত অলীক পদার্থ" এসব বাক্য বিশ্লেষক নয়। সুতরাং 'সৎ', 'অসৎ' 'অস্তিত্বশীল' এসব প্রকৃত বিধেয় নয়; সত্ত্ব, অসত্ত্ব, অস্তিত্ব—এসব গুণ নয়। উক্ত শব্দগুলি যে বিধেয় পদ নয়, এ জাতীয় শব্দ যে-সব বাক্যে ব্যবহৃত হয় তার বৈয়াকরণ উদ্দেশ্য-পদই যে প্রকৃত (বা যৌক্তিক) বিধেয়, তা এভাবে দেখানো যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে = অমুক বস্তুটি এমন যে তাতে ঈশ্বরত্ব আছে
= ক এমন বস্তু যা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি
মানুষের অস্তিত্ব আছে = ক, খ প্রভৃতি এমন বস্তু যে এদের মনুষ্যত্ব ধর্ম আছে
ক অলীক = এমন কোনো বস্তু নেই যাতে ক-ত্ব গুণ আছে,
যা ক-এর দৃষ্টান্ত বা যা ক শ্রেণীর অন্তর্গত
জগৎ অলীক = এমন কোনো বস্তু নেই যাতে জগত্ত্ব ধর্ম আছে॥

উক্তরূপ বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়ঃ কিভাবে বৈয়াকরণ ভ্রান্তি থেকে, ভাষাগত ভ্রান্তি থেকে, অধিবিদ্যার উৎপত্তি হয়—কিভাবে অস্তিত্ব, দ্রব্য, সত্তা দেশকালাতীত পদার্থ, যথা অলীকতা, অসত্ত্ব প্রভৃতি, অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

৪. দর্শনের কাজঃ ভাষাবিশ্লেষণ

অধিবিদ্যা অসম্ভব—এ কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল। তাই বলে দর্শনও কি অসম্ভব? অধিবিদ্যা ও দর্শন কি অভিন্ন? আধিবিদ্যক বাক্যের মত দার্শনিক বাক্যও কি অর্থহীন? উত্তরে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেনঃ না, অধিবিদ্ না হয়েও দার্শনিক হওয়া যায়। দর্শন সম্ভব। তবে দর্শন কোনো তত্ত্ব বা মতবাদের সমষ্টি নয়। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতির মত দর্শন কোনো বিদ্যা নয়, দর্শন বলে কিছু নেই, আছে দার্শনিক ক্রিয়া। দর্শন হল দার্শনিক ক্রিয়া॥ কিন্তু দার্শনিক ক্রিয়া বা দর্শন বলতে কী বুঝব? দার্শনিকের কাজ কী? এর উত্তরে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা যা বলেন তা আসলে উইট্‌গেন্‌-স্টাইনের নিম্নোক্ত প্রখ্যাত উক্তিটির পুনরুক্তিঃ

দর্শন হল ভাষা-সমালোচনা।

এ উক্তি অনুসরণ করে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা বলেন—দার্শনিকের কাজ হল শব্দার্থ বিশ্লেষণ, বাক্যার্থ বিশ্লেষণ। তারা বলেন, এখানে "বিশ্লেষণ" বলতে

বুঝতে হবে ঃ যৌক্তিক বিশ্লেষণ—শব্দের বা বাক্যের অর্থ পরিষ্করণ ও পরিশোধন। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা যে জাতীয় বিশ্লেষণের কথা বলেন তার দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। 'দ্রব্য' শব্দটির অর্থের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং 'ক সৎ', 'ক-এর অস্তিত্ব আছে', 'ক অসৎ' এ আকারের বাক্যের যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, তা যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী অনুমোদিত বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত।

দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা—এ'রা মনে করতেন যে দর্শনের কাজ হল নিঃসন্দিগ্ধ স্বতঃসিদ্ধ সত্য আবিষ্কার করা এবং এ সব স্বতঃসিদ্ধ থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে অন্যান্য সত্য নিষ্কাশন করা। এ উদ্দেশ্যেই দেকার্ত "আমি আছি"র স্বতঃসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ মতের প্রতিবাদ করে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেন ঃ নিঃসন্দিগ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক, সুতরাং বন্ধ্যা। এ জাতীয় বাক্য থেকে কেবল বিশ্লেষক বাক্যই নিঃসৃত হতে পারে। যদি মনে করা হয় যে দর্শন জাগতিক বা জগত-অতিবর্তী ব্যাপারের ব্যাখ্যা, তাহলে উক্ত পদ্ধতিতে দর্শন রচনা করা যায় না। কেননা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য থেকে ব্যাপার বিষয়ক সত্য, দার্শনিক সত্য, নিঃসৃত হতে পারে না। আর একথা মানা যায় না যে, বিশুদ্ধ গণিতের বাক্যের মত দার্শনিক উক্তিও বিশ্লেষক বাক্য। কাজেই স্বতঃসিদ্ধ অনুসন্ধান ও তার ভিত্তিতে দর্শন-সৌধ নির্মাণ দর্শনের লক্ষ্য হতে পারে না।

যেহেতু দার্শনিকের কাজ কেবল ভাষা বিশ্লেষণ, এবং যেহেতু বিজ্ঞানীর কাজ জাগতিক ব্যাপার সংক্রান্ত নিয়ম রচনা, সেহেতু দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কোনো সাদৃশ্যও নেই। কেননা এদের লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। দার্শনিক বাক্য ব্যাপারবিষয়ক উক্তি নয় (আবার স্বতসত্য উক্তিও নয়), ভাষাবিষয়ক উক্তি। দার্শনিক বাক্যে কোনো ব্যাপার বর্ণিত হয় না। এয়ার বলেন ঃ দর্শনে ক কী?—যথা, সত্য কী? সামান্য কী?—এ জাতীয় প্রশ্ন ক-এর স্বরূপ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা নয়। এবং এ রকম প্রশ্নের জবাবে দার্শনিক যদি বলেন, 'ক হল—', যথা, সত্য হল আনুরূপ্য, তাহলে ক সম্বন্ধে, সত্য সম্বন্ধে, কোনো উক্তি করা হয় না। উক্তি করা হয় "ক" শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে, "ক" বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে, যথা "সত্য" কথাটি কি বোঝায় সে সম্বন্ধে॥

ব্যবহারঘটিত সংজ্ঞা[1]

দার্শনিক বাক্য হল সংজ্ঞা বাক্য এবং দার্শনিকের কাজ হল সংজ্ঞাকরণ। পূর্বে বলা হয়েছে, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী মতে—দার্শনিকের কাজ হল বিশ্লেষণ। বস্তুত আলোচ্য মতে সংজ্ঞাকরণ ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেননা সংজ্ঞা বলতে এখানে আরিস্টটলীয় জাতিবিভেদকঘটিত সংজ্ঞা বা সমার্থক-শব্দসমষ্টি-দিয়ে-গঠিত সংজ্ঞা বোঝাচ্ছে না। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা সংজ্ঞা বলতে বোঝেন প্রসঙ্গঘটিত* বা ব্যবহারঘটিত সংজ্ঞা। এ বিশেষ সংজ্ঞা কী নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে।

1. definition in use *প্রসঙ্গঘটিত সংজ্ঞা=contextual definition

"অস্তিত্ব"-এর সংজ্ঞা ঃ

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে = এমন একটা বস্তু আছে যাতে সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমানতা
পরম করুণাময়তা, অনাদি-অনন্তত্ব
প্রভৃতি ধর্ম বর্তমান

"সত্য"-এর সংজ্ঞা ঃ

"মানুষ মরণশীল" সত্য = মানুষ মরণশীল

"যদি"র সংজ্ঞা ঃ

যদি ক মানুষ হয় তাহলে ক মরণশীল = এমন নয় যে ক মানুষ কিন্তু অমর ॥

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করলে বোঝা যাবে,

কোনো শব্দের ব্যবহারঘটিত সংজ্ঞা দিতে হলে—

(1) শব্দটিকে কোনো বাক্যে ব্যবহার করতে হবে, এবং

(2) বাক্যটিকে অন্য একটি সমার্থক বাক্যে "অনুবাদ" করতে হবে, এবং

(3) এমনভাবে অনুবাদ করতে হবে— যেন সংজ্ঞেয় শব্দটি অনুবাদলব্ধ বাক্যে অনুপস্থিত থাকে ॥

উক্তরূপ সংজ্ঞাকরণের লক্ষ্য হল যে-শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে তার পরিহার্যতা প্রদর্শন। লক্ষণীয় যে উক্তরূপ সংজ্ঞাকরণ এক প্রকারের যৌক্তিক বিশ্লেষণ— ভাষা বিশ্লেষণ।

9. যৌক্তিক দৃষ্টিবাদের সমালোচনা

(1) পূর্বতসিদ্ধ বাক্যমাত্রই কি বিশ্লেষক ?

পূর্বতসিদ্ধ (বা অবশ্যম্ভব) বাক্য মাত্রই বিশ্লেষক, সুতরাং অ-তথ্যজ্ঞাপক এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যৌক্তিক দৃষ্টবাদী তত্ত্ব। কিন্তু এ তত্ত্বটি মেনে নেওয়া যায় না। একটা উদাহরণ।

সব কার্যের কারণ আছে

—এ বাক্য না হয় বিশ্লেষক, না হয় মেনে নিলাম যে "কারণ"-এর লক্ষণার্থ "কার্য"-এর লক্ষণার্থের মধ্যে নিহিত আছে, কিন্তু

সব ঘটনার (বা পরিবর্তনের) কারণ আছে

—এ অবশ্যম্ভব বাক্যটি বিশ্লেষক বলে গণ্য হতে পারে না, কেননা "ঘটনা"র (বা "পরিবর্তন"-এর) লক্ষণার্থের মধ্যে "কারণ"-এর লক্ষণার্থ নিহিত নেই। সুতরাং এটি একটি পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্য। আরও দুটি উদাহরণ—

লাল হল একটা রঙ

যা লাল তা অবশ্যই নীল নয়

আমরা দেখাব যে এ বাক্য দুটিও পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্য। আমরা জানি, যে-বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সমার্থক, বা যে বাক্যের উদ্দেশ্যের লক্ষণার্থ

বিশ্লেষণ করে বিধেয়ের লক্ষণার্থ পাওয়া যায়, সে বাক্য বিশ্লেষক। এ মান-দণ্ডটিকে আরও বিশদভাবে নিম্নোক্ত রূপে ব্যক্ত করা যায়।

যদি : (1) কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ অভিন্ন বা সমার্থক হয়, অথবা

(2) কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য "ক এবং খ," বা "কখ" আকারের সংযৌগিক পদ বা এরূপ পদের সমার্থক হয় ;

এবং ক বিধেয় হয়, অথবা খ বিধেয় হয়,* অথবা

(3) কোনো বাক্যের বিধেয় "ক অথবা খ" আকারের বৈকল্পিক পদ বা এরূপ পদের সমার্থক হয় ;

এবং ক উদ্দেশ্য হয়, অথবা খ উদ্দেশ্য হয়**

তাহলে এবং কেবল তাহলে : বাক্যটি বিশ্লেষক বলে গণ্য।

কোনো বাক্যে এ সর্ত তিনটির কোনোটি পালিত হলেই বাক্যটি বিশ্লেষক বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ : (1) সব মানুষ হল মানুষ। সব মানুষ হল চিন্তাশীল প্রাণী ॥

(2) সব চিন্তাশীল প্রাণী হল প্রাণী। সব চিন্তাশীল প্রাণী হল চিন্তাশীল।
সব মানুষ হল প্রাণী। সব মানুষ হল চিন্তাশীল।
যা চিন্তাশীল এবং প্রাণবান তা হল প্রাণবান।
যা চিন্তাশীল এবং প্রাণবান তা হল চিন্তাশীল ॥

(3) সব পুত্র হল সন্তান। সব পুত্র হল পুত্র অথবা কন্যা।
দ্রব্য হল পদার্থ।
দ্রব্য হল দ্রব্য U গুণ U কর্ম U সামান্য U বিশেষ U সমবায় U অভাব † ॥

লক্ষণীয় : "সন্তান" = "পুত্র U কন্যা"
"পদার্থ" = "দ্রব্য U গুণ U কর্ম U সামান্য U বিশেষ U সমবায় U অভাব"।

---

* সেমিকোলোনের পরবর্তী অংশ এ ভাবেও ব্যক্ত করা যেত : এবং 'ক' ও বিধেয় অভিন্ন বা সমার্থক হয়, অথবা 'খ' ও বিধেয় অভিন্ন বা সমার্থক হয়।

(3)-এর বেলাতে অনুরূপভাবে বলা যেত : এবং 'ক' ও উদ্দেশ্য............।

** তৃতীয় সর্তটির তাৎপর্য বুঝে নাও। আমরা জানি, যে বাক্যের বিধেয় কোনো জাতি, এবং উদ্দেশ্য ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রজাতি, বোঝায় সে বাক্য বিশ্লেষক যথা : মানুষ হল প্রাণী, পশ্চিম হল দিক, ঋক্ হল বেদ। এখন, এরূপ বিধেয়ের, বিশেষত যে বিধেয় নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজাতির সমষ্টি বোঝায় তার, সমার্থক হিসাবে প্রজাতিগুলির নাম যুক্ত করে একটি যৌগিক পদ,"—অথবা—অথবা........."আকারের পদ, ব্যবহার করা যায়। যথা, "ঋক্ হল বেদ" এ বাক্য এভাবে ব্যক্ত করা যায় : ঋক্ হল ঋক্ অথবা যজুঃ অথবা সাম অথবা অথর্ব। যেহেতু প্রথম বাক্যটি বিশ্লেষক, সেহেতু দ্বিতীয়টিও বিশ্লেষক। সেরূপ, "পশ্চিম হল দিক" = "পশ্চিম হল পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, ঈশান, অগ্নি, বায়ু, নৈঋর্ত, উর্ধ অথবা অধঃ" (দ্বিতীয় বাক্যের কমার বদলে 'অথবা' পড়তে হবে)।

† সংক্ষেপকরণের জন্য "অথবা"র পরিবর্তে "U" চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এখন,

লাল হল একটা রঙ

এ পূর্বতসিদ্ধ বাক্যটি বিশ্লেষক নয়, সংশ্লেষক ; কেননা :

(1) "লাল" ও "রঙ" সমার্থক নয়, (প্রথম সর্তটি খাটল না)

(2) "ক এবং খ" বা "কখ" আকারের এমন কোনো পদ নেই যা উদ্দেশ্য "লাল"-এর সমার্থক এবং যার কোনো এক অংশ ('ক' বা 'খ') ও বিধেয় "রঙ" অভিন্ন, (দ্বিতীয় সর্তটিও খাটল না)*

(3) "ক অথবা খ" আকারের এমন কোনো পদ নেই যা বিধেয়ের "রঙ"-এর সমার্থক। (কাজেই তৃতীয় সর্তটিও খাটল না)

(কেন এ সর্তটি খাটল না তা নিচে ব্যাখ্যা করা হল।)

মনে হতে পারে : আলোচ্য বাক্যের বিধেয় "রঙ"-এর সমার্থক বৈকল্পিক পদ গঠন করা যায়, বলা যায়

"রঙ" = "লাল ∪ নীল ∪ সবুজ ∪ হলদে ∪ গোলাপী ∪ নারাঙি ∪ বাদামী ∪ ···"

সুতরাং তৃতীয় সর্ত অনুসারে আলোচ্য বাক্যটি বিশ্লেষক, কেননা আলোচ্য বাক্যে "রঙ"-এর পরিবর্তে সমার্থক বৈকল্পিক পদটি বসিয়ে এ বাক্যটি পাই

লাল হল লাল ∪ নীল ∪ সবুজ ∪ ········· ∪ ·········

এবং বাক্যটি স্পষ্টতই বিশ্লেষক॥ কিন্তু এ যুক্তি ভুল। যতক্ষণ না উক্ত বৈকল্পিক বাক্যাংশের "·················" এ চিহ্নগুলি দূর করতে পারি, অর্থাৎ সব রঙের নাম করতে পারি, ততক্ষণ বলা যাবে না "রঙ"-এর সমার্থক কোনো বৈকল্পিক পদ পেয়েছি। আর সব রঙের নাম উল্লেখ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। কাজেই এ কথা সঙ্গতভাবে বলা যায় না যে তৃতীয় সর্ত অনুসারে আলোচ্য বাক্যটি বিশ্লেষক।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলতে পারেন, বৈশ্লেষিকতার মানদণ্ড হিসাবে যে তিনটি সর্ত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি কেবল উদ্দেশ্য—বিধেয় আকারের বাক্য সম্বন্ধেই খাটে, অন্য আকারের বাক্য সম্বন্ধে খাটে না। তারা বলতে পারেন— বিশ্লেষক বলতে বুঝতে হবে : এমন বাক্য যার অন্তর্গত যৌক্তিক শব্দগুলির অর্থ বিচার করে, বা বাক্যটির আকার দেখেই, বাক্যটি সত্য না মিথ্যা তা জানা যাবে। (156-157 পৃ: দ্রষ্টব্য।) কিন্তু

যা লাল তা অবশ্যই নীল নয়

এমন কিছু থাকতে পারে না যা লাল-এবং-নীল

লাল রঙ অবশ্যই নীল থেকে ভিন্ন

এ পূর্বতসিদ্ধ বাক্যগুলির অন্তর্গত যৌক্তিক শব্দের অর্থ বিচার করেই এদের সত্যতা মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যায় না। সুতরাং বিশ্লেষক বাক্যের যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী (এয়ার-প্রদত্ত) লক্ষণ অনুসারেও উক্ত বাক্যগুলি বিশ্লেষক নয়, সংশ্লেষক।

---

* এ কথা ঠিক যে "লাল রঙ হল একটা রঙ" এ বাক্য বিশ্লেষক, কিন্তু "লাল হল একটা রঙ" এ বাক্য বিশ্লেষক নয়।

(2) মূল্যবিষয়ক বাক্য বলে স্বতন্ত্র কোনো বাক্য কি নেই ?

মূল্য সম্বন্ধে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের আবেগসর্বস্ব তত্ত্বটি মেনে নেওয়া যায় না। কেন যায় না দেখা যাক।

দুটি মূল্যবিষয়ক বাক্যের মধ্যে যৌক্তিক বিরুদ্ধতা, জ্ঞানীয় অর্থের বিরুদ্ধতা, থাকতে পারে। যথা,

রাম বলল : ক কাজটি ভাল

শ্যাম বলল : ক কাজটি ভাল নয়।

—এখানে স্পষ্টতই রামের উক্তি ও শ্যামের উক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ॥ কিন্তু দুটি অনুজ্ঞাবাক্যের মধ্যে যৌক্তিক বিরোধ থাকতে পারে না ; কেননা অনুজ্ঞাবাক্য প্রসঙ্গে সত্যতা মিথ্যাত্বের কথা উঠতে পারে না। কাজেই একথা মানা যায় না যে, মূল্যবিষয়ক বাক্যগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুজ্ঞা বাক্য, মানা যায় না যে

ক কাজটি ভাল = ক কাজটি করবে

ক কাজটি ভাল নয় = ক কাজটি করো না।

সেরকম, পছন্দ-অপছন্দ-জ্ঞাপক বাক্যের মধ্যে, যথা

(রামের উক্তি :) আমি কবিতাটি পছন্দ করি

(শ্যামের উক্তি :) আমি কবিতাটি পছন্দ করি না

এ বাক্য দুটির মধ্যে কোনো যৌক্তিক বিরুদ্ধতা নেই, কিন্তু

কবিতাটি সুন্দর   কবিতাটি সুন্দর নয়

এ বাক্য দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধ বাক্য। কাজেই এ কথা মানা যায় না যে—মূল্যবিষয়ক বাক্যে কেবল পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি ব্যক্ত হয়। মানা যায় না যে—

কবিতাটি সুন্দর = আমি কবিতাটি পছন্দ করি

কবিতাটি অসুন্দর = আমি কবিতাটি অপছন্দ করি।

তারপর, "সুন্দর" আর "পছন্দ করি," "অসুন্দর" আর "অপছন্দ করি", "ভাল" আর "অনুমোদন করি" —এসব যদি সমার্থক হত তাহলে,

ক বস্তুটি সুন্দর কিন্তু আমি নিজে এ জাতীয় বস্তু পছন্দ করি না

ক বস্তুটি সুন্দর নয় (জানি) কিন্তু আমি ক বস্তুটি পছন্দ করি

ক কাজটি ভাল (জানি) তবু আমি এ কাজ অনুমোদন করতে পারি না

এসব বাক্য স্ববিরোধী বলে গণ্য হত। কিন্তু এসব বাক্য স্ববিরোধী নয়, সুতরাং উক্ত শব্দগুলি সমার্থক নয়।

নিম্নোক্ত প্রশ্নটি ও উত্তরটি লক্ষণীয়।

প্রশ্ন : আপনার কী মত ? সত্য কথা বলা কি সব সময় ভাল ?

উত্তর : আমি নিজে সত্য কথা বলা পছন্দ করি।

এ উত্তরে প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তিনি মনে করবেন—তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া হয়নি, উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ; তিনি মনে করবেন—তার প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিতে হলে "— ভাল," "— ভাল নয়" এ আকারের

উক্তি করার দরকার। এর থেকে বোঝা যায়ঃ আমরা মূল্যবিষয়ক বিশেষণ ব্যবহার করে কেবল পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করি না, আরও কিছু বোঝাই।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা যেন মনে করেনঃ "পছন্দ করি" আর "অনুমোদন করি" "অপছন্দ করি" আর "অনুমোদন করি না"—এসব সমার্থক। কিন্তু এ সব সমার্থক নয়। এমন হতে পারেঃ আমি কোনো কাজ অনুমোদন করি কিন্তু পছন্দ করি না, বা আমি অনুমোদন করি না কিন্তু পছন্দ করি। ভাল মন্দ হিতাহিত কী আমরা জানি, কিন্তু মন্দ আর অহিতই আমাদের পছন্দ আর যা ভাল বা হিতকর তাই অপছন্দ করি॥ যা ভাল তাই যদি সবাই পছন্দ করত, যা মন্দ তাই যদি সবাই অপছন্দ করত, এবং এ পছন্দ অপছন্দ অনুসারে কোনো কাজে লিপ্ত হত বা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকত—তাহলে নৈতিক শিক্ষার কোনো প্রয়োজন থাকত না, ভাল কী, মন্দ কী—এসব জিজ্ঞাসা নিয়ে নীতিশাস্ত্র গড়ে উঠত না।

তারপর, আমি ক বস্তু বা কাজ কেন পছন্দ করি (অপছন্দ করি) তা না জেনেও পছন্দ (অপছন্দ) করতে পারি। বলতে পারিঃ রামকে আমার খুব পছন্দ, কিন্তু কেন ওকে পছন্দ হয় তা জানি না। যুক্তিবিজ্ঞান আমার একেবারেই পছন্দ নয়, কিন্তু কেন, তা ঠিক বলতে পারি না॥ কিন্তু একথা বলা যায় না

আমি ক অনুমোদন করি, কিন্তু কেন অনুমোদন করি তা জানি না

আমি ক অনুমোদন করি না, কিন্তু কেন অনুমোদন করি না তা বুঝতে পারি না। কেননা অনুমোদন বা অননুমোদন করি কোনো জ্ঞাত হেতুতে, কোনো যুক্তিতে। যথা ক কাজটি ভাল মনে করি বলেই অনুমোদন করি। এজন্য বলা হয়েছে অনুমোদনের (অননুমোদনের) একটা স্বতঃসার্বিকতা আছে। কিন্তু পছন্দ অপছন্দ ব্যক্তিসাপেক্ষ। আমার ক কাজটি পছন্দ কিন্তু আমি এ দাবী করি না, সবাই ক পছন্দ করে বা সবাইর ক কাজ করা উচিত। কিন্তু আমি যদি ক কাজটি অনুমোদন করি তাহলে আমার এ দাবীও থাকে যে ক কাজটি করা সঙ্গত, সবাই ক অনুমোদন করবে বা সবাইর ক অনুমোদন করা উচিত।

আবার,

ক ভাল = আমি ক অনুমোদন করি

ক মন্দ = আমি ক অনুমোদন করি না

এ সমীকরণ মানা যায় না। কেননা আমাদের যে কাজ করার সামর্থ্য আছে কেবল তার সম্বন্ধে অনুমোদন অননুমোদনের কথা ওঠে। যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে তার সম্বন্ধেও কিন্তু সার্থকভাবে "ভাল", "মন্দ"—এ বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা যায়। যথা, বলা যায়—

শীতকালে শীত পড়া ভাল

ভূমিকম্প কখনও ভাল নয়।

কিন্তু এসব বাক্যে "ভাল"-এর পরিবর্তে "অনুমোদন করি" ও "ভাল নয়"-এর পরিবর্তে "অনুমোদন করি না" প্রয়োগ করা যায় না, বলা যায় না

শীতকালে শীত পড়া আমি অনুমোদন করি
ভূমিকম্প কখনও আমি অনুমোদন করি না।

কিন্তু বলা যায়

শীতকালে শীত পড়া আমি পছন্দ করি
ভূমিকম্প কখনও আমি পছন্দ করি না ৷৷

এর থেকে বোঝা যায় ঃ "পছন্দ করি" আর "অনুমোদন করি", "পছন্দ করি না আর "অনুমোদন করি না" সমার্থক নয়। আবার, "ভাল" আর "অনুমোদন করি", "ভাল নয়" (বা "মন্দ") আর "অনুমোদন করি না"—এসবও সমার্থক বলে গণ্য হতে পারে না ৷৷

(3) যে বাক্য বিশ্লেষকও নয় যাচাইযোগ্যও নয় তার কি জ্ঞানীয় অর্থ নেই ?

অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেন ঃ বাক্য দু প্রকার—পূর্বতসিদ্ধ-বিশ্লেষক আর পরতসাধ্য-সংশ্লেষক, এবং যা বিশ্লেষকও নয় যাচাইযোগ্যও নয় তার কোনো জ্ঞানীয় অর্থ নেই। আমরা বাক্যের দ্বিকোটিক বিভাজন তত্ত্বের সমালোচনা করেছি। এখন অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্বটি আলোচনা করব। এ তত্ত্বটি যদি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় তাহলে "আধিবিদ্যক বাক্যমাত্রই অর্থহীন" এ উক্তিও ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হবে।

(ক) অর্থের যাচাইকরণ তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই এ আপত্তি উঠতে পারে ঃ

যে বাক্য বিশ্লেষক বা যাচাইযোগ্য কেবল তারই (জ্ঞানীয়) অর্থ আছে

স্পষ্টতই এ বাক্যটি বিশ্লেষকও নয়, আবার বাক্যটি যাচাইযোগ্যও নয় ; সুতরাং এ সূত্রটির জ্ঞানীয় অর্থ নেই ৷৷ এ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেন ঃ এ বাক্যে কোনো বিবৃতি ব্যক্ত হয় নি, এটি নির্দেশক বাক্য নয় ; বাক্যটিতে একটি বিধি বা বিধান ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু যদি এ বাক্যে কোনো ব্যাপার বর্ণিত না হয়, কোনো (ব্যাপারবিষয়ক) উক্তি করা না হয়, যদি বাক্যটি কেবল কোনো বিধান বা কর্মপন্থাই নির্দেশ করে, তাহলে এ বাক্য প্রসঙ্গে সত্য মিথ্যার কথা উঠতে পারে না। কোনো বিধিবিধান সঙ্গত অসঙ্গত হতে পারে, পালনীয় অ-পালনীয় হতে পারে ; কিন্তু সত্য বা মিথ্যা বলে গণ্য হতে পারে না। আর যা সত্য মিথ্যা বলে গণ্য নয় তার জ্ঞানীয় অর্থও থাকতে পারে না। সুতরাং, উক্ত সূত্রটি অর্থহীন—এ আপত্তি তুললে, যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেন বলে মনে হয় না।

(খ) আলোচ্য যাচাইসূত্রের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি ওঠে। "বাক্য" বলতে অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি বোঝায়। কাজেই যখন বলা হয় "যে বাক্য বিশ্লেষক বা

যাচাইযোগ্য………" তখনই ধরে নেওয়া হয় যে অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টির কথ বলা হচ্ছে। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেন—

ব বাক্যটি যদি বিশ্লেষক বা যাচাইযোগ্য না হয় তাহলে বাক্যটি অর্থহীন ।

কিন্তু ব যদি অর্থযুক্ত না হত তাহলে বাক্য বলেই গণ্য হতে পারত না। "ব বাক্য" কথাটি বললে এ কথাও বলা হয়ে যায় যে ব-এর অর্থ আছে। তাহলে যাচাইকরণ তত্ত্বের আর প্রয়োজন থাকল কোথায় ? তাছাড়া সেক্ষেত্রে

ব বাক্যটি অর্থহীন

—এ উক্তি স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। এ অসুবিধা দূর করার জন্য যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেনঃ বাক্য আর বচনের মধ্যে পার্থক্য করার দরকার। বচন মাত্রেরই অর্থ আছে কিন্তু বাক্যের অর্থ নাও থাকতে পারে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত বিশেষ প্রকারের শব্দবিন্যাসকে বাক্য বলে—তা সে শব্দ-বিন্যাস অর্থযুক্ত হোক বা না হোক। যথা "দ্বিঘাত সমীকরণ ঘোড়দৌড় দেখে" এটিও বাক্য। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা বলেন

যে বচন বিশ্লেষক বা যাচাইযোগ্য নয় তা অর্থহীন

—এ কথা বললে উক্ত আপত্তি উঠতে পারে, ঠিক ; কিন্তু যদি বলি

যে বাক্য বিশ্লেষক বা যাচাইযোগ্য নয় তা অর্থহীন

তাহলে, উক্তরূপে যাচাইসূত্রটি ব্যক্ত করলে, উক্ত আপত্তি ওঠে না। কিন্তু শেষোক্ত সূত্রটিও আপত্তিকর। "যাচাইযোগ্য" মানে যা সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে, কিন্তু বাক্য বলতে যদি কেবল শব্দবিন্যাসই বোঝায় তাহলে বাক্য সম্বন্ধে সত্যতার (মিথ্যাত্বের), সুতরাং যাচাইযোগ্যতার, কথাও ওঠে না। এ আপত্তির সম্মুখীন হয়ে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা নানানভাবে যাচাই সূত্রটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ সব পরিমার্জিত সূত্রগুলির বিরুদ্ধেও অনুরূপ আপত্তি ওঠে।

(গ) যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা স্বীকার করেন যে সবল-যাচাই তত্ত্ব বা বাস্তব-যাচাই তত্ত্ব মেনে নিলে অর্থযুক্ত সার্বিক বাক্যও, যথা বৈজ্ঞানিক বাক্যও, অর্থহীন হয়ে পড়ে, আবার "চাঁদের অপর দিকে পাহাড় আছে", "অশোক বলে একজন রাজা ছিলেন" এ জাতীয় বাক্যও অর্থহীন হয়ে পড়ে ; এজন্য তারা দুর্বল ও নীতিগত যাচাইযোগ্যতার কথা বলেন। এ স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায় যে যাচাইতত্ত্ব প্রয়োগ না করে অন্যভাবে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা জানতে পারেন যে বৈজ্ঞানিক বাক্য, বা সাধারণত অর্থযুক্ত-বলে-গৃহীত বাক্যও অর্থবহ। তা না হলে এ জাতীয় বাক্যকে যাচাইতত্ত্বের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চাইবেন কেন ? নিশ্চয়ই যাচাই না করেই তারা জানতে পারেন যে এ জাতীয় বাক্যেরও অর্থ আছে। তার মানে, যারা যাচাইতত্ত্বকে অবিশ্লেষক বাক্যের অর্থযুক্ততা নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড বলে সোচ্চার ঘোষণা করেন তারাও আসলে যাচাইতত্ত্ব ছাড়াই অর্থযুক্ততা নির্ণয় করেন।

(ঘ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী যাচাইকরণ তত্ত্বটি বিভিন্ন সূত্রাকারে ব্যক্ত করেছেন। এ সূত্রগুলির কোনোটিই সন্তোষজনক বলে মনে হয় না।

যথা, এয়ার-কথিত, সব চেয়ে দুর্বল যাচাইকরণ সূত্রটি হল এই ঃ

যদি ব এবং ভ থেকে ম নিঃসৃত হয় এবং ম প্রত্যক্ষ-বাক্য হয় তাহলে
বুঝতে হবে ব (বা ভ)-এর অর্থ আছে।

কিন্তু এ মানদণ্ড অনুসারে যে কোনো অর্থহীন বাক্যকেই অর্থযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করা যায়। যথা, "আদিতে বাক্য ছিলেন" (ব) এ বাক্যটি কি যাচাইযোগ্য? উত্তর ঃ উক্ত মানদণ্ড অনুসারে যাচাইযোগ্য (সুতরাং অর্থযুক্ত), কেননা অন্য বাক্য ভ-এর সঙ্গে যুক্ত করলে একটি প্রত্যক্ষ-বাক্য বৈধভাবে* নিঃসৃত হতে পারে। যথা

(ব) আদিতে বাক্য ছিলেন, (এবং)
(ভ) যদি আদিতে বাক্য থাকেন তাহলে এ পৃষ্ঠাটি বাংলায় লেখা
(ম) ∴ এ পৃষ্ঠাটি বাংলায় লেখা।

এখানে ম প্রত্যক্ষ-বাক্য, সুতরাং ব অর্থাৎ "আদিতে বাক্য ছিলেন" দুর্বলভাবে যাচাইযোগ্য ; সুতরাং অর্থবহ। এ আপত্তির উত্তরে এয়ার বলেন ঃ প্রশ্ন যদি এই হয় যে, ব যাচাইযোগ্য কিনা তাহলে ব-কে এমন একটি বাক্য (বা বাক্য সমষ্টি) ভ-এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যা যাচাইযোগ্য। কিন্তু এ ভ (যথা 'যদি আদিতে.........') যাচাইযোগ্য কিনা তা আবার নির্ণয় করতে আর একটি যুক্তির দরকার, এবং তার হেতুবাক্যের যাচাইযোগ্যতা নির্ণয় করতে আর একটি যুক্তির দরকার হতে পারে—এবং এভাবে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হতে পারে।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা তাদের যাচাইকরণ মানদণ্ডটি এমনভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি যাতে আধিবিদ্যক বাক্য অর্থহীন আর বৈজ্ঞানিক বাক্য অর্থযুক্ত প্রতিপন্ন হয়। যে মানদণ্ড দিয়ে আধিবিদ্যক বাক্যের অর্থহীনতা প্রতিপন্ন হয় ঠিক সে মানদণ্ড প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক বাক্যেরও অর্থহীনতা দেখানো যায়। এজন্য কেউ কেউ যাচাইযোগ্যতার কথা না বলে মিথ্যা-প্রতিপাদ্যতার[1] কথা বলেন।

(ঙ) মিথ্যা-প্রতিপাদ্যতা তত্ত্ব অনুসারে—

যে বাক্য মিথ্যা বলে প্রতিপাদনযোগ্য কেবল তারই অর্থ আছে।

এ মানদণ্ড অনুসারে সার্বিক বাক্য অর্থযুক্ত কেননা কোনো একটি বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারলেই সার্বিক বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা যায়। কিন্তু আংশিক বাক্যের (সার্বিক বাক্যের বিরুদ্ধ বাক্যের) যথা

অন্তত একটা লাল ফুল গন্ধহীন নয়**

এ বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করব কি করে? এ বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা যায় না, কেননা আংশিক বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করতে হলে আনুষঙ্গিক সার্বিক বাক্যের,

* যুক্তিটি *modus ponendo ponens* আকারের যুক্তি। এতে দ্বিতীয় হেতুবাক্যটি প্রথমে লেখা হয়েছে।

1. falsifiability

** অন্তত একটা ক হল খ=কতক ক হল খ। "কতক—হয়—", "কতক —নয়—" আকারের বাক্যকে "অন্তত একটি—হয় (নয়)—" আকারে ব্যক্ত করা যায়।

সব লাল ফুল গন্ধহীন

—এ বাক্যের, সত্যতা প্রতিষ্ঠা করার দরকার। কিন্তু সার্বিক বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করা যায় না।* তার মানে, আলোচ্য মানদণ্ড অনুসারে সার্বিক বাক্যের অর্থ আছে, আংশিক বাক্য অর্থহীন।

(চ) দেখা গেল ঃ মিথ্যা-প্রতিপাদ্যতা মানদণ্ড মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে আংশিক বাক্য অর্থহীন। আর যাচাইযোগ্যতা মানদণ্ডটি মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে সার্বিক বাক্য অর্থহীন। কেননা সার্বিক বাক্য যাচাইযোগ্য নয়। অবশ্য শেষোক্ত ত্রুটি দূর করার জন্য অনেক যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী, যথা এয়ার, দুর্বল যাচাইযোগ্যতার কথা বলেন।

যাচাইযোগ্যতা ও মিথ্যা-প্রতিপাদ্যতা —এ দুটি মানদণ্ডের আরও একটি দোষ হল এইঃ এ মানদণ্ডগুলি মেনে নিলে, যে যৌগিক বাক্যের এক অংশ স্পষ্টতই অর্থহীন সে সমগ্র যৌগিক বাক্যকেও অর্থযুক্ত বলে গণ্য করতে হয়।

ধরা যাক, ব বাক্যটি অর্থযুক্ত (কেননা যাচাইযোগ্য, ধরা যাক, বস্তুত সত্য-বলে যাচাইকৃত) এবং ভ বাক্যটি অর্থহীন। যাচাইযোগ্যতা মানদণ্ড অনুসারে; "ব অথবা ভ" বাক্যটি অর্থবহ হয়ে পড়ে; কেননা ব-এর যাচাই হয়েছে বলে, ব সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে বলে, বলতে হয়ঃ "ব অথবা ভ" যাচাইযোগ্য।** যথা

এ ফুলটা লাল অথবা আদিতে বাক্য ছিলেন

—এ বাক্যটি যাচাইযোগ্য কেননা এর প্রথম বিকল্প যাচাইযোগ্য (দেখা গেল, সত্য)। যাচাইযোগ্য বলে সমগ্র বাক্যটি অর্থযুক্ত। এ কথা স্বীকার করা মানেঃ এ কথা মেনে নেওয়া যে, যে বাক্যের এক অংশ অর্থহীন সে বাক্যেরও অর্থ আছে।

ধরা যাক ব বাক্যটি অর্থযুক্ত (কেননা মিথ্যা-প্রতিপাদ্য; বস্তুত, মিথ্যা) এবং ভ বাক্যটি অর্থহীন। মিথ্যা প্রতিপাদ্যতা মানদণ্ড অনুসারেঃ "ব এবং ভ" বাক্যটি অর্থবহ হয়ে পড়ে। কেননা ব-এর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন হলে "ব এবং ভ"-এর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন হয়ে যায়।† যথা

সব মানুষ সত্যবাদী এবং আদিতে বাক্য ছিলেন

এ বাক্যটির প্রথম অংশটি মিথ্যা (-প্রতিপাদ্য), সুতরাং সমগ্র বাক্যটি মিথ্যা (-প্রতিপাদ্য) সুতরাং সমগ্র বাক্যটির অর্থ আছে। কিন্তু যে বাক্যের এক অংশ অর্থহীন সে সমগ্র বাক্যের অর্থ আছে —এ কেমন কথা?

---

* অবরোহ অনুমানে সার্বিক বাক্য প্রমাণিত হয় ঠিক, কিন্তু অন্য সার্বিক বাক্যের (হেতু-বাক্যের) সত্যতা স্বীকার করে নিতে হয়। এ সার্বিক হেতুবাক্যকে আবার প্রমাণ করতে হলে অন্য অবরোহের দরকার। বলা বাহুল্য, এভাবে সব সার্বিক বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে না।

** যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে বৈকল্পিক বাক্যের কোনো একটি বিকল্প সত্য হলেই বৈকল্পিক বাক্যটি সত্য বলে গণ্য।

† যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে—সংযৌগিক বাক্যের কোনো একটি সংযোগী মিথ্যা হলেই সংযৌগিক বাক্যটি মিথ্যা বলে গণ্য।

দশম অধ্যায়

বস্তুবাদ

1. ভূমিকা

আমরা জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি আলোচনা করেছি। জ্ঞান প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন ওঠেঃ আমরা কী জানি? জ্ঞানের বিষয় কী? সাধারণ লোকের কাছে এটা কোনো সমস্যাই নয়, কেননা সাধারণ লোকের ধ্রুব বিশ্বাসঃ আমরা পরিবেশের বস্তু, ব্যাপার, ঘটনা* —এসব জানি। এ ব্যাপারে কোনো সমস্যা যে উঠতে পারে সাধারণ লোক তা মনে করে না। কিন্তু দার্শনিকরা এ বিষয়ে একমত নয়। কেউ কেউ মনে করেন আমরা যা জানি তা আমাদের মনেরই কোনো বৃত্তি বা অবস্থা। এ মতের সঙ্গে লোকায়ত মতের কোনো সাদৃশ্যই নেই। এ মতভেদ থেকে বোঝা যায় যে জ্ঞানের বিষয় কী? —এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি আরও সুনির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করা যায়ঃ জ্ঞানের বিষয় কি মনসাপেক্ষ না মনোনিরপেক্ষ? বস্তুত এ প্রশ্নের কী উত্তর দেওয়া হয় সেদিক থেকে দেখলে সব দার্শনিককে দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায়। যাঁরা বলেন জ্ঞানের বিষয় কোনো মনোনিরপেক্ষ বস্তু বা ব্যাপার তাদের বলে বস্তুবাদী। আর যারা বলেন জ্ঞান-বিষয়ের অস্তিত্ব মনসাপেক্ষ (জ্ঞানসাপেক্ষ) তাদের বলে ভাববাদী।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন ওঠেঃ জড় আর মন এদের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ? যারা বলেন জড় থেকেই মনের সৃষ্টি, জড়ই মুখ্য আর মন, আত্মা এসব গৌণ তাদের জড়বাদী বা প্রাকৃতবাদী** বলে। আর যারা বলেনঃ না, মনই বেশী গুরুত্বপূর্ণ, বা বস্তুজগৎ কোনো আত্মার অভিব্যক্তি বা যাকে জড় বলে মনে করা হয় তা আসলে আত্মিক বা চিন্ময়—তাদের তত্ত্বগত ভাববাদী বলা হয়। তত্ত্বগত ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের বিরোধ নেই, বিরোধ হল জড়বাদ বা প্রাকৃতবাদের সঙ্গে। তত্ত্বগত ভাববাদী হয়েও কেউ জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ (বস্তুর অস্তিত্ব হল জ্ঞাননিরপেক্ষ—এ মত) গ্রহণ করতে পারে।

আমরা বস্তুবাদ ও ভাববাদের বিভিন্ন প্রকার বিশদভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

2. বস্তুবাদের বিভিন্ন প্রকার

বস্তুবাদের প্রতিপক্ষ হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ। এ ভাববাদের বক্তব্য হলঃ আমাদের জ্ঞান বা চেতনার, এক কথায়—মনের, বাইরে কোনো বাহ্য বস্তু বা

* ব্যাপার=fact ঘটনা=event ** প্রাকৃতবাদ=naturalism

জড় বস্তু থাকতে পারে না। এ ভাববাদী মতের প্রতিবাদ করে বস্তুবাদীরা ঘোষণা করেন—মনের বাইরে জড় বস্তুর স্বতন্ত্র, অনুভবনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বস্তুবাদী মতেঃ জ্ঞানে বস্তু আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয়, আমরা বস্তুর মুখোমুখী হই। বস্তুবাদের লক্ষণ দিতে গিয়ে বস্তুবাদী সাণ্টায়ন বলেছেনঃ ব্যাপকতম অর্থে বস্তুবাদ বলতে বোঝায়—জ্ঞান-অতিবর্তী, জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস। আর সংকীর্ণ অর্থে বস্তুবাদ বলতে বোঝায় এ দাবী—যা-ই অনুভূত বা জ্ঞাত হয় তারই জ্ঞাননিরপেক্ষ বা অনুভবনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। আর বস্তু ঠিক যে রূপে আমাদের বোধে ধরা দেয় সে রূপই বস্তুর প্রকৃত রূপ। স্পষ্টতই বস্তুবাদের প্রকার ভেদ আছে আর বস্তুবাদী দাবীর মাত্রাভেদ আছে।

কোনো বস্তুবাদী বলতে পারেন—সব জ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাননিরপেক্ষ; আর কোনো বস্তুবাদী বলতে পারেন—জ্ঞাত বস্তুর স্বরূপ অংশত জ্ঞাননিরপেক্ষ অংশত জ্ঞানসাপেক্ষ, বলতে পারেন যে, সব জ্ঞাত বিষয়ই জ্ঞান-নিরপেক্ষ নয়। আবার কোনো বস্তুবাদী বলতে পারেন—বস্তু সাক্ষাৎ অনুভবে জানা যায়, অথবা বলতে পারেন—বস্তুর সাক্ষাৎ অনুভব হয় না। ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যায়, বিভিন্ন বস্তুবাদী মতকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভাগ করা যায়। তবে বস্তুবাদী মতবাদগুলিকে অপরোক্ষ বস্তুবাদ ও পরোক্ষ বস্তুবাদ এ দু জাতে ভাগ করাই বেশী সুবিধাজনক বলে মনে হয়।

অপরোক্ষ বস্তুবাদ বা জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ[1]ঃ এ মতের বক্তব্য হল এই —প্রত্যক্ষ হল বস্তুর সঙ্গে সরাসরি মুখোমুখী হওয়া, বস্তুজ্ঞান হয় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে বা অনুভবে।

পরোক্ষ বস্তুবাদ বা জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ[2]ঃ এ মতে বস্তুর ইন্দ্রিয়ানুভব হল পরোক্ষ প্রক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ানুভবে সরাসরি বস্তুজ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ানুভবে পাই মনোনিরপেক্ষ বস্তুর কোনো প্রতিরূপ। এ প্রতিরূপের ভিত্তিতেই পরোক্ষভাবে বস্তুজ্ঞান হয়।

অপরোক্ষ বস্তুবাদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলঃ সরল বস্তুবাদ ও নব্য বস্তুবাদ। আর পরোক্ষ বস্তুবাদের দুটি প্রধান রূপ হলঃ প্রতিরূপী বস্তুবাদ[3] ও সবিচার বস্তুবাদ[4]।

একটা কথা। যে ক্রমে বস্তুবাদী মতগুলি এখানে উল্লেখ করা হল সে ক্রমে কিন্তু মতবাদগুলি আলোচিত হবে না। কিছুটা ঐতিহাসিক ক্রম বজায় রাখার জন্য আমরা প্রথমে দুটি প্রাচীন মতঃ সরল বস্তুবাদ (বস্তুবাদের একটি অপরোক্ষ রূপ) ও প্রতিরূপী বস্তুবাদ (একটি পরোক্ষ রূপ,) আলোচনা করব। তারপর দুটি নব্য রূপ আলোচনা করব—প্রথমে অপরোক্ষ নব্য রূপটি (নব্য বস্তুবাদ) তারপর পরোক্ষ নব্য রূপটি (সবিচার বস্তুবাদ) আলোচনা করব।

1. Epistemological Monism 2. Epistemological Dualism
3. Representative Realism 4. Critical Realism

3. সরল বস্তুবাদ[1]

অপরোক্ষ বস্তুবাদের সব চেয়ে সরল রূপ হল নির্বিচার বস্তুবাদ, সরলমতি বস্তুবাদ বা সংক্ষেপে, সরল বস্তুবাদ। এ মতবাদকে দার্শনিক মতবাদ বলে গণ্য করা হয় না। দার্শনিকরা মনে করেন: এটা একটা লোকায়ত মত; আপামর জনসাধারণের স্থূল, নির্বিচার ও অসংস্কৃত মত। যখন সরল বস্তু-বাদের কথা বলা হয় তখন একজন "সাধারণ লোক"-এর কল্পনা করা হয়। এবং মনে করা হয় যে, এ কল্পিত ব্যক্তির স্থির বিশ্বাস: বহির্জগৎ মনোনিরপেক্ষ বস্তুর সমষ্টি, এ বস্তুগুলির অস্তিত্ব বা স্বরূপ মনের উপর বা জ্ঞাত হওয়ার উপর নির্ভর করে না। আমি যেমন বস্তুগুলির অস্তিত্ব ও স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারি, অন্যেরাও ঠিক তেমনই এদের জানতে পারে। কোনো বিশেষ বস্তু আমার কাছে যে রূপে দেখা দেয় অন্যের কাছেও ঠিক সে রূপেই উপস্থিত হয়॥ বলা হয়, সরল বস্তুবাদী ব্যক্তিটি আরও মনে করে: বস্তুগুলি অপরোক্ষ অনুভবে জানা যায়; বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—এ সবই প্রাকৃত ধর্ম, বস্তুস্থিত ধর্ম।

(সরল বস্তুবাদের মতে: বস্তু সাক্ষাৎভাবে আমাদের চেতনায় ধরা দেয় এবং কোনো বস্তু প্রকৃতই যেমন, বস্তুটি তেমনভাবেই জ্ঞাত হয়। এমন নয় যে, আমরা বস্তুর কোনো প্রতিফলন পাই এবং প্রতিফলনের মারফতে বস্তুকে জানতে পারি॥ এ মতে—আমাদের চেতনা হল সন্ধানী আলোর মত, যেন এ আলো ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বস্তুকে আলোকিত করে, এবং ফলে জ্ঞাত বস্তুকে সরাসরি জানতে পারে।)

সরল বস্তুবাদের বক্তব্য নিম্নোক্ত পাঁচটি বাক্যে ব্যক্ত করা যায়:

(1) বহির্জগতে বহু বস্তু আছে—গাছপালা, ঘরবাড়ী, নদীনালা, পাহাড়পর্বত ইত্যাদি।

(2) বস্তু মাত্রই অনুভবনিরপেক্ষ, মনোনিরপেক্ষ। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ আমাদের অনুভবের উপর নির্ভর করে না। আমরা কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি বা না করি—বস্তু বহির্জগতে নিজ নিজ রূপে অবস্থান করে॥

(3) বস্তু মাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং এদের সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা হয় ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়ে সে সব উক্তির সত্যতা যাচাই করা যায়।

(4) বস্তুকে সাক্ষাৎ অনুভবে পাওয়া যায়। বস্তুর জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান॥

(5) অনুভবে যা পাই তা-ই বস্তু বা বস্তুধর্ম। আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ নির্ভুলভাবে জানা যায়, কোনো বস্তু প্রকৃতই যেমন, তেমন বলেই তাকে জানা যায়॥

মনে করা করা হয়, উক্ত বাক্যগুলিতে জনসাধারণের বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু দার্শনিকরা প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা ও ন্যায্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অনেকে এদের প্রত্যেকটির সত্যতা অস্বীকার করেছেন। যে যুক্তির ভিত্তিতে উক্ত বিশ্বাসগুলি সম্বন্ধে সংশয় করা হয় সে যুক্তিগুলির মূল বক্তব্য হল:

---
1. Naive Realism

ক একটি বস্তু, ক বস্তুতে খ ধর্ম আছে

কেননা আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবে ক-কে পাই এবং জানতে পারি ক-তে খ আছে —এ যুক্তি অবৈধ। কেননা—

বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা খ বস্তুকে ক বলে ভুল করি, আবার
অনেক ক্ষেত্রে অ-বস্তুও বস্তু বলে অনুভূত হয়॥

যুক্তিটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

(1) আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা কতকটা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি যদি অন্যরূপ হত, বা আমাদের আরো কয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকত, তাহলে বহির্জগতে বিভিন্ন বস্তুতে এখন যেসব ধর্ম প্রত্যক্ষ করি তখনও কি ঠিক তাই করতাম? না। তাহলেঃ হয়ত বস্তুতে আরো কতকগুলি ধর্ম প্রত্যক্ষ করতাম, এখন বস্তুগুলি যেমন দেখায় তখন হয়ত তেমন দেখাত না। যথা, আমাদের চোখের গঠন যদি অন্যরূপ হত তাহলে এখন যা যেমন দেখায় তখন তা অন্যরূপ দেখাত। আমাদের রসনার গঠন অন্যরূপ হলে কোনো খাদ্যবস্তু আস্বাদন করে এখন যে স্বাদ পাই, তার বদলে অন্যরূপ স্বাদ পেতাম॥ বস্তুত এমন বহু প্রাণী আছে যারা সম্পূর্ণ বর্ণান্ধঃ এদের কাছে এ জগতের সব কিছুই সাদা কাল বা ধূসর (লক্ষণীয় "বর্ণ"-এর পারিভাষিক অর্থে এ সব বর্ণ নয়)। এ সব প্রাণীও যদি তাদের মত ব্যক্ত করতে পারত, (সরল বস্তুবাদী) দর্শন রচনা করতে পারত, তাহলে বলতঃ এ জগতে সাদা, কাল আর ধূসর বস্তু ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু নেই।

দেখা গেল, আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ের স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের গঠনের উপর নির্ভর করে। এবং ইন্দ্রিয়ের মারফতে ছাড়া প্রত্যক্ষকরণ সম্ভব নয়। এক রঙের চশমা খুলে, খালি চোখে বা অন্য রঙের চশমা পরে, দেখতে পারি কোনো বস্তু বিভিন্ন রঙের চশমায় বা খালি চোখে কেমন দেখায়। কিন্তু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ চশমা থেকে মুক্তি নেই। কাজেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যেঃ ক বস্তুটি যেমনভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, ক বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে ঠিক তেমনই।

(2) এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যেঃ কোনো বস্তু বা বস্তুধর্ম কোনো বিশেষ মুহূর্তে কী রূপে আমাদের বোধে ধরা দেবে তা অনেকটা নির্ভর করে— পরিবেশের উপর, পরিপ্রেক্ষিতের উপর এবং ইন্দ্রিয়-মস্তিষ্কের তৎকালীন অবস্থার উপর। যথা, যদি ডান হাতটি বরফ গলা জলে এবং বাম হাতটি ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে নিয়ে পর মুহূর্তে দুটি হাতই এক সঙ্গে স্বাভাবিক উত্তাপের, নাতিশীতোষ্ণ, জলের বালতিতে ডোবানো হয় তাহলে ডান হাত দিয়ে এ অনুভব হবে— বালতিটির জল অত্যন্ত গরম, আর বাম হাত দিয়ে এ বোধ হবে— এ বালতিটির জল অতিশীতল। আরও কয়টি উদাহরণঃ সুস্থ অবস্থায় যে স্বাদ পাই, সর্দি হলে সে স্বাদ পাই না। গোলাকার মুদ্রা সোজাসুজি ঠিক ওপর থেকে গোল দেখায়, অন্য পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন একপাশ থেকে,

অন্যরূপ দেখায়। কোনো বস্তু, যেমন ঐ মন্দিরটি, থেকে যতদূরে যাই বস্তুটি ক্রমশ তত ছোট দেখায়॥ তাহলে প্রশ্ন ওঠেঃ বস্তুর আসল রূপ কী? আমাদের উদাহরণের বালতির জলের উত্তাপটি ঠিক কেমন? ঐ মন্দিরের প্রকৃত আকার* কী? যাকে গোলাকার মুদ্রা বলি তার প্রকৃত আকার* কোন্‌টি? মুদ্রাটি ত পরিপ্রেক্ষিতভেদে নানান আকারে প্রতিভাত হয়, কিন্তু গোল আকারটিই মুদ্রাটির প্রকৃত আকার বলে গণ্য হয় কেন?

(3) সরল বস্তুবাদীদের দাবী হলঃ বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদি বস্তুগত ধর্ম, বস্তুর স্বগত বা অনপেক্ষ ধর্ম। যাকে দার্শনিকরা "ভ্রমপ্রত্যক্ষনির্ভর যুক্তি"[1] বলে অভিহিত করেছেন সে যুক্তি প্রয়োগ করে সহজেই দেখানো যায় যে এ দাবী অসঙ্গত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়—এ ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যেঃ কোনো বস্তু প্রকৃতই যেমন সব সময় বস্তুটি ঠিক তেমন রূপে আমাদের বোধে ধরা দেয় না। এবং ফলে, এ কথা বলা যায় না— আমরা সব সময় সব বস্তুকেই যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করি এবং কোনো বস্তুতে যে ধর্মই প্রত্যক্ষ করি না কেন, বস্তুটিতে প্রকৃতই সে ধর্মটি বর্তমান। আমরা জানিঃ সবুজ পাহাড় দুর থেকে নীল দেখায়, সোজা কাঠি জলে আধ-ডোবা অবস্থায় বাঁকা দেখায়, দুটি সমান্তরাল রেল লাইন অসমান্তরাল (অভিসারী[2]) দেখায়। এ সব ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে—বহির্জগতের সব বস্তু প্রকৃতই যেমন ঠিক তেমন রূপে আমাদের প্রত্যক্ষে ধরা দেয় না।

(4) ভ্রমপ্রত্যক্ষে কোনো বস্তু খ-কে ক বলে ভুল করি। হয়ত বস্তুটিতে আছে দ ধর্ম, আমরা প্রত্যক্ষে পাই ধ ধর্ম। অনেক সময় আবার প্রত্যক্ষে অ-বস্তুও বস্তুরূপে প্রতিভাত হয় (এরূপ প্রত্যক্ষকে বলে অমূল প্রত্যক্ষ)। তার মানে, কোনো দেশখণ্ডে কোনো বস্তু না থাকলেও এ বোধ হতে পারেঃ ওটি ক বস্তু, ঐ ক বস্তুতে ধ ধর্ম বর্তমান। যথা মদমত্ত, অবস্থায় লোকে বহু অলীক বস্তু দেখতে পায়, অবাস্তব শব্দ শুনতে পায়— যেমন, দেখতে পায় দেয়াল বেয়ে বহু লাল ইঁদুর ছোটাছুটি করছে। প্রলাপী জ্বরে এ রকম অ-বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। অস্ত্রোপচার করে যে ব্যক্তির একটি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেও অনেক ক্ষেত্রে বাদ-দেওয়া-পায়ে ব্যথা অনুভব করে।

লক্ষণীয় যে, নিছক অনুভব বা প্রত্যক্ষকরণের দিক থেকে বাস্তব বস্তুর প্রত্যক্ষ আর অ-বস্তুর প্রত্যক্ষে কোনো ভেদ নেই। ভ্রান্ত ও অমূল প্রত্যক্ষের সময় এ বোধ হয় না যে— এ প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত, ঐ বস্তুটি অলীক। তাহলে প্রশ্ন ওঠেঃ কোন্ প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত বস্তু-প্রত্যক্ষ আর কোন্ প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত অবস্তু-প্রত্যক্ষ তা বুঝব কেমন করে? যদি বুঝতে না পারি তাহলে এ কথা কেমন করে বলি ঃ অনুভবে বস্তুর স্বরূপ জানা যায়?

---

* "আকার" কথাটির দ্ব্যর্থতা লক্ষণীয়। এখানে মন্দিরের ক্ষেত্রে— আকার=size, আর মুদ্রার ক্ষেত্রে— আকার=shape।

1. argument from illusion 2. convergent

(5) তারপর, স্বপ্নকালীন প্রত্যক্ষের থেকে নির্ভুল প্রত্যক্ষকে পৃথক করব কেমন করে? এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে ঃ স্বপ্নে-দেখা বস্তুর বোধের সঙ্গে বাস্তব বস্তুর নির্ভুল বোধের কোনো পার্থক্য নেই, বোধের সময় দুটি বোধই নির্ভুল বলে মনে হয়। যখন স্বপ্ন দেখি তখন এ জ্ঞান হয় না যে— আমি স্বপ্ন দেখছি; আর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর গায়ে এমন কোন চিহ্ন থাকে না যা দেখে স্বপ্নকালেই বোঝা যায় যে— এ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুটি আসলে অ-বস্তু। বস্তুত স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তবেই বুঝতে পারি, স্বপ্নকালীন প্রত্যক্ষটি আসলে অমূল প্রত্যক্ষ।

কিন্তু এমন ত হতে পারে যে আমরা সবাই একটানা স্বপ্নে ডুবে আছি, নিরন্তর স্বপ্ন দেখছি। এমন ত হতে পারে— যাকে বাস্তব জগৎ বলি তা প্রকৃতপক্ষে অলীক স্বপ্নজগৎ, যাকে অনুভব বলি তা হল একটা বিশাল নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তবে বুঝতে পারি পূর্বেকার (স্বপ্নকালীন) বোধ ছিল স্বাপ্নিক বোধ, সুতরাং অমূলক অনুভব। কিন্তু এমন ত হতে পারে— আমরা যে একটানা স্বপ্নে ডুবে আছি সে স্বপ্ন একদিন ভেঙ্গে গেলে এবং সত্যিকার (পারমার্থিক) জ্ঞানের উদয় হলে বুঝতে পারব ঃ এতদিন একটানা স্বপ্ন দেখছিলাম, বুঝতে পারব ঃ এ তথাকথিত বাস্তব জীবনটাই একটা স্বপ্ন। বস্তুত অনেক দার্শনিক মনে করেন ঃ এ জীবন অলীক, এ জগৎ মায়া, প্রকৃতজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হলে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে জানতে পারব—এ জগৎ স্বপ্ন, মায়া বা মতিভ্রম ॥ কাজেই

ক-কে ইন্দ্রিয়ানুভবে পাই, অনুভবে পাই যে ক-তে ধ ধর্ম আছে

∴ ক বলে একটা বস্তু আছে এবং ক-তে প্রকৃতই ধ ধর্ম বর্তমান।

এ যুক্তি অচল ॥

সরল বস্তুবাদ ও সংশয়বাদ ঃ ওপরে যা বলা হল তার থেকে মনে হতে পারে—কোনো বস্তুর সত্ত্ব আছে কিনা, বস্তুটিতে প্রকৃতই অমুক অমুক ধর্ম আছে কিনা তা জানা যায় না। বস্তুত সংশয়বাদীরা মনে করেন ঃ কোনো জ্ঞানই সম্ভব নয়। আমরা যা কিছুই জানি বলে মনে করি তার সম্বন্ধেই সংশয় হতে পারে ॥ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান কেমন করে পাওয়া যায় —এ প্রশ্ন তুলে (অ-সংশয়বাদী) দেকার্ত একটা "দুষ্ট দৈত্য" বা "প্রতিভাবান প্রতারক"-এর কল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এমন ত হতে পারে—কোনো দুষ্ট দৈত্য আমাদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছে যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি আমাদের প্রতারিতই করবে, আমাদের মনে কেবল স্বপ্ন মায়া বা মতিভ্রমই সৃষ্টি করবে।

ওপরে যে সংশয়ের কথা বলা হল তা নিরসন করে বলা যায় ঃ কোনো কিছু ক যে প্রকৃতই একটা বস্তু, ক-তে যে ধ ধর্মটি বর্তমান তা যদি কখনই জানা না যেত তাহলে "ভ্রমপ্রত্যক্ষ", "অমূল প্রত্যক্ষ", "স্বপ্ন"—এ সব কথা অর্থহীন হয়ে পড়ত। রেল লাইন দুটি যে সমান্তরাল তা জানি বলেই এ কথা বলতে পারি ঃ যে প্রত্যক্ষে এদের অসমান্তরাল দেখায় সে প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত ॥

আবার অনুভব দিয়েই অন্য অনুভবের দোষ সংশোধন করা যায়, অনেক ক্ষেত্রে একটি অনুভব দিয়ে বোঝা যায় যে অন্য অনুভবটি ভ্রান্ত।

প্রসঙ্গত, উক্ত যুক্তিতে সংশয়বাদ খণ্ডিত হয় না। কেননা, যদি একটি ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হয় তাহলেই সঙ্গতভাবে এ সংশয় হতে পারেঃ আমার এ প্রত্যক্ষটি যে ভ্রান্ত নয় তার নিশ্চয়তা কী। যদি জানি ঐ এক শ' জন লোকের মধ্যে একজন খুনী আছে তাহলে এদের যে কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে সংশয় হতে পারে—ঐ লোকটি খুনী নয়ত ?

আর একটা কথা। দার্শনিকরা সরল বস্তুবাদকে সাধারণ লোকের মতবাদ বলে উপস্থিত করেন। কিন্তু এ "সাধারণ লোকটি" দার্শনিকদের কল্পনাপ্রসূত। কেননা, দর্শনে-হাতে-খড়ি-হয়-নি-এমন কোনো লোকও বিশ্বাস করে না যেঃ অনুভবে যা পাই তাই বস্তু বা বস্তুগত ধর্ম। কেউ কি মনে করে জলে যে ছায়া দেখি তাও কায়া? কেউ কি মনে করে রজ্জুসর্প ভ্রমের সাপটিও একটি প্রকৃত বস্তু? কোনো "সাধারণ লোক" কি মনে করে—বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বস্তু যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয় সে সব আকারগুলি বস্তুটির প্রকৃত আকার? সাধারণ লোক যদি সরল বস্তুবাদী হত তাহলে বলত নাঃ এক টাকার মুদ্রাটি গোল, তার পরিবর্তে বলতঃ টাকাটির নানান রূপ, কখনও গোলাকার, কখনও ডিম্বাকার, কখনও বা—। বরং দেখা যাবে, যা বোধে ধরা দেয় তাই বস্তুগত ধর্ম—এটা একটা দার্শনিক মত (নব্য বস্তুবাদীদের মত,) লোকায়ত মত নয়।

4. প্রতিরূপী বস্তুবাদ[1]

বস্তুকে অনুভবে সরাসরি পাওয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাই তাই বস্তু বা বস্তুগত ধর্ম—এ সরল বস্তুবাদী তত্ত্ব মানলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ ও অমূলপ্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেকে মনে করেন প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি ব্যাখ্যা করতে হলে বলার দরকারঃ না, বস্তু সাক্ষাৎ অনুভবে ধরা দেয় না, আমরা অনুভবে যা পাই তা হল বস্তুর প্রতিবিম্ব, প্রতিফলন, প্রতিচ্ছবি বা মনশ্চিত্র। এ মতবাদের সুবিধা হল এইঃ এ মতে বলা যায়—অনুভবে যে মনশ্চিত্র পাই তার সঙ্গে প্রকৃত বস্তুর মিল নাও থাকতে পারে। ভ্রমপ্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ, স্বপ্ন—এ সব ক্ষেত্রে মনশ্চিত্রের সঙ্গে প্রকৃত বস্তুর মিল নেই, কিন্তু নির্ভুল প্রত্যক্ষে যে বস্তু প্রতিচ্ছবি পাই তা হল প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ॥ এ মতবাদকে বলে পরোক্ষ-অনুভব তত্ত্ব।

যে বস্তুবাদ বস্তুর স্বতন্ত্র মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং পরোক্ষ অনুভব তত্ত্ব মেনে নেয় তাকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলা হয়। এ মতবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলা হয় এজন্যঃ এ মতে বস্তু সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাত হয় না, প্রত্যক্ষে প্রতিভাত হয় বস্তুর প্রতিরূপ। আবার উক্ত মতবাদ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ নামেও অভিহিত হয়, কেননা প্রাকৃত বিজ্ঞান (মুখ্যত সপ্তদশ শতাব্দীর

1. Representative Realism

পদার্থবিজ্ঞান)· বস্তুর মুখ্য ধর্ম ও গৌণ ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য কল্পনা করেছিল সে পার্থক্যকরণ মেনে নিয়ে এ মতবাদ গড়ে উঠেছে। আলোচ্য মতবাদটিকে আবার জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ[1] নামেও চিহ্নিত করা হয়, কেননা এ মতের ভিত্তি হল—একদিকে প্রতিরূপ, অন্যদিকে প্রতিরূপের-জনক অর্থাৎ বস্তু —এদের দ্বৈততা।

প্রতিরূপী বস্তুবাদের প্রধান প্রবক্তা জন্ লক্। তিনি মনে করেন—বহির্জগতে মনোনিরপেক্ষ বহু বস্তু আছে, কিন্তু বস্তুগুলি যেরূপে আমাদের অনুভবে প্রতিভাত হয় সে রূপগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বস্তুর প্রকৃত রূপ নয়। লক্ বলেন: বস্তুর গুণ দু রকম—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ।

মুখ্য গুণগুলি বস্তুগত ধর্ম —এদের স্বতন্ত্র মনোনিরপেক্ষ সত্ত্ব আছে, এদের অস্তিত্ব বা স্বরূপ মোটেই আমাদের অনুভবের উপর নির্ভরশীল নয়। যথা, বস্তুর আকার, ওজন, পরিমাণ, গতিবেগ—এ সব মুখ্য গুণ। কোনো জ্ঞাতা প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক এদের কিছু যায় আসে না —এরা স্বতন্ত্র বস্তুগত ধর্ম। কিন্তু গৌণ গুণগুলি বস্তুর প্রকৃত গুণ নয়, এদের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বস্তুর উপর যেমন নির্ভর করে তেমনই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের উপরও নির্ভর করে। যথা বস্তুর বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, উষ্ণতা, শৈত্য —এ সব গৌণ গুণ। এদের সত্ত্ব ও স্বরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর নির্ভরশীল। যেমন, আমাদের চোখ আছে বলে এবং দেখি বলেই গোলাপ লাল দেখায়, গোলাপে প্রকৃতপক্ষে রক্তত্ব ধর্মটি নেই। উক্তরূপ গুণকে বস্তুর গৌণ গুণ বলা হয়ত ঠিক নয়, কেননা এরা ঠিক বস্তুর গুণ নয়। বহির্জগতে বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, স্পর্শ নেই, উষ্ণতা নেই, শৈত্য নেই, শব্দ নেই। তবে এ কথা বলা যায় না যে: চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক আছে বলেই বা আমাদের ইচ্ছা ও খামখেয়ালের ফলেই আমাদের বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদির অনুভব হয়। গৌণ গুণেরও বাস্তব ভিত্তি আছে, এ ভিত্তি হল বস্তুগত শক্তি। মনোনিরপেক্ষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে, ঐ সব শক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে ইন্দ্রিয়গুলি উদ্দীপ্ত হয় এবং ফলে বর্ণের বোধ, স্পর্শের বোধ —এ জাতীয় সব বোধ হয়। যেমন ক বস্তুতে একটা শক্তি শ আছে, এই শ আমাদের জিহ্বার সংস্পর্শে এলে মধুর স্বাদ পাই, খ বস্তুটিতে আর একটি শক্তি স আছে, এই স আমাদের চোখের সংস্পর্শে এলে লাল দেখি। আমরা মনে করি—অমুক (গৌণ) গুণ, যথা লাল, ঐ বস্তুতে আছে; বস্তুত আমরা প্রত্যক্ষ করি যে বস্তুটি লাল। কিন্তু লক্-এর মতে— বস্তুতে আছে গৌণ-গুণের-অনুভব-উৎপাদনকারী শক্তি। এ সব শক্তি যোগ্য ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে আমাদের লাল, নীল, উষ্ণ, শীতল— এ সব অনুভব হয়, লকের ভাষায়— আমরা এ সবের "ধারণা" লাভ করি। লক্ষণীয় যে লকের মতে— অনুভবে যে গৌণ গুণের "ধারণা" পাই তার সঙ্গে বস্তুগত শক্তির আনুরূপ্য আছে ঠিক, কিন্তু সাদৃশ্য নেই। যথা, অনুভবে পাই

1. Epistemological Dualism

লালের ধারণা কিন্তু বস্তুতে আছে লালের-ধারণা-উৎপাদনকারী শক্তি। বলা বাহুল্য, এ শক্তিটি লালবর্ণ নয় (বস্তুত এ শক্তিটি হল এক বিশেষ পরিমাপের ইথার-তরঙ্গ উৎপাদনের শক্তি, এবং তরঙ্গগুলি বর্ণহীন)। জিহ্বা দিয়ে চিনি আস্বাদন করলে পাই সুমধুর স্বাদ, কিন্তু চিনিতে এ স্বাদ নেই, আছে মিষ্ট স্বাদ উৎপাদনকারী একটি শক্তি, ফলে আমাদের স্বাদের "ধারণা"র সঙ্গে চিনিতে নিহিত শক্তিটির সাদৃশ্য নেই। ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যায়, লক্ যে বাস্তব জগৎ কল্পনা করেছেন সে জগতে—বর্ণ নেই, শব্দ নেই, গন্ধ নেই, স্বাদ নেই, স্পর্শ নেই, উষ্ণতা বা শৈত্য নেই। আছে কেবল মুখ্য গুণ, আর গৌণ-গুণ-উৎপাদনকারী শক্তি (আর অবশ্যই মনোনিরপেক্ষ বস্তু)।

লকের মতে বস্তুর কোনো গুণই—কি মুখ্য গুণ কি গৌণ গুণ—আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবে ধরা দেয় না; অনুভবে পাই গুণের প্রতিচ্ছবি বা ধারণা। এ ধারণা দু রকম—মুখ্য গুণের ধারণা ও গৌণ গুণের ধারণা। এদের পার্থক্য হল এই ঃ মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুগত ধর্মের সাদৃশ্য আছে। যথা, ক বস্তুটির ওজনের যে নির্ভুল ধারণা হল বস্তুত ক বস্তুটিতে সে ওজন বর্তমান; কিন্তু গৌণ গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের (শক্তির) কোনো সাদৃশ্য নেই।

ইন্দ্রিয়ানুভবে বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি পাই লক্ তাকে "ধারণা" বলে অভিহিত করেছেন। সাম্প্রতিক কালের দার্শনিকরা এসব প্রতিরূপকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত বলে উল্লেখ করেন। এ সব হল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের সাক্ষাৎ বিষয়, ইন্দ্রিয়ানুভবে গৃহীত "উপাত্ত"।

আমরা এতক্ষণ বস্তুর গুণ ও এদের ইন্দ্রিয়ানুভবে-প্রতিফলিত-রূপ-এর (ধারণার বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের) কথা বলেছি। কিন্তু বস্তু কী? লকের মতে বস্তু হল গুণের আধার বা আশ্রয়। গুণ নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই এদের একটা আশ্রয় বা আধার আছে। এ আধারকে বলে দ্রব্য। অনুভবে আমরা বস্তুর গুণের পরিচয় পাই, কিন্তু দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। কাজেই এ কথা মানতে বাধ্য হই যে দ্রব্য বলে কোনো পদার্থ গুণগুলিকে ধারণ করে থাকে। এ দ্রব্য কিন্তু সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না। দ্রব্য গুণের অতিরিক্ত কিছু, গুণগুলি যে আধারে থাকে তাই দ্রব্য—এ ছাড়া দ্রব্য সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারি না। দ্রব্যেরই অন্য নাম বস্তু। বস্তু হল গুণের আধার। মনে করা যাক, কোনো বস্তু ক-তে গ, ঘ, ঙ, চ—এসব গুণ বর্তমান। এখানে ক কিন্তু এ সব গুণের সমষ্টিমাত্র নয়। ক হল গ, ঘ, ঙ, চ-এর অতিরিক্ত একটি পদার্থ। লকের মতে, এ অতিরিক্ত গুণাধারাটির অস্তিত্ব না মেনে উপায় নেই। কিন্তু ক বস্তুটিকে বস্তুরূপে, দ্রব্যরূপে বা গুণাধার রূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপে ব্যক্ত করা যায় ঃ

(1) বহির্জগতে বহু বস্তু আছে—গাছপালা, ঘরবাড়ী, নদীনালা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি।

(2) বস্তু মাত্রই অনুভবনিরপেক্ষ। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ আমাদের অনুভবের উপর নির্ভর করে না। আমরা কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করি বা না করি—বস্তু বহির্জগতে নিজ নিজ রূপে অবস্থান করে॥

(3) বস্তুধর্মমাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং এদের সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা হয় ইন্দ্রিয়ানুভব দিয়েই সে সব উক্তির সত্যতা যাচাই করা যায়।

(4) ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাই তা বস্তু নয়, বস্তুর কোনো অংশও নয় (যথা উপরিভাগও নয়)। ইন্দ্রিয়ানুভবে সাক্ষাৎভাবে পাই বস্তুধর্মের প্রতিরূপ (এবং বস্তু হল এ প্রতিরূপের কারণ)॥

(5) ইন্দ্রিয়ানুভবে যে প্রতিরূপ পাই সে প্রতিরূপের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে (নির্ভুল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে) বস্তুধর্মের সাদৃশ্য, অন্তত আনুরূপ্য, থাকে। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যথা ভ্রমপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে) এদের সঙ্গে বস্তুধর্মের আনুরূপ্য থাকে না॥

লক্ষণীয় যে প্রথম উক্তি দুটি বস্তুবাদের সত্ত্বিবিষয়ক উক্তি, আর শেষোক্ত উক্তিগুলিতে যুক্তভাবে প্রতিরূপী বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। আরও লক্ষণীয় সত্ত্বিবিষয়ক মতবাদের দিক থেকে সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে বিশেষ ভেদ নেই। বস্তুত সর্বপ্রকারের বস্তুবাদের মধ্যে প্রথম তিনটি উক্তির ব্যাপারে ঐকমত্য দেখা যায়। সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল পার্থক্য হল এই: সরল বস্তুবাদের মতে বস্তুর সাক্ষাৎ অনুভব হয়, আর প্রতিরূপী বস্তুবাদের মতে আমরা অনুভবে বস্তুকে পাই না, পাই বস্তুর প্রতিরূপ।

প্রতিরূপী বস্তুবাদের উৎকর্ষ ও সমর্থক-যুক্তি

সরল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে সেসব আসলে প্রতিরূপী বস্তুবাদের সমর্থক যুক্তি। কখনও কখনও ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়, অমূল প্রত্যক্ষ হয়, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখায় —এ সব ব্যাপার অপরোক্ষ অনুভব তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু পরোক্ষ অনুভব তত্ত্ব, প্রতিরূপ তত্ত্ব, সুতরাং প্রতিরূপী বস্তুবাদ, মেনে নিলে সহজেই এ সব ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায়। এবং মনে হয়: কোনো না কোনো প্রকারের জ্ঞানীয় দ্বৈতবাদ মেনে না নিলে—অনুভূত গুণ এবং প্রকৃত গুণের মধ্যে পার্থক্য না করলে—উক্তরূপ ব্যাপারের সহজ ব্যাখ্যা মিলবে না। প্রতিরূপী বস্তুবাদের সুবিধা হল এই: যেহেতু এ মতে অনুভব একটি পরোক্ষ প্রক্রিয়া, সেহেতু এ মতবাদ বাস্তব পদার্থ ও অনুভবলব্ধ পদার্থের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে ভ্রম প্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ, পরিপ্রেক্ষিত ভেদে বস্তুর আকার পরিমাণের বিভিন্নতা —এ সব ব্যাখ্যা করতে পারে।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ নিম্নোক্তরূপে ভ্রমপ্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেয়। এ ব্যাখ্যা অনুসারে: দূরত্ব, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অবস্থা, ভেদে ইন্দ্রিয় উদ্দীপনারও তারতম্য হয়, ফলে একই বস্তু বিভিন্নরূপে

অনুভূত হতে পারে। সাধারণ স্বভাবী প্রত্যক্ষে বাহ্য উদ্দীপনার ফলে যে ইন্দ্রিয়মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া ঘটে, অমূল প্রত্যক্ষ বা স্বপ্নে আন্তর উদ্দীপনার ফলে ঠিক সেরূপ ইন্দ্রিয়মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া ঘটে। তার ফলে স্বভাবী অবস্থায় যে অনুভব হয় বা হয়েছিল, অমূল প্রত্যক্ষে বা স্বপ্নে ঠিক সেরূপ অনুভব হয়॥

প্রতিরূপী বস্তুবাদের অপকর্ষ

লকের মুখ্য সমালোচক বার্কলি অকাট্যভাবে দেখিয়েছেন যে: লক্ যে যুক্তি দিয়ে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন সে যুক্তিগুলি টেকে না। প্রথমত, গৌণ গুণ ও মুখ্য গুণ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, গৌণ গুণ যদি বস্তুগত ধর্ম না হয় তাহলে মুখ্য গুণও বস্তুগত ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। যথা, বর্ণ (গৌণ গুণ) ও আকার (মুখ্য গুণ) অবিচ্ছেদ্য, বর্ণ বাদ দিয়ে বস্তুর আকার থাকতে পারে না। কাজেই বর্ণ যদি গৌণ ও মনোগত ধর্ম হয় তাহলে আকারও গৌণ ও মনোগত ধর্ম। দ্বিতীয়ত, লক্ মনে করেন: উত্তাপ, শৈত্য, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি বস্তুগত ধর্ম নয়; কেননা অবস্থাভেদে এদের পরিবর্তন হয়। যথা, যে জল বরফগলা-জলে-ডোবানো হাতে গরম বোধ হয় সে জলই গরম-জলে-ডোবানো হাতে ঠাণ্ডা বলে বোধ হয়, কাজেই ঠাণ্ডা গরম এসব বস্তুগত ধর্ম নয়। কিন্তু (বার্কলি বলেন:) ইন্দ্রিয়ের অবস্থা ভেদে, পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত ভেদে বস্তুর আকার, পরিমাণ, ওজন, গতিবেগ— এ সব তথাকথিত মুখ্য গুণেরও পরিবর্তন হয়। যথা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই গোলাকার মুদ্রা বিভিন্নরূপ দেখায়। এক কথায়, লকের আপেক্ষিকতা যুক্তিতে যদি গৌণ গুণের মনসাপেক্ষতা প্রমাণিত হয় তাহলে ঐ একই যুক্তিতে মুখ্য গুণেরও মনসাপেক্ষতা প্রমাণিত হয়।

লক্ বলেন, ইন্দ্রিয়ানুভবে সাক্ষাৎভাবে যা পাই তা (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) হল বস্তুর প্রতিরূপ। কিন্তু লব্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি যে এদের অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র বস্তুর প্রতিচ্ছবি তার প্রমাণ কী? এদের গায়ে ত এমন কোনো চিহ্ন থাকে না যে ঐ চিহ্ন দেখে বুঝব এরা কোনো কিছুর প্রতিরূপ। এমন ত হতে পারে—যাকে প্রতিরূপ মনে করছি তাই আসল বস্তু, এ তথাকথিত প্রতি-রূপের অতিরিক্ত কোনো বস্তু নেই। এমন ত হতে পারে— অনুভবলব্ধ ইন্দ্রিয়ো-পাত্ত গুলি স্বয়ম্ভু পদার্থ। কোনো (কাল্পনিক) চিত্র দেখেই কি বোঝা যায় যে চিত্রটি কোনো বাস্তব বস্তু বা নিসর্গের চিত্র?

প্রতিরূপী বস্তুবাদের মতে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হল মনশ্চিত্র। তাই যদি হয় তাহলে মনশ্চিত্র অতিক্রম করে, এদের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে, মনোবহিস্থ বস্তুর জ্ঞান লাভ করা যাবে কেমন করে? মনশ্চিত্রের বাইরে যে কোনো বস্তু আছে তা জানব কেমন করে? আর বস্তুগুলির স্বরূপই বা জানব কী ভাবে? যথা, আমরা যদি (সম্মুখস্থ) টেবিলটার অস্তিত্ব যাচাই করতে যাই তাহলে আমরা, লকের মতে, সরাসরি পাই কতকগুলি ইন্দ্রিয়োপাত্ত— চতুষ্কোণতা, মসৃণতা, কাঠিন্য ইত্যাদির "ধারণা"। এ সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত

অতিক্রম করে যদি টেবিল-বস্তুটি ধরতে যাই তাহলে, লকীয় তত্ত্ব ঠিক হলে, দেখব : এ জাতীয় কতকগুলি ইন্দ্রিয়োপাত্ত ভিন্ন অন্য কিছু (কোনো "বস্তু") আমাদের অনুভবে ধরা দেয় না। কেননা লকের মতে— বস্তু-প্রত্যক্ষকরণ সম্ভব নয়, ইন্দ্রিয়ানুভবে কেবল ইন্দ্রিয়োপাত্তই পাওয়া যায়। এখন, লকীয় জ্ঞান-তাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ যদি সত্য হত তাহলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনও নিশ্চিত হওয়া যেত না। এমনকি, ইন্দ্রিয়োপাত্তের অতিরিক্ত কোনো মনোনিরপেক্ষ বস্তু আছে কিনা তাও নিশ্চয় করে বলা যেত না।

ধরা যাক, প্রতিরূপী বস্তুবাদ মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কাজেই, "প্রতিরূপী বস্তুবাদ মানলে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে —এ কথা বলা যায় না"—এ আপত্তি না হয় তুলব না। কিন্তু তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ইন্দ্রিয়ানুভবে যদি বস্তুকে না পাই, কেবল ইন্দ্রিয়োপাত্তই পাই তাহলে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে এদের উৎপাদকের, বস্তুর, আনুরূপ্য আছে কি নেই, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তা বুঝব কেমন করে? আবার, বস্তুই যে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ তাই বা বুঝব কি করে? আমরা "সাধারণ লোকেরা" সাধারণভাবে সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ তত্ত্বে বিশ্বাস করি, কাজেই আমরা বলতে পারি : কোনো ব্যক্তির আলোকচিত্রের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির চেহারার তুলনা করা যায়, আলোকচিত্রটি ঐ ব্যক্তির সঠিক প্রতিকৃতি কিনা তা নির্ণয় করা যায়, কেননা আমরা সাক্ষাৎ ভাবে আলোকচিত্রটিও দেখতে পাই, আবার চিত্রটিতে যে ব্যক্তি চিত্রিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে তার চেহারাও সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু লকের মত মেনে নিলে এ রকম তুলনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের তুলনা করা সম্ভব নয়, কেননা লকীয় পরোক্ষ-অনুভব তত্ত্ব অনুসারে অনুভবে বস্তু পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বস্তুর প্রতিরূপ। কাজেই কোনো প্রতিরূপ প্রকৃত প্রতিরূপ কিনা, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত কিনা, তা নির্ণয় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা যে আনুরূপ্যের কথা ("ধারণা", ও বস্তু বা বা গুণের আনুরূপ্যের কথা) বলেন সে আনুরূপ্য খাটতে হলে দুটি সম্বন্ধী দরকার : চিত্র (প্রতিরূপ) ও যা চিত্রিত হয় (বস্তু বা গুণ)। কিন্তু বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্যে আনুরূপ্যের সম্বন্ধ আছে কিনা তা জানা সম্ভব নয়। কেননা এ মতে এ সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধী (বস্তু বা গুণ) আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়, কোনোভাবে জ্ঞানগোচরও নয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদের মতে : কোনো বস্তু ক হল তার প্রতিরূপ খ ইন্দ্রিয়ো-পাত্তের কারণ। কিন্তু প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা সঙ্গতভাবে এ কথা বলতে পারেন না। কেননা "ক খ-এর কারণ" এ কথা জানতে হলে ক ও খ-এর সহগামিতার জ্ঞান হওয়া দরকার। কিন্তু প্রতিরূপী অনুভবতত্ত্ব অনুসারে ক-এর প্রত্যক্ষ হয় না। আবার একই যুক্তিতে বলা যায় : খ-থেকে ক-কে অনুমানও করা যাবে না। কেননা, খ (ইন্দ্রিয়োপাত্ত) থেকে তার কারণ ক (বস্তু) অনুমান করতে হলে, এদের সহগামিতার জ্ঞান হওয়ার দরকার, কিন্তু আলোচ্য মতে ক-কে

কখনও সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না। তাছাড়া, আমরা যখন কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করি, বা প্রত্যক্ষ করি বলে মনে করি, তখন এ কথা মনে হয় না যে অনুভবলব্ধ উপাত্ত থেকে বস্তু অনুমান করছি। এ কথাও মনে হয় না যে অনুভবলব্ধ ঘট পট, গাছপালা প্রভৃতি আমাদের ব্যক্তিগত "ধারণা"। যদি আমাদের এ বোধ হত যে ঘট পট—এ সব ব্যক্তিসাপেক্ষ বস্তু-প্রতিরূপ তাহলে সর্বজনগ্রাহ্য বস্তু জগতের ধারণারও উৎপত্তি হত না।

সর্বশেষে, একটি উপমা ব্যবহার করে প্রতিরূপী বস্তুবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মূল আপত্তিটির পুনরুক্তি করলাম। প্রতিরূপী বস্তুবাদে জ্ঞাতা ও বস্তুর মধ্যে যে পর্দার, ইন্দ্রিয়োপাত্তের পর্দার, কল্পনা করা হয়েছে সে পর্দা স্বচ্ছ কাচের পর্দা নয়, এটা একটা লোহ যবনিকা। এ লোহ যবনিকার এক দিকে জ্ঞাতা; কিন্তু এর অপরদিকে কী আছে, বা আদৌ কিছু আছে কিনা, তা জানবার উপায় নেই। এ জন্যই লকের প্রতিরূপী অনুভব তত্ত্বকে লোহযবনিকা তত্ত্ব* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

5. নব্য বস্তুবাদ

নব্য বস্তুবাদী চিন্তাধারা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বস্তুবাদী চিন্তাধারায় এক নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। জার্মানীতে ব্রেন্টানো ও মাইনং এ মত প্রচার করেন: জ্ঞাত বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান-ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। মাখ্ ও মার্কিন দার্শনিক জেমস্ দেখান: যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে ধরা দেয় তা কোনো মনোবৃত্তি বা মানসাবস্থা নয়, তা হল কোনো না কোনো বস্তু। মূর বিশদভাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে: প্রত্যক্ষকরণের বিষয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নির্ভর করে আমাদের প্রত্যক্ষ করার উপর —এ ভাববাদী তত্ত্ব ভ্রান্ত। এ ব্যাপারে রাসেল্ মূরকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন। এ সব একমুখী চিন্তাধারা এসে পরিণতি লাভ করেছে নব্য বস্তুবাদ নামক দার্শনিক তত্ত্বে।

ইংল্যাণ্ডে যে ব্যক্তি প্রথম নব্য বস্তুবাদী তত্ত্বের মর্মকথা বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন, তিনি হলেন টি. পি. নান্। নান্-এর বক্তব্য হল:

(ক) যাকে বস্তুর গুণ বলা হয় তা—মুখ্য হোক কি গৌণ হোক—প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত ধর্ম; গুণমাত্রই অনুভবনিরপেক্ষ।

(খ) কোনো গুণ যে রূপে আমাদের অনুভবে ধরা দেয় গুণটি ঠিক সে রূপেই বস্তুতে বর্তমান।

এমন কিছুর জ্ঞান হতে পারে বা এমন কিছু থাকতে পারে যার অস্তিত্ব আমাদের অনুভবের উপর নির্ভর করে (যথা, ভ্রমপ্রত্যক্ষলব্ধ অলীক বস্তু) —এ মতের তীব্র বিরোধিতা করে নান্ বলেন: "যাকে ব্যথা বলি তাও

* 135 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমার মনের বাইরের জিনিষ; এর সঙ্গে মনের বিভিন্ন সম্বন্ধ হতে পারে, কিন্তু ব্যথার অস্তিত্ব আমার মনোনিরপেক্ষ"।

(নান্-এর মতে: ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বাস্তব গুণের মধ্যে যে বিভেদ কল্পনা করা হয় বস্তুত এদের মধ্যে সে পার্থক্য নেই। যা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবে ধরা দেয় তাই বস্তুর স্বগত ধর্ম॥ যেমন: বিভিন্ন আলোতে কোনো গোলাপ ফুলে যে ভিন্ন ভিন্ন রঙ দেখতে পাই গোলাপটিতে সে সব রঙই বর্তমান। একই গরম জলে হাত ডোবালে বিভিন্ন ব্যক্তি যে ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপ বোধ করে সে সব উত্তাপই ঐ জলের বস্তুগত ধর্ম। কোনো চৌকোনা টেবিলের দিকে বিভিন্ন দিক থেকে তাকালে যে ভিন্ন ভিন্ন আকার দেখতে পাই, তার সবই টেবিলটিতে বর্তমান॥ সাধারণ লোকরা এবং বিজ্ঞানীরা কোনো বিশেষ রঙকে কোনো গোলাপের, একটি বিশেষ মাত্রার উত্তাপকে কোনো জলের, কোনো বিশেষ আকারকে কোনো টেবিলের, প্রকৃত বা আদর্শ রঙ, উত্তাপ বা আকার বলে ধরে নেয়। এতে কাজের সুবিধা হয়— কোনো বস্তুর একটি রঙ এর প্রকৃত রঙ, একটি উত্তাপ এর প্রকৃত উত্তাপ —এ সব ধরে না নিলে কাজের অসুবিধা হয়। কিন্তু নান্-এর মতে: সব অনুভূত গুণই বস্তুগত ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুতে কেবল একটি রঙ নেই, আছে অনেক রঙ (বিভিন্ন আলোতে যে সব রঙ দেখতে পাই সে সব রঙ)। কোনো বস্তুতে কোনো বিশেষ সময়ে কেবল এক বিশেষ পরিমাণের উত্তাপ থাকে না, থাকে নানান মাত্রার উত্তাপ, এবং উত্তাপ ধর্মটি কেবল বস্তুর গায়েই লেগে থাকে না—বস্তুখণ্ডের বাইরেও বহুদূর প্রসারিত থাকে—যথা এক ফুট দূরে এর এক উত্তাপ, দু ফুট দূরে অন্য মাত্রার উত্তাপ, তিন ফুট.........ইত্যাদি॥

মার্কিন নব্য-বস্তুবাদ: নব্য-বস্তুবাদী মেনিফেস্টো

মাখ্, ব্রেন্‌টেনো ও মাইনং-এর রচনায়, রাসেল্ ও মূর-এর রচনায় বা নান্-এর সোচ্চার ঘোষণায়, নব্য বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলেও নব্য বস্তুবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ, পুষ্পিত পল্লবিত রূপ, লক্ষিত হয় মার্কিন বস্তুবাদীদের দর্শনে। বস্তুত নব্য বস্তুবাদ বলতে এখন সাধারণত একটি বিশেষ মার্কিন দার্শনিক গোষ্ঠীর দর্শনই বোঝায়। ছয় জন মার্কিন দার্শনিক—হল্ট্, মারভিন্, পেরি, পিট্‌কিন্, স্পলডিং ও মন্টেগ্ —"নব্য-বস্তুবাদ" নামে এক প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে "ছয় জন বস্তুবাদীর প্রথম প্রচারপত্র ও কর্মপদ্ধতি" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটি হল একটি আপোষহীন বস্তুবাদী মেনিফেস্টো বা ঘোষণাপত্র। এ মেনিফেস্টোতে যে সব ঘোষণা করা হয়েছে তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করলাম এবং এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে আমাদের মন্তব্য জুড়ে দিলাম।

(1) প্রাকৃত বিজ্ঞান, গণিত, যুক্তিবিজ্ঞান প্রভৃতিতে যেসব পদার্থ বা বিষয় (বস্তু, ব্যাপার ইত্যাদি) আলোচিত হয় সে সব কোনো অর্থেই মনোগত নয়।

এ ঘোষণাটি হল মাইনং-এর বস্তুতত্ত্বের পুনরুক্তি। মাইনং-এর মতে: যা অনুভবের, জ্ঞানের বা চিন্তার, বিষয় হতে পারে তাই সৎ, তারই কোনো না কোনো প্রকারের সত্ত্ব আছে। যথা, দুই সংখ্যাটির বা গোলাকার-বর্গক্ষেত্র-এরও একরূপ সত্ত্ব আছে। অস্তিত্ব বা অবস্থিতি থেকে পৃথক করার জন্য এদের সত্ত্বকে বিদ্যমানতা বা অববর্তিতা[1] বলে বর্ণনা করা যায়। অর্থাৎ বলা যায়— এদের অস্তিত্ব নেই ঠিক, কিন্তু এদের আছে বিদ্যমানতা, কাজেই এরা অলীক নয়। বস্তুত মাইনং-এর মতে কোনো কিছুই সম্পূর্ণ অসৎ নয়।

উপরোক্ত ঘোষণা থেকে বোঝা যায় যে নব্য বস্তুবাদীরা, প্লেটোর মতো, গাণিতিক ও যুক্তিবৈজ্ঞানিক পদার্থেরও সত্তা দাবী করেছেন, এবং মাইনং-এর মতো, "অলীক" পদার্থেরও সত্তা দাবী করেছেন।

(2) এ পদার্থগুলির সত্তা ও স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের উপর, আমাদের দ্বারা জ্ঞাত-হওয়া-নামক ব্যাপারের উপর, নির্ভরশীল নয়।

এ ঘোষণা হল বার্কলির, "অস্তিত্ব বলতে বোঝায় জ্ঞাততা"—এ উক্তির বিরুদ্ধে বস্তুবাদী প্রতিবাদ। নব্য বস্তুবাদীরা মূরকে অনুসরণ করে বার্কলির ভাববাদ খণ্ডন করার, এবং উক্ত ঘোষিত উক্তি প্রতিষ্ঠা করার, চেষ্টা করেন।

(3) বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে আন্তর সম্বন্ধ আছে কিনা, ঐক্য বা সংসক্তি আছে কিনা, বাস্তব অনুভব দিয়েই তা বুঝতে হবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর পূর্বতসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া চলবে না। এবং এখন পর্যন্ত প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে যা জানা গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায়: বিভিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আমাদের জ্ঞানে পাই বহুতাবাদের সমর্থন ও অদ্বৈতবাদের খণ্ডন॥

প্রকৃতি হল একটি সুসংবদ্ধ অদ্বয়তন্ত্র[2]—এ বিষয়গত-ভাববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে উক্ত উক্তি করা হয়েছে। উক্ত বাক্যের বক্তব্য হল:

(4) কোনো সম্বন্ধই আন্তর সম্বন্ধ নয়, সম্বন্ধমাত্রই বাহ্য সম্বন্ধ। অর্থাৎ সম্বন্ধের ফলে সম্বন্ধী কোনো অ-পূর্ব ধর্ম অর্জন করে না। আবার কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে, সম্বন্ধ ঘটার ফলে, বস্তু দুটির কোনোটির কোনো স্বগত ধর্ম পরিবর্তিত হয় না।

এ উক্তির পূর্বপক্ষ হল ভাববাদীদের আন্তর-সম্বন্ধ তত্ত্ব। এবং এ উক্তিতে বস্তুবাদীদের ও বহুতাবাদীদের বাহ্য-সম্বন্ধ তত্ত্বও ব্যক্ত হয়েছে।

(5) ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ সকল ভাস, ধর্ম বা ইন্দ্রিয়োপাত্তই বস্তুর স্বগত (অর্থাৎ বস্তুগত) ধর্ম, এবং ইন্দ্রিয়ানুভব একটি অপরোক্ষ প্রক্রিয়া।

এ উক্তিতে সরল বস্তুবাদের একটি মূল সূত্রের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এবং এতে নব্য-বস্তুবাদী প্রত্যক্ষতত্ত্ব —সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ তত্ত্ব— ব্যক্ত হয়েছে। এবং বলা বাহুল্য, এ উক্তিতে প্রতিরূপী প্রত্যক্ষতত্ত্বের, এবং সর্ব প্রকার জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদের, বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

---

1. subsistence 2. monistic system

(6) মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্র ও প্রত্যক্ষকরণের অন্যান্য কারণ-প্রক্রিয়ার কাজ হল : বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম বেছে নেওয়া এবং জ্ঞাতার কাছে সরাসরি উত্থাপন করা।

এ ঘোষণায় যে নব্য-বস্তুবাদী তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে তার নাম নির্বাচন তত্ত্ব[1]। কোনো কোনো নব্য বস্তুবাদী কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ে উৎপাদক তত্ত্ব[2] প্রচার করেন। প্রথমোক্ত তত্ত্ব অনুসারে—মন, ইন্দ্রিয়, স্নায়ু ইত্যাদি, এক কথায় জ্ঞাতা, কোনো বস্তুর কোনো ধর্ম, যথা এ (লাল) ফুলটির লাল রঙ, বেছে নিয়ে প্রত্যক্ষ করে। আর শেষোক্ত তত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যক্ষে কোনো বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়াদির মারফতে আমাদের মনে কোনো মনশ্চিত্র উৎপাদন করে।

(7) চেতনা হল আমাদের দেহের (স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) একটি "বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া"[3]। এ বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে কোনো সময়ে বস্তুজগতের যে অংশ, "প্রস্থচ্ছেদ,"[4] পাই সে খণ্ডিতাংশের অন্তর্গত বস্তুগুলির সমষ্টিই হল আমাদের তৎকালীন চেতনা বা চেতনামণ্ডল।

এ ঘোষণাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—এতে নব্য বস্তুবাদী চেতনাতত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। এ তত্ত্বে কখনও কখনও চেতনাকে "অনুসন্ধানী আলোক" বলে বর্ণনা করা হয়। তবে উক্ত ঘোষণায় চেতনাকে বাস্তব জগতেরই একটি নির্বাচিত খণ্ড বা প্রস্থচ্ছেদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ মতে : যে সব বস্তু আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাই সে জ্ঞাত বস্তুসমষ্টিই আমাদের বিশেষ মুহূর্তের (যখন এদের জ্ঞান হয় তখনকার) চেতনা। এ বস্তুগুলির চেতনা বলে এদের অতিরিক্ত কিছু নেই। চেতনাও মনোগত ব্যাপার নয়। বাস্তব জগতের অন্যান্য পদার্থের মত চেতনাও একটা প্রাকৃত পদার্থ।

স্বাতন্ত্র্যতত্ত্ব ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ

নব্য বস্তুবাদী পেরি বলেন : নব্য বস্তুবাদের ভিত্তি হল—স্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব[5] ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ[6]। শেষোক্ত তত্ত্বের অপর নাম অন্তর্ভাববাদ[7]।

স্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব অনুসারে : বস্তু আমাদের মনে "প্রবেশ করে," বা আমাদের সঙ্গে জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, মানে জ্ঞানের বিষয় হয়, ঠিক। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের-বিষয়-হওয়ার উপর জ্ঞাত বস্তুর সত্ত্ব বা স্বরূপ নির্ভর করে না॥ এ কথার অর্থ : কোনো বস্তুর, ক-এর, থাকা না থাকা বা অমুক অমুক ধর্ম থাকা আমার তোমার জ্ঞানের উপর—আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হবার উপর—নির্ভরশীল নয়। বরং ক-এর স্বতন্ত্র মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে বলেই, বস্তুত ক-তে অমুক অমুক ধর্ম আছে বলেই, ক আমাদের প্রত্যক্ষে অমুক অমুক ধর্ম বিশিষ্ট বস্তু রূপে ধরা দেয়॥

জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদের বক্তব্য হল : যখন কোনো বস্তু ক জ্ঞাত হয় তখন ক বস্তুটিই (ক-এর কোনো প্রতিভু বা প্রতিরূপ নয়, সরাসরি ক-ই)

---

1. Selective Theory 2. Generative Theory
3. specific response 4. cross-section 5. Theory of Independence
6. Epistemological Monism 7. Theory of Immanence

আমাদের সঙ্গে একটি সম্বন্ধে—জ্ঞানীয় বা আনুভবিক সম্বন্ধে—আবদ্ধ হয়, এবং এ সম্বন্ধের ফলেই ক আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, অনুভূত হয়। আমাদের দিক থেকে দেখলে ক আমাদের জ্ঞানের বিষয় ঠিক; কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখলে ক একটি স্বতন্ত্র বস্তু— বহির্জগতের বহু বস্তুর একটি। এখন, আমার জ্ঞানের বিষয় হয়েছে বলে ক-কে আমার "ধারণা"ও বলতে পার। কিন্তু, ক এখন আমার মনে "প্রবেশ" করেছে বলে ক বাইরের জগতে নেই—এ কথা বলা যায় না। জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ বস্তু ও বস্তুর ধারণার, জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর ও জ্ঞাত বস্তুর—মানে বাস্তব জগতে-অবস্থিত বস্তুর ও জ্ঞানের-বিষয়ীভূত বস্তুর, পার্থক্য অস্বীকার করে। একই ব্যক্তি, শ্যাম, দুটি ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে, যেমন এক দিক থেকে সে পুত্র (রামের পুত্র) অন্য দিক থেকে সে পিতা (যদুর পিতা)। বিভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে তার স্বরূপ পালটায় না, যথা রামের-পুত্র-শ্যাম ও যদুর-পিতা-শ্যাম একই ব্যক্তি, ভিন্ন ব্যক্তি নয়। ঠিক সেরূপ একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে, বা বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির সঙ্গে, জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে, এবং জ্ঞানীয় সম্বন্ধে যুক্ত হওয়ার ফলে তা কোনো ধর্ম অর্জন করে না বা তার স্বরূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। পেরি বলেন: কোনো বস্তু যখন জ্ঞাত হয় তখন বস্তুটি আমাদের জ্ঞানের বিষয়, বা "ধারণা" সুতরাং ধারণা হল বিশেষ সম্বন্ধে (জ্ঞানীয় সম্বন্ধে) আবদ্ধ কোনো বস্তু। সংক্ষেপে, একই ক-কে বস্তুও বলা যায়, ধারণাও বলা যায়—বহির্জগতের দিক থেকে বস্তু, জ্ঞানের দিক থেকে ধারণা।

নব্য বস্তুবাদের সত্তাতত্ত্ব ও ভ্রান্তিতত্ত্ব

(নব্য বস্তুবাদীরা বলেন যে তাদের নব্য মতবাদটি আসলে সরল বস্তুবাদেরই পুনরুজ্জীবিত রূপ)। তাঁরা বলেন: ধারণা সৃষ্টি করা, বস্তু গঠন করা বা প্রদত্ত বস্তুধর্ম বিকৃত করা—এসব আমাদের মন বা ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়; এদের কাজ হল— বস্তু প্রকাশ করা, অনুসন্ধানী আলো ফেলে বাস্তব জগতে অবস্থিত বা সত্ত্বাবান বস্তু বা ধর্ম আবিষ্কার করা।) নব্য বস্তুবাদীদের মতে: প্রত্যক্ষে যা কিছু পাই—রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি তা কোনো অর্থেই মনোগত নয়, এ সবই বস্তুগত ধর্ম। এবং মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে লক্-কল্পিত কোনো পার্থক্য নেই, সব গুণই বস্তুর স্বগত ধর্ম। যথা: ঐ পাহাড়টি দূর থেকে নীল দেখায় কাছে থেকে সবুজ দেখায়, কাজেই পাহাড়টিতে নীল, সবুজ এ দুটি রঙই বর্তমান। এ সোজা কাঠিটা জলে ডোবালে বাঁকা দেখায়, কাজেই কাঠিটা সোজাও বটে বাঁকাও বটে॥ ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাওয়া যায় তার কোনোটি মনোগত বা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। বস্তুত অন্যান্য বস্তুর মত এ জাতীয় আভাসেরও আলোকচিত্র তোলা যায়। যথা, আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিরূপের ছবি তোলা যায়। এমন কি ভ্রমপ্রত্যক্ষে যা ভাসে তারও ছবি তুলে নেওয়া যায়। যথা: সমান্তরাল রেল লাইনের ছবি তুললে দেখা যাবে এরা ক্রমাভিসারী হয়ে এক জায়গায় মিশে গেছে। দূর থেকে পাহাড়টির ছবি (রঙিন আলোকচিত্র)

তুললে নীল ছবি উঠবে, কাছে থেকে তুললে উঠবে সবুজ ছবি। (প্রশ্ন : যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হল তার ছবি তুললে কি সাপের ছবি উঠত?) নব্য বস্তুবাদীরা বলেন : ভ্রমপ্রত্যক্ষে, অমূল প্রত্যক্ষে বা স্বপ্নে যে সব ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই তাও বস্তুগত মনোনিরপেক্ষ ধর্ম।

প্রশ্ন : যদি যা কিছু অনুভবে পাই তাই বস্তুগত ধর্ম হয়, তাহলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ অমূল প্রত্যক্ষ—এ সবের ব্যাখ্যা কী? এ সব ব্যাপার কি এ কথা প্রমাণ করে না যে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষে বা স্বপ্নে পাওয়া আভাসগুলি আমাদের মনোজাত, মনস্থিত অ-বস্তু?

উত্তর : (এ প্রশ্নের উত্তরে নব্য বস্তুবাদী হল্ট্ বলেছেন)—না, এসব মনের সৃষ্টি নয়। ভ্রমের কারণ হল বস্তুর বিরুদ্ধ ধর্ম। একই বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম বর্তমান বলেই আমাদের ভ্রম হয়॥ যথা, কোনো লাল বস্তুতে লাল, নীল প্রভৃতি বাধক ধর্ম বস্তুতেই থাকে বলে লাল বস্তুটিকে নীল বলে ভ্রম হতে পারে। হল্ট্ বলেন : আমরা এমন কথা কিন্তু বলি না—স্বপ্নে-দেখা বস্তু বা অমূল-প্রত্যক্ষে-প্রাপ্ত বস্তুর, গাছপালা পাহাড়পর্বতের মতো অস্তিত্ব (বা দৈশিক অবস্থিতি) আছে; আমরা বলি—এসব মনের সৃষ্টি নয়, এ সবেরও এক প্রকারের সত্তা আছে, এ সত্তাকে বিদ্যমানতা বা অবর্তিতা* বলে চিহ্নিত করতে পারি। কোনো কিছুকে মনোনিরপেক্ষ হতে গেলে যে তাকে কোনো দেশ-কাল খণ্ডে থাকতে হবে এমন কথা নেই। যেমন গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানে যে পদার্থগুলি আলোচিত হয় সে পদার্থগুলি দেশ-কালে অবস্থান করে না, কিন্তু এদের অসৎ বা অবস্তু বলা যায় না। মন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ পরিবেশে "অলীক"-বলে-কথিত পদার্থ (যথা, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ) বেছে নেয়। এদের অলীক বলা হয় এজন্য : এভাবে বেছে নেওয়া আভাস বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে স্বভাবী অবস্থায় নির্বাচিত আভাসের সামঞ্জস্য নেই।

নব্য বস্তুবাদীদের "বস্তু"

নব্য বস্তুবাদীরা বলেন যে তারা সরল বস্তুবাদের সর্বাস্তিবাদী তত্ত্ব মেনে নেন। কিন্তু সরল বস্তুবাদীরা বস্তু বলতে যা বোঝেন, নব্যরা ঠিক তা বোঝেন না। সরল বস্তুবাদীদের বস্তু অনেকটা লক্-এর "দ্রব্য"-এর মতো—বস্তু হল গুণের আশ্রয় বা আধার। কিন্তু নব্য মতে : বস্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি মাত্র, এদের অতিরিক্ত কিছু নয়। যাকে কমলালেবু বলি তা হল গোলাকার, কমলা রঙ, মিষ্টত্ব, মসৃনতা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ভাসের সমষ্টি—এসব ভাসের অতিরিক্ত "দ্রব্য" বলে কোনো ধারক বা আধার নেই। যাকে আমারা বস্তু বলি তা হল কতকগুলি ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংযোগস্থল॥

বস্তু বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত সংযোগের স্বরূপ সম্পর্কে নব্য বস্তুবাদীদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন—জ্ঞানের বিষয়, উপাত্ত বা "বস্তু" হল মনোনিরপেক্ষ প্রাকৃত পদার্থ। এ মতকে প্রাকৃতবাদ বলা হয়। আবার

* অবর্তিতা=subsistence, অস্তিত্ব (অস্তিতা)=existence

কারও কারও মতে—এসব প্রাকৃত পদার্থ নয়, এসব হল নিষ্প্রকার, নিরপেক্ষ বা উদাসীন পদার্থ। এ জাতীয় কোনো নিরপেক্ষ ভাস-পদার্থ ক জ্ঞাত হলে ক জ্ঞানের-বিষয়-এর মর্যাদা লাভ করে, এবং সে ক্ষেত্রে ক-কে মনোগত ধারণাও বলা যায়। আর অন্য ভাস-সমষ্টির উপকরণ হিসাবে, অর্থাৎ কোনো উপাত্ত সমষ্টির সঙ্গে (যে সমষ্টির সঙ্গে ক উপাত্তটি যুক্ত থাকে) সম্পর্কের দিক থেকে, ক-কে প্রাকৃত পদার্থও বলা যায়। এ মতকে বলে নিরপেক্ষতাবাদ।

নব্য বস্তুবাদ ঃ চেতনা ও "বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া"

হল্ট্ বলেন ঃ চেতনা মনের ধর্ম নয় (মন বলেও কিছু নেই), অহংবোধ বা চেতনা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। এ মতে—পরিবেশ আমাদের দেহে, স্নায়ুতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়ে, একটি বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটায়। প্রতিক্রিয়াটি কী? হল্ট্ এ প্রসঙ্গে যে উদাহরণ দিয়েছেন তা লক্ষ করলে বোঝা যাবে বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া বলতে তিনি কি বোঝাতে চান। আমরা বলি, যে কোনো গাছ, যথা সূর্যমুখীর চারা, সূর্যের দিকে সাড়া দেয়। কিন্তু হল্ট্ বলেন ঃ গাছের এ প্রতিক্রিয়াকে সূর্য সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া বলা যায় না, এ প্রতিক্রিয়া হল আলোক প্রভাবের ফলে উদ্দীপ্ত বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া। পরিবেশের যে যে অংশ, গুণ বা দিক বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটায় আমরা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ায় সে সে দিক বা গুণ বেছে নিই। এজন্য বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে অনুসন্ধানী আলোকসম্পাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আলোকসম্পাতে যেমন বস্তু বিকৃত বা পরিবর্তিত না হয়ে কেবল প্রকাশিত হয়, সেরূপ বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে বস্তু অবিকৃত অবস্থায় জ্ঞাত হয়। এ বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে বাস্তব জগতের একাংশ, আলোকিত অংশ, আমাদের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়॥ আবার অনেক সময় উপমা বদল করে বলা হয় ঃ আমাদের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া যেন বাস্তব জগতের, উপাত্ত-বিছানো জগতের, একাংশ কেটে নিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরে; ফলে, যা অনুভবে পাই তা হল বাস্তব জগতের এক খণ্ডিত অংশ, একটি "প্রস্থচ্ছেদ"। বিশেষ সময়ে বাস্তব-জগত-থেকে-কেটে-তুলে-নেওয়া অংশই হল আমাদের তৎকালীন চেতনা। যাকে আমরা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় বলি বা চেতনামণ্ডলের উপকরণ বলি (যথা টেবিল, চেয়ার, গাছপালা ইত্যাদি) তাদের মধ্যেই আমার চেতনা অবস্থিত॥ হল্ট্ বলেন—এজন্য এ কথাও বলতে বাধা নেই যে ঃ আমার চেতনা বা মন এখন ঐ ওখানে (বাইরের জগতে) আছে, ঐ যেখানে আমার-দ্বারা-জ্ঞাত বস্তু সকল, সেখানেই আমার চেতনা। এ মতে—বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নির্বাচিত "বস্তু" বা উপাত্তসমষ্টি হল বিশেষ মুহূর্তের চৈতন্য বা মন। যথা, এ মুহূর্তে আমি যে সব বস্তু প্রত্যক্ষ করছি—খাতাপত্র, বই কলম, যে শব্দ শুনছি, যে গন্ধ পাচ্ছি—এসব মিলেই আমার এখনকার চেতনা। এমন নয় যে, এসব চেতনার বিষয়, এবং এসব বিষয়ের অতিরিক্ত চেতনা বলে কিছু আছে; হল্টের মতে এসব জ্ঞাত পদার্থই আমার তৎকালীন চেতনা।

নব্য বস্তুবাদের সমালোচনা

নব্য বস্তুবাদের একটি মূল সূত্র হল জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বয়বাদ। এ সূত্র অনুসারে —প্রত্যক্ষে যা কিছু পাই, যা কিছু সাক্ষাৎভাবে অনুভূত হয়, তাই মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অংশ বা বস্তুর ধর্ম। প্রশ্ন ওঠেঃ তাই যদি হবে তাহলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ অমূল প্রত্যক্ষ—এ সবের ব্যাখ্যা কী? জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বয়বাদ ও সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, নব্য বস্তুবাদ ভ্রমের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যা কিছু অনুভবে পাই তাই যদি বস্তুগত হয় তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়োপাত্ত অলীক বলে গণ্য হয় কেন? কোনো অনুভূত পদার্থকে সৎ, কোনো অনুভূত পদার্থকে অসৎ, বলে মনে করা হয় কেন? নব্য বস্তুবাদ মেনে নিলে অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ আর ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের মধ্যে কোনো ভেদ দেখানো যায় না। এ মত গ্রহণ করলে বলতে হয়ঃ ভ্রম ভ্রম নয়, অভ্রান্ত জাগ্রত বোধের মত স্বপ্নও অভ্রান্ত। সাধারণ ভাষায় "ভ্রমপ্রত্যক্ষ", "অমূল প্রত্যক্ষ", "স্বপ্ন" বা এদের কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। এ শব্দগুলি কি নিরর্থক ও অর্থহীন? নব্য বস্তুবাদী মত যদি সত্য হত তাহলে এ প্রায়শ-ব্যবহৃত অর্থবহ শব্দগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ত।

মন ও চেতনা সম্বন্ধে নব্য বস্তুবাদ যে মত পোষণ করে তাও অসঙ্গত বলে মনে হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের বোধে বস্তুধর্ম যেমন ধরা দেয়, সে রকম সাক্ষাৎ অনুভবে আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, অনুভূত গুণ আর বোধ (বা চেতনা) এক কথা নয়। বোধেরও সাক্ষাৎ অনুভব হয়, আমার জ্ঞান হলে—আমার যে জ্ঞান হয়েছে তাও অনুভবে জানতে পারি। বোধের বিষয় ভিন্ন বোধ হতে পারে না ঠিক, কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা যায় নাঃ বোধ আর বোধের বিষয় অভিন্ন। হল্টের চেতনাতত্ত্বের সমালোচনা করে তাই তাঁরই আপনজন ইংরেজ নব্য বস্তুবাদী আলেকজাণ্ডার বলেনঃ হল্টের মতবাদে জ্ঞানীয় সম্বন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অস্বীকার করা হয়েছে। ধরা যাক আমার অগ্নির বোধ হল। এ ক্ষেত্রে আমার বোধটি এ আকার নেয়ঃ আমার সামনে আগুন আছে, বা আমি জানি যে ওটা আগুন, আমি বোধ করছি ওটা "আমার আগুন" (আমার দ্বারা জ্ঞাত আগুন)। আলেক-জাণ্ডারের বক্তব্য হল এইঃ "ক হল খ"—এ জ্ঞান হলে সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞানও হয়— "আমি জানি যে ক হল খ"। তিনি অভিযোগ করেন যে হল্টের চেতনাতত্ত্বে, সাধারণভাবে মার্কিন নব্য-বস্তুবাদী তত্ত্বে, "আমি জানি যে—" -এর ব্যাখ্যা, অর্থাৎ জ্ঞানের-জ্ঞান-এর ব্যাখ্যা মেলে না।

কোনো কোনো নব্য বস্তুবাদীর মতে ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল নিরপেক্ষ বা "উদাসীন"[1] পদার্থ, আবার কেউ কেউ বলেন—ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল প্রাকৃত পদার্থ। ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, এদের অতিরিক্ত কোনো চেতনা, বোধ বা মনোবৃত্তি না মেনে উপায় নেই। কেননা চেতনা ভিন্ন অন্য কোনো কিছু আমাদের

1. neutral

কোনো কিছু সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে না। স্নায়ুতন্ত্রের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে সন্ধানী আলোকসম্পাতের সঙ্গে তুলনা করা ভুল। কেননা : কেবল স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কোনো কিছু সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে পারে না, কেননা এ সব অচেতন পদার্থ। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে স্নায়ু প্রক্রিয়া থেকে যেমন পৃথক করার দরকার, সেরূপ চেতনা বা মানসক্রিয়া থেকে এদের পৃথক করার দরকার। কেননা, একই উপাত্ত বিভিন্ন মানসক্রিয়াতে বিভিন্নভাবে প্রতীত হতে পারে—যথা, সংবেদনে একভাবে (স্পষ্ট, প্রাণবন্তরূপে) আর স্মৃতিতে অন্যভাবে (অস্পষ্ট, দুর্বলরূপে)।

আবার, নব্য বস্তুবাদী চেতনাতত্ত্বে স্মৃতির ব্যাখ্যাও মেলে না। নব্য বস্তুবাদীরা বলেন : যা-ই জ্ঞাত হয় তাই বস্তুর ধর্ম। এখন স্মৃতিতে যে উপাত্ত পাই তা আমার বর্তমান জ্ঞানের (বর্তমান) বিষয়। এ বর্তমান উপাত্তটি কি করে অতীত বস্তুর অংশ বা ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে তা বোধগম্য নয়। যে অতীত বস্তুটি (হয়ত বস্তুটি বিনষ্ট হয়ে গেছে) স্মরণ করি সে বস্তুটির সঙ্গে কি করে আমার-বর্তমান-স্মৃতি-ধৃত উপাত্তটির সংযোগ থাকতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি না।

নব্য বস্তুবাদীরা দাবী করেন যে নব্য বস্তুবাদ আসলে সরল বা লোকায়ত বস্তুবাদের সংস্কৃত—পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত রূপ। কিন্তু সাধারণ লোকেরা নিশ্চয়ই সর্বাস্তিবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করে না, মনে করে না যে প্রত্যক্ষলব্ধ সকল বিষয়েরই বাস্তবতা আছে। তারপর, সব কিছুর অস্তিত্ব না থাকলেও বিদ্যমানতা নামক এক প্রকারের সত্তা আছে—এটাও লোকায়ত মত নয়। সাধারণ লোক কোনো কিছুর সত্ত্ব বলতে বোঝে : দেশকালে অবস্থিতি।

6. সবিচার বস্তুবাদ[1]

সবিচার বস্তুবাদ পরোক্ষ বস্তুবাদের এক বিশেষ রূপ। এটি মূলত একটি মার্কিন দার্শনিক গোষ্ঠীর মতবাদ। সাতজন মার্কিন দার্শনিক—সাণ্টায়ন, লাভজয়, প্রাট্, স্ট্রং, ড্রেক্, রোজারস্ এবং সেলারস্—যৌথভাবে "সবিচার বস্তুবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ" নামে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন তাতে প্রচারিত মতবাদই সবিচার বস্তুবাদ নামে পরিচিত। এ মতবাদ অনেকাংশে মার্কিন ষড়-দার্শনিকের নব্য-বস্তুবাদী প্রত্যক্ষতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ।

হল্ট, পেরি প্রভৃতি নব্য বস্তুবাদীরা মনে করেন : প্রত্যক্ষলব্ধ বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তাঁরা বলেন : সাক্ষাৎ অনুভবে যা পাই তা হল ইন্দ্রিয়োপাত্ত সমষ্টি এবং বস্তু ত আসলে ইন্দ্রিয়োপাত্তেরই সমষ্টি (বা সংযোগস্থল) ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষে সরাসরি বস্তুকে জানা যায় না॥ নব্য বস্তুবাদী প্রত্যক্ষ তত্ত্বের, বস্তুত সর্ব প্রকার অপরোক্ষ-বস্তুবাদী প্রত্যক্ষ তত্ত্বের—অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদের, বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে সবিচার

1. Critical Realism

বস্তুবাদীরা বলেনঃ প্রত্যক্ষের তিনটি উপকরণ—অনুভব ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও প্রত্যক্ষীকৃত বস্তু। তার মানে, সবিচার বস্তুবাদীরা জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদের সমর্থক; প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে হলে জ্ঞাতা ভিন্ন আরও দুটি ব্যাপার থাকার দরকার—ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বস্তু।

উপাত্ত আর বস্তু অভিন্ন—এ নব্য বস্তুবাদী মতের বিরুদ্ধে সবিচার বস্তুবাদীদের ঘোরতর আপত্তি। তাঁরা বলেনঃ উপাত্তকে বস্তুর মর্যাদা দিলে বস্তু বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। কেননা বস্তু বলতে আমরা ভাসমান ইন্দ্রিয়োপাত্ত বুঝি না, বস্তু বলতে যা বুঝি তা নির্দিষ্ট দেশ-কাল খণ্ডে অভিন্ন রূপে, একই আকারে, অবস্থান করে। যেমন, এ টেবিলটা হয় গোল, না হয় চৌকো, না হয় তেকোনা, না হয়………। এমন হতে পারে না যে একই টেবিল বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। অথচ নব্য-বস্তুবাদী প্রত্যক্ষতত্ত্ব মেনে নিলে বলতে হয়ঃ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বস্তু ক যে যে আকারে, যে যে রূপে, আমাদের অনুভবে প্রতিভাত হয় সে সব আকারই বস্তুটির স্বগত আকার। বলতে হয়ঃ সব ধর্ম, এমন কি ভ্রম প্রত্যক্ষে যে সব ধর্ম অনুভূত হয় সে সব ধর্মও, বস্তুগত ধর্ম। এসব কথা বলার অর্থ—বস্তুর স্বাতন্ত্র্য অগ্রাহ্য করা, বস্তুকে উপাত্তে রূপান্তরিত করা। সবিচার বস্তুবাদীরা বলেনঃ নব্যদের বস্তুবিনাশী ব্যাখ্যার কবল থেকে বস্তুকে (সাধারণত আমরা বস্তু বলতে যা বুঝি তাকে) রক্ষা করবার একটাই মাত্র উপায় আছে। এ উপায় হলঃ বস্তু ও উপাত্তের অভিন্নকরণ মেনে না নেওয়া, এ কথা ঘোষণা করা—বস্তু ও উপাত্ত ভিন্ন পদার্থ। সবিচার বস্তুবাদী মতে উপাত্ত বস্তু নয়, বস্তুর অস্তিত্বের চিহ্ন, বস্তুর অবস্থিতির জ্ঞাপক-হেতু।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাই তাকে, নব্য বস্তুবাদীদের মতো, সবিচার বস্তুবাদীরাও উপাত্ত, ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা প্রদত্ত বলে উল্লেখ করেন, ঠিক; কিন্তু সবিচার বস্তুবাদীরা "ইন্দ্রিয়োপাত্ত" প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে "সারধর্ম" ও "ধর্ম-সংঘট"[1] এ কথাগুলিও ব্যবহার করেন।

জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ[2] ঃ উপাত্ত ও বস্তুর পার্থক্য

নব্য বস্তুবাদী মতেঃ প্রত্যক্ষে বস্তু কোনো প্রকারে আমাদের মনের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে "প্রবেশ করে"—অর্থাৎ আমরা বস্তু পাই ইন্দ্রিয়ানুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হিসাবে। সবিচার বস্তুবাদীরা বলেন—এ প্রত্যক্ষ-বিশ্লেষণ অসঙ্গত। তাঁরা দ্বৈতবাদী প্রত্যক্ষতত্ত্বের সমর্থনে ও অদ্বয়বাদী প্রত্যক্ষতত্ত্বের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেন।

(1) কোনো বস্তু যুগপৎ একাধিক ব্যক্তির অনুভবের "মধ্যে" থাকতে পারে না। "মধ্যে" কথাটি আক্ষরিক অর্থে নিয়ে, সবিচার বস্তুবাদীরা বলেন—অনুভবে থাকা

1. character-complex 2. Epistemological Dualism

অর্থ হল অনুভবের অংশ বা উপকরণ হিসাবে থাকা। কাজেই কোনো বস্তু ব যদি ক ব্যক্তির চেতনার অংশ হত তাহলে তা খ ব্যক্তির চেতনার অংশ হতে পারত না। কিন্তু একই বস্তু একাধিক ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হতে পারে। সুতরাং এ সিদ্ধান্তই করতে হয় যে : বস্তু সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাত হতে পারে না। সাক্ষাৎ অনুভবে পাওয়া যায় বস্তুজ্ঞাপক ধর্ম-সংঘট।

(2) কোনো বস্তু ব এক ব্যক্তির চেতনায় দ রূপে অন্য ব্যক্তির চেতনায় ধ রূপে প্রতিভাত হতে পারে। ধরা যাক দ, ও ধ দুটি বাধক ধর্ম, একই সময়ে একই আশ্রয়ে থাকতে পারে না— এমন ধর্ম। এখন দ-এর প্রত্যক্ষ যদি ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয় তাহলেও অন্বয়বাদী মতে বলতে হবে : দ ধর্মটি প্রকৃতই ব বস্তুতে বর্তমান, ব-বস্তুর অংশ বা উপকরণ। সে ক্ষেত্রে ভ্রমপ্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ বা স্বাপ্নিক প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কেন কোনো প্রত্যক্ষকে "ভ্রমপ্রত্যক্ষ", "অমূল প্রত্যক্ষ" বা "স্বপ্ন" বলে বর্ণনা করা হয় তা ব্যাখ্যা করা যায় না। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় : বস্তু সাক্ষাৎভাবে অনুভূত হয় —এ নব্য (বা সরল) বস্তুবাদী তত্ত্ব গ্রাহ্য নয়।

(3) তারপর, প্রাকৃত বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত হল এই : প্রাকৃত বস্তু সরাসরি আমাদের বোধে ধরা দেয় না। আমাদের বোধে সরাসরি যা পাই তা হল—বস্তু-প্রেরিত "বার্তা", (বর্তমান বা অতীত) বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞাপক কোনো আভাস বা উপাত্ত। যথা, যখন দূরস্থ তারাটি দেখি, বা দেখি বলে মনে করি, তখন আমাদের সাক্ষাৎ অনুভবে পাই ঐ তারা-থেকে-আগত আলোক-বার্তা। এ বার্তাটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছাতে যে সময় লেগেছে—হয়ত বা এক হাজার বছর লেগেছে—সে সময়ের মধ্যে হয়ত তারাটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের অনুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হল : ঐ তারকা-নির্দেশক সংকেত, ইন্দ্রিয়োপাত্ত রূপ সংকেত-বার্তা। এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় : সাক্ষাৎ অনুভবে যা পাওয়া যায় তা বস্তু নয়, বস্তুর জ্ঞাপকহেতু, বস্তুনির্দেশক ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যে দেশকাল খণ্ডে উপাত্ত-নির্দেশিত বস্তুটি অবস্থান করে বলে আমরা বিশ্বাস করি, ঐ দেশকাল খণ্ডে, বা কোনো দেশকালেই, বস্তুটির অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অনুভবলব্ধ উপাত্ত ও অনুভূত-বলে-গৃহীত বস্তু ভিন্ন পদার্থ।

উপাত্ত ও "ধারণা"র পার্থক্য

সবিচার বস্তুবাদীরা মনে করেন : বস্তুর সাক্ষাৎ অনুভব হয় না, অনুভবে পাওয়া যায় উপাত্ত বা ধর্ম-সংঘট। কিন্তু তাঁরা বলেন, এ কথার অর্থ এই নয় যে— অনুভূত উপাত্তগুলি মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থা, মনোগত বিষয় বা "ধারণা"। সবিচার বস্তুবাদীদের মতে—অপরোক্ষ অনুভব তত্ত্ব যেমন পরিত্যাজ্য, ঠিক সেরূপ ভাববাদী (বার্কলীয়) অনুভবতত্ত্বও সমভাবে পরিত্যাজ্য। বার্কলীয় প্রত্যক্ষতত্ত্ব অনুসারে—অনুভবে যা পাই তা হল ধারণা ; ধারণা মনোগত, অনুভবের

বাইরে এর অস্তিত্ব নেই। এ সব অনুভবেরই বিশেষ দশা। বার্কলীর মতের সমালোচনা করে সবিচার বস্তুবাদী স্ট্রং বলেছেন : মনে করা যাক, আমি দেখছি—তিনফুট ব্যাসবিশিষ্ট ঐ চাকাটি দূরে সরে যাচ্ছে এবং চাকাটি এ বাড়ীর আর ঐ বাড়ীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অনুভবে-ধৃত উপাত্তটি হল : একটি অপসৃয়মান তিন ফুট ব্যাসের চাকা—যে চাকাটা এখন ঐ বাড়ী দুটির মাঝখানে। বলা বাহুল্য, কোনো মনোগত ধারণা চক্রাকার হতে পারে না, তিন-ফুট-ব্যাস বিশিষ্ট হতে পারে না, বা মনের বাইরে ঐ বাড়ী দুটির মাঝখানে অবস্থিত থাকতে পারে না (ধারণা আবার মনের বাইরে রাস্তার উপরে থাকবে কি করে ?)। এর থেকে বোঝা যায় যে উপাত্ত আর ধারণা ভিন্ন পদার্থ। তারপর, একই ধর্ম-সংঘট বিভিন্ন জ্ঞানক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থিত হতে পারে —যথা অনুভবে একভাবে আর স্মৃতিতে অন্যভাবে প্রতিভাত হতে পারে। এর থেকেও বোঝা যায়—উপাত্ত আর ধারণা (মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থা) অভিন্ন নয়।

বস্তুর অস্তিত্ব

সবিচার বস্তুবাদ যে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ প্রচার করে তার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে : উপাত্তই যদি অনুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হয় তাহলে বলতে হয় —উপাত্ত-অতিবর্তী কোনো বস্তু আমাদের অনুভবে ধরা দেয় না। সেক্ষেত্রে বস্তুর অস্তিত্ব আছে কিনা তাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না॥ এ আপত্তির উত্তরে সবিচার বস্তুবাদীরা বলেন : ভাববাদীরা এবং প্রতিরূপবাদের সমালোচকরা মনে করেন যে—যা অনুভবের সীমায় সরাসরি ধরা দেয় কেবল তারই (উপাত্তেরই) অনুভব হয়। কিন্তু উপাত্ত-অতিগামিতা, অপর-জ্ঞাপকতা বা প্রতিনিধিত্বকরণ-সামর্থ্য সুরুতেই মেনে না নিয়ে উপায় নেই। এ কথা অনস্বীকার্য যে—অনুভবে এর বিষয় হিসাবে আমরা বস্তুকেই পাই, বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় অথচ অনুভবে সাক্ষাৎভাবে পাই উপাত্ত—এ দুটি ব্যাপারের আপাত-অসংগতি এক ভাবেই সমাধান করা যায়। সমাধানটি হল এই : প্রদত্ত উপাত্তকে অতিক্রম করে, আমরা উপাত্তের মাধ্যমে বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করি। উপাত্ত-অতিক্রমণ[1] বলে কোনো ব্যাপার যদি না থাকত তাহলে বস্তুর আনুভবিক জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) অসম্ভব হয়ে পড়ত, অথচ অনুভবে যে বস্তুর প্রতীতি হয় এ কথা না মেনে উপায় নেই।

আলোচ্য মতে—উপাত্ত-অতিক্রমণ অন্যান্য পার্থিব ঘটনার মতই একটি প্রাকৃত ঘটনা। ইন্দ্রিয়ানুভবে কোনো উপাত্ত বা প্রতিরূপের মধ্যস্থতায় আমরা যে বাস্তব পদার্থ প্রত্যক্ষ করি—এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। উপাত্তের মাধ্যম ছাড়া বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু উপাত্ত প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হল বস্তু। যেমন, চশমার সাহায্যে বস্তু দেখি, চশমার কাচ দেখি না, সেরকম উপাত্তের মাধ্যমে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়; অনুভবে উপাত্ত উপাত্তরূপে প্রতীত হয়

1. transcendence of the sense data 2. character-complex

না। তারপর, "ক খ-এর প্রতিরূপ" এ কথার অর্থ হল ঃ ক-এর মাধ্যমে খ-কে জানা যায়। যথা, আমরা কোনো ব্যক্তির আলোক চিত্র দেখি ঐ চিত্রটি দেখবার জন্য নয়, চিত্রিত ব্যক্তিটি কেমন তা জানবার জন্য। এ চিত্রের মারফতে আমরা চিত্রিত ব্যক্তিটিকে দেখতে পাই। চিত্রের সাহায্যে যদি চিত্রিত বস্তুকে দেখতে না পেতাম তাহলে "চিত্রটি"কে চিত্র বলেই স্বীকার করতাম না। দর্পণে ছায়া দেখার জন্য আমরা দর্পণ ব্যবহার করি না; দর্পণ-ছায়ার ভেতর দিয়ে আমি আমার পূর্ণাবয়ব বা বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ করতে পারি বলেই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াই। কাজেই এক অর্থে বলা যায় ঃ আমরা দর্পণ-চিত্র দেখি না, আলোকচিত্র দেখি না; দেখি দর্পণে মুকুরিত ব্যক্তি বা আলোকচিত্রে চিত্রিত বস্তু ব্যক্তি বা ব্যাপার। প্রতিকৃতি যদি কেবল একখণ্ড চিত্রিত কাগজই হত তাহলে আমরা প্রিয়জনের প্রতিকৃতি সযত্নে রক্ষা করতাম না। ছবি কেবলই ছবি নয়, ছবির ভেতর দিয়ে আমরা চিত্রিত বস্তুই দেখি।

সবিচার বস্তুবাদীরা বলেন ঃ উপাত্ত উপাত্ত-হিসাবে অনুভবে প্রতিভাত হয় না, অনুভবলব্ধ "স্বচ্ছ" উপাত্তের ভেতর দিয়ে আমরা বস্তুই প্রত্যক্ষ করি। কি ভাববাদী কি সরল বস্তুবাদী—এরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, অনুভব কয়েকটি (আবশ্যিক) সর্তের উপর নির্ভর করে, যথা ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগ, পর্যাপ্ত আলোক (দার্শন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে) ইত্যাদি। সবিচার বস্তুবাদীরা এ সর্তের তালিকায় আরও একটি সর্ত যোগ করেন। এ সর্তটি হল ঃ উপাত্তগ্রহণ। তাঁরা বলেন, গৃহীত উপাত্তের মাধ্যমেই বস্তুপ্রত্যক্ষ হয়।

উপাত্তের স্বরূপ

এতক্ষণ আমরা "ইন্দ্রিয়োপাত্ত" (সংক্ষেপে "উপাত্ত") কথাটি ব্যবহার করে এসেছি। কিন্তু উপাত্ত কী? এর স্বরূপ কী? আমরা দেখেছি, নব্য বস্তুবাদীদের মধ্যে উপাত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে ঐকমত্য নেই—কারও কারও মতে উপাত্ত প্রাকৃত পদার্থ, আবার কারও মতে উপাত্ত অপ্রাকৃত, নিষ্প্রকার, "নিরপেক্ষ" পদার্থ। উপাত্ত বা "ধর্ম-সংঘট"* সম্বন্ধে সবিচার বস্তুবাদীদের মধ্যেও ঐকমত্য দেখা যায় না। ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ নিয়ে সবিচার বস্তুবাদীরা দু দলে বিভক্ত। লাভ্‌জয়, প্রাট্ ও সেলারস্-এর মতে— ইন্দ্রিয়োপাত্ত মনোগত ব্যাপার, অনুভবেরই একটা উপকরণ। অপরপক্ষে, সাণ্টায়ন, ড্রেক্, স্ট্রং ও রোজারস্-এর মতে ঃ ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ধর্ম-সংঘটের কোনো অস্তিত্বই নেই—কি মনে কি বহির্জগতে; এ সবের আছে দেশকালাতীত সত্ত্ব, এ সব হল সামান্য "সারধর্ম", সুতরাং যৌক্তিক পদার্থের সত্ত্ব যেরূপ, এদের সত্ত্বও তদ্রূপ। দ্বিতীয় মতে ঃ ধর্মসংঘটের অস্তিত্ব নেই, আছে বিদ্যমানতা[1], দেশকালে অবস্থিতি নেই, আছে অববর্তিতা[1], এবং

* মনে রাখার দরকার যে সবিচার বস্তুবাদীরা "ইন্দ্রিয়োপাত্ত"-এর পরিবর্তে "ধর্মসংঘট" কথাটিও ব্যবহার করেন।

1. subsistence

এসব সামান্য (ভাসমান) পদার্থ অপরিবর্তনশীল। অনুভবের সীমায় ধরা দিক বা না দিক, এদের কোনো দশান্তর হয় না। ধ ধর্ম-সংঘটটি যখন ক ব্যক্তির বোধে ধরা দেয় তখন এর যা প্রকৃতি, খ ব্যক্তির বোধে উপস্থিত হলেও, বা যখন সকলের বোধের সীমার বাইরে থাকে তখনও, এর সে একই প্রকৃতি।। প্লেটো যেমন "শাশ্বত আকার"-এর কথা বলেন, সাণ্টায়নও প্রায় সে রকম শাশ্বত ধর্ম-সংঘটের কথা বলেন। সাণ্টায়নের মতে—ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল ধর্মসংঘট বা সারধর্ম, এসব সারধর্ম শাশ্বত, নিরালম্ব, স্বয়ম্ভু পদার্থ। এসব চিরন্তন ধর্ম-বিন্যাস যেন বিশ্বে ভাসমান, এরা যেন আমাদের বোধে ধরা দেবার জন্য, আমাদের অনুভবের আলোতে উদ্ভাসিত হবার জন্য, অপেক্ষা করছে।

কোনো বস্তু ব কোনো ব্যক্তির, ক-এর, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির) সংস্পর্শে এলে বস্তুটি আমাদের ইন্দ্রিয়াদির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, এবং বিশেষ কার্য উৎপাদন করে। এ কার্যগুলির মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক-এর অনুভবে কোনো ধর্ম-সংঘট ধ-এর উপস্থিতি। এ গৃহীত ধর্ম-সংঘট ক-ব্যক্তি ব বস্তুতে আরোপ করে, যেন ব বস্তুতে প্রক্ষেপণ করে। তাহলে এ মতে প্রত্যক্ষকরণ হল : ইন্দ্রিয়াদির-জালে-ধরা কোনো উপাত্ত ধ-কে বহির্জগতের কোনো বস্তুতে, ব-তে, আরোপ করা ; এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে আরোপিত ধর্মটি প্রকৃতই ব বস্তুর ধর্ম। নির্ভুল প্রত্যক্ষে— আরোপিত ধর্মটি প্রকৃতপক্ষে ব বস্তুর ধর্ম, এক্ষেত্রে উপাত্ত প্রক্ষেপণ ক্রিয়াটি যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। আর যে ধর্ম-সংঘট যে-বস্তুতে প্রক্ষেপ করা হয় বস্তুটিতে যদি বস্তুত সে ধর্ম না থাকে তাহলে প্রত্যক্ষে ভ্রান্তি দেখা দেয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিধৃত ধর্ম-সংঘট যদি যথাযথভাবে আরোপিত বা প্রক্ষেপিত না হয় তাহলে আমরা বলি— আমাদের প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত বা অমূলক। এক কথায়, এ মতে— ধর্ম-সংঘটগুলি স্বতন্ত্রভাবে বহির্জগতে যেন "ঘুরে বেড়ায়", আমাদের ইন্দ্রিয়াদি এদের কোনোটি ধরে কোনো বস্তুর গায়ে লাগিয়ে নেয়, এবং আমরা ঐ বস্তুতে-লাগানো ধর্মটি প্রত্যক্ষ করি। এখন ইন্দ্রিয়োপাত্ত-লাগানো কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হতেও পারে, নাও হতে পারে ; আর না হওয়ার ফল হল— প্রত্যক্ষে ভ্রান্তি।

সবিচার বস্তুবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য

সবিচার বস্তুবাদ এক প্রকারের জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ। এ দ্বৈতবাদের সঙ্গে লকীয় প্রতিরূপবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। লকের মতে আমরা অনুভবে সাক্ষাৎভাবে যা জানি তা হল "ধারণা" বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত। কিন্তু সবিচারবাদী দ্বৈততত্ত্ব (পরোক্ষ-অনুভব তত্ত্ব) অনুসারে— আমরা ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করি। বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে না। এ বিশ্বাস সহজাত, সাণ্টায়নের ভাষায়—একটা "জান্তব ধ্রুব-বিশ্বাস"। এ বিশ্বাস মেনে না নেওয়া অসঙ্গত। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে হলে এ লোকায়ত "জান্তব" বিশ্বাস মেনে নিয়ে তবেই অগ্রসর হওয়া দরকার। আর

ভ্রমপ্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ প্রভৃতির যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে হলে এ কথা মেনে নেবার দরকার যে, কোনো প্রতিরূপ বা প্রতিভূর মারফতেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হতে পারে।

যদি উক্ত জান্তব বিশ্বাস সমর্থন করতে হয় এবং প্রত্যক্ষের ভ্রান্তির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে হয় তাহলে, মনে হয়, সবিচার বস্তুবাদীদের জ্ঞানীয় দ্বৈতবাদ ও উপাত্ত-অতিক্রমণ তত্ত্ব, বা এ জাতীয় কোনো তত্ত্ব, মেনে নেবার দরকার।

নব্যদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অদ্বয়বাদ, লকের প্রতিরূপবাদ ও বার্কলির ভাববাদী প্রত্যক্ষতত্ত্বের চেয়ে সবিচার বস্তুবাদী প্রত্যক্ষতত্ত্ব অধিকতর যুক্তিসহ বলে মনে হয়। কিন্তু আলোচ্য প্রত্যক্ষতত্ত্ব সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। সবিচার বস্তুবাদীদের কারও কারও মতে ইন্দ্রিয়োপাত্ত হল শাশ্বত স্বয়ম্ভু ও সামান্য পদার্থ। অথচ প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন ইন্দ্রিয়ের উপর বস্তুর ক্রিয়ার ফলে মনে ইন্দ্রিয়োপাত্ত-উৎপত্তি কার্যটি ঘটে। কিন্তু শাশ্বত পদার্থের আবার উৎপত্তি হয় কেমন করে? অবশ্য এ আপত্তির উত্তরে সবিচার বস্তুবাদীরা বলবেন: এখানে উৎপত্তি মানে— মনে উদয় হওয়া, উপস্থিত হওয়া। কিন্তু তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়: কোনো বস্তু বা অ-বস্তু কোনো-বাস্তব-আশ্রয়-নেই-এমন উপাত্ত আমাদের মনে উপস্থিত করে কেন? অর্থাৎ, অমূল প্রত্যক্ষ, ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয় কেন?

কেউ কেউ বলেন, ধৃত উপাত্ত আমরা কোনো বস্তুতে আরোপ করি বা প্রক্ষেপণ করি, আবার কেউ কেউ বলেন উপাত্তটিকে কোনো বস্তুর স্বগত ধর্ম বলে "কল্পনা" করি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ প্রক্ষেপণ যথাযথ আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ প্রক্ষেপণ বা কল্পনা অসঙ্গত হবে কেন? উক্তরূপ আরোপণ, প্রক্ষেপণ বা কল্পনাকরণ কি আমাদের ইচ্ছাধীন? ইচ্ছাধীন হতে পারে না। কেননা আমরা স্বেচ্ছায় অ-যথাযথভাবে উপাত্ত প্রক্ষেপণ করব কেন? তাহলে, উপাত্ত আরোপণ কোনো কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সবিচার বস্তুবাদীরা বলতে পারেন: নির্ভুল আরোপণের ক্ষেত্রে (এবং নির্ভুল প্রত্যক্ষের বেলায়) এ আরোপণ ক্রিয়ার নিয়ন্তা হল বস্তু, ইন্দ্রিয়াদির স্বভাবী অবস্থা ইত্যাদি। অপরপক্ষে, ভ্রান্ত, আরোপণের ক্ষেত্রে (এবং ভ্রান্ত ও অমূল প্রত্যক্ষের বেলায়) নিয়ন্তা হল ইন্দ্রিয়াদির অস্বভাবী অবস্থা, পরিপ্রেক্ষিতের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ॥

একাদশ অধ্যায়

ভাববাদ

1. ভূমিকা

"ভাববাদ" কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং ভাববাদী দার্শনিক বলতে এত বিভিন্ন প্রকারের দার্শনিক বা দার্শনিক-সম্প্রদায় বোঝায় যে ভাববাদের একটা সামান্য লক্ষণ দেওয়া দুরূহ কাজ। যেমন, বার্কলি, স্পিনোজা, লাইব্‌নিট্‌স্, কাণ্ট্, ফিস্‌টে, শেলিং, হেগেল, রয়েস্, মাক্‌টাগারট্, ব্রাড্‌লি, ক্রোচে—এঁরা সবাই ভাববাদী বলে স্বীকৃত। কিন্তু এদের প্রত্যেকের দর্শন সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় এমন একটি লক্ষণ রচনা করা সহজ ব্যাপার নয়॥ তবে মনে হয়, এভাবে ভাববাদের লক্ষণ দেওয়া যেতে পারে :

> যে মতবাদে আত্মিক সত্তা পরম মূল্য বলে গণ্য হয়, যে মতবাদ অনুসারে— সব অস্তিত্বের মূলে আছে কোনো না কোনো আত্মিক সত্তা, আত্মিক পদার্থই প্রাথমিক ও পরম সত্ত্ব, যে মতবাদ মনে করে জড়ের চেয়ে আত্মা উন্নততর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান, অথবা যে মতবাদ অনুসারে— যা জড় বা প্রাণময় বলে মনে করা হয় তা আসলে চিন্ময় বা চিন্ময়ের অভিব্যক্তি তাকে ভাববাদ বলে অভিহিত করা যায়।

সংক্ষেপে, যে মতবাদ আত্মিক সত্তার প্রাথমিকতায় ও মৌলিকতায় বিশ্বাস করে তাই ভাববাদ বলে গণ্য।

কোনো দার্শনিক ভাববাদী সিদ্ধান্তে আসতে পারেন—

(ক) এ যুক্তি বা বিশ্বাসের জোরে যে : জ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে জ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল, অথবা

(খ) এ যুক্তি বা বিশ্বাসের জোরে যে : জাগতিক বস্তুসমূহ প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় পদার্থ, বিশ্বজগৎ কোনো পরমাত্মার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুসারে চলে বা সব কিছুই পরমাত্মার অভিব্যক্তি।

এ দু রকম বিশ্বাসের ভিত্তিতে দু প্রকার ভাববাদ গড়ে উঠেছে : জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ[1] ও আধিবিদ্যক (বা তত্ত্বগত) ভাববাদ[2]।

জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদী মতে, বিশেষত ভাববাদের যে বিশেষ রূপটি মানসবাদ[3] বা আত্মগত ভাববাদ নামে খ্যাত সে মতানুসারে— জ্ঞানের বিষয় প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতার চেতনার বৃত্তি, অবস্থা বা "ধারণা"। কোনো কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদী মনে করেন যে : কতকগুলি জ্ঞানীয় (জ্ঞাতার মনোগত) আকার প্রয়োগ না করলে জ্ঞান হতে পারে না, সুতরাং জ্ঞাত বস্তুর প্রকৃতি অনেকাংশে

1. Epistemological Idealism 2. Metaphysical Idealism 3. Mentalism

জ্ঞাতার মনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বার্কলির আত্মগত ভাববাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কাণ্টের সবিচার ভাববাদও জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ বলে গণ্য।

আধিবিদ্যক-ভাববাদী মতে, আত্মাই প্রাথমিক মৌলিক সত্তা, আত্মারই চরম সত্ত্ব আছে। এ মতেঃ আত্মা (পরম আত্মা) হল মুখ্য আর জড় জগৎ হল গৌণ, আত্মার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনেই জড় জগতের সার্থকতা, বিশ্বজগতের কোনো স্বগত তাৎপর্য, গুরুত্ব, মূল্য বা সার্থকতা নেই। আধিবিদ্যক ভাববাদের পূর্বপক্ষ হল জড়বাদ বা প্রাকৃতবাদ। এর সঙ্গে বস্তুবাদের বিরোধ নেই। আধিবিদ্যক ভাববাদীরা সঙ্গতভাবে এ কথা মানতে পারে যে বস্তুর অস্তিত্ব ব্যক্তিমনোনিরপেক্ষ, আমার তোমার জানার উপর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কাজেই আধিবিদ্যক ভাববাদী হয়েও কোনো দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে বস্তুবাদী হতে পারে।

স্পিনোজা, লাইব্‌নিট্‌স্‌, হেগেল্‌, বিভিন্ন হেগেলীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা আধিবিদ্যক ভাববাদী। আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে— দার্শনিক ঈশ্বরবাদ, বিভিন্ন প্রকারের বিষয়গত ভাববাদ, ব্রহ্মবাদ —এ সবই আধিবিদ্যক ভাববাদের দৃষ্টান্ত।

আমরা বার্কলির আত্মগত ভাববাদ, কাণ্টের সবিচার ভাববাদ ও হেগেলের ব্রহ্মবাদ আলোচনা করব।

2. আত্মগত ভাববাদ[1]

যে সব বস্তু বা বস্তুধর্ম আমরা প্রত্যক্ষ করি বলে মনে করি সে সবের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতার মনের উপর নির্ভর করে, এসব তথাকথিত বস্তু বা বস্তুধর্ম হল জ্ঞাতার মনো"মধ্য"স্থ ধারণা —এ মতবাদকে আত্মগত ভাববাদ বলে। এ ভাববাদী তত্ত্ব অনুসারে— প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র বিষয় হল আমাদের "ধারণা"।

আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনে আত্মগত ভাববাদের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ধর্মযাজক বার্কলি। বার্কলি বলেনঃ সমস্ত পদার্থকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— জ্ঞাতা (বা মন) ও তার ধারণা। মন ও তার ধারণাবলী ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সৎ পদার্থ বলতে বুঝতে হবে— মন বা ধারণা॥ বার্কলীয় দর্শনের মূল বক্তব্য হলঃ অনুভব ছাড়া কোনো পদার্থের জ্ঞান হয় না, এবং ফলে সকল পদার্থের অস্তিত্ব অনুভবের, বা চেতনার, উপর নির্ভরশীল।

আমরা সবাই মনোনিরপেক্ষ জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি— বাইরের জগতে বহু জড় দ্রব্য আছে। এবং জড় দ্রব্য আছে বলে এবং ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে এদের সংযোগ হয় বলেই জড় দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু বার্কলি মনোনিরপেক্ষ জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। বস্তুত বার্কলীয় দর্শনের মূল

1. Subjective Idealism

লক্ষ্য হল জড়বাদখণ্ডন। বার্কলির মতে জড়বাদের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদ ও সংশয়বাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাজেই ধর্মযাজক বার্কলি জড়বাদ খণ্ডনকে তার দর্শনের ধ্রুব লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

আত্মগত ভাববাদের মূল সূত্র

আত্মগত ভাববাদের মূল সূত্র দুটি ঃ

(1) আমাদের আনুভবিক জ্ঞানের বিষয় হল আমাদের নিজ নিজ ধারণা, এবং এ সব ধারণা গুণের ধারণা, বস্তুর ধারণা নয়। অর্থাৎ অনুভবে সরাসরি যা পাই তাই ধারণা এবং অনুভবে যে সব ধারণা সরাসরি পাই সে ধারণাগুলি বস্তুর (যথা টেবিলচেয়ার, গাছপালা ইত্যাদির) ধারণা নয়, এসব হল ইন্দ্রিয়গম্য গুণের ধারণা (যথা বর্ণ, উত্তাপ, স্বাদ ইত্যাদির ধারণা)।

(2) তথাকথিত গুণ বা বস্তুর অস্তিত্ব অনুভবের উপর নির্ভরশীল।

যেহেতু ঃ অনুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হল ধারণা, গুণের ধারণা,
গুণের অতিরিক্ত কোনো বস্তু আধারের কল্পনা অসঙ্গত,
ধারাণামাত্রই অনুভবক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, এবং
ধারণাকে আমরা সাধারণ ভাষায় গুণ বা বস্তু বলে অভিহিত করি,

সেহেতু ঃ যাকে বস্তু বা গুণ বলা হয় তার অস্তিত্ব
আমাদের অনুভবের উপর নির্ভরশীল।

এজন্য বার্কলি বলেন ঃ যা অনুভূত কেবল তাই সৎ, এবং যা অনুভূত নয় তা অসৎ। "অস্তিত্ব আছে" অর্থ কোনো মনের ধারণারূপে আছে (অনুভূত হয়ে আছে)। অস্তিত্ব হল অনুভূতত্ব (বা জ্ঞাততা*)। বার্কলি বলেন ঃ esse est percipi—সত্ত্বং জ্ঞাতত্বম্—সত্তা হল জ্ঞাততা অর্থাৎ যার অনুভূতত্ব বা জ্ঞাততা আছে কেবল তাই সৎ; কোনো কিছু কেবল জ্ঞাতরূপেই সৎ, যতক্ষণ ক জ্ঞাত ততক্ষণই ক সৎ, ক যখন অজ্ঞাত ক তখন অসৎ। যা জ্ঞাত (যার জ্ঞাততা ধর্ম আছে) তারই অস্তিত্ব আছে, যার জ্ঞাততা নেই তার অস্তিত্বও নেই। যা সৎ তা কেবল জ্ঞাতরূপেই সৎ—জ্ঞাতৈক সৎ।**

ক-এর সত্ত্ব আছে=ক-এর জ্ঞাততা ধর্ম আছে ॥

কাজেই বার্কলির সিদ্ধান্ত হল ঃ স্বর্গমর্ত্যের সকল পদার্থ—যে বিপুল বিশাল পদার্থ দিয়ে এ বিশ্বচরাচর গঠিত—এদের কোনোটির কোনো মনোবাহ্য অস্তিত্ব নেই; অর্থাৎ, "এ সব সৎ" অর্থ—এদের জ্ঞাত-হওয়া নামক ধর্ম আছে। যে পদার্থের জ্ঞাততা নেই, অর্থাৎ যা কোনো জ্ঞানের বিষয় নয়, তা অলীক।

টীকা ঃ এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখার দরকার। যার জ্ঞাততা আছে কেবল তারই সত্ত্ব আছে —এ উক্তি বার্কলি করেন কেবল ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ সম্পর্কে। বার্কলির মূল ভাববাদী সূত্রটি সাধারণত এ ভাবে ব্যক্ত করা হয় ঃ

* বার্কলি 'অনুভব' কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন, এ অর্থে ঃ অনুভব=জ্ঞান।
** জ্ঞাত+একসৎ এক=কেবল।

সৎ বলতে বোঝায় জ্ঞাত* ; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বার্কলীয় সূত্রটি এরূপ : সৎ বলতে বোঝায় জ্ঞাত বা জ্ঞাতা** । যার জ্ঞাততা ধর্ম আছে তা যেমন সৎ, যার জ্ঞাতাত্ব ধর্ম আছে তাও সৎ। এ কথার অর্থ : সৎ পদার্থ দু রকম—যে জানে সে (জ্ঞাতা বা মন) আর যা জ্ঞাত হয় তা। উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গ সূত্রটির তাৎপর্য হল এই। বার্কলি যদি সব পদার্থ সম্বন্ধেই বলতেন : এদের সত্তা অনুভবের উপর নির্ভর করে তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হত—মনেরও অস্তিত্ব নির্ভর করে, অন্য মনের দ্বারা অনুভূত হবার উপর, বলতে হত—আমার মন পদার্থটি আমার বা অপর কারও ধারণা। এজন্য বার্কলি বলেছেন : কোনো কিছুকে সৎ হতে গেলে তাকে জ্ঞাতা হতে হবে অথবা জ্ঞাত হতে হবে। ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের সত্তা কোনো মনের দ্বারা জ্ঞাত হবার উপর নির্ভর করে —এসব জ্ঞাত বলেই সৎ। কিন্তু যে-মন অনুভব করে তার অস্তিত্ব কারও দ্বারা জ্ঞাত হবার উপর নির্ভর করে না, মন জ্ঞাতা বলেই সৎ।

বার্কলির যুক্তি

আত্মগত ভাববাদের পক্ষে বার্কলি যে মূল যুক্তিটি উত্থাপন করেছেন তার তিনটি ধাপ। (1) প্রথম ধাপ হল : কোনো কোনো পদার্থ কেবল জ্ঞাত হলেই সৎ বলে গণ্য—এ কথা প্রতিষ্ঠা করা, (2) দ্বিতীয় ধাপ হল : সব ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থই যে কেবল জ্ঞাতরূপেই-সৎ, জ্ঞাত-হিসাবে-সৎ—এ কথা প্রতিষ্ঠা করা (এ কথা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বার্কলি মুখ্য ও গৌণ গুণের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন), আর (3) তৃতীয় ধাপ হল : গুণের "আধার"-এর, জড় দ্রব্যের, অস্তিত্ব খণ্ডন করা ॥

(1) বার্কলি দেখিয়েছেন, এমন কতকগুলি শব্দ আছে যে— শব্দগুলি যা বোঝায় তার অস্তিত্ব নির্ভর করে আমাদের জ্ঞানের উপর। যথা "ব্যথা" শব্দটি। এ শব্দটি যা বোঝায় জ্ঞাত বলেই তা সৎ। এ জাতীয় শব্দের বাচ্য জ্ঞাত-হিসাবেই-সৎ। এদের সম্বন্ধে "এরা অজ্ঞাত অথচ সৎ" এ কথা বলা যায় না। যথা, "অননুভূত ব্যথা" স্ববিরোধী কথা : ব্যথাবোধেই ব্যথার সত্ত্ব, ব্যথা বোধ ভিন্ন ব্যথা থাকতে পারে না।

(2) দ্বিতীয় ধাপে বার্কলি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে : সব গুণবাচক শব্দ সম্বন্ধে এ কথা খাটে যে এদের যা বাচ্য তা জ্ঞাত-বলেই-সৎ। বস্তুবাদী লকই, তাঁর অজ্ঞাতে, আত্মগত ভাববাদের পথ অনেকটা সুগম করে গিয়েছেন। আমরা জানি যে লকের মতে : বস্তুর সাক্ষাৎ অনুভব হয় না। আমাদের অনুভবের সাক্ষাৎ বিষয় হল "ধারণা"। দৃষ্টিবাদী বার্কলি লকের এ তত্ত্ব সাগ্রহে স্বীকার করে নেন। তবে লক্ মনে করেন যে : গৌণ গুণগুলি মনোগত ধর্ম হলেও, মুখ্য গুণগুলি বস্তুগত ধর্ম। লকের মতে— গৌণ গুণগুলি জ্ঞাতার

* esse est percipi (সত্ত্বং জ্ঞাতত্বম)

** esse est aut percipi aut percipere (সত্ত্বং জ্ঞাতত্বং জ্ঞাতৃত্বম বা)।

অনুভবের উপর নির্ভরশীল। লক্ গৌণ গুণের আপেক্ষিকতা থেকে এদের মনোনির্ভরতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেনঃ গৌণগুণ জ্ঞাতার মন, ইন্দ্রিয়ের অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়; সুতরাং এসব মনোগত ধর্ম॥ লকের মতো বার্কলি মনে করেন যে আপেক্ষিকতা থেকে মনসাপেক্ষতা প্রমাণ করা যায়। এবং অনুরূপ যুক্তি দিয়ে বার্কলি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আপেক্ষিক বলে গৌণ গুণ মনোগত —এ যুক্তি যদি নির্ভুল হয় তাহলে মুখ্য গুণও মনোগত ধর্ম, কেননা মুখ্য গুণের প্রকৃতি আনুভবিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যথা বস্তুর আকার, ওজন, গতিবেগ ইত্যাদি (লকের মুখ্য গুণ) প্রত্যক্ষণের অবস্থা ভেদে —দূরত্ব, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি ভেদে— ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। কাজেই বার্কলি বলেনঃ

গৌণ গুণের সঙ্গে মুখ্য গুণের পার্থক্য নেই
গৌণ গুণের অস্তিত্ব অনুভবসাপেক্ষ (লকের সিদ্ধান্ত, বার্কলি কর্তৃক গৃহীত)
∴ মুখ্য গুণের অস্তিত্বও অনুভবসাপেক্ষ।

মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য নেই, গৌণ গুণ অনুভবসাপেক্ষ সুতরাং মুখ্য গুণও অনুভবসাপেক্ষ—এ কথা না হয় মানা গেল। কিন্তু মুখ্য গুণ বস্তুগত, সুতরাং গৌণ গুণও বস্তুগত—এ কথা বলতে বাধা কোথায়? এর উত্তরে বার্কলি নিম্নোক্ত যুক্তিটির অবতারণা করেছেনঃ

সব অনুভবগম্য গুণ—বর্ণ, আকার, উত্তাপ, ওজন ইত্যাদি প্রত্যক্ষের নিয়ামক ভেদে পরিবর্তিত হয়,

∴ অনুভূত গুণগুলি যদি বস্তুগত ধর্ম হত, তাহলে একই বস্তুতে বাধক গুণের যুগপৎ অবস্থিতি স্বীকার করতে হত,

কিন্তু একই সময়ে একই বস্তুতে বাধক গুণের (যথা, লাল ও নীলের) অস্তিত্ব থাকতে পারে না;

∴ অনুভূত গুণগুলি বস্তুগত ধর্ম হতে পারে না —এ কথা স্বীকার করতে হয়।

দৃষ্টান্তঃ বিভিন্ন দূরত্ব থেকে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন আকারের বস্তু বলে দেখায়। যথা, ঐ বস্তুটি এক দূরত্ব থেকে পঁচিশ বর্গফুট আকারের, আরও বেশী দূর থেকে ষোল বর্গফুট আকারের, আর দূর থেকে নয় বর্গফুট আকারের বস্তু বলে দেখায়। এ সব ধর্ম (আকার) যদি বস্তুগত ধর্ম হত তাহলে বলতে হত— বস্তুটি পঁচিশ বর্গফুট আকারের, ষোল বর্গফুট আকারের এবং নয় বর্গফুট আকারের। কেননা এ আকারগুলির কোনোটিকে বিশিষ্ট, "মর্যাদাসম্পন্ন" বা প্রকৃত ধর্ম বলে আর অন্যগুলিকে অপ্রকৃত ধর্ম বলে মনে করার কোনো যুক্তি নেই। বার্কলি বলেনঃ এর থেকে একমাত্র সিদ্ধান্ত হতে পারে এই যে— সব অনুভূত ধর্মই মনের ধারণা।

(3) একটি সহজ প্রশ্ন তুলে বার্কলি "জড়দ্রব্যের-অস্তিত্বে-বিশ্বাস" খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্নটি এইঃ কোনো জড় বস্তু, যথা এ আপেলটি,

থেকে এর সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বাদ দিলে, অর্থাৎ যদি কল্পনা করি যে—বস্তুটিতে এ গুণ নেই, সে গুণ নেই, ঐ গুণ নেই, কোনো গুণই নেই, তাহলে এর কী পড়ে থাকে? গুণের অতিরিক্ত কোনো কিছু থাকে কি? বার্কলির স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন উত্তর: না, থাকে না। একটা উদাহরণ: একটা পেঁয়াজ দেখে মনে হতে পারে—বাইরে যা দেখছি সে সব খোসা, এ খোসার অন্তরালে পেঁয়াজ বস্তুটি সযত্নে রক্ষিত আছে, খোসা ছাড়ালে ঐ বস্তুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা যায়—খোসা দিয়েই পেঁয়াজ বস্তুটি গঠিত, খোসাগুলির বিন্যাসই পেঁয়াজ, খোসার অতিরিক্ত পেঁয়াজ বলে কোনো বস্তু নেই॥ বার্কলির মতে: পেঁয়াজের খোসার সঙ্গে "পেঁয়াজ"-এর যে সম্পর্ক, গুণের সঙ্গে "বস্তু"রও ঠিক সে সম্পর্ক। সব বস্তুই পেঁয়াজের মত—কতকগুলি গুণের সমষ্টি, এ গুণগুলিই যুক্তভাবে সাধারণ ভাষায় বস্তু বলে অভিহিত হয়। উদাহরণ হিসাবে আমার সামনে টেবিল নামক যে "বস্তু"টি আছে তার কথাই ধরা যাক। কাঠিন্য অভেদ্যতা, অসচ্ছতা, চতুষ্কোণত্ব, মসৃণতা, কৃষ্ণবর্ণত্ব ইত্যাদি গুণ ভিন্ন এদের অতিরিক্ত টেবিল বলে কোনো দ্রব্য, লুক্কায়িত কোনো গুণধারক, আছে কি? উত্তরে বার্কলি বলেছেন: জড় দ্রব্য বলতে সাধারণত যা বোঝায়, এবং লক্ যে জড় দ্রব্যের কথা বলেন, সে দ্রব্য অনুভবে পাওয়া যায় না, এবং ফলে এর কোনো বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় (লক্ নিজেই স্বীকার করেছেন, বিশুদ্ধ দ্রব্য "কী তা আমি জানি না")। বার্কলি বলেন: তাহলে, জড় দ্রব্য বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব মানব কেন? তাঁর মতে—উক্তরূপ কোনো বিশুদ্ধ দ্রব্য নেই। এ জাতীয় দ্রব্য অলীক, একরূপ "আধিবিদ্যক প্রেতাত্মা" ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে বস্তু বলা হয় তা হল আসলে "গুণের পুঁটুলি" (রাসেল্-এর ভাষায়)।

একটি স্বতন্ত্র যুক্তি

বার্কলির মতে: বস্তু বা বস্তুধর্মের অস্তিত্ব আমাদের অনুভবের উপর নির্ভরশীল, যা অননুভূত বা অজ্ঞাত তা অসৎ। এ মতের বিরুদ্ধে স্বভাবতই আপত্তি ওঠে: যে বস্তু বা বস্তুধর্ম অনুভূত হয়নি, যা অজ্ঞাত তার সম্বন্ধে কোনো উক্তি করা যায় না ঠিক, কিন্তু অজ্ঞাত বস্তুধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না—এ কেমন কথা? এ কথা ঠিক যে বস্তুর ও গুণের জ্ঞাততা ধর্ম আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল (জ্ঞাত না হলে কোনো কিছুতে জ্ঞাততা ধর্ম বর্তাবে কেমন করে?)। কিন্তু বস্তু বা বস্তুধর্মের অস্তিত্ব (জ্ঞাততা ধর্ম ছাড়া অপরাপর অজ্ঞাত ধর্মের অস্তিত্ব) আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বার্কলি নিম্নোক্ত স্বতন্ত্র যুক্তিটি উত্থাপন করেন:

কোনো পদার্থের অস্তিত্ব আছে কিনা অনুভব দিয়েই তা যাচাই করা যায়,

∴ অননুভূত, অজ্ঞাত জড় বস্তুর* অস্তিত্ব আছে কিনা অনুভব দিয়েই তা যাচাই করতে হবে।

---

* "অজ্ঞাত", কেননা গুণের অতিরিক্ত কোনো বস্তু-আধারের জ্ঞান হয় নি।

∴ অজ্ঞাত জড়বস্তু আছে কিনা তা যাচাই করতে হলে যা অননুভূত বা অজ্ঞাত তা অনুভব করার দরকার।
কিন্তু যা অজ্ঞাত (অজ্ঞাতরূপে) তার অনুভবকরণ একটা স্ববিরোধী কাজ, কেননা, অনুভব করলেই অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়ে যায় ;
∴ অজ্ঞাত জড় বস্তু আছে কিনা তা অনুভবে যাচাই করা যায় না।
কিন্তু যা অনুভবগম্য নয় তার অস্তিত্বও নেই,
∴ জড় বস্তুর (অজ্ঞাত গুণ-আধারের) অস্তিত্ব নেই ॥

উপরোক্ত যুক্তিটিকে আরও সাধারণভাবে নিম্নোক্ত আকারে ব্যক্ত করা হয়ঃ চেতনার বাইরে কোনো বস্তু আছে—এ কথা ভাবা যায় না। কেননা ভাবা মানেই চেতনার অন্তর্ভুক্ত করা। সুতরাং চেতনার বাইরে কোনো বস্তু আছে—এটা স্ববিরোধী উক্তি। অর্থাৎ কোনো কিছু সম্বন্ধে "ভাবা" বা "কল্পনা করা" মানেঃ পদার্থটিকে মনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা, এবং মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে, "পদার্থটি মনোনিরপেক্ষ"—এ উক্তি করা যায় না। "ক পদার্থটি মনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ক পদার্থটি মনোনিরপেক্ষ"—এ উক্তি স্ববিরোধী।

আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা

বস্তুবাদী দার্শনিকরা বার্কলির যুক্তির মধ্যে "বিস্তর দোষ" লক্ষ করেছেন। নিচে বস্তুবাদীকথিত কয়েকটি দোষ উল্লেখ করা হল।

(1) রাসেল্ বলেন "—এর মধ্যে", "—এতে" এ কথাগুলি দ্ব্যর্থবোধক। "ক আমার মনেতে আছে" —এ কথা দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারেঃ (1) আমার মনে ক-এর ধারণা বা চিন্তা আছে, ক-এর জ্ঞান আছে ; (2) ক সশরীরে আমার মনের মধ্যে আছে। ধরা যাক, ক ব্যক্তিকে বললামঃ তোমাকে আমার মনে আছে। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই নয় যেঃ ক ব্যক্তিটি সশরীরে আমার মনের মধ্যে অবস্থান করছে ; আমার বক্তব্য হলঃ আমার মনে ক-ব্যক্তির ভাব, চিন্তা বা স্মৃতি আছে। অর্থাৎ আমি এখানে "—এতে" কথাটি প্রথম অর্থে ব্যবহার করছি। সাধারণত এ অর্থেই "—এর মধ্যে," "—এতে" এ সব ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বার্কলির মতেঃ বস্তু = ধারণা, কাজেই তিনি বলেন ঐ গাছটি যখন জ্ঞাত হয়েছে তখন গাছটিকে অবশ্যই আমার মনেতে থাকতে হবে। এখানে বার্কলি "—এতে" কথাটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। এরূপ ব্যবহার অসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে বার্কলি সঙ্গতভাবে যে উক্তি করতে পারতেন তা হলঃ গাছটির ধারণা আমার মনের মধ্যে আছে। রাসেল্ বলেনঃ

অমুক ব্যক্তির কথা আমার মনেতে (মনে) আছে,
∴ ব্যক্তিটি আমার মনের মধ্যে অবস্থান করে

এ যুক্তি যেমন অসঙ্গত,

ক পদার্থটি আমার জ্ঞানের বিষয়
∴ ক পদার্থটি আমার মনের মধ্যে আছে

এ যুক্তিও ঠিক তেমন অসঙ্গত।

(2) রাসেল্‌ বলেন : ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা ধারণা এক অর্থে মনোগত ব্যাপার, কেননা ইন্দ্রিয়ানুভব না হলে ইন্দ্রিয়োপাত্তও লাভ করা যায় না। কিন্তু

ইন্দ্রিয়োপাত্তের অস্তিত্ব আমাদের অনুভবের উপর নির্ভরশীল

এ কথা প্রতিষ্ঠা করলেই ভাববাদ সমর্থিত হয় না, কেননা উক্ত বাক্য থেকে এ কথা নিঃসৃত হয় না যে

যে-পদার্থের জ্ঞান হয় তাকে আমাদের মনের মধ্যে থাকতে হবে।

ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আরও প্রমাণ করার দরকার যে

জ্ঞাত না হলে পদার্থের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ইন্দ্রিয়োপাত্ত অনেকটা মনোগত ব্যাপার—এ কথা রাসেল্‌ মেনেছেন। কিন্তু এ কথাই বা মানব কেন? এ কথা ঠিক যে — অনুভব ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধ এমন যে অনুভব না হলে ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : দুটি বিষয় ক (যথা অনুভব) ও খ (যথা ইন্দ্রিয়োপাত্ত) -এর মধ্যে যদি সহগামিতার (সহবর্তিতার) সম্বন্ধ থাকে তাহলে এ কথা মনে করব কেন যে —খ ক-এর অংশ বা ক-এর অন্তর্ভুক্ত? আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলে বায়ু চাপমানযন্ত্রের পারদের উচ্চতার পরিবর্তন হয় না। এ ব্যাপার থেকে কি এ সিদ্ধান্ত করতে হবে যে : পারদ-উচ্চতা ধর্মটি পারদের ধর্ম নয়, আবহাওয়ার ধর্ম, আবহাওয়ার "মধ্যে" নিহিত আছে? এ ক্ষেত্রে যদি উক্ত সিদ্ধান্ত না করি তাহলে ইন্দ্রিয়োপাত্তের বেলায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত করব কেন? বলব কেন : ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুর ধর্ম নয়, মনোগত ধর্ম, মনের "মধ্যে" অবস্থিত?

(3) বস্তুবাদীরা (যথা রাসেল্‌ ও মূর) বলেন : বার্কলি অনুভব-ক্রিয়া ও অনুভবের-বিষয়—এদের পার্থক্য অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এদের পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। আর এদের পার্থক্য লক্ষ করলেই বোঝা যাবে

ক অনুভূত হয়েছে ∴ অনুভবের বাইরে ক-এর অস্তিত্ব নেই

এ যুক্তি অসঙ্গত। এ কথা ঠিক যে অনুভব ক্রিয়াটি একটি মানসিক ব্যাপার, মন ছাড়া অনুভব ক্রিয়া থাকতে পারে না। সেরূপ, বোধ করা, প্রত্যক্ষ করা, জানা, সচেতন-হওয়া—প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে কেবল মনে। কিন্তু, অনুভবের (বোধের, প্রত্যক্ষের, জ্ঞানের, চেতনার) বিষয় আমাদের মনের বাইরে থাকতে পারে না—এ কথা মনে করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। যথা, আমার যদি লাল রঙের অনুভব হয় তাহলে অবশ্যই অনুভব ক্রিয়াটি আমার মনোগত ঘটনা, কিন্তু অনুভবের বিষয়টিও, লাল রঙটিও, আমার মনোগত— এ কথা মনে করার পক্ষে কোনো সঙ্গত যুক্তি দেখি না।

অনুভব (বোধ, প্রত্যক্ষ, জ্ঞান, চেতনা) মাত্রই কোনো কিছুর, অমুক-এর, অনুভব (বোধ, প্রত্যক্ষ, জ্ঞান, চেতনা)। বিষয়হীন অনুভব (ইত্যাদি) হতে পারে না। আর, অনুভব ও অনুভবের বিষয়, সম্পর্কিত হলেও, ভিন্ন পদার্থ।

দুটি ধারণা বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্যে, যথা অনুভূত লাল ও অনুভূত নীল-এর মধ্যে, আমরা পার্থক্য দেখাই কেমন করে? অবশ্যই, অনুভবের বিষয়ের

মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে। যেমন, আমরা বলি : এটি লালের প্রত্যক্ষ ওটি নীলের প্রত্যক্ষ, এ অনুভবের বিষয় লাল, ঐ অনুভবের বিষয়টি নীল। মূর বলেন : যদি অনুভব (ক্রিয়া) ও অনুভবের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা না হয় তা হলে দুটি অনুভবের মধ্যে, যথা লালের অনুভব ও নীলের অনুভবের মধ্যে, পার্থক্য দেখানো যায় না। কেননা, নিছক অনুভব ক্রিয়া হিসাবে অনুভব দুটির মধ্যে পার্থক্য নেই— দুটিই অনুভব।

আত্মগত ভাববাদীরা মনে করেন যে চেতনার বিষয় হল চেতনার উপকরণ। মূর বলেন : চেতনার বিষয় কখনও চেতনা-উপকরণ বলে গণ্য হতে পারে না। যথা, (ঐ নীল ফুলটির) নীল রঙ ফুলটির উপকরণ, ঐ ফুলটির অন্তর্গত, নীল রঙ ও ফুলটির মধ্যে বিশেষ একটি সম্বন্ধ আছে—বলতে পারি নীল রঙ সমবায় সম্বন্ধে নীল ফুলে বর্তমান। কিন্তু নীল রঙের সঙ্গে নীলের চেতনার এ জাতীয় সম্বন্ধ নেই। নীল রঙ অনুভবে বা চেতনায় সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকতে পারে না; যদি থাকত তাহলে নীল ফুলের মত নীলের-অনুভবেরও একটা রঙ থাকত, অনুভবটাও ফুলের মত রঙীন হত। কিন্তু অনুভবে বা কোনো মানসিক ক্রিয়াতে কোনো রঙ ধরতে পারে না।

(4) সত্তা হল জ্ঞাততা—এ সূত্রটিতে বার্কলি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন তা মোটেই স্পষ্ট নয়। ধরা যাক, এ সূত্রের বক্তব্য হল : "সৎ" আর "জ্ঞাত," "সত্তা" আর "জ্ঞাততা" সমার্থক শব্দ, অর্থাৎ সূত্রটি "সৎ" আর "সত্তা"র সংজ্ঞা। সে ক্ষেত্রে সূত্রটি "বন্ধ্যা", অ-তথ্যজ্ঞাপক। সে ক্ষেত্রে সূত্রটির বক্তব্য হল—

সত্তা হল সত্তা ("জ্ঞাততা"র পরিবর্তে সমার্থক "সত্তা" ব্যবহার করে)

জ্ঞাততা হল জ্ঞাততা ("সত্তা"র পরিবর্তে সমার্থক "জ্ঞাততা" ব্যবহার করে)।

কিন্তু সাধারণ ভাষায় "সত্তা" ("সৎ") আর "জ্ঞাততা" ("জ্ঞাত") সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। এ ব্যবহার অনুসারে—

ক সৎ কিন্তু ক অজ্ঞাত

ক অসৎ কিন্তু ক জ্ঞাত*

এ বাক্যগুলি স্ববিরোধী বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং সত্তা = জ্ঞাততা —এ সমীকরণ গ্রহণ করা যায় না। আর সৎ বলতে যদি জ্ঞাতই বোঝায় তাহলে ভ্রমপ্রত্যক্ষে বা অমূল প্রত্যক্ষে যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই তাকে অলীক অপভাস** বলে চিহ্নিত করব কেন? তারপর, "সত্তা" ও "জ্ঞাততা", "সৎ" ও "জ্ঞাত"—এদের কোনোটির লক্ষণার্থ অন্যটির লক্ষণার্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি এদের একটি লক্ষণার্থ বিশ্লেষণ করে অন্যটি পাওয়া যেত তাহলে,

ক-এর জ্ঞাততা আছে ∴ ক সৎ পদার্থ

ক সৎ পদার্থ ∴ ক জ্ঞাত পদার্থ

এ যুক্তিগুলিকে অবশ্য বৈধ বলে স্বীকার করতে হত। কিন্তু যুক্তিগুলি অবৈধ,

---

* যথা রজ্জু-সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্প; এখানে ক-এর দৃষ্টান্ত হল এরূপ অলীক সর্প।

** অবভাস নয়, অপভাস। অবভাস=appearance, অপভাস=false appearance

কেননা ঃ এদের হেতুবাক্য সত্য আর সিদ্ধান্ত মিথ্যা—এ কথা বললে কোনো স্ববিরোধী উক্তি করা হয় না।

আবার "সত্তা" ও "জ্ঞাততা" বাধক শব্দও নয়। কাজেই এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে ঃ এ শব্দ দুটি স্বতন্ত্র শব্দ। যেহেতু এরা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ যেহেতু এরা দুটি স্বতন্ত্র পদার্থ বোঝায়, সেহেতু এদের মধ্যে অবশ্যম্ভবতার সম্বন্ধ থাকতে পারে না। অর্থাৎ

"যা সৎ তাই জ্ঞাত"—এটি অবশ্যম্ভব বাক্য নয়, আপাতিক বাক্য।

পেরি প্রভৃতি নব্য বস্তুবাদীরা বলেন ঃ যা সৎ তাই জ্ঞাত, এবং অজ্ঞাত বস্তু অসৎ —এ আপাতিক বাক্যটি অবৈধ সামান্যীকরণ দোষে দুষ্ট। আমাদের অভিজ্ঞতায় বহু অন্বয়ী দৃষ্টান্ত পেয়েছি ঃ অমুক বস্তুটি জ্ঞাত এবং সৎ, তমুক বস্তুটি জ্ঞাত এবং সৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্ঞাততা ও সত্তার মধ্যে কেবল অন্বয় দেখেই বার্কলি অবৈধভাবে সামান্যীকরণ করে বলেন ঃ যা সৎ তাই জ্ঞাত। কিন্তু কেবল অন্বয়ের ভিত্তিতে সামান্যীকরণ করলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা থাকে, নির্ভুল সামান্য বাক্য পেতে হলে ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের দরকার। অথচ আলোচ্য সামান্য বাক্যটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত দেখানো সম্ভব নয়। দেখানো সম্ভব নয় যে ঃ ক অজ্ঞাত এবং ক অসৎ।

পেরি বলেন— বার্কলির যুক্তি অহংকেন্দ্রিকতা[1] দোষে দুষ্ট। জ্ঞানমাত্রই অহংকে কেন্দ্র করে হয়, জ্ঞানমাত্রই আমার, জ্ঞাতার, বা কোনো অহং দ্বারা লব্ধ জ্ঞান। কোনো উক্তি করতে হলে বস্তুটিকে জানার দরকার, যে বস্তু অজ্ঞাত তার সম্বন্ধে স্পষ্টতই কিছু জানা যায় না বা কোনো উক্তি করা যায় না —এ ব্যাপারটিকে বলে অহংকেন্দ্রিকতা। কিন্তু এ ব্যাপারটি থেকে বার্কলি এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেন ঃ যা অজ্ঞাত তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এ কথার অর্থ, আত্মগত ভাববাদীরা—

যা জ্ঞাত নয় তার সম্বন্ধে কোনো উক্তি করা যায় না, বা
যা জ্ঞাত নয় তার সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা যায় না

এ সত্য বাক্য থেকে এ মিথ্যা সিদ্ধান্ত করেন যে

যা জ্ঞাত নয় তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

পেরি আরও বলেন, আত্মগত ভাববাদের আর একটি দোষ হল ঃ ঐকান্তিকতা দোষ[2]। যদি মনে করা হয় যে— কোনো বস্তু ক খ-এর সঙ্গে একটি সম্বন্ধে আবদ্ধ বা একটি বিশেষ মণ্ডলীর, খ-মণ্ডলীর, অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং ক অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে না বা অন্য কোনো মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না— তাহলে ঐকান্তিকতা দোষ হয়। এখন, আত্মগত ভাববাদীদের যুক্তি এ দোষে দুষ্ট। তাঁরা মনে করেন যে যেহেতু জ্ঞাত বস্তুমাত্রই কোনো জ্ঞানের বিষয় হয়, জ্ঞাতার মনের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, সেজন্য বস্তু জ্ঞাতার মন ভিন্ন অন্যত্র বা অন্য সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকতে পারে না। নব্য বস্তুবাদীরা

1. ego-centric predicament 2. fallacy of exclusive particularity

বলেন : জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে ক জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধের দিক থেকে ঐ একই ক-কে বাস্তব জগতে অবস্থিত বস্তু বলে বর্ণনা করা যায়। ক যদি বাস্তব জগতের কোনো পদার্থ হয় তাহলে, তা জ্ঞাতার মনের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে, তার স্বরূপ হারিয়ে ফেলে না, বা তা ধারণায় পরিণত হয়ে যায় না।

পেরি আত্মগত ভাববাদের আরও একটি দোষ উল্লেখ করেছেন এবং এ দোষের নাম দিয়েছেন : প্রথম জ্ঞাত রূপ দিয়ে লক্ষণকরণ, প্রথম পরিচয়কেই চরম পরিচয় বলে গণ্যকরণ[1]। কোনো বস্তুকে প্রথম পরিচয়ে যে রূপে পাই সে রূপটি বস্তুটির লক্ষণ বা সারধর্ম —এ কথা মনে করলে উক্ত দোষ হয়। জ্ঞানের অহং-কেন্দ্রিকতা নামক ব্যাপারের পরিণতি হল এই— কোনো জ্ঞাত বস্তুর প্রাথমিক পরিচয় হল : বস্তুটি জ্ঞানের বিষয়, এর জ্ঞাততা আছে। এখন, আত্মগত ভাববাদীরা মনে করেন : জ্ঞাততাই বস্তুর চরম পরিচয় বা লক্ষণ, কাজেই যার জ্ঞাততা নেই তার সত্ত্বও নেই। কিন্তু প্রথম-পরিচয়ে-পাওয়া ধর্মটিই (জ্ঞাততাই) বস্তুর একমাত্র ধর্ম নয়, এ ধর্মটি না থাকলেও বস্তুর বস্তুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

বার্কলি ও ঈশ্বর-প্রকল্প

বার্কলির মতে বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে অনুভবের উপর। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে : যে বস্তু কোনো ব্যক্তিই অনুভব করছে না, যথা আমার রুদ্ধদ্বার রুদ্ধবাতায়ন নির্জন ঘরের টেবিলটি, অননুভূত থাকা কালে তার কি অস্তিত্ব থাকে না ?* এ প্রশ্নের উত্তরে বার্কলি বলেন : কোনো বস্তুর অস্তিত্ব যে আমার তোমার বা অন্য ব্যক্তিমনের অনুভব করার উপর নির্ভর করে আমি এমন কথা বলি না, আমি বলি— বস্তুর অস্তিত্ব কোনো না কোনো মনের উপর নির্ভরশীল। মন বা আত্মা বলতে কেবল সসীম মানবীয় মন বোঝায় না, অসীম ঈশ্বর-মনও বোঝায় ; ঈশ্বর-মন হল পরমাত্মা। এখন, আমরা কেউ যখন টেবিলটি প্রত্যক্ষ করছি না তখনও, বস্তুত সব সময়েই, টেবিল "বস্তুটি" ঈশ্বরের অনুভবে ধারণারূপে বর্তমান থাকে, সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও, ঈশ্বর অনুভবে থাকে বলে টেবিলটির অস্তিত্ব বজায় থাকে ॥

আর একটি প্রশ্ন। বহির্জগতের বস্তুগুলি যদি আমাদের ধারণামাত্র হত তাহলে আমরা যে কোনো অবস্থায় স্বেচ্ছায় যে কোনো ধারণা লাভ করতে বা সৃজন করতে পারতাম ; যথা, যাকে লাল ফুল বলা হয় তার দিকে তাকিয়ে নীলের ধারণা পেতে পারতাম। আমাদের মনস্থিত ধারণা প্রক্ষেপণ করে, যাকে বস্তু— বলা হয় তাতে যে কোনো ধর্ম প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। বস্তুত তা পারি না।

1. fallacy of definition by initial predication

* আমি যখন ঘুমাই, চোখ বুজে, ধ্যানস্থ হয়ে থাকি, বা টেবিলটির দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে তাকাই তখন কি টেবিলটির অস্তিত্ব থাকে না ?

কিন্তু কেন? আবার, লক্ষ করি: ধারণাগুলি বিশেষ ক্রমে আমাদের অনুভবে উপস্থিত হয়। যথা ওদিকে, ঐ গাছটির নিচের দিকে তাকালে পাই ধূসরের ধারণা (কাণ্ডের রঙ) আর উপরের দিকে তাকালে পাই সবুজের ধারণা (পাতার রঙ)। এ ধারণাগুলি অন্য ক্রমে আসে না কেন? নিচের দিকে তাকালে সবুজের আর ওপরের দিকে তাকালে ধূসরের অনুভব হয় না কেন? আবার এ ব্যাপারটিও লক্ষ করি: আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করে আমাদের চেতনায় ধারণাগুলি যেন ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ করে। প্রশ্ন: অনুভবকালে ধারণার বিশেষ ক্রমে উপস্থিত হওয়া, চেতনায় জোর করে প্রবেশ করা—এ সবের ব্যাখ্যা কী? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বার্কলি আবার ঈশ্বর প্রকল্পের সাহায্য নেন। তিনি বলেন: ঈশ্বর তার মনস্থিত ধারণাগুলি বিশেষ ক্রমে বিশেষ পরিবেশে আমাদের ব্যক্তিমনে প্রেরণ করেন, এবং তার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভব হয়।

বার্কলির ভাববাদের যৌক্তিক পরিণতি হল অহংসর্বস্ববাদ[1]—কেবল আমি এবং আমার ধারণা ভিন্ন অন্য কিছুর সত্ত্ব নেই—এ মতবাদ। যে পদার্থ জ্ঞাত হয়েছে বা যার জ্ঞান হয়েছে কেবল তাই সৎ—এভাবে যদি সত্তার লক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে, বলা বাহুল্য, আমি এবং আমার মনোগত ধারণা ভিন্ন অন্য কিছুর সত্তা থাকতে পারে না। এ অহংসর্বস্ববাদী পরিণতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বার্কলি ঈশ্বরের শরণ নিয়েছেন।

লক্ষণীয় যে অহংসর্বস্ববাদী পরিণতি এড়াতে গিয়ে এবং বহির্জগতের বাস্তবতা রক্ষা করতে গিয়ে বার্কলি ঈশ্বর প্রকল্পের আশ্রয় নেবার ফলে তার দর্শন একটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। বার্কলির দর্শনের এ শেষোক্ত রূপটি কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ বলে গণ্য হতে পারে না। এ দর্শনে দেখা যায় আধিবিদ্যক ভাববাদের সূচনা। বার্কলির এ আধিবিদ্যক ভাবধারা কিভাবে পরবর্তী কালে আধিবিদ্যক ভাববাদকে, যথা বিষয়গত ভাববাদকে, প্রভাবিত করে তা পরে বিষয়গত ভাববাদ প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। আপাতত বার্কলির দর্শনের দ্বিতীয় রূপটির মূল্য বিচার করা যাক।

বার্কলি-অনুসৃত যুক্তি দিয়েই দেখানো যায় যে বহির্জগতের বাস্তবতা রক্ষা করতে গিয়ে ঈশ্বর প্রকল্পের আশ্রয় নেওয়া বার্কলির পক্ষে অসঙ্গত। বার্কলি হলেন দৃষ্টিবাদের সমর্থক; তাঁর মতে ইন্দ্রিয়ানুভব ভিন্ন জ্ঞান হতে পারে না। ঈশ্বর কিন্তু অনুভবগম্য নয়, আমাদের ঈশ্বরের "ধারণা" (ইন্দ্রিয়োপাত্ত অর্থে) নেই, কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। সুতরাং জগতের বাস্তবতা দেখাতে গিয়ে বার্কলির পক্ষে কাল্পনিক ঈশ্বরের শরণ নেওয়া অসঙ্গত। তারপর, আমরা মনোনিরপেক্ষতা বা বাস্তবতা বলতে যা বুঝি ঈশ্বর প্রকল্প দিয়ে তার ব্যাখ্যা হয় না। ধরা যাক, কোনো একটি ক্ষণে আমার ক পদার্থটির অনুভব হচ্ছে না। বার্কলি বলবেন: ঐ ক্ষণে ক ঈশ্বরের ধারণারূপে বর্তমান, কাজেই ঐ ক্ষণে

1. Solipsism

ক-এর সত্ত্ব আছে, কেননা ক কারও দ্বারা (ঈশ্বরের দ্বারা) জ্ঞাত হয়েছে। কিন্তু আমার জ্ঞাত বিষয় নয় বলে ক আমার পক্ষে অসৎ। আর ক ঈশ্বরের মনস্থিত ধারণা কিনা—তা আমি জানব কেমন করে? বার্কলির সূত্র অনুসারে ঈশ্বর বা অন্য ব্যক্তির (জ্ঞাতার) অস্তিত্ব ত আমার অনুভবের উপর নির্ভরশীল। বার্কলি অবশ্য বলেন, সৎ পদার্থ দু রকম—জ্ঞাত ও জ্ঞাতা। কিন্তু আমি ভিন্ন অন্য জ্ঞাতা আছে কিনা কি করে জানব? ধরা যাক, আমাদের ঈশ্বর-অনুভব হয়। তার মানে ঈশ্বর আমাদের মনস্থিত ধারণা। এ ধারণাটি আবার আমার মনে ধারণা প্রেরণ করে কেমন করে? তারপর, বার্কলির মতে, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের হেতু হল ঈশ্বর কর্তৃক ধারণা-প্রেরণ। কিন্তু ঈশ্বর কি প্রতারক, দেকার্ত কল্পিত "দুষ্ট দৈত্য"? তা না হলে আমাদের মনে অমূল, ভ্রান্ত বা স্বাপ্নিক ধারণা পাঠিয়ে ঈশ্বর আমাদের প্রতারিত করবে কেন?

3. সবিচার ভাববাদ

সবিচার ভাববাদ বলতে বোঝায় কাণ্টের দার্শনিক মত। কাণ্ট্ নিজে তাঁর দার্শনিক মতবাদকে আকারক ভাববাদ, অতিবর্তী ভাববাদ ও সবিচার ভাববাদ* বলে বর্ণনা করেছেন।

কাণ্ট্ তাঁর দর্শনকে এক প্রকারের ভাববাদ বলে বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁর যুগান্তরকারী গ্রন্থ "বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার"-এর কয়েকটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম হল "ভাববাদখণ্ডন"। স্পষ্টতই এ প্রসঙ্গে কাণ্ট্ ভাববাদ বলতে ভাববাদের বিশেষ (বা বিশেষ বিশেষ) রূপ বুঝেছেন; সর্ব প্রকারের ভাববাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেন নি। কাণ্ট্ কোন্ (বা কোন্ কোন্) ভাববাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেন তা জানতে পারলে কাণ্টীয় ভাববাদ বুঝতে সুবিধা হবে। "ভাববাদ খণ্ডন" নামক অংশে কাণ্ট্ বলেছেন যে তিনি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন জড়বিষয়ক ভাববাদ—যে ভাববাদ জড় বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করে বা এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে সে ভাববাদ। কাণ্টের মতে এ ভাববাদের দুই রূপ: সংশয়ী ভাববাদ ও নির্বিচার ভাববাদ**। সংশয়ী ভাববাদ বলতে কাণ্ট্ বোঝেন দেকার্তের ভাববাদ; কাণ্ট্ মনে করেন যে দেকার্তের ভাববাদী তত্ত্ব অনুসারে— দেশস্থ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নয়, কেবল "আমিই সৎ" এ বাক্যই নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য। দেকার্তে আরোপিত এ মতবাদকেই কাণ্ট্ সংশয়ী ভাববাদ বলে অভিহিত করেছেন। আর বার্কলি-প্রচারিত ভাববাদকে কাণ্ট্ নির্বিচার ভাববাদ বলে বর্ণনা করেছেন; কাণ্ট্ মনে করেন যে বার্কলির মতে—দেশস্থিত

* যথাক্রমে: Formal Idealism, Transcendental Idealism ও Critical Idealism

** যথাক্রমে: Problematic Idealism ও Dogmatic Idealism

বস্তুর অস্তিত্ব নেই, এ সব কল্পনাপ্রসূত। বার্কলিতে আরোপিত এ মতবাদকেই কাণ্ট্ নির্বিচার ভাববাদ বলে অভিহিত করেছেন।*

কাণ্ট্ যে উক্ত মতবাদগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন তার থেকে বোঝা যায় যে কাণ্টের মতে—(ক) বাহ্য, দেশস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অযৌক্তিক, আর (খ) দেশস্থিত বস্তুসমূহ অলীক, আমাদের কল্পনাপ্রসূত—এ মতও অযৌক্তিক। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কাণ্টকে ভাববাদী বলব কেন? এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর পরে দেওয়া যাবে। আপাতত বলা যায় যে, কাণ্টের মতে—আমরা যা জানি তা অর্থাৎ বিষয়, জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নয়; বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ। এবং এ উক্তি স্পষ্টতই একটি ভাববাদী উক্তি।

এখন, "বিষয়" বলতে যদি জ্ঞানের বিষয় বোঝায় তাহলে বলতে হয়ঃ "বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ"—এটি একটি বিশ্লেষক বাক্য, এবং এ বাক্যে যে উক্তি করা হয়েছে তা একটি তাদাত্ম্য-উক্তি, সুতরাং বন্ধ্যা, অ-তথ্যজ্ঞাপক। বলা বাহুল্য, উক্ত অর্থে কাণ্ট্ "বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ"—এ উক্তি করেন নি। তারপর, বস্তুবাদীরাও এ উক্তি মেনে নেবেন; তারাও স্বীকার করবেন যেঃ জ্ঞাত হবার জন্য, জ্ঞাততা ধর্মের জন্য, বিষয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাণ্ট্ এ অর্থেও বলেন নি যে বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ। আবার কাণ্টের উক্তিতে বার্কলির মতও ব্যক্ত হয় নি; কাণ্ট্ এ কথা বলতে চান নি যে বিষয়মাত্রই ধারণা। "বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ" —এ কথা বলে কাণ্ট্ বলতে চেয়েছেনঃ কোনো বিষয়ের জ্ঞান হলে বিষয়টিতে আমরা যে সব ধর্ম প্রত্যক্ষ করি সে সব ধর্ম বস্তুগত নয়, অর্থাৎ যে রূপে বস্তু (মনোনিরপেক্ষ বস্তু) আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় সে রূপ বস্তুর স্বরূপস্থ, জ্ঞাননিরপেক্ষ রূপ নয়। জ্ঞাত বিষয়ের যে সব ধর্মকে আমরা মনোনিরপেক্ষ বস্তুগত ধর্ম মনে করি তাদের অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। যথা "ঐ জ্ঞাত বস্তুটি ঐ দেশকাল খণ্ডে আছে", "ওটি একটি দ্রব্য"—এ সব কথা বলতে যে ধর্ম নির্দেশ করি সে সবের অস্তিত্ব আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হবার ওপর নির্ভর করে॥

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল অনুভবের[1] পূর্বতসিদ্ধ আকার; আর দ্রব্য, গুণ, কার্য, কারণ—এ সব বুদ্ধির[2] পূর্বতসিদ্ধ আকার বা প্রকার (বুদ্ধির আকারকে 'প্রকার' বলা হয়)। সংবেদনলব্ধ উপাদান এ সব আকারে আকারিত না হলে এবং এ সব প্রকারে প্রকারিত না হলে, কোনো জ্ঞান হতে পারে না।

* কাণ্ট্ যাকে সংশয়ী ভাববাদ বলে অভিহিত করেছেন তা দেকার্তের মতবাদের সঠিক ব্যাখ্যা কিনা এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে। আর যে মতবাদকে নির্বিচার ভাববাদ বলে অভিহিত করেছেন তা আদৌ বার্কলির মতবাদ নয় (বার্কলি এমন কথা বলেন নি যেঃ দেশ আমাদের কল্পনার সৃষ্টি)। কিন্তু কাণ্ট্ দেকার্তের বা বার্কলির মতবাদের সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন কিনা—এ প্রশ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। এ দুটি মতবাদের সমালোচনা করে কাণ্ট্ কী বলতে চেয়েছেন তাই প্রাসঙ্গিক।

1. অনুভব (সংবেদনশক্তি)=sensibility 2. বুদ্ধি (বোধশক্তি)=understanding

কেবল বুদ্ধির দ্বারা (বাস্তব জগতের) কোনো জ্ঞান হতে পারে না*। অপর-পক্ষে কেবল অনুভব থেকেও (বাস্তব জগতের) কোনো জ্ঞান হয় না**। কাণ্ট্ বলেন, সংবেদনলব্ধ উপাদান ছাড়া বুদ্ধির প্রকার "শূন্যগর্ভ" আর বুদ্ধির প্রকার ছাড়া অনুভব "অন্ধ"। অনুভব ও বুদ্ধি— দুই-ই জ্ঞানের অপরিহার্য সর্ত। অনুভবে যা পাই তাকে বলে আভাস (বা, ভাস), এ আভাস জ্ঞানের উপাদান, জ্ঞানের বিষয় নয়। জ্ঞানের বিষয় হতে গেলে একে বৌদ্ধিক প্রকারে প্রকারিত হওয়ার দরকার। বৌদ্ধিক প্রকারে প্রকারিত ভাসকে বলে অবভাস[1]। এ অবভাসের দু দিক: আকার ও উপাদান। অবভাসের যেটুকু সংবেদনজন্য অনুভবে পাই তা হল উপাদান, আর যে আকারে সন্নিবিষ্ট ও গ্রথিত হয়ে উপাদান আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তা হল আকার। অবভাস বলতে কিন্তু অলীক পদার্থ বোঝায় না। যা অলীক তার জ্ঞান হতে পারে না, কিন্তু অবভাস আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অবভাসের পারমার্থিক সত্তা নেই, আমাদের জ্ঞান না হলে অবভাসের কথাও উঠত না—এ কথা ঠিক। কিন্তু বস্তুত আমাদের সকলের মনের গঠন এমন যে: যা কিছু বাহ্য-ইন্দ্রিয়গম্য তাকে আমরা দেশকালের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করি (অনুভবের আকারে আকারিত করি) এবং অনুভবলব্ধ জ্ঞান-উপাদানকে বুদ্ধির প্রকারের সংশ্লেষিত বা একত্রিত করি। আমাদের মনের গঠন যদি অন্যরূপ হত তাহলে এখন যেরূপ জ্ঞান হয় তখন সেরূপ জ্ঞান হত না। মানব মনের গঠন বস্তুত যেমন, গঠনটি ঠিক তেমন বলেই বর্তমানে যে জাতীয় অবভাস পাই, সে অবভাসের জ্ঞান হয়। কাণ্টের বক্তব্য নিম্নোক্ত যুক্তির আকারে ব্যক্ত করা যায়:

যা অনুভব ও বুদ্ধির দ্বারা আকারিত প্রকারিত তা অনুভব-বুদ্ধিসাপেক্ষ,
জ্ঞানের বিষয়মাত্রই অনুভব ও বুদ্ধির দ্বারা আকারিত প্রকারিত,
∴ জ্ঞানের বিষয়ের স্বরূপ অনুভব-বুদ্ধিসাপেক্ষ (জ্ঞানসাপেক্ষ)।
∴ জ্ঞানে-আকারিত-প্রকারিত-নয়-এমন বস্তুর, বিশুদ্ধ বস্তুর, স্বরূপস্থ বা স্বয়ংসৎ বস্তুর, জ্ঞান হয় না।

এজন্য কাণ্ট্ বলেন: অনুভব ও বুদ্ধিই জগৎ রচনা করে—রচনা করে গৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে।

সংক্ষেপে, কাণ্টের অতিবর্তী ভাববাদের বক্তব্য হল: দেশকাল ও বুদ্ধির প্রকারসমূহ প্রাকৃত জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত, এ সব বস্তুর স্বগত ধর্ম নয়, এ সব হল অনুভব ও বুদ্ধির পূর্বতসিদ্ধ আকার। স্বয়ংসৎ বস্তু,[2] নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু, দেশকালে অবস্থান করে কিনা, এদের মধ্যে কার্য কারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তা জানা যায় না; জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

---

* এ উক্তি হল বুদ্ধিবাদী লাইব্‌নিট্‌স্ ও ভলফ্-এর মতবাদের বিরুদ্ধে কাণ্টের প্রতিবাদ।

** এ উক্তি হল দৃষ্টিবাদী লক্, বার্কলি, হিউম্—এদের মতবাদের বিরুদ্ধে কাণ্টীয় প্রতিবাদ।

1. appearance 2. thing-in-itself

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে বুদ্ধি বা আত্মার একীকরণ ক্রিয়ার ফলে কোনো কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে তা কিন্তু আমাদের লৌকিক অহং বা আত্মা নয়, তা হল অলৌকিক, অতিবর্তী অহং[1]। অলৌকিক বা শুদ্ধ অহংকে অন্তর্দর্শনে পাওয়া যায় না, অন্তর্দর্শনে যে অহং-এর প্রত্যক্ষ হয় তা হল বিষয়-অহং, বা জ্ঞাত-অহং ; বিষয়ী-অহং বা জ্ঞাতা-অহং নয়। কাণ্টের মতে জ্ঞানক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য একটি অলৌকিক বা অতিবর্তী অহং মেনে নেবার দরকার। এ অলৌকিক আত্মা অজ্ঞেয়, কেননা ঃ এ আত্মা হল জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত, এবং

যা জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত তা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না,
অতিবর্তী অহং জ্ঞানের আবশ্যিক সর্ত ;
∴ এ অহং জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।

কিন্তু লৌকিক-অহং[2] জ্ঞানের বিষয় হতে পারে, কাজেই এ অহং জ্ঞাতা বলে গণ্য নয়। এ অহং হল আমাদের ভাবনা কল্পনার সমষ্টি। আমরা বলি ঃ আমি আমার নিজেকে, আমাকে, জানি। এ ক্ষেত্রে "আমাকে" জানলাম, বিষয়রূপে জানলাম ; এ জ্ঞান কিন্তু "আমি"র, জ্ঞাতা-আমির, জ্ঞান নয়।

প্রাকৃত জগৎ, কাণ্টের ভাষায়—অবভাস-জগৎ, অলৌকিক অহং-এর উপর নির্ভর করে। কাজেই বলতে পারি ঃ আমরাই এ জগতের রচয়িতা, এ জগতের অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানসাপেক্ষ। তবে এখানে "জ্ঞানসাপেক্ষ" অর্থ এই নয় যে ঃ আবভাসিক জগৎ লৌকিক অহং সাপেক্ষ। এ জগতের স্বরূপ নির্ভর করে অতিশায়ী (অতিবর্তী) "আমি"র উপর। দেশকালস্থিত বস্তু, আমাদের লৌকিক অহং, বস্তুত সর্ব প্রকারের জ্ঞাত ও জ্ঞেয় পদার্থেরই, কেবল "লৌকিক বাস্তবতা"[3] আছে ; কিন্তু এসব কোনো কিছুই স্বয়ংসৎ নয়, এদের আছে "লোকোত্তর অবাস্তবতা"[4]। "লৌকিক বাস্তবতা আছে আর লোকোত্তর অবাস্তবতা আছে" —এ কথার অর্থ ঃ এ সবের লৌকিক সত্ত্ব আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্ব নেই। অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক থেকে, এসব বাস্তব। কিন্তু জ্ঞানের বাইরে এসব অবভাসের সত্ত্ব নেই, এসব জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বয়ংসৎ পদার্থ নয়, জ্ঞান-অতিবর্তী পদার্থ হিসাবে এসব অবাস্তব। তবে "অবভাস (অলৌকিক) অহং-এর রচনা"—এ কথা বললে কিন্তু মনোনিরপেক্ষ (এমন কি অলৌকিক-অহং নিরপেক্ষ) জড় বা স্বয়ংসৎ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় না। মনোনিরপেক্ষ কোনো কিছু আমাদের অনুভব-বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে আবভাসিক জগৎ রচিত হতে পারে। কাণ্ট্ এজন্য অজ্ঞেয়, স্বরূপ-অব্যক্ত, শুদ্ধ জ্ঞান-উপাদান -এর কথা বলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে কাণ্ট্‌কে বস্তুবাদীও বলা যায়। কাণ্ট্ এ কথা বলেন না যে, সব কিছুই জ্ঞানসাপেক্ষ, কাণ্ট্ বলেন ঃ অবভাস জ্ঞানসাপেক্ষ ; কিন্তু শুদ্ধ স্বয়ংসৎ বস্তুর, অজ্ঞাত অজ্ঞেয় স্বরূপ-অব্যক্ত জ্ঞান-উপাদানের, অস্তিত্ব আমাদের উপর নির্ভর করে না।

1 transcendental ego 2. empirical ego 3. empirical reality
4. transcendental ideality

"প্রাকৃত জ্ঞানের স্বীকার্য"[1] আলোচনা করতে গিয়ে কাণ্ট্ এভাবে বাস্তবতার লক্ষণ দিয়েছেন।

> যা প্রাকৃত জ্ঞানের ঔপাদানিক সামগ্রীর বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের সঙ্গে সংসৃষ্ট তাই বাস্তব।*

এ বাক্যের বক্তব্য হল : কোনো কিছুকে বাস্তব হতে হলে তাকে প্রত্যক্ষগোচর হতে হবে অথবা প্রত্যক্ষগোচর বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে, অর্থাৎ তাকে অনুভূত বা অনুভবযোগ্য হতে হবে। উক্ত স্বীকার্যটি স্পষ্টতই ভাববাদ বিরোধী বলে মনে হয়। এ স্বীকার্য প্রসঙ্গেই কাণ্ট্ ভাববাদ খণ্ডনের কথা বলেছেন। ভাববাদ খণ্ডন করতে গিয়ে কাণ্ট্ নিম্নোক্ত মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন : আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি, কিন্তু বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি না। ভাববাদীরা মনে করেন : আন্তর অনুভবে যা পাই তাই—আমাদের মন বা মনের অবস্থা—এ সবই, একমাত্র সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়, এবং এ রকম আন্তর অনুভবের ভিত্তিতে অনুমান করে বাহ্য বস্তু পাই। কাণ্টের মত উক্ত মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কাণ্ট্ বলেন : বাহ্য অনুভবই অপরোক্ষ, এবং বাহ্য বস্তুর জ্ঞান আন্তর প্রত্যক্ষের আবশ্যিক সর্ত। কাণ্টের মতে : বাহ্য বস্তুর জ্ঞান ছাড়া আত্মজ্ঞান হয় না। বাহ্য জড় পদার্থ না থাকলে এবং বাহ্য বস্তুর জ্ঞান না হলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারতাম না। কাণ্টের যুক্তিটি নিম্নরূপ :

অহং-এর জ্ঞান হয় আন্তর অনুভবে
আন্তর অনুভব কালিক আকারে আকারিত হয়**
∴ অহং-এর জ্ঞান কালিক আকারে আকারিত হয়, অর্থাৎ
কালিক আকারে, কালিক পদার্থরূপে, অহং-এর অনুভব হয়।

এখন, কালিক আকারে অনুভব হয় = পরিবর্তনশীল, চলমানরূপে অনুভব হয়। কিন্তু অপরিবর্তনীয় বা স্থিতিশীল পদার্থের অনুভব না হলে, কোনো কিছু চলমানরূপে অনুভূত হতে পারে না†
অনুভবে যে অহংকে পাই তা চলমান
∴ কোনো স্থিতিশীল পদার্থের অনুভব না হলে চলমান অহং-এর অনুভব হতে পারে না।

এখন, আমাদের অনুভবের দুটি মাত্র রূপ ; বাহ্য অনুভব ও আন্তর অনুভব,
আন্তর অনুভবে কিন্তু কোনো স্থিতিশীল পদার্থ পাওয়া যায় না
(কেননা আন্তর অনুভবের আকার হল কাল)
∴ বাহ্য অনুভব থেকেই স্থিতিশীল পদার্থের জ্ঞান হয়॥

---

1. Postulates of Empirical Thought

* শ্রীরাসবিহারিদাস-এর অনুবাদ অনুসরণে ; কাণ্টের দর্শন 115 পৃ : দ্রষ্টব্য।

** কেননা কাণ্টের মতে কাল আন্তর অনুভবের আকার, যেমন দেশ (কাল) বাহ্য অনুভবের আকার।

† কেবল স্থিতিশীল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করা হলেই কোনো কিছু গতিশীল হিসাবে অনুভূত হতে পারে।

দেখা গেল যে, 'বাহ্য বস্তু আছে'—এ জ্ঞান না হলে 'আমি আছি'—এ জ্ঞান হতে পারে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে কাণ্টীয় দর্শনে বস্তুবাদী ও ভাববাদী —এ দু রকম চিন্তাধারাই দেখা যায়।

(সরল) বস্তুবাদীরা বলেন : সব বস্তু ও বস্তুধর্ম জ্ঞাননিরপেক্ষ

(আত্মগত) ভাববাদীরা বলেন : সব বস্তু ও বস্তুধর্ম জ্ঞানসাপেক্ষ

আর, কাণ্ট্ বলেন : (স্বয়ংসৎ) বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাননিরপেক্ষ, তবে এ বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, কিন্তু
বস্তুর যে অবভাস পাই তার অস্তিত্ব জ্ঞানসাপেক্ষ।

একটা প্রশ্ন : বস্তুবাদী প্রবণতা সত্ত্বেও কাণ্ট্‌কে ভাববাদী বলে গণ্য করা হয় কেন ?
উত্তর : কাণ্টের মতে—

বস্তুবাদীদের বস্তুধারক দেশকাল বাস্তব পদার্থ নয়, এ সব অনুভবের আকার।

বস্তুজগতের প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতির নিয়ন্তা নয়, জ্ঞানই জ্ঞাত জগতের স্বরূপের নিয়ন্তা। অর্থাৎ,

বস্তুজগৎ জ্ঞাতার মনের আকারে প্রকারে আকারিত প্রকারিত হয়, মন তার পূর্বত-সিদ্ধ আকার প্রকার দিয়ে জগৎ রচনা করে।

স্বয়ংসৎ বস্তুর জ্ঞান হয় না, জ্ঞানের বিষয় হল অবভাস, এবং এ অবভাস আমাদেরই সৃষ্টি ॥

স্পষ্টতই এ সব ভাববাদী উক্তি। কাণ্টীয় দর্শনকে ভাববাদ বলে গণ্য করার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেতু হল এই : কাণ্ট্‌ই সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন যে—

জ্ঞানের ফলে জ্ঞাত বিষয়ে মনোগত ধর্ম আরোপিত হয়, জ্ঞাত হয় বলেই জ্ঞান-উপাদান পরিবর্তিত, বিকৃত বা বিশেষভাবে রচিত হয়।

এ মত বস্তুবাদীদের বাহ্যসম্বন্ধ তত্ত্ব ও স্বাতন্ত্র্য তত্ত্বের বিরোধী। বস্তুবাদীদের মতে—কোনো বস্তুর স্বরূপ যা, জ্ঞানীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হলেও তা অক্ষুণ্ণ থাকে, জ্ঞাত বস্তু জ্ঞাততা ধর্ম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্ম অর্জন করে না। কাণ্টীয় দর্শন এ বস্তুবাদী তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী।

জ্ঞান হলে জ্ঞান-উপকরণ বিকৃত (আকারিত প্রকারিত) হয়, জ্ঞানই বাস্তব জগৎ (জ্ঞাত জগৎ) রচনা করে —এটি কাণ্ট্-উত্তর ভাববাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। এবং এ যুক্তির প্রথম প্রণেতা হলেন কাণ্ট্। এক অর্থে বার্কলিকেও বস্তুবাদী বলা যায়। কেননা বার্কলির মতে : আমাদের মন নিষ্ক্রিয় গ্রাহক মাত্র, মন প্রদত্ত ধারণা বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত সরাসরি গ্রহণ করে, অনুভূত হবার ফলে এ সব ধারণায় কোনো মনোগত ধর্ম আরোপিত হয় না, গৃহীত ইন্দ্রিয়োপাত্ত গুলির অস্তিত্ব ব্যক্তিমনোনিরপেক্ষ। ঈশ্বর প্রেরিত এ ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলিকে যদি বস্তু বলে গণ্য করি (এখানে বস্তু = আমার মনোনিরপেক্ষ জ্ঞাত পদার্থ) তাহলে বার্কলিও বস্তুবাদী বলে গণ্য। কিন্তু কাণ্ট্‌কে ভাববাদী বলব, কেননা কাণ্টের মতে—কোনো কিছু যে-রূপে অনুভূত বা জ্ঞাত সে-রূপ আমাদের মনের সৃষ্টি। সংবেদনলব্ধ

উপাদানে মন তার আকার প্রকার না লাগিয়ে কোনো কিছু অবিকৃত অবস্থায় সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না।

কাণ্টীয় দর্শনকে ভাববাদ বলে গণ্য করার আর একটি হেতু হল কাণ্টের অতিবর্তী বা অলৌকিক অহং তত্ত্ব। আমরা জানি, বুদ্ধি অনুভবলব্ধ ভাসকে প্রকারিত করে। কাণ্টের মতে অতিবর্তী অহং না মানলে বুদ্ধির একত্রীকরণ, সংশ্লেষণ বা বিষয়গঠন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এ অহং জ্ঞানের অপরিহার্য সর্ত। পরবর্তী কালে ব্রহ্মবাদী নামক ভাববাদীরা কাণ্টের এ সক্রিয় ও স্বতঃক্রিয় অহংকে ভিত্তি করে দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করেছেন।

4. বিষয়গত ভাববাদ

বিষয়গত ভাববাদ এক প্রকারের আধিবিদ্যক বা তত্ত্বগত ভাববাদ। তত্ত্বগত ভাববাদীরা—বিশ্বের চরম তত্ত্ব কী?—এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ভাববাদী সিদ্ধান্তে পৌছান। অন্য আধিবিদ্যক ভাববাদীদের মতো, বিষয়গত ভাববাদীরাও পরম তত্ত্বের বা চরম সত্ত্বের একটি লক্ষণ ধরে নিয়ে অগ্রসর হন। বিষয়গত ভাববাদের প্রধান প্রবক্তা, ভাববাদ শিরোমণি হেগেল্ এভাবে চরম সত্ত্বের লক্ষণ দেন: যা অসীম, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর বা স্বনিয়ন্ত্রিত তাই চরম সত্ত্ব। হেগেলীয় ভাববাদ ব্রহ্মবাদ নামেও পরিচিত।

আত্মগত ভাববাদী বার্কলি বলেছেন্: জ্ঞানের বিষয় হল ধারণা, যাকে বস্তু বলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতার মনস্থিত ধারণা, জ্ঞাতা বা বিষয়ীর ধারণা। বিষয়গত ভাববাদ এ মতের বিরোধী। বিষয়গত ভাববাদের মতে:

(1) জ্ঞানের বিষয়ের বাস্তবতা আছে, অনুভবলব্ধ বস্তুধর্ম বিষয়গত, এ সব মানব মনের ধারণা নয়।

বিষয়গত ভাববাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ নয়, আধিবিদ্যক মতবাদ—এ কথা ঠিক; কিন্তু এ ভাববাদও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের নিম্নোক্ত সূত্রটি মেনে নেয়:

(2) জ্ঞানের বা মনের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সব কিছুই মনসাপেক্ষ।

তারপর কাণ্টের নিম্নোক্ত মতটিও বিষয়গত ভাববাদ মেনে নেয়:

(3) বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, বাহ্য বস্তুর জ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না। এ কথা বলা যায় না যে—আমার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারি কিন্তু বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করতে পারি।

আবার, বিষয়গত ভাববাদীরা দেকার্তের নিম্নোক্ত মতটিও মেনে নেন:

(4) কেবলমাত্র চৈতন্য সম্পর্কেই নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

বিষয়গত ভাববাদ যে চারটি মত মেনে নেয় বলে বলা হল সে মতগুলির মধ্যেই স্পষ্টতই অসংগতি ও পরস্পরবাধকতা আছে। যথা: সব কিছুই যদি মনসাপেক্ষ হয় এবং একমাত্র আত্মচৈতন্যই যদি নিঃসন্দিগ্ধ হয় তাহলে

জ্ঞানের বিষয়কে বস্তুগত বলি কেমন করে? আর, যদি বাহ্য বস্তুর জ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান না হয় তাহলে—সব কিছুই মনসাপেক্ষ, বা কেবল আত্মচৈতন্য সম্বন্ধেই নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় —এসব কথা বলি কেমন করে?

আত্মগত ভাববাদী বার্কলিরই একটি উক্তিকে ঈষৎ পরিবর্তন পরিবর্ধন করে উক্ত বাক্যগুলির মধ্যে সংগতি প্রদর্শন করা যায়। এজন্য বলা যায় বার্কলিই বিষয়গত ভাববাদের সমর্থক মূল যুক্তিটির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। অনুভূত বিষয়ের বাস্তবতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বার্কলি বলেছেনঃ অনুভবে যে ধারণা পাই সে ধারণাগুলি আসলে ঈশ্বর-প্রেরিত ধারণা, কাজেই আমাদের অনুভবের বিষয় ব্যক্তিমনসাপেক্ষ নয়। এ সবও বাস্তব পদার্থ। এ উক্তি অনুসরণ করে বিষয়গত ভাববাদীরা বলেনঃ সব কিছুরই অস্তিত্ব মনসাপেক্ষ, তবে বস্তুর অস্তিত্ব আমার তোমার ব্যক্তি চেতনার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে এক অসীম ও সার্বিক চেতনার উপর—পরম চৈতন্যের উপর। এ নির্বিশেষ চৈতন্যকে ব্রহ্ম বলে অভিহিত করা হয়। এজন্য বিষয়গত ভাববাদকে ব্রহ্মবাদ বা ব্রহ্মবাদী ভাববাদও বলা হয়।

আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা করে বিষয়গত ভাববাদীরা বলেনঃ আমাদের জ্ঞানের বিষয় ঈশ্বরের ধারণা মাত্র নয়, এ সবও বাস্তব পদার্থ। তবে যেহেতু সবকিছুই মনসাপেক্ষ, সেজন্য বাস্তব জগতও কোনো অসীম ও নির্বিশেষ মনের, পরম চৈতন্যের, উপর নির্ভরশীল। আমাদের ব্যক্তিচৈতন্যও বিশ্বচৈতন্যের উপর নির্ভর করে। বিষয়গত ভাববাদীরা কাণ্ট্‌কে অনুসরণ করে আরও বলেনঃ লৌকিক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পরসাপেক্ষ, বস্তুজ্ঞান না হলে আত্মজ্ঞানও হতে পারে না। কিন্তু লৌকিক জ্ঞাতা (অহং) এবং জ্ঞাত বস্তু—এ সবই আবার নির্ভর করে অলৌকিক অহং-এর উপর। যেমন বার্কলির ঈশ্বরকে, তেমনিই কাণ্টের অলৌকিক অহংকে, ভিত্তি করেই বিষয়গত ভাববাদীদের "পরম চৈতন্য"-এর ধারণা গড়ে উঠেছে। কিন্তু কাণ্ট্‌ যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বয়ংসৎ বস্তুর কল্পনা করেছেন তার সমালোচনা করে হেগেল্‌ বলেনঃ যেহেতু সবকিছুই চৈতন্যনির্ভর সেহেতু অজ্ঞাত অজ্ঞেয় স্বয়ংসৎ বস্তুর ধারণাও স্ববিরোধী। আর স্বয়ংসৎ বস্তু যদি অজ্ঞেয়ই হবে তাহলে এ বস্তুর যে অস্তিত্ব আছে তাই বা জানব কেমন করে? জ্ঞানসীমার অপর পারে কী আছে তার সম্বন্ধে কিছুই জানা না গেলে, জ্ঞানের যে সীমা আছে, অজ্ঞেয় বলে যে কিছু আছে —তাই বা জানা যায় কেমন করে? পুনরুক্তি করে বলিঃ জ্ঞানের অতিবর্তী বিষয়ের ধারণা স্ববিরোধী —এমন কি পরমাত্মাও ব্যক্তিচৈতন্যের বা জড় জগতের অতিবর্তী কোনো পদার্থ নয়।

ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যায় যে—বিষয়গত ভাববাদীরা যে পরমাত্মার কথা বলেন তার সঙ্গে বার্কলি-কথিত ঈশ্বরের, বা যারা স্রষ্টা ঈশ্বরের কথা বলেন তাদের ঈশ্বরের, গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। বার্কলি-কল্পিত ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তি চেতনার অতিবর্তী—এ ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা, এবং এ

ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিমনে ধারণা সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্রহ্মবাদীদের ব্রহ্ম বা পরম চৈতন্য জগৎ-অতিবর্তী পদার্থ নয়, এবং একে আমাদের স্রষ্টাও বলা যায় না। এ চৈতন্য আমাদের সসীম ব্যক্তি চৈতন্যের মধ্যেই নিহিত আছে, সসীম চৈতন্যের অন্তবর্তী পদার্থ। অর্থাৎ আমাদের খণ্ড খণ্ড চৈতন্য পরম চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি। আমি যখন চিন্তা করি তখন যে আমি কেবল এককভাবে চিন্তা করি তা নয়, আমার চেতনা কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে পরমাত্মার চিন্তাও আত্মপ্রকাশিত হয়। সসীম আমি অসীম আত্মার অভিব্যক্তি। পরমাত্মা হল সীমার মাঝে অসীম।

"সৎ" অর্থ কোনো আত্মার পক্ষে সৎ। কাণ্ট্ বলেন: যার সঙ্গে চৈতন্যের সম্পর্ক নেই তার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কেননা জ্ঞানের আকার প্রকার দিয়েই জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয়। কাণ্টের এ যুক্তিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে হেগেল্ বলেন: এ বস্তুজগৎ যে কেবল কোনো পরম চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত তা নয়, এ জগৎ পরম চৈতন্যেরই বহিঃপ্রকাশ। কাজেই হেগেল্ জড় জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। কিন্তু বলেন যে এ জগতের পরিপূর্ণ সত্ত্ব নেই, স্বতন্ত্র পরমচৈতন্য-নিরপেক্ষ সত্ত্ব নেই। পরমাত্মার বহিঃপ্রকাশ রূপেই এ জগৎ সৎ। আবার কাণ্টের সমালোচনা করে হেগেল্ বলেন: বুদ্ধির আকার প্রকারগুলি কিন্তু মনোগত নয়, এ সবও বস্তুগত ধর্ম। কেননা সব কিছুই ত পরমাত্মার অভিব্যক্তি। কাজেই যে আকারে প্রকারে আমাদের কাছে জগৎ প্রতিভাত হয় সে আকার প্রকারগুলি জ্ঞাত জগতের বাস্তব ধর্ম। কাণ্ট্-কথিত আকার প্রকারগুলি যদি কেবল বুদ্ধিগত ধর্ম হত তাহলে যে বাস্তব জগৎ আমাদের জ্ঞানের কারণ তা (কাণ্টের স্বয়ংসৎ জগৎ) আমাদের বুদ্ধির বিধান (আকার প্রকার) মেনে নেবে কেন? যেমন, "দ্রব্য" একটি বৌদ্ধিক প্রকার—দ্রব্যত্ব যদি বস্তুগত ধর্ম না হত তাহলে কাণ্টের স্বয়ংসৎ বস্তু আমাদের-দ্বারা-আরোপিত বুদ্ধিদত্ত দ্রব্যত্ব মেনে নেবে কেন, দ্রব্য বলে প্রতিভাত হবে কেন?

হেগেল্ যে পরমাত্মার কথা বলেন তা এক অদ্বয় পদার্থ, আত্মজ্ঞানস্বরূপ। এমনকি যাকে জীবাত্মা বলি তাও আত্মজ্ঞানস্বরূপ। এমন নয় যে আত্মা একটা দ্রব্য, এবং জ্ঞান এ দ্রব্যের ধর্ম। আত্মচৈতন্যই আত্মা। তারপর, এ কথাও বলা যায় না যে, চেতনা আছে অথচ আত্মচেতনা নেই। চেতনার চেতনা বা আত্মচেতনাই আত্মার স্বরূপ।

আমরা জানি যে "জ্ঞাতা" ও "জ্ঞেয়" পরস্পরাপেক্ষ শব্দ; জ্ঞাতা ছাড়া যেমন জ্ঞেয়ের কথা বলা যায় না, তেমনই জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতা থাকতে পারে না। জ্ঞাতার অতিরিক্ত কিছু, জ্ঞাতার ইতর বা অপর কিছু, না থাকলে—আত্মার অপর, অনাত্মা না থাকলে—জ্ঞান হতে পারে না। অনাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আত্মা নিজেকে আত্মা বলে চিনতে পারে। এখন, যদি পরমাত্মার অপর কিছু না থাকত তাহলে সে আত্মা আত্মসচেতন বা আত্মজ্ঞানস্বরূপ হতে পারত না। পরমাত্মার "অপর" হল বিশ্বপ্রকৃতি ও ব্যক্তিচৈতন্য। আত্মজ্ঞানের জন্য

পরিপূর্ণতা লাভের জন্য, পরমাত্মা নিজেকে বহিঃপ্রকাশিত করেন অপর কিছু হিসাবে— বহিঃপ্রকাশিত করেন ব্যক্তিমনেতে, বিশ্বপ্রকৃতিতে। এক পরমাত্মা নিজেকে বহুতে বিকশিত করেন। অসীম আত্মা নিজেকে আত্মা বলে জানে প্রকৃতির ভেতর দিয়ে, সসীম আত্মা ও তাদের কৃতির—ইতিহাস, শিল্পকলা, ধর্ম দর্শন—এ সবের মধ্য দিয়ে। আমরা যে বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শনে নিজেদের প্রকাশিত করি তা মূলত পরমাত্মারই বিভিন্ন পর্যায়ের অভিব্যক্তি।

মনে রাখতে হবে পরম চৈতন্যের অভিব্যক্তি—বাহ্যকরণ ও অপরীকরণ—কালিক প্রক্রিয়া নয়। এমন নয় যে, পরম চৈতন্য কোনো এক ক্ষণে নিজেকে আত্মপ্রকাশিত করেছে। যে অভিব্যক্তির কথা বলা হল তা অকালিক বা শাশ্বত অভিব্যক্তি। বহুতে একের প্রকাশ, সসীমে অসীমের প্রকাশ—বহুর মধ্যে এক, সসীমের মধ্যে অসীম —এ শাশ্বত ব্যাপার।

পরমাত্মা কি ক্রমে নিজেকে প্রকাশিত করেন হেগেল তা বিশদভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমরা যদি সঠিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হই তাহলে আমরা বিপরীত ক্রমে পরমাত্মার ধারণায় পৌঁছিতে পারি। ব্যক্তি চেতনার অপর হল বহির্জগৎ। আমাদের সসীম চেতনা ও চেতনা-বিষয়ের যে দ্বৈততা তার থেকে আমাদের যে উত্তরণ হয়—এ কথা না মেনে উপায় নেই। এ উত্তরণ না হলে দ্বৈততা বোধও হত না, সসীমতা বোধ ও অপরতা বোধও হত না। উক্ত দ্বৈততার সমন্বয়কারী আরও ব্যাপকতর, উন্নততর চেতনায় না পৌঁছালে এ সব বোধ হত না। একটা সহজ উদাহরণ। আমাদের ভ্রমপ্রত্যক্ষ হয়, অমূল প্রত্যক্ষ হয়। এখন যে চেতনার ফলে আমি জানি যে আমার প্রত্যক্ষ-চেতনা ভ্রান্ত, সে চেতনা অবশ্যই আরও উন্নততর চেতনা। এ ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের জ্ঞানের-জ্ঞান-এর ভেতর দিয়ে পূর্ববর্তী পর্যায়ের জ্ঞানের অপূর্ণতা উপলব্ধি করতে করতে আমরা পরম চৈতন্য কী তার ধারণা করতে পারি। নিজের খণ্ডিত চৈতন্যের মধ্যে পরম চৈতন্যকে অংশত উপলব্ধি করতে পারি, বুঝতে পারি আমরা পরম চৈতন্যের খণ্ডিত অংশ।

সমগ্র বিশ্বজগৎ একই পরম চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ। কাজেই বলা যায় সব কিছুই চিন্ময়। পরম চৈতন্য জ্ঞান বা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাস্বরূপ। কাজেই হেগেলের মতে: সত্তা আর প্রজ্ঞার মধ্যে মূলত কোনো ভেদ নেই, যাকে সৎ বলি তা পরম চৈতন্যেরই (চিন্ময়) প্রকাশ। এখানে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা বলতে বুঝতে হবে পরম চৈতন্য। যা পরম চৈতন্যের অভিব্যক্তি তাই সৎ, আর যাই সৎ তাই পরম চৈতন্যের অভিব্যক্তি। এক্ষেত্রে পরম চেতনা ও তার বিষয়ের মধ্যে ভেদ নেই।

হেগেলের মতে সমগ্র বিশ্ব একটি সুসংবদ্ধ তন্ত্র। এ তন্ত্রের প্রত্যেক অংশ অন্য অংশের উপর নির্ভরশীল। এ তন্ত্র থেকে পৃথক করে নিয়ে কোনো অংশকে চরম তত্ত্ব মনে করলে ভুল হবে। কেবল জাগতিক বস্তুর নয়, ব্যক্তি চৈতন্যেরও পরম সত্ত্ব নেই। এক অখণ্ড অসীম ও অবশ্যম্ভব চৈতন্যের অংশরূপেই এদের সত্ত্ব।

হেগেলের ভাববাদ এক প্রকারের অদ্বৈতবাদ। যে বিশ্বাসের উপর এ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত তা হল: (ক) আন্তরসম্বন্ধ তত্ত্ব ও (খ) বহুত্বে অভিন্নতা তত্ত্ব। আন্তরসম্বন্ধ তত্ত্ব অনুসারে—সম্বন্ধ হল সম্বন্ধীর একটি উপকরণ। ক ও খ-এর মধ্যে স সম্বন্ধ থাকার ফলে ক-তে ও খ-তে যে ধর্ম বর্তায়, এদের মধ্যে স সম্বন্ধটি না থেকে যদি অন্য কোনো সম্বন্ধ থাকত তাহলে ক ও খ-তে সে ধর্ম বর্তাত না, ক ও খ-এর স্বরূপ অন্য রকম হত। সুতরাং সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোনো পদার্থকে বিচার করলে তার স্বরূপ বিকৃত করা হয়। সুতরাং কোনো পদার্থ যে বিশাল অন্বয় তত্ত্বের অংশ সে তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তাকে কখনই পরিপূর্ণভাবে সৎ বলা যায় না, বলতে হয়: এ পদার্থের আংশিক সত্ত্ব আছে, ঐ পদার্থের অমুক মাত্রার সত্ত্ব আছে। এজন্য হেগেল সত্ত্বের মাত্রাভেদের কথা বলেন। হেগেলীয় ভাববাদীদের আর একটি বিশ্বাস হল: বহুর মধ্যে একত্ব। পরমচৈতন্য বহুধা বিভক্ত হয়ে যে বহুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে সে বহুগুলির মধ্যে একত্ব বর্তমান। বস্তুত আমাদের বহুত্বের ধারণা একত্বের ধারণার, ভিন্নতার ধারণা অভিন্নতার ধারণার উপর নির্ভর করে। এ মতে—এ পদার্থগুলি ভিন্ন না এক? এ প্রশ্ন অসঙ্গত। কেননা এদের মধ্যে একত্ব থাকলেই এরা ভিন্ন বলে গণ্য হতে পারে, আর এদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেই বলা যায় এদের মধ্যে একত্ব আছে। বহুর মধ্যে একত্ব—এ তত্ত্ব হেগেলীয় ভাববাদীদের দর্শনে নানানভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যথা: সসীমের মধ্যে অসীম, বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষ।

পরমচৈতন্য যে আমাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা নয়, বস্তুত সৎ, প্রকৃতপক্ষে চরম সত্ত্ব, তার সমর্থনে বহু বিষয়গত ভাববাদী নিম্নোক্ত যুক্তিটি উত্থাপন করেন।

আমার অহং সীমিত, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ, এবং আমার অস্তিত্ব আপতিক—এ বোধ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমি আমার খণ্ডিত সত্তা ও এর আপতিকতা অতিক্রম করে অতিবর্তী কোনো অহং-এতে পৌঁছেছি। অসীমের এবং অবশ্যম্ভবের ধারণা না থাকলে, এবং সসীম ও আপতিকতার পর্যায় অতিক্রম করে অসীম ও অবশ্যম্ভবের উপলব্ধি করতে না পারলে, নিজেকে সসীম, নিঃসঙ্গ ও আপতিক বলে মনে করতে পারতাম না। যে মুহূর্তে আমার সসীমতা ও আপতিকতার বোধ হয় সে মুহূর্তে, বুঝতে হবে, আমি নিজেকে অতিক্রম করে গেছি, আমি পরমচৈতন্যের উপলব্ধির দিকে এগিয়ে গেছি। কাজেই অসীম পরমচৈতন্যকে আমি আমার সীমিত আত্মার মধ্যেই উপলব্ধি করি।

পরম সত্ত্ব হল পরমাত্মা—এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হেগেল দু জাতীয় মতবাদ খণ্ডন করেছেন:

(1) পরম সত্ত্ব হল নির্গুণ, উদাসীন, কেবল সত্তা, শুদ্ধ সত্তা
—এটা স্পিনোজা ও শেলিং-এর মত।

(2) পরম সত্ত্ব অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, জ্ঞানে যা পাই তা হল পরম সত্ত্বের অবভাস —এটা কাণ্টের মত ॥

প্রথম মতবাদটির বিরুদ্ধে হেগেল্ বলেছেন : শুদ্ধ নির্গুণ সত্ত্ব বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তা মহাশূন্যতা ছাড়া কিছুই নয়। এ রকম "সত্ত্ব"কে অসত্ত্ব বলতেও বাধা নেই। কিন্তু পরম সত্ত্ব নির্গুণ হতে পারে না। এতে অন্তত এ ধর্ম আছে যে এ সত্ত্ব চিন্তিত বা কল্পিত হতে পারে। সুতরাং পরম সত্ত্ব নির্গুণ নয়। কাণ্টের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে হেগেল্ ও তার অনুগামীরা বলেন : কাণ্টের স্বয়ংসৎ বস্তু স্ববিরোধী। কাণ্ট্ মনে করেন যে অনুভবলব্ধ বিষয় অতিক্রম করে স্বয়ংসৎ-এতে বুদ্ধির প্রকার প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু কাণ্ট্ স্বয়ংসৎ বস্তুকে আমাদের অনুভব উপাদানের উৎস (কারণ) মনে করেন। এ ক্ষেত্রে কাণ্ট্ অবশ্যই বুদ্ধির একটি প্রকার, কার্যকারণ, প্রয়োগ করেছেন। কাণ্টের অজ্ঞাত অজ্ঞেয় স্বয়ংসৎ তা হলে আর অজ্ঞাত থাকল কোথায়? এতে অন্তত জ্ঞান-উপাদানের কারণ হওয়া নামক ধর্মটি বর্তমান। সুতরাং হেগেলের সিদ্ধান্ত হল : পরম সত্ত্ব অজ্ঞেয় বা নির্গুণ হতে পারে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

জড় ও জড়বাদ[1]

1. জড়ের স্বরূপ

ইংরাজ দার্শনিক জি. ঈ. মূর বলেন যে দর্শনের যে শাখার নাম 'তত্ত্ববিদ্যা'[2] তার কাজ হল সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা ; অর্থাৎ এই বিশ্বে কি কি বস্তু বা কি কি ধরণের বস্তুই কেবল আছে, তার বিবৃতি দেওয়া। এ দিক থেকে দেখতে গেলে 'জড়বাদ' একটি সুপ্রাচীন এবং প্রচলিত মতবাদ। এই মতের প্রধান কথা হল, এই বিশ্বজগতের অসংখ্য জড়বস্তু, প্রাণ এবং মন আপাতঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হলেও, সবই মূলতঃ জড় ও জড়বস্তুর যান্ত্রিক রকমফের মাত্র। অর্থাৎ কেবলমাত্র জড়কে সৎবস্তু বলে স্বীকার করলেই সমগ্র বিশ্বজগতের পরিপূর্ণ বর্ণনা হয়ে যায়। জড়বস্তুর থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন কোন সৎবস্তু স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এই দার্শনিক মতবাদ প্রসঙ্গে জড়বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় জড়পদার্থ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের মত অনুশীলন করতে হয়। অবশ্য বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যার মধ্যে সমগ্র বিশ্বজগতকে কুক্ষিগত করে না। তবু জড়বাদী দর্শন জড়ের বৈজ্ঞানিক মতবাদ একেবারে উপেক্ষা করতে পারে না।

মানুষের শরীর, পশুপাখী, বৃক্ষলতা, সূর্যচন্দ্র, নদী-মরু-পর্বত, ধূলিকণা ইত্যাদি সকলেই জড়বস্তু। মনুষ্য সৃষ্ট যন্ত্র ও তার ক্রিয়া, জড় এবং যান্ত্রিক। বিভিন্ন জড়পদার্থের মধ্যে সাধারণ ধর্ম 'জড়তা' বা 'জাড্য' কি তাই আলোচ্য ; কেননা ওটা বুঝলেই সব জড়বস্তুকেই বোঝা হয়ে যায়। অসংখ্যের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল বা সাদৃশ্য বের করে তাদের আয়ত্ত করাই বুদ্ধির চেষ্টা। মানুষের চিন্তা যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর আশ্রয় না করে কল্পনাধর্মী ছিল তখনও নানাভাবে এই সাদৃশ্য দেখার চেষ্টা হয়েছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গম্য জড়বস্তুর মূল উপাদান এক হতে বাধ্য, আর যদিও সাধারণ জড় পদার্থের আকার পরিবর্তিত হয়, তবু ঐ উপাদান পরিবর্তিত হয় না।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে এই উপাদান হলো জল, কেউ বা বলেছেন আগুণ, অপর কেউ বলেছেন, বায়ু। অন্য গ্রীক দার্শনিকেরা বিভিন্ন রকমের জড়বস্তুর প্রয়োজনে, জল, তেজ মরুৎ প্রভৃতি সকলকেই উপাদান বলতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, উপনিষদকে আশ্রয় করে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশরূপী পঞ্চভূতকে স্বীকার করেছেন। স্থূল, প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ছাড়াও, এদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অবিভাজ্য, অদৃশ্য অংশও

1. Matter and Materialism 2. অধিবিদ্যা=Metaphysics

এ'রা স্বীকার করেছিলেন আর মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ুর সেই ক্ষুদ্রতম, নিরংশ অংশের নাম দিয়েছিলেন 'পরমাণু'। গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রিটাস্, বৈচিত্র্যের অনুরোধে, অসংখ্য অবিভাজ্য পরমাণু স্বীকার করেছেন ; তবে তাঁর মতে পরমাণুগুলি পরিমাণে ভিন্ন হলেও গুণগতভাবে এক। ভারতীয় মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ুর পরমাণুগুলি গুণগতভাবে ভিন্ন। আগেই বলা হয়েছে যে এই সব মতবাদ কিছুটা কল্পনাভিত্তিক।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা জড়ের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করেছে। সব বৈজ্ঞানিকই মোটামুটিভাবে স্বীকার করেন যে কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল বস্তুই কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকাদ্বারা গঠিত। আগে এই কণিকাগুলিকে পরমাণু বা এ্যাটম বলা হত ; অধুনা এগুলিকে ইলেকট্রণ বলা হয়।

(ক) পরমাণুবাদ[1] **:** রসায়নশাস্ত্রের গবেষণা জড়ের মূল উপাদানকে অনেকটা প্রকট করেছে। খনিজপদার্থ, বৃক্ষলতা, জল, বায়ু ইত্যাদিকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ সব বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি মূল উপাদান বার বার, ঘুরে ঘুরে উপস্থিত হয় ; যথা,—কার্বন, অম্লজান, উদ্‌জান, পারদ প্রভৃতি। এরকম 105টি মূল উপাদান আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এই উপাদানগুলি বিশেষ বিশেষ পরিমাণে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় ও বিভিন্ন যৌগিক খনিজ, ভৌত বা রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন করে। এই বিশেষ পরিমাণে মিশ্রণের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যৌগিক জল উৎপন্ন করবার জন্য দুই অংশ হাইড্রোজেন এক অংশ অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়। মূল উপাদানের এই ব্যবহার ব্যাখ্যা করার জন্য জন্ ডাল্‌টন (1766—1844) পরমাণু-প্রকল্প তৈরী করলেন। মূল উপাদানগুলি যদি অবিভাজ্য অতি ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরী না হত তবে এই উপাদানগুলির বিশেষ পরিমাণে মিশ্রণ সম্ভব হতো না। আজ আমরা জানি যে, হাইড্রোজেন, কার্বন, লোহা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলিকে এবং ইহাদের দুই বা ততোধিকের মিশ্রণে উৎপন্ন জল, কাঠ, মাটি প্রভৃতি যৌগিক পদার্থগুলিকে চূর্ণ করে ভাগ করতে করতে সবই কতকগুলি (বর্তমানে 105টি) বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট পরমাণুতে রূপায়িত হয়। পরমাণু প্রকল্পের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি গুণগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন ও একশত পাঁচ প্রকারের হতে পারে।

(খ) ইলেকট্রণ-প্রকল্প[2] **:** মিলিক্যান, বোর্, প্ল্যাঙ্ক, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানীরা আর এক ধাপ এগিয়ে উপরোক্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ-ধর্ম আবিষ্কার করলেন। এ'দের মতে একটি পরমাণু বিভিন্ন বিদ্যুৎ-কণিকার একটি জটিল সংস্থা ; একটি লোহার পরমাণু ও একটি রূপার পরমাণুর মধ্যে এই মতে কোন গুণগত পার্থক্য নেই ; যে অতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-কণিকা দিয়ে প্রত্যেক পরমাণু গঠিত, তাদের সংখ্যা, গতি আর বিন্যাসের ওপর ঐ পার্থক্য নির্ভর

1. Atomic Theory 2. Electronic Theory

করে। এই পরমাণুগুলির কেন্দ্রে এক বা একাধিক প্রোটন দানা বেঁধে থাকে এবং তার চারদিকে, অনেকটা দূরত্ব রেখে, কেন্দ্রস্থ প্রোটনকণার সমসংখ্যক ইলেকট্রণকণা প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রণ ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-ধর্মী আর প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎ-ধর্মী।

বর্তমানের এই ইলেকট্রণ-প্রকল্প জড়বস্তুকে শক্তিতে রূপায়িত করার দিকে যাচ্ছে। কোন একটি পরমাণুর স্বরূপ, তার অংশীভূত অতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির বিন্যাস, বেগ ও গতির উপর নির্ভর করে। যে শক্তি কেন্দ্রস্থ কণাগুলিকে দানা পাকিয়ে রাখে তা অত্যন্ত প্রচণ্ড। সে তুলনায় যে শক্তি ইলেকট্রণগুলিকে কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরার পথে ধরে রাখে, তা পরিমাণে খুবই কম। শক্তি বা কার্যক্ষমতা ছাড়া পরমাণু নেই। 'পারমাণবিক' পরিবর্তন করতে হলে পরমাণুর কেন্দ্রে পরিবর্তন ঘটাতে হয়—কেন্দ্রস্থ দানাবাঁধা প্রোটনগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে বা তাতে নূতন প্রোটন যোগ করে এই পরিবর্তন ঘটানো হয়; এর ফলে বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণও হয় প্রচণ্ড। এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রস্থ বস্তুর কিছুটা অংশই শক্তিতে রূপায়িত হয়ে যায়। 'রাসায়নিক' পরিবর্তন হল ইলেকট্রণ কণার কক্ষপথে পরিবর্তন ঘটানো—পরমাণুর কেন্দ্রকে তা স্পর্শ করে না। 'রাসায়নিক' পরিবর্তনে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা পারমাণবিক পরিবর্তনের তুলনায় অনেক কম। বর্তমান যুগে একটি পরমাণুকে ভেঙ্গে বা দুটি পরমাণুকে জুড়ে শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে। পারমাণবিক বোমা ফাটলে পারমাণবিক চুল্লীতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা ইউরেনিয়ম প্রভৃতি ভারী বস্তুর পরমাণু ভেঙ্গেই পাওয়া যায়।

বর্তমান শতকে, 1955 খৃষ্টাব্দে, প্রতিবস্তুর (anti-matter) খোঁজ পাওয়া গেছে। আমরা বলেছি যে ইলেকট্রণ ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-ধর্মী আর প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎ-ধর্মী। বস্তুকণার এই ধর্ম বিপরীত হলেই—ইলেকট্রণ ধনাত্মক ও প্রোটন ঋণাত্মক হলেই—প্রতিবস্তু হল। এই প্রতিবস্তু ব্যবহার করে যে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে তা 'রাসায়নিক' বা 'পারমাণবিক' পরিবর্তনের প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। একটি প্রতিবস্তু সমজাতীয় বস্তুর (প্রতিবস্তু নয়) সঙ্গে মিলিত হওয়া মাত্র কখনো কখনো উভয়ের বস্তু-রূপের বিলুপ্তি হয়ে যায়, তাদের 'বস্তুত্ব' লোপ পায় ও উভয়েই সামগ্রিক ভাবে শক্তিতে রূপায়িত হয়।

কণিকা না শক্তি, স্থূল বস্তু না বিদ্যুৎ-তরঙ্গ, এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করা বিজ্ঞানের যেন দায় হয়ে উঠেছে। আলোকরশ্মি ও ইলেকট্রণ উভয়কেই কোন অবস্থায় তরঙ্গ বা শক্তি আর অন্য কোন অবস্থায় কণিকা বলে মনে হতে পারে। তাই একজন পদার্থবিদ্ বলেছেন যে সোম, বুধ ও শুক্রবারে আমরা কণিকাবাদে বিশ্বাস করি; মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে তরঙ্গ বা শক্তিবাদে; আর রবিবারে বোধ হয় কিছুই বিশ্বাস করা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রকল্পগুলি তাই শেষ মীমাংসা কিছু করতে পারে নি—গবেষণা চলছে।

2. জড়ের নির্জড়ীকরণ

উপরের আলোচনা থেকে মনে হয় বর্তমান বিজ্ঞান যেন আগেকার জড় সম্পর্কে মতবাদের বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী দর্শন জড়ের অচেতন, নিশ্চেষ্ট কণিকারূপী শরীরে বিশ্বাস করত, আর মনে করত যে এদেরই মিলনে বা সংঘর্ষে সর্ববস্তুর উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয়। এই নিশ্চেষ্ট কণিকা বর্তমান গবেষণার ফলে ক্রমশঃই যেন শক্তিতে রূপায়িত হয়ে যাচ্ছে, আর এই প্রক্রিয়ায় জড় যেন তার পূর্বের রূপ পালটিয়ে নির্জড় হয়ে যাচ্ছে—স্থূল বস্তু নির্বস্তুতে, শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বর্তমান শতকের গবেষণার ফল তাই "জড়ের নির্জড়ীকরণ" বলে আখ্যাত হয়েছে।

আগে মনে করা হত যে নিশ্চেষ্ট জড়কণিকাগুলির গতি পরিবর্তন পরস্পরের সংঘাত, ও বাইরের থেকে আঘাত প্রত্যাঘাতের ফলেই হয়। নিউটন বল্লেন যে সংঘাত ছাড়াও মাধ্যাকর্ষণ কণিকাদের গতির কারণ হতে পারে। পরন্তু পরমাণুর স্বরূপ যদি ইলেকট্রণ কণার সংখ্যা, বিন্যাস ও গতির উপরে নির্ভর করে তবে ঐ স্বরূপ কোন একটি অবিভাজ্য মুহূর্তে থাকবে না; ঐ স্বরূপ লাভ করতে হলে তার খানিকটা নিরবচ্ছিন্ন কালের প্রয়োজন হবে। প্রাণ ও মননের স্বরূপও খানিকটা কালধারায় সাধিত হয়, এক অবিভাজ্য ক্ষণে থাকতে পারে না। তাই মনে হয় যে জড় ও চেতনকে ভিন্ন বলে মানতে হলেও তারা স্বরূপতঃ অনেকটা সমজাতীয় হয়ে পড়েছে। অন্ততঃ দার্শনিক দেকার্ত তাদের যতটা বিপরীত কল্পনা করেছিলেন ততটা বৈপরীত্য আর স্বীকার করা যাচ্ছে না। আগে জড় কণিকার গতিকে বাইরের থেকে আগত মনে করা হত; এখন গতি জড়ের স্বরূপে, প্রাণকেন্দ্রে বাসা বেঁধেছে। লর্ড বাফুর (Lord Balfour) বলেছেন যে 'জড় সম্বন্ধে আমরা এত বেশী জেনেছি যে আমরা জড়বাদী হতে পারি নে'। এডিংটন্, জীন্‌স্ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকের মতটি বর্তমান বিজ্ঞানের পরিপন্থী নাও হতে পারে।

আমরা অবশ্য দেখেছি যে বর্তমান গবেষণা এখনও জড়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মীমাংসা করে উঠতে পারে নি। তাই 'আমার মতই বিজ্ঞান সমর্থন করে' মনে করে জড়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী কোন দার্শনিকেরই উল্লসিত হবার কারণ নেই। তবে জড় সম্বন্ধে আমাদের যতটা জ্ঞান বা অজ্ঞানতা থাকুক না কেন, এটা ঠিক যে পূর্বের নিশ্চেষ্ট, অচেতন জড় কণিকা একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে; অন্ততঃ স্থূল কণিকা ও তার কার্যক্ষমতার মধ্যে আর বিশেষ পার্থক্য করা যাচ্ছে না।

3. জড়বাদ

জড়বাদী বিশ্বদর্শনের মূল কথা হল জড় বা জড়বস্তুরই কোন রকমফের হল একমাত্র সংবস্তু। প্রত্যক্ষগম্য কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তু ও তাদের বিশ্লেষণে যে অপ্রত্যক্ষ পরমাণুপুঞ্জ পাওয়া যায়, তারা ছাড়া আর কোন সংবস্তু নেই।

পরমাণুগুলি অসংখ্য ও নিত্য ; এদের মিলনে ও সংঘাতে অন্য সর্ববস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। প্রাণ ও মন জড়েরই এক বিশেষ রূপ। আপাতঃদৃষ্টিতে জড় থেকে এরা গুণগতভাবে ভিন্ন বলে মনে হলেও, সুস্থ বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এদের জড়াশ্রয়ী বা জড়রূপী বলে প্রতীয়মান হয়। প্রাণ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে ভৌতিক দেহকে আশ্রয় করেই থাকে, আর দেহাতিরিক্ত কোন প্রাণীন পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। অনুরূপভাবে মননও ভৌতিক স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। ভারতীয় জড়বাদী চার্বাকগণও দেহাত্মবাদী। চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই এ'দের মতে আত্মা বা মন। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি ভৌতিক পদার্থের সংমিশ্রণে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়—যদিও চৈতন্য এর কোন একটি উপাদানে থাকে না। অনুরূপভাবে পান, চূন ও সুপারীর সংমিশ্রণে রক্তরাগ দেখা যায় যদিও তা ঐ উপাদানগুলিতে নেই।

জড়বাদী মতে জগতের উৎপত্তিতে অনাদি ও সর্ব প্রথম স্তর হলো জ্যোতিষ্কলোকের ধূলিপটল, নিত্য জড় পরমাণু ও তাদের অন্ধ গতি। পরে যুগ যুগ ধরে ক্রমবিকাশের ফলে ঐ জড়বস্তু প্রাণীদেহ সৃষ্টি করেছে এবং সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে মনন ও মানসিকতাকেও সম্ভব করেছে। জড়, প্রাণ ও মনের মধ্যে কোন গুণগত ভেদ নেই ; এরা একই ভৌতিক জড়পদার্থের স্থূল বা সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র। প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের কোথাও কোন ছেদ নেই—সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি জড়েরই এক নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। তাই একমাত্র জড়কেই সৎ বলে মানলে সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা হয়ে যায়।

জড়বাদীদের আরও বক্তব্য হল যে জড়কণাগুলির গতি, মিলন, বিকাশ ও সংঘাত কেবলমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জড় থেকে প্রাণ ও মনের বিকাশ কারও উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য কারণতা[1] স্বীকার না করে যান্ত্রিক কারণতা[2] স্বীকার করাই বিজ্ঞানসম্মত। অর্থাৎ আদিমতম স্তরের জড়বস্তু অন্ধ ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে নিজে নিজেই প্রাণস্তর ও মানসস্তরের বিকাশ করেছে। চলমান যন্ত্রের মধ্যে যখন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তখন ঐ ক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা অপরিবর্তনীয় একরূপতা দেখা যায় এবং প্রত্যেকটি ক্রিয়া তার পূর্ববর্তী ক্রিয়া বা সংঘাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যান্ত্রিক কারণতায় কারণ কার্যের নিয়ত পূর্বগামী, ও কার্য কারণের নিয়ত অনুগামী ; কোনও ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমান কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় না। ঘড়ির কাঁটা সময় দেখাবার উদ্দেশ্যে ঘুরছে বলা অবৈজ্ঞানিক, ভৌতিক ঘড়ির এমন কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। বরং যন্ত্রাংশের পূর্ববর্তী গতিই ঐ কাঁটা ঘোরাচ্ছে বলাই ঠিক। যান্ত্রিক ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যাখ্যা থেকে বেশী স্পষ্ট, সরল, প্রামাণ্য, বৈজ্ঞানিক ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা। জড়বাদে তাই যান্ত্রিক কারণতারই প্রাধান্য। জড়বাদ সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে একটা বিরাট যন্ত্র বলে কল্পনা করে। এই মতে ঐ যন্ত্র তার অংশগুলির অন্ধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম ও মানসিক বস্তুরাজির উৎপত্তি সম্ভব করেছে।

---

1. teleological causation 2. mechanical causation

একটা ভৌতিক শক্তি, উত্তাপ, যেমন অন্য ভৌতিকশক্তি, আলোকে রূপান্তরিত হতে পারে তেমনি জড়শক্তি, জীব বা মানসশক্তিতে রূপায়িত হতে পারে। জীব বা মানসশক্তি জড় থেকে ভিন্ন নয়; জড়েরই আরও সূক্ষ্ম, জটিল, উন্নততর স্তর মাত্র। জাগতিক ক্রমবিকাশে সম্পূর্ণ নূতন কিছুর প্রকাশ নেই; আদিমতম জড়স্তরেরই জটিলতর পুনরাবর্তন হয় মাত্র। যান্ত্রিক কারণতার লৌহশৃঙ্খলে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি বাঁধা রয়েছে। জীবনক্রিয়া তার পূর্ববর্তী ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়ার মিলনে উৎপন্ন হয় আর চেতনক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যদি মনে হয় যে চেতনক্রিয়া স্নায়বিক ক্রিয়া থেকে ভিন্ন, তবে জড়বাদী বলবেন যে চৈতন্য মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা বিচ্ছুরিত একটা প্রতিবিম্ব বা উপাবভাস[1]। এর অর্থ হল চৈতন্য মস্তিষ্কক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটা ফাল্‌তু জিনিষ; সে কখনই মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। বর্তমানে ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্ববিদেরা মানসক্রিয়া ও শারীরক্রিয়ার মধ্যে ঐক্য সাধন করেছেন বলে দাবী করে থাকেন। এই মতে 'শব্দচেতনা' অর্থ হল বহিঃস্থ কোন উত্তেজকের প্রতি শরীরের এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া বা ব্যবহার মাত্র। ব্যবহারবাদ[2] তাই মনকে অস্বীকার করে এক চরম জড়বাদের সমর্থক হয়ে পড়ে। এখন মানসিক ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় যদি পূর্বগামী স্নায়বিক প্রক্রিয়াদ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কথার কথা মাত্র। যে কাজ আমরা স্বেচ্ছায় করি বলে মনে হয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তা কিন্তু আমরা করতে বাধ্য; অর্থাৎ পূর্ববর্তী অবস্থার দ্বারা আমাদের কর্ম সব সময়ই নিয়ন্ত্রিত। তাই স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ মূর্খতার নামান্তর মাত্র।

জড়বাদীদের উপরোক্ত যুক্তি যদি ঠিক হয় তবে তাদের বিশ্বদর্শনে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক বা কোন অধ্যাত্ম-আদর্শের স্থান থাকতে পারে না। বিদেহী আত্মা বা পরমাত্মা স্বীকার করা এই মতে অযৌক্তিক। ভৌতিক জড়জগতের কোন কিছুই আত্মশক্তি বা পরমাত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। পরলোক, ঈশ্বর বা বিদেহী আত্মা অপ্রত্যক্ষ, অতএব অবস্তু। আত্মা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ; দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ হয়ে যায়। বিদেহী আত্মা মৃত্যুর পর মর দেহ ত্যাগ করে পরলোকে যায়, এমন কথা অতিকথন। নৈতিক সততার পরাকাষ্ঠা লাভ করবার জন্য বা ঈশ্বর সান্নিধ্যের জন্য যদি আমরা ব্যগ্র হই তবে তা ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার সামিল। নৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ বাস্তব নয়—প্রত্যক্ষ-গম্যও নয়। প্রত্যক্ষগম্য জগত ও ভৌতিক বস্তুনিচয় ছাড়া আর সব কিছুই যদি বৈজ্ঞানিক মতে অসার হয়, তবে ইহজগতেই যতটা সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হওয়াই বুদ্ধিমান মানুষের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। জড়বাদ তাই ভোগসুখবাদে[3] পর্যবসিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন যুক্তি নেই আর যাও বা আছে তা পঙ্গু যুক্তি। নৈতিক সততা ও কর্তব্যবোধ নিছক প্রবঞ্চনা আর ধর্মনিষ্ঠা একটা পাগলামী মাত্র।

1. উপাবভাস=epi-phenomenon 2. Behaviourism 3. Hedonism

4. জড়বাদের সমালোচনা

জড়বাদ সমগ্র প্রকৃতিকে নিশ্চেষ্ট জড়কণিকা ও তাদের অন্ধ, যান্ত্রিক গতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়; এমনকি প্রাণ ও মনকে জড়েরই রূপান্তর বলে মনে করে। এই মত বর্তমান শতকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। জড় ও যান্ত্রিকতা ভৌতিক জগতের ব্যাখ্যায় যথাযোগ্য সূত্র হলেও, প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যায় একেবারেই অক্ষম। জড়বাদের দোষ হল জগতের একাংশ ব্যাখ্যায় যা সুপ্রযুক্ত, তাকে সমস্ত প্রকৃতির ব্যাখ্যায় জবরদস্তি নিয়োগ করা; এতে করে ভৌতিক বস্তু থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন পদার্থের অপব্যাখ্যা হয়। জড় যান্ত্রিকতা অবশ্যই মিথ্যা নয়, কিন্তু সমগ্রের ব্যাখ্যায় তা পর্যাপ্তও নয়। অধিকাংশ বিশ্বদর্শনই এইভাবে অংশতঃ সত্য হলেও যথোচিত গ্রহণযোগ্য হয় না। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ কথা স্পষ্ট হবে যে জীবশক্তি জড়দেহাশ্রিত হয়েও ঐ দেহস্থ ভৌতরাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন শক্তি। তাই ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে নূতনের আবির্ভাব মানতেই হয়; যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের সংযোগে যে ঐক্য সাধিত হয় তা একান্তই বহিরাগত; স্বতন্ত্র অংশগুলির বহিঃস্থ মিলন। প্রাণীন পদার্থের বিভিন্ন অংশ কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে বেরিয়ে, পরস্পরের ধারক হয়ে এক অখণ্ড ঐক্য সাধন করে। মন বা মানসিকতার ঐক্য আরও বেশী নিবিড়; একটি মানসিক ধারণার মধ্যে পূর্বলব্ধ জ্ঞানগুলি অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে। প্রাণ ও মনের ঐক্যকে কখনই স্বতন্ত্র অংশের সংযোগ বিভাগের ফল বলা যায় না। তাই প্রাণ ও মনের যান্ত্রিক ঐক্য স্বীকার করা অযৌক্তিক। পরে দেখা যাবে যে মনকে মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্ষরণ বা উপাবভাস বলা নেহাতই গা-জোরি কথা।

জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা পদার্থবিজ্ঞানই অধুনা জড়বাদের বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দিতে যে পদার্থবিজ্ঞানের ওপর জড়বাদ নির্ভর করে ছিল, বর্তমান শতকে সেই ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে গেছে। ইলেকট্রণ প্রকল্পের জন্য প্রাচীন, নিশ্চেষ্ট জড়কণিকায় আস্থা আর রাখা যাচ্ছে না—প্রতি-বস্তু বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করছে। একটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রণগুলো যান্ত্রিক নিয়মে প্রোটনের চারপাশে ঘোরে না—তাদের চলাচল নাকি এলোমেলো, মুক্ত। বলবিদ্যার[1] সমস্ত যান্ত্রিক নিয়ম জানা থাকা সত্ত্বেও, কোনো এক মুহূর্তে ইলেকট্রণের গতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা নাকি সম্ভব নয় (হাইসেনবার্গের প্রকল্প)। আমরা অগেই বলছি যে বর্তমানের গবেষণা জড়শক্তিকে প্রাণ ও মননশক্তির সমজাতীয় ভাবতে বাধা দেয় না। নিশ্চেষ্ট, অচেতন জড়কণিকা ও তাদের যান্ত্রিক সংঘর্ষের একাধিপত্য ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষগম্য ভৌতিক পদার্থই একমাত্র বাস্তব সংবস্তু, জড়বাদীর একথা ঠিক হলে জড়বাদীরাই বা অপ্রত্যক্ষ পরমাণু ও তাদের সংযোগ-বিভাগ স্বীকার করেন কি করে? জড়বাদী বলতে পারেন যে পরমাণু অপ্রত্যক্ষ হলেও তাদের

1. Mechanic

সম্মিলিত কার্যাবলীর ফল—ভৌতিক পদার্থ—তো প্রত্যক্ষ। পরন্তু পরমাণু ও ভৌতরাসায়নিক পদার্থের মধ্যে গুণগত মিল রয়েছে। কিন্তু প্রাণ ও মনকে অভৌতিক মেনে নিয়েও বহু দার্শনিক ভৌতিক পরিবেশের ওপর এদের প্রভাব স্বীকার করেছেন। অনেকে বলেন্ যে অপ্রত্যক্ষ আত্মার প্রকল্প, ঐ প্রকল্প থেকে নিঃসৃত নৈসর্গিক পদার্থের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে। অন্ততঃ প্রাণ ও মনের অস্তিত্বে যে অপরাপর যুক্তি রয়েছে তা বিচার না করেই, কেবল অপ্রত্যক্ষ বলে, তাদের নির্বিচারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরন্তু বহু সংশয়বাদী দার্শনিক প্রত্যক্ষকে সত্তার একমাত্র নিরিখ বলে মানেন না। রাসেল্ বলেছেন যে "আমি যে একটা চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা কাগজে কলম দিয়ে লিখছি" এই পরিষ্কার প্রত্যক্ষগম্য বিষয়টিকে যুক্তিযুক্তভাবে সন্দেহ করা যায়।

জ্ঞানের দিক থেকে জ্ঞাতা আত্মাকেই প্রাথমিক তত্ত্ব বলে স্বীকার করে অন্য সব জ্ঞেয় পদার্থকে তাতে আশ্রিত বলে মানতে হয়। জ্ঞানের সম্ভাবনা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য স্বীকার করতে বাধ্য। জ্ঞান যদি মস্তিষ্কে রাসায়নিক ক্ষরণ মাত্র হতো তবে তা কখনও 'সত্য' হতে পারত না। কোনো রাসায়নিক পদার্থ সৎবস্তু হতে পারে; কিন্তু 'সত্যতা' কেবল মানসিক জ্ঞানেরই ধর্ম, যখন ঐ জ্ঞান কোনো সৎবস্তুকে নির্দেশ করে। তাই প্রাণ ও মনকে জড় ও যান্ত্রিকতায় পর্য্যবসান করা যায় না। জ্ঞাতার চৈতন্য বৃত্তিই জড় ও যান্ত্রিকতার সত্তা প্রমাণ করতে পারে। জ্ঞাতা জড়কে অতিক্রম করে যায়।

প্রত্যেক বিজ্ঞান জগতের একাংশের উপর গবেষণা করে। তাই কোনো সতর্ক বিজ্ঞানী নৈতিক মূল্য বা পুরুষার্থকে কখনও নস্যাৎ করেন না। এঁদের মতে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শগুলি তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় যুক্তিতেই সমর্থিত হবার যোগ্য— পদার্থবিদ্যা বিশেষ এক বিভাগের বিদ্যা বলে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

উপরোক্ত সমালোচনার প্রভাবে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর স্থূল জড়বাদ, অধুনা "নিসর্গবাদ"[1] রূপে সমর্থিত হতে চাইছে। গ্রীক দার্শনিক লিউসিপ্পাস্ ও ডিমক্রিটাস্, রোমান কবি লুক্রেশিয়াস্ বা ভারতীয় চার্বাকগণ যে ধরণের জড়বাদ মানতেন তার বেশ খানিকটা পরিবর্তন হতে চলেছে। আধুনিক 'নিসর্গবাদ' স্থূল জড়কণিকার সংঘাতের উপরে জোর না দিয়ে, জড়-শক্তি, গতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলারই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নিসর্গবাদীরা জড়কে শক্তিরূপে দেখতে চাইলেও, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে কিন্তু যান্ত্রিক বলেই ভাবেন। তাই নিসর্গবাদের সঙ্গে জড়বাদের বিশেষ পার্থক্য নেই।

প্রিংগল্ প্যাটিসন্ প্রমুখ কোন কোন দার্শনিক অবশ্য নিম্নতর এবং উচ্চতর নিসর্গবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।* নিম্নতর নিসর্গবাদ জড়বাদেরই আধুনিক রূপ—প্রাণ ও মনকে এই মত যান্ত্রিক প্রাকৃত নিয়মের প্রভাবে জড়শক্তির রূপান্তর বলে ভাবেন। তাই নিসর্গবাদের সঙ্গে জড়বাদের বিশেষ পার্থক্য নেই।

1. Naturalism

* Idea of God, Gifford Lecture, 1912 First Series, Lecture V.

উচ্চতর নিসর্গবাদ অবশ্য জড়, প্রাণ ও মনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেও, প্রকৃতির ক্রমবিকাশে কোন ছেদ মানে না—প্রাথমিক জড়বস্তুর থেকেই সর্বকিছু এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উদ্ভূত বলে ব্যাখ্যা করতে চায়। এই উচ্চতর নিসর্গবাদ কিন্তু জড়বাদের মূল বক্তব্যের বিরোধী হয়ে পড়ে। এখন প্রাণের স্বরূপালোচনায় এই বিষয়টির ওপর আরও বেশী আলোকপাত করা যাবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাণ ও প্রাণবাদ[1]

জীব বা প্রাণীদেহের স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকদের মধ্যে দুটি বিপরীত মতবাদ প্রচলিত আছে—যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ। পূর্বের অধ্যায়ে জড়বাদ সমর্থিত যন্ত্রবাদের কথা বলা হয়েছে। এই মতে প্রাণীন পদার্থ একটি ভৌতরাসায়নিক জটিল যন্ত্রমাত্র। জড়-উপাদান ও যান্ত্রিক কারণতার সাহায্যেই প্রাণের পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়ে যায়। নিষ্প্রাণ ভৌতিক পদার্থের সঙ্গে প্রাণের মাত্রাগত ভেদ থাকলেও গুণগত পার্থক্য নেই। অপর পক্ষে প্রাণবাদ এদের গুণগত বৈজাত্য স্বীকার করে; এইমতে প্রাণকে জড় ও যান্ত্রিকতায় নিঃশেষে পর্যবসিত করা যায় না। প্রাণের ব্যাখ্যায় ভৌতরাসায়নিক যন্ত্রাতিরিক্ত কোন নূতন জৈবতত্ত্বের অবতারণা করতে হয়। প্রাণ সর্বক্ষেত্রে জড়দেহাশ্রিত হলেও, সব জড়বস্তুই প্রাণবান নয়। যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণীদেহের কিছু সাদৃশ্য থাকলেও, এদের বৈজাত্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। তাই প্রথমেই নিষ্প্রাণ যন্ত্র ও প্রাণবান দেহের মধ্যে পার্থক্যটা বিশদভাবে বুঝে নিতে হবে।

1. যন্ত্র ও প্রাণীদেহ

মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্র ও প্রাকৃতিক প্রাণীদেহের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকায় এদের তুলনা করা সম্ভব হয়েছে। যন্ত্র যেমন কতকগুলি অংশের সমষ্টি তেমনি জটিল প্রাণীদেহ কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েই গঠিত হয়। কারিগর যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এমনভাবেই সন্নিবিষ্ট করে যে, তাদের যৌথ কার্যকলাপে কারিগরের কাম্য কোন উদ্দেশ্য আপনাআপনি সাধিত হয়; যেমন ঘড়ি সময় নির্দেশ করে। একই প্রাণীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য সাধন করে। যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ অংশগুলি যেমন নিছক ভৌতরাসায়নিক তেমনি জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও ভৌতরাসায়নিক; অন্ততঃ অন্যরকমের কোন পদার্থ জীবদেহে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কার্বন, অম্লজান, উদ্‌জান ও নাইট্রোজেন দিয়েই জীবকোষ গঠিত হয়।

উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যন্ত্র ও জীবদেহের বৈসাদৃশ্য এতই প্রকট যে, প্রাণের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ঐ পার্থক্য বিচারেই ধরা পড়ে। যন্ত্রের মধ্যে অংশগুলির সমাবেশ কৃত্রিম; পূর্বে অসংযুক্ত অবয়বগুলির সংযোগে এখানে এক ঐক্য সাধিত হয়ে থাকে। প্রাণীদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকলাপ একটি মূল বীজ বা জননকোষ থেকে উদ্‌গত হয়; কাণ্ড,

1. Life and Vitalism.

শাখা, পত্র, পুষ্প একই বীজের পরিণতি। এই অঙ্গগুলি আবার কখনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না; বীজগত ঐক্য তাদের পশ্চাৎপট বলে তারা পরস্পরের সহযোগিতায় এক অখণ্ড ঐক্যের ধারক হয়। বীজগত ঐক্য সরল—পরিণত তদুৎপন্ন ঐক্য জটিল; জীবন না গেলে এই ঐক্যের হানি হতে পারে না। যন্ত্রগত ঐক্য অনেকটা শিথিল, প্রাণীদেহের মতো দৃঢ়পিনদ্ধ নয়।

যন্ত্রের অবয়বগুলি অবয়বী ছাড়াও থাকতে পারে বলে এদের মধ্যে সম্পর্কটি নিতান্তই বাহ্য। ঘড়ির অংশগুলি আগে পৃথক পৃথক ভাবে তৈরী হয়; পরে তাদের সংযোগে সমগ্রটি উৎপন্ন হয়। কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ রয়েছে ততক্ষণ জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কখনও থাকে না; তাই তাদের মধ্যে বাহ্য সংযোগ সম্বন্ধের প্রশ্নই ওঠে না। এর অর্থ হল যন্ত্রের অঙ্গসংস্থান প্রাণীদেহের অঙ্গসমাবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিজাতীয়।

যান্ত্রিক ঐক্য অনেকটা শিথিল বলে ঘড়ির কোন অংশ খুলে নিয়ে নূতন কোন অনুরূপ অংশ বসানো যায়; কিন্তু জীবদেহের থেকে কোন অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করলে ঐ অঙ্গের প্রাণস্পন্দন লুপ্ত হয়। আধুনিক শল্যবিদ্যা একের বিচ্ছিন্ন অক্ষিপটল বা মূত্রগ্রন্থি অপরের শরীরে জোড়া দিতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু বিচ্ছিন্ন হবার পর প্রাণস্পন্দন লোপ পেলে ঐ অঙ্গে কোন কাজ হয় না। পরন্তু প্রাণীদেহে এইরকমের জোড়াতালি সবসময়েই সফল হয় না।

প্রাণীদেহের ঐক্য নিজে নিজেই ভেতর থেকে উপচিত ও সংবর্ধিত হয়ে থাকে—যন্ত্রের মতো অবয়বগুলির বাইরের যোগাযোগে উৎপন্ন হয় না। প্রাণীর ঐক্য অবয়বনিরপেক্ষ নয়, আর অবয়বও অবয়বী ছেড়ে থাকতে পারে না। এই ঐক্য স্বয়ং সংবর্ধিত, স্বয়ং সংরক্ষিত যা যন্ত্রের পরাশ্রয়ী ঐক্যের থেকে সম্পূর্ণ বিজাতীয়।

যন্ত্র বাইরের থেকে যন্ত্রীর দ্বারা চালিত হয়। এর নিজস্ব কোন লক্ষ্য নেই; যন্ত্র কেবল যন্ত্রীর উদ্দেশ্য সাধন করে। সময় দেখাবার জন্যেই কাঁটা ঘোরে না, যান্ত্রিক কারণতাবলে পূর্বগামী গতিই ঘড়ির কাঁটাকে ঘোরায়। জীবদেহ কিন্তু নিজশক্তিতেই নিজের কল্যাণরূপ উদ্দেশ্য সাধন করে। কোন অঙ্গ কেটে বা ছড়ে গেলে জীবদেহ নিজে নিজেই তা সারিয়ে নেয়; খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের কাজ অন্য অঙ্গ পুষিয়ে নেয়। যন্ত্রের অঙ্গ বিকল হলে যন্ত্র নিজেই তার সুরাহা করতে পারে না।

যন্ত্রের ক্রিয়াও স্ব-সংরক্ষণ বা স্ব-সংবর্ধনের পক্ষে উপযোগী নয়। কাজ করতে করতে কালক্রমে ক্ষয় পেয়ে নষ্ট হওয়াই যন্ত্রের নিয়তি। জীব কিন্তু খাদ্যগ্রহণ ও জীর্ণ করে আপনিই বৃদ্ধি পেতে পারে। যন্ত্র বংশবৃদ্ধি করতে পারে না—প্রাণীদেহের কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা রয়েছে। প্রাণী এই কারণে স্বজাতির সংরক্ষণ করতে পারে। এর থেকে বোঝা যায় যে জীবদেহের স্বতঃসংবর্ধিত উদ্দেশ্য হল আত্মসংরক্ষণ ও স্বজাতি সংবর্ধন। বর্তমানে শোনা যায় যে গণকযন্ত্র চালিত যন্ত্রমানব (রবোট) তৈরী হচ্ছে। এই যন্ত্রমানবের ক্রিয়া কিন্তু সাবলীল

নয়, তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, তার প্রজনন ক্ষমতা নেই এবং তার গতিবিধি একরূপ ও অপরিবর্তনীয়। যন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত রবোটে আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন আভাস দেখা যায় না।

যন্ত্রচালনার নিয়ম ও যন্ত্রের অঙ্গসংস্থান জানা থাকলে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে যন্ত্রের ক্রিয়া আগে থাকতে বলে দেওয়া যায়; এর কারণ এই যে যান্ত্রিক কারণতা অপরিবর্তনীয় থাকে। একটি জীবন্ত ভোমরার কার্যকলাপ কিন্তু আন্তরপ্রেরণায় নানারূপ গ্রহণ করে; নিজের কল্যাণসাধনই এর উদ্দেশ্য। এই প্রতিক্রিয়াগুলি কি রকমের হবে তা আগে থাকতে বলা যায় না বলে এখানে উদ্দেশ্য-কারণতাই একমাত্র ব্যাখ্যা বলে মনে হয়।

2. যন্ত্রবাদের[1] পরীক্ষা

প্রাণসম্পর্কে যন্ত্রবাদের মূল বক্তব্য পূর্বেই উপস্থিত করা হয়েছে (পৃঃ 242)। এ মতের পক্ষে প্রধান যুক্তি হল এই যে, যান্ত্রিক কারণতা অবলম্বন করে যদি প্রাণীদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপ ব্যাখ্যা করা যায় তবে ঐ জৈবক্রিয়া সহজ ও সুখবোধ্য হয়ে ওঠে। জড়জগতে যান্ত্রিক কারণতার অপ্রতিহত রাজত্ব আর ঐ কারণতা, পরীক্ষণের দ্বারা, পদার্থবিদ ও রাসায়নিকেরা প্রমাণ করেছেন। ভৌতরাসায়নিক বিজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তাদের ব্যাখ্যাসূত্রই গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

বর্তমানে বহু জৈবক্রিয়া যান্ত্রিক বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। জীবশরীরের রক্তচলাচল বা পরিপাকক্রিয়া একান্তই যান্ত্রিক বলে মনে হয়। আমিষ বা নিরামিষ, যে প্রকার খাদ্যই হোক না কেন, তা জীর্ণ করতে জীবদেহ যে জটিল নিয়ম অবলম্বন করে তা সর্বত্রই একরূপ—চীনা, জাপানী, ইংরাজ, ভারতীয় ভেদে তা ভিন্ন হয় না। রক্তসংবহনও অপরিবর্তনীয় ভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়;—ঐ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না বলে ওটাও যান্ত্রিক নিয়ম।

জীববিদ্যা হয়তো এখনও পর্যন্ত সমস্ত প্রাণক্রিয়াকেই যান্ত্রিক বলে ব্যাখ্যা করতে পারে নি; কিন্তু ভবিষ্যতেও পারবে না, তাই বা কি ভাবে বলা যায়? অন্ততঃ জীবদেহকে এক জটিল যন্ত্র বলে ধরে নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেলে হয়তো ভবিষ্যতে জীববিদ্যার সাফল্য কীর্তিত হবে।

জীবন কিছু রহস্যজনক পদার্থ নয়; ভৌতরাসায়নিক যন্ত্রের সঙ্গে তার পূর্ণ বৈজাত্য স্বীকার করলে জীবনরহস্য কোন দিনই নিরাকৃত হবে না। প্রাণবাদীরা জীবনের ব্যাখ্যায় যে 'প্রাণতত্ত্ব' টেনে এনেছেন তা ভৌতরাসায়নিক নয়; কিন্তু সেই অপ্রত্যক্ষ পদার্থটি যে কি বস্তু তার কোন হদিস তাঁরা আজ পর্যন্ত দিতে পারেন নি। প্রাণবাদীদের প্রকল্প তাই জীবনকে এক দুর্ভেদ্য রহস্যে পরিণত করেছে। একমাত্র যন্ত্রবাদ অবলম্বন করেই হয়তো আমরা সফল হতে পারি।

উপরোক্ত যুক্তিগুলির মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। স্থূল প্রাণবাদীদের কল্পিত

1. Mechanism.

'প্রাণতত্ত্ব' বাস্তবিকই এক রহস্য ; ভৌতিক না হয়েও ঐ অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব যে কি করে জীবশরীরস্থ ভৌতরাসায়নিক অঙ্গের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা বোঝা যায় না। কিন্তু আজ পর্যন্ত জীববিদ্যা জীবদেহকে জড় ও যান্ত্রিকতায় পর্যবসান করতে পারে নি। যন্ত্র ও প্রাণের তুলনামূলক আলোচনায় তাদের যে বিজাতীয়ত্ব আমরা দেখেছি, তাতে জড় ও প্রাণের বৈষম্য প্রকৃতিগতই মনে হয় (পৃঃ 243)। নব্য-প্রাণবাদ ঐ গুণগত বৈষম্যের ভিত্তিতেই প্রাণীদেহকে যন্ত্র বলতে নারাজ।

জীবদেহের পেশীসংবর্ধন, রক্তসংবহন, পরিপাকক্রিয়া ইত্যাদি আলাদা আলাদা ভাবে যান্ত্রিক কারণতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেলেও, ঐ দেহগত ঐক্যেরও ব্যাখ্যা যে যান্ত্রিক হবে এমন বলা যায় না। বিজ্ঞানীরা যখন যথাযথ ব্যাখ্যা পান না, তখন কাজ চালাবার জন্য একটা দুর্বল প্রকল্প ধরে নিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু এসব প্রকল্প অনেক সময় পরিত্যক্ত হয়েছে ; তাই যান্ত্রিক প্রকল্প ভবিষ্যতে জীববিদ্যায় প্রমাণিত হবেই এমন বলা যায় না।

যন্ত্রবাদীরা বলেন যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই প্রাণকে সহজবোধ্য করে তুলবে ; পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এই পদ্ধতিতেই উন্নতি লাভ করেছে। একথার সত্যতা স্বীকার করতে হলে কিন্তু জড় ও প্রাণের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য মানতেই হয়। এদের মধ্যে কিন্তু আমরা বৈজাত্যই দেখেছি। এখন জড় ও প্রাণের মধ্যে যদি মৌলিক পার্থক্যই থাকে তা হলে জড়জগতের সার্থক ব্যাখ্যা জীবজগতের ঘাড়ে চাপালে জীবন রহস্যঘন ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। তাই যান্ত্রিক কারণতাকে একমাত্র সহজ ব্যাখ্যা বলতে হলে জড়বাদের মূল বক্তব্য—এ বিশ্বসংসারে সব কিছুই জড় ও যান্ত্রিক—আগে থাকতেই মেনে নিতে হয় ; কিন্তু তা মেনে নেবার কোন কারণ নেই।

3. প্রাণবাদের[1] পরীক্ষা

প্রাণবাদীদের প্রধান বক্তব্য এই যে যন্ত্র ও যান্ত্রিক পদ্ধতির থেকে-জীবদেহের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা বলেছি যে এই গুণগত বৈজাত্য অস্বীকার করা যায় না। তবে ঐ বৈজাত্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচীন জীববিদেরা যে "প্রাণতত্ত্ব বা প্রাণবল (vital force)" জীবদেহস্থ বলে কল্পনা করেছিলেন তার রহস্য আজও অপসারিত হয় নি। এ্যারিস্টটল্ ও মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের লেখায় এই 'প্রাণতত্ত্বের' কথা পাওয়া যায়। অধ্যাপক ড্রিস্ (Prof. Driesch) একেই প্রাণের বৈশিষ্ট্য বলে মানতেন ; আর এই রহস্যাবৃত তত্ত্বকে তিনি প্রচ্ছন্ন 'চেতনতত্ত্ব' (Psychoid) বলতে দ্বিধা করেন নি, যদিও তা নিম্নতম স্তরের জীবাণুর মধ্যেও থাকতে বাধ্য। এই অদ্ভুত তত্ত্ব পরীক্ষণগ্রাহ্য নয়। যন্ত্রবাদীরা ঠিকই বলেন যে এই তত্ত্ব এক বিরাট ভ্রান্তিপ্রসূত। প্রাণবাদীদের "প্রাণ-বা-চেতনতত্ত্ব" মানলে প্রকৃতির ক্রমবিকাশে জড়বস্তুর ও প্রাণস্তরের মধ্যে কোন

1. Vitalism

অনবচ্ছিন্ন ধারা স্বীকার করা যাবে না, আর সমস্ত প্রকৃতির এক সুব্যবস্থিত ব্যাখ্যাও সম্ভব হবে না। এর অর্থ এই নয় যে সব প্রাণবাদীরাই রহস্যের জাল বুনে চলেন। জড় ও প্রাণের মৌলিক পার্থক্য মেনেও নব্য-প্রাণবাদীরা এক বিশেষভাবে প্রাণের মৌলিকত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন।

4. প্রাণ-সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মত

যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ উভয় বক্তব্যেরই মূল্য রয়েছে। 'দেহযন্ত্র বা শরীরযন্ত্র' কেবল কথার কথাই নয়—রক্তসঞ্চালন, পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে যান্ত্রিক বলেই মনে হয়; শল্যচিকিৎসকেরা সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোগ-বিভাগ, অন্ততঃ অংশতঃ, করতে পেরেছেন তা যান্ত্রিক প্রকল্পকে সমর্থন করে। তাই বলে যন্ত্র ও প্রাণের বৈজাত্যও উপেক্ষণীয় নয়। নব্য-প্রাণবাদীরা দেহযন্ত্রের মধ্যে কোন রহস্যাবৃত 'প্রাণতত্ত্ব' না মেনেও বলেন যে, প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশে জীবস্তরের ব্যাখ্যা ঠিক পূর্বগামী ভৌতরাসায়নিক স্তরের মতো হতে পারে না—এই নূতন স্তরে উদ্দেশ্যমুখীন কারণতাও স্বীকার করতে হবে। জীব-দেহের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক হলেও যখন সবগুলি পরস্পরসাপেক্ষ হয়ে এক অখণ্ড জৈবিক ঐক্য সম্ভব করে, তখন ঐ ঐক্য যান্ত্রিক নয়—নিজ কল্যাণ ও প্রজাতিকল্যাণে নিয়োজিত এক উদ্দেশ্যাভিমুখী ঐক্য। বিভিন্ন যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি জীবগত ঐক্যে এমনভাবেই সুসংবদ্ধ ও সুব্যবস্থিত হয়ে আছে যে, তারা একত্রে নিজেদেরই অন্তর্লীন কোন উদ্দেশ্য আপনা আপনি সাধন করে চলে। প্রাচীন প্রাণবাদীদের কথা যতটা অবৈজ্ঞানিক নব্য-প্রাণবাদীর এই উদ্দেশ্য-কারণতা ততটা অবৈজ্ঞানিক নয়। যান্ত্রিক ঐক্য ও জৈবিক ঐক্য বিজাতীয়; ঐ পার্থক্য স্বীকার করলে জৈবিক ঐক্যের সম্ভাবনায় উদ্দেশ্য-কারণতা মানতে হবে। তাই প্রাণের ব্যাখ্যায় পূর্ণ যান্ত্রিকতা যেমন মানা যায় না, তেমনি পরিপূর্ণ উদ্দেশ্য-কারণতারও স্থান নেই। অংশতঃ যান্ত্রিকতা এবং ঐক্যগত উদ্দেশ্য-কারণতাই হয়তো প্রাণের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেবে। এইভাবে জীববিদ্যার অভিনবত্ব সূচিত হয় ও সে ভৌতরসায়নবিদ্যা নিরপেক্ষ হয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে।

5. প্রাণের উৎপত্তি

এই পৃথিবীতে প্রাণের প্রকাশ চিরকালই ছিল না। বর্তমান ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সিদ্ধান্ত এই যে জগতের প্রথম স্তর হল নিষ্প্রাণ জড় ও যান্ত্রিকতা। প্রাথমিক স্তরে পৃথিবীর পরিমণ্ডল এত সাংঘাতিক উত্তপ্ত ছিল যে প্রাণের অস্তিত্ব তখন সম্ভব ছিল না। পরে বহুযুগ ধরে ক্রমপরিবর্তনের ধারায় সরল প্রাণকোষের বিকাশ সম্ভব হয়েছে এবং আরও বহুযুগ ধরে ঐ প্রাণকোষ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রাণকোষ কি ভাবে পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে উৎপন্ন হলো এই এক সমস্যা।

এ ক্ষেত্রে দুটি মত চালু আছে—জীবজনি[1] ও অজীবজনি[2]। প্রথমটির মতে পূর্বগামী জীবই অন্য জীবের সৃষ্টি করতে পারে, এক ডিম্বাণুই অন্য ডিম্বের জনক হয়। দ্বিতীয়টির মতে প্রাথমিক জড়বস্তুর থেকেই জীবকোষের সৃষ্টি হয়েছে ক্রমবিকাশের ধারায়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাতে কিন্তু জীবজনি মতটিই সত্য বলে মনে হয়। নিছক জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়। পানা পুকুরের জলে জীবাণু প্রচ্ছন্ন থাকে বলে পরে তাতে পোকার উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু পাস্তুর দেখিয়েছেন যে যদি ঐ জলের শোধন করে তাকে বাইরের জীবাণুমুক্ত রাখা যায়, তবে আর তাতে প্রাণের প্রকাশ হবে না। কিন্তু জীবজনি প্রথম ডিম্বাণুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন যে বহুদূর অতীতে অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র থেকে, হয়তো উল্কাপাতের সাহায্যে, পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর মতই সেই কল্পিত গ্রহে বা উল্কায় প্রথম জীবকোষ কি ভাবে উৎপন্ন হল, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

অতএব অজীবজনি বলে যে ক্রমবিকাশের অবিচ্ছিন্ন ধারায় অজৈবস্তুর থেকেই, অনুকূল পরিবেশে, জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতে জড় ও প্রাণের পার্থক্য মাত্রাগত, প্রকৃতিগত নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে বৈজাত্য স্বীকার করেও এক ধরণের অজীবজনিই সম্ভবতঃ প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে। এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা, জগতের ক্রমবিকাশ তত্ত্বের আলোচনাতে পাওয়া যাবে।

1. Biogenesis 2. Abiogenesis

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্রমবিকাশ তত্ত্ব[1]

1. ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

'ক্রমবিকাশ' বলতে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে সর্ববস্তুর ধীর, ক্রমিক পরিণতি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই বুঝব। বিজ্ঞান সৃষ্টিবাদের বিরোধী। এই বিশ্বপ্রকৃতি এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই তা কোন অলৌকিক শক্তির দ্বারা হঠাৎ সৃষ্টি হয়ে যায় নি। বিজ্ঞানের মতে জগতের বর্তমান অবস্থা—তার অগন্য জৈবিক ও অজৈবিক সত্তার নানা জাতি-প্রজাতি—বহুযুগ ধরে প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত মৌলিক, প্রাথমিক অবস্থার ক্রমবিকাশের ফল। এই ক্রমবিকাশের পদ্ধতি হল সরল থেকে যৌগিক অবস্থায়, অনুন্নত থেকে উন্নতাবস্থায়, নিম্ন থেকে উচ্চস্তরে, মৌলিক বা প্রাথমিক স্তর থেকে জটিল, জটিলতর স্তরে ক্রমপরিবর্তন বা পরিণতি। এই ক্রমবিকাশের ধারায় পূর্বাবস্থার থেকে তৎপরবর্তী অবস্থার ভেদ অত্যন্ত অল্প, কেননা এই পরিবর্তন একান্তই ক্রমিক। এই ধারার মধ্যে পূর্বাপর অবস্থাগুলি অনবচ্ছিন্ন ; আর এই বিকাশের ফলে পূর্বাবস্থারই কেবল পুনরাবর্তন হবে এমন নিয়ম নেই ; একেবারে নূতন কিছুরও আবির্ভাব হতে পারে।

প্রকৃতির এই ক্রমবিকাশের বিবরণকে ইতিহাস বলা যায়। দর্শন সকল বস্তুর ব্যাপক ধর্মগুলির আলোচনা করে ; কেননা দর্শন সমস্ত জগতের বর্ণনা দিতে চায়। কাল, পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ এমনি একটি সর্বব্যাপী ধর্ম। জগতে এমন কিছুই নেই যার কালিক পরিবর্তন হয় না। বৌদ্ধাচার্যগণ বলেন যে সবকিছুই নিত্যপরিনামী, নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজ ও তার অনুশাসনগুলি যুগে যুগে পাল্‌টে যায় ; জীবজগতের বিভিন্ন জাতি-প্রজাতি চিরকাল এক অবস্থায় থাকে না ; গ্রহনক্ষত্রেরাও এই পরিবর্তনের ধারায় বিধৃত। গ্রীক-দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলতেন "সব কিছুই চলে যায়" ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন "চরৈবেতি, চরৈবেতি"! ক্রমবিকাশ তাই স্বীকৃত সত্য। ক্রমবিকাশের তত্ত্ব কিন্তু বলে যে এই ক্রমপরিণতির মধ্যে নিয়মানুগত্য দেখা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরীক্ষণের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সৌরমণ্ডল ও নক্ষত্রপুঞ্জের বর্তমান অবস্থা লক্ষ লক্ষ বৎসরের ক্রমপরিনতির ফল। নক্ষত্রের তাপমাত্রা বহুকাল ধরে হ্রাস পাবার ফলে তাতে নানারূপ রাসায়নিক পদার্থ আত্মপ্রকাশ করে, আর এই ভাবে জ্যোতির্লোক ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। আজ পর্যন্ত ঐ পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে বহু আলোকবর্ষ দূরস্থ নীহারিকায় এবং সমগ্র জ্যোতির্লোকে। মাটির বিভিন্ন স্তরের স্বরূপালোচনা

---

1. Theory of Evolution

করে ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ পেয়েছেন যে আমাদের পৃথিবী একটা তরল, উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বর্তমান কঠিন আকার ধারণ করেছে। মাটির নীচে যে ভূস্তরগুলি রয়েছে তার মধ্যে অধুনা লুপ্ত প্রাচীন জীবকুলকে শিলীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে; তাদের থেকে উন্নততর জীবেরা পরে তাদের স্থান নিয়েছে। আধুনিক জীববিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, প্রথমাবস্থায় নিম্নতম স্তরের এককোষী প্রাণ ছিল; পরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অসংখ্য বৃক্ষলতা, পশু-পাখী, এমনকি মানুষেরও বিকাশ হয়েছে ধীরে ধীরে। আদম-ইভের গল্প কথা আজ আর বিশ্বাস করা যায় না। এ কথা আজ কেউ বলেন না যে সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট এক মানব-মানবীর সন্তান বা সমগ্র অশ্বজাতি ঐরূপ এক অশ্ব-অশ্বার বংশধর। বনমানুষ ও অন্যান্য অতিকায় বানরের সঙ্গে মানুষের অস্থিসংস্থানের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে, চার্লস্ ডারউইন তাঁর বিখ্যাত "মানুষের অবতরণ (Descent of Man)" এবং "প্রজাতির উৎপত্তি (Origin of Species)" গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। ডার্‌উইন জৈবিক ক্রমবিকাশের মূল সূত্র আবিষ্কার করে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর মতে জীবকুলের কোন প্রজাতিই নিত্য নয় ও অন্য প্রজাতি থেকে তার পার্থক্য অনতিক্রম্য নয়। বহুকাল ধরে, অল্প অল্প পরিবর্তনের ধারা বেয়ে, একজাতি অপর জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে; যেমন, নরাকার বানর থেকেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। এভাবে দেখলে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে এক নিয়তপরিবর্তনশীল, বিরাট নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যায়; আর জ্যোতিপুঞ্জের বা জৈবিক বা সামাজিক ক্রমবিকাশ-কে পৃথক করে নিলে, তাদেরকে ঐ বিরাট স্রোতধারারই বিভিন্ন আবর্ত বলা যেতে পারে। এই অর্থে ক্রমবিকাশের অস্তিত্ব আজ আর অবিশ্বাস করা যায় না। দর্শনশাস্ত্রে কেবল এই বিকাশধারার নিয়মটির আলোচনা হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে কি ভাবে এই প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশ সহজে আমাদের বুদ্ধিগম্য হতে পারে অর্থাৎ ক্রমবিকাশের তত্ত্বটি কি। এ স্থলে নানামুনির নানামত। আমরা এবার প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশে যন্ত্রকারণতা ও উদ্দেশ্যকারণতার মধ্যে দ্বন্দ্বের আলোচনা করে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশ ও সৃষ্টিমূলক ক্রমবিকাশের নীতি ব্যাখ্যা করব।

2. যান্ত্রিক কারণতাবলম্বী ক্রমবিকশ তত্ত্ব[1]

জড়বাদী বা নিসর্গবাদী দর্শন সমগ্র জগতের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে কেবলমাত্র যান্ত্রিক কারণতার নীতি স্বীকার করে থাকে। বিশ্বের ক্রমবিকাশ কোন লৌকিক বা অলৌকিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হচ্ছে না; মহাশূন্যে অগুন্তি জড়কণিকার আকস্মিক, স্বতঃসঞ্জাত সংঘাতে ও আকর্ষণ-বিকর্ষণে সকল বস্তুরই উদ্ভব হতে পারে। জড় ও প্রাণ উভয়েই যান্ত্রিক। মোটরের ভেঁপু কখনও পথচারীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বাজে না; যন্ত্রের নিয়মে চালক যখন বিদ্যুৎ

1. Theory of Mechanical Evolution.

প্রবাহ মুক্ত করে তখনই বাজে। ঠিক তেমনি আঘাত করবার উদ্দেশ্যে কেউ মুষ্ট্যাঘাত করে না; আগে স্নায়বিক প্রবাহ মুক্ত হলে, পেশী স্বতঃই সংকুচিত হয়ে মুষ্ট্যাঘাত ঘটিয়ে দেয়। জড়, প্রাণ ও মনের মধ্যে কেবল মাত্রাগত পার্থক্য; সকলেই কমবেশী যান্ত্রিক নিয়মে বিধৃত। যান্ত্রিক মতে জগতের ক্রমবিকাশে কোথাও কোন ছেদ নেই—জড়ই জটিলরূপে প্রাণ, প্রাণই জটিলরূপে (অর্থাৎ জড়ই জটিলতর রূপে) মনে পর্যাবসান হয়েছে। এই কারণে, যুগ যুগ ধরে একই মৌলিক উপাদানের—অর্থাৎ জড়ের—বারে বারে জটিল থেকে জটিলতররূপে পুনরাগমন হয়েছে; কোথাও কোন নূতন সত্তার আবির্ভাব হয় নি। মৌলিক জড়সত্তার অন্ধ স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়নে, বহুকালব্যাপী ক্রমবিকাশের ধারায়, ছোট বড়, সরল-জটিল সকল বস্তুই আকস্মিক ভাবে সম্ভব হয়েছে। ইংরাজ দার্শনিক হার্বার্ট্ স্পেন্সার ও ফারসী গণিতজ্ঞ ল্যাপ্লাস্ যান্ত্রিক কারণতা আশ্রয় করে জগতের ক্রমবিকাশ-সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন। ডারউইন ও লামার্ক ঐ একই ভাবে জীবজগতের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন।

(ক) হার্বার্ট্ স্পেন্সারের মতে ক্রমবিকাশ সর্বব্যাপী আর এই বিকাশের উপাদান হলো জড়, গতি ও শক্তি। তাঁর মতে এ গুলি কিন্তু চরম তত্ত্ব নয়, তবে আমাদের জ্ঞান এ গুলির মৌলিক ভিত্তিমূলে পৌঁছতে পারে না। এ গুলির মূলে রয়েছে এক অজ্ঞেয় পরমসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই। জড় ও তার অন্তর্লীন গতি নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত ও সংকুচিত হয়ে এই বিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব করেছে। এই প্রকৃয়ায়, অপেক্ষ্যকৃত অসংবদ্ধ জড়কনিকারা ক্রমে সুসংবদ্ধ হয়েছে; অস্ফুট হয়েছে স্ফুট থেকে স্ফুটতর; সরল হয়েছে যৌগিক আর সাম্যাবস্থার থেকে বৈষম্যাবস্থার উদ্ভব হয়েছে। জড়ের গতিও এইভাবে সমানতালে পরিবর্তিত হয়েছে। এই নিয়মের মধ্যে দুটি নিয়মই প্রধান—পৃথককরণ ও সংশ্লেষণ। পৃথককরণের মাধ্যমে সমমান বিষমমান হয়ে যায়, আর প্রাথমিক সরলতা জটিলতা প্রাপ্ত হয়। আবার যখন অসংবদ্ধ উপাদান হয় সুসংবদ্ধ, অসংহত হয় সংহত তখন ঐ বিপরীত প্রক্রিয়ার নাম 'সংশ্লেষণ' বা ঐক্যবিধান। এই দুই প্রক্রিয়ার যুগ্মপ্রভাবে ক্রমবিকাশের ধারা বয়ে চলে।

আমাদের সৌরজগতের প্রাথমিক উপাদান প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগে গ্যাসীয় আকারে কোন নীহারিকার অংশ ছিল। নীহারিকার সাম্যাবস্থা অনাদিকাল থেকেই অস্থির হওয়ায়, তার কিছুটা অংশ, অন্ধ, আকস্মিক নিয়মবলে সংকুচিত হয়ে, সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। পরে এরা এদের জন্মদাতা নীহারিকা থেকে বেগবলে নিক্রান্ত হয়—পৃথককরণ পদ্ধতিতে। সূর্যদেহের অংশ আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ উৎপন্ন করে আর মহাকর্ষের প্রবল আকর্ষণে তারা সূর্যেরই চারপাশে এক পারিবারিক ঐক্য স্থাপন করে—সংশ্লেষণের নিয়মে। আমাদের পৃথিবীও প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাসের সাম্যাবস্থা ছিল। ক্রমশঃ এর কিছুটা আকস্মিক ভাবে জমাট হয়ে কঠিন আকার নিয়েছে আর, কিছুটা জল ও বায়ুতে রূপান্তরিত হয়ে ঐ ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। এখানেও সেই

পৃথককরণ ও ঐক্যবিধানের খেলা। আরও বহুযুগ পরে সমুদ্রগর্ভে সর্বাপেক্ষা সরল জীবনের সঞ্চার হল; বিশ্লিষ্ট জড়াত্মক উপাদানই (কার্বণ, অক্সিজেন প্রভৃতি) সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রাণকণিকা উৎপন্ন করেছে। এর পর উচ্চবর্ণের স্নায়ুতন্ত্র সমন্বিত প্রাণীর উদ্ভব হলে, তাকে আশ্রয় করে চৈতন্য ও মনের বিকাশ হয়েছে। স্পেন্সারের মতে পৃথককরণ ও সংশ্লেষণের নিয়ম দুটি পুরোপুরি যান্ত্রিক; আকস্মিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এক অন্ধ গতিবলে, এরা ক্রমবিকাশকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত করে।

সমালোচনা—স্পেন্সারের মত সর্বাংশে মিথ্যা না হলেও এই মতে জাগতিক ক্রমবিকাশে আকস্মিকতার দাপট অত্যন্ত বেশী বলে মনে হয়। প্রকৃতির ঘটনা ও বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ যে ভাবে দেখা যায়, এদের মধ্যে যে সুসংবদ্ধ সামঞ্জস্য পাওয়া যায় এর সবটাই আকস্মিক বা অন্ধ গতিবেগে উৎপন্ন বলে মনে হয় না। আবার পরমসত্তা সম্বন্ধে যদি আমাদের কোন জ্ঞানই না থাকে, তবে স্পেন্সারই বা কি করে জানলেন যে জড়, গতি ও শক্তিই কেবল সেই পরমের প্রকাশ? পরন্তু প্রাথমিক উপাদান যদি সাম্যাবস্থায়ই থেকে থাকে তা হলে সে কেন যে বৈষম্য প্রাপ্ত হবে তার উত্তর স্পেন্সারে নেই। স্পেন্সার বলেছেন যে ঐ আদিম উপাদান নাকি চিরকালই অস্থির; কিন্তু প্রকৃতিতে সমমানের বস্তু বা সাম্যাবস্থাকে, বৈষম্যাবস্থার থেকে বেশী স্থায়ী ও অচঞ্চল বলে দেখা যায়। তাছাড়া সমগ্র বিশ্বকে যান্ত্রিক কারণতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা একদেশ-দর্শিতা প্রমাণ করে (অধ্যায় নং 12)। প্রাণী ও মনস্তরের বিশ্লেষণ জড়স্তরের সঙ্গে তার বৈজাত্যই ঘোষণা করে। যে ক্রমবিকাশ তত্ত্ব নবীনের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারে না, তা গ্রহণ-যোগ্য নয়।

(খ) লামার্ক এবং ডারউইনই প্রথমে জীবজগতের ক্রমবিকাশতত্ত্ব উদঘাটন করেন। এ'রাই প্রমাণ করেন যে জীবকুলের বিভিন্ন জাতি—প্রজাতি এক অভিন্ন উৎপত্তিস্থল থেকে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লামার্ক এই বিবর্তনের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর মতে পরিবেশের প্রভাবে কোন জীবের অঙ্গে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। জিরাফের দীর্ঘ গ্রীবা হয়তো প্রথম থেকেই ছিল না। অনবরত উচু গাছের পাতা খেতে গিয়ে অন্যজাতের কোন হ্রস্বগ্রীব প্রাণীর গলা হয়তো কিছুটা লম্বা হল আর সে তার বংশধরের মধ্যে সেই পরিবর্তনটুকু সংক্রামিত করল। এভাবে বহু বংশ পরম্পরায় সেই প্রাণীর গ্রীবা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সে জিরাফে পরিণত হয়েছে। প্রজাতির বিবর্তনে লামার্কের মতে (1) পরিবেশের প্রভাবে প্রাণীদের অঙ্গসংস্থানে পরিবর্তন হতে পারে; আর (2) প্রাণীর জীবদ্দশাতেই অর্জিত শারীরিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সংক্রামিত হতে পারে। কিন্তু কোন গুণ বা দোষ পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কিনা সন্দেহ; শিল্পী বা ওস্তাদের সন্তান সব সময়েই শিল্পী বা ওস্তাদ হয় না।

ডারউইনের বিখ্যাত মতে প্রাণীদেহে যে পরিবর্তন আসে তা বাইরের পরিবেশ

প্রভাবে উৎপন্ন হয় না—ঐ পরিবর্তন একান্তই আকস্মিক। এই মতে প্রাণীর জননকোষ অতিক্ষুদ্র হলেও তার মধ্যে জটিলতা কিছু কম নয়। কোন পুরুষে হয়তো কোন এক প্রাণীর জননকোষে আকস্মিকভাবে কোন নূতন ধর্ম দেখা দিল। জননকোষের এই পরিবর্তনের ফলে ঐ প্রাণী হয়তো কোন সুবিধাজনক অঙ্গসংস্থানের অধিকারী হল ; আর এর ফলে সে জীবনযুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান প্রাণীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। প্রাণীজগত অনবরত কঠিন জীবনযুদ্ধে লিপ্ত। গাছপালা, পশুপাখী প্রত্যেকের প্রজনন ক্ষমতা এত বেশী যে সকলের সন্তান-সন্ততিরা বেঁচে থাকলে সীমিত খাদ্য বা আশ্রয় কারুরই মিলত না। তাই প্রাণীকুল সকলেই আত্মরক্ষার জন্য প্রচণ্ড জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এখন যে হরিণ অত্যন্ত দ্রুতগামী, জীবনযুদ্ধে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ; আর যে হরিণের শিং বিস্তৃত ও জটিল, লতাপাতায় আটক হয়ে, তার মরবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই যে প্রাণীর জননকোষের বৈশিষ্ট্য তাকে সুবিধাজনক অঙ্গের অধিকারী করেছে, প্রকৃতি যেন তাকে নির্বাচিত করে বাঁচিয়ে রাখে, আর যে প্রাণীর ঐ আকস্মিক পরিবর্তন অসুবিধাজনক, সে জীবনযুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই নিয়মে সুবিধাজনক পরিবর্তনগুলি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হতে হতে আর সঞ্চিত হতে হতে নূতন জাতের প্রাণীর উদ্ভব হয় ও বহু প্রাচীন জাতের প্রাণীরা লুপ্ত হয়ে যায়। জীবনযুদ্ধে তাই যোগ্যতমেরই বাঁচবার অধিকার আর অন্ধ প্রকৃতি যোগ্যতমকেই বংশ রক্ষা করার জন্য আপনা আপনি নির্বাচিত করে। উপযুক্ত অঙ্গসজ্জা পেয়ে জীব এই যোগ্যতা অর্জন করে আর তা সে পায় আকস্মিকভাবে। জননকোষের বৈশিষ্ট্যই উত্তরপুরুষে সংক্রামিত হতে পারে—জীবদ্দশায় লব্ধ গুণের সংক্রান্তি সম্ভব নয়। ডারউইনের মতে, এক প্রজাতি থেকে অন্যের উদ্ভব (1) আকস্মিক পরিবর্তনের পুরুষানুক্রমিক অন্ধ সঞ্চয়নে, আর (2) উপযোগী পরিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচনে। এ নির্বাচন অবশ্য কোন বুদ্ধিমান কর্তার অপেক্ষা রাখে না—অন্ধ চেষ্টা আর ভুলের ধারা বেয়ে, মূক প্রকৃতিই অকস্মাৎ কোন সুবিধাজনক পরিবর্তন সম্ভব করে। তাই প্রজাতির ক্রমবিকাশ একান্তই যান্ত্রিক।

পরবর্তীকালে জীববিজ্ঞানী ভাইস্‌ম্যান লামার্কের মত খণ্ডন করে ডারউইনের মতের যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তিনি দেখলেন যে, একমাত্র জনিতার যৌন জননকোষই বংশগতির ধারা রক্ষা করে। ঐ জননকোষ সন্তান উৎপন্ন করে ও বাইরের প্রভাব কাটিয়ে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সঞ্চারিত হয়। তাই জননকোষের আকস্মিক পরিবর্তনই অনুগামী পুরুষকে প্রভাবিত করতে পারে। যদিও ডারউইন জননকোষের ও দেহকোষের পরিবর্তন পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হতে পারে বলে মানতেন, তবু তাঁর মতে ঐ দেহকোষের পরিবর্তন বাইরের পরিবেশের প্রভাবে উৎপন্ন নয়—একান্তই আকস্মিক। ভাইসম্যান আরও অগ্রসর হয়ে দেখলেন যে কেবলমাত্র জননকোষের আকস্মিক পরিবর্তন বংশগতির নির্ধারক ; আর দেহকোষের বৈশিষ্ট্য প্রাণীর জননকোষে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। ভাইস্‌ম্যান আরও

দেখলেন যে, জীবদ্দশায় উদ্যম বা অভ্যাসলব্ধ কোনো শারীরিক বৈশিষ্ট্যও ঐ যৌন জননকোষকে পরিবর্তিত করতে পারে না। এ বিষয়ে ডারউইনের মতই যথার্থ।

সমালোচনা—লামার্ক—ডারউইন—ভাইস্‌ম্যান কেবলমাত্র জীবজগতের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সমগ্র জগতের তত্ত্ব প্রকাশ করেন নি। তাই ঐ ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক মূল্য যাই হোক না কেন দার্শনিক মূল্য খুব বেশী নয়। তবে এ কথা ঠিক যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন, বংশগতির ধারা, জীবনযুদ্ধে যোগ্যতমের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি তত্ত্ব জৈবক্রমবিকাশে অস্বীকার করা যায় না। উপরন্তু ডারউইনই ক্রমবিকাশের কথা উপস্থিত করার পর ঐ তত্ত্ব সমস্ত জগতে আরোপিত হয়েছে। লামার্ক—ডারউইন—ভাইসম্যান অবশ্য এই প্রজাতি-বিবর্তনে যান্ত্রিক কারণতাই স্বীকার করেন। কিন্তু জীব যদি শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা না করত তবে জীবনযুদ্ধ সম্ভব হতো কি করে? তাহলে জীবকুলের মৌলিক উদ্দেশ্য হল আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা; তবে এ কথা বলা চলে না যে, উঁচু-নীচু সকল স্তরের প্রাণীই সচেতনভাবে, নিজ বুদ্ধিবলে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করে। তবু বোধ হয় এরা অচেতনভাবে বা স্বতঃই ঐ উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণশক্তির প্রয়োগ করে। তাই জীব বিবর্তনে উদ্দেশ্য-কারণতা একেবারেই অর্থহীন নয়। আবার ডারউইন, লামার্কের মতে জীবদেহের পরিবর্তন বংশানুক্রমে অত্যন্ত কম মাত্রায় ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় ও এই সঞ্চয়ের ফলে বহু পুরুষ পরে এক প্রজাতি ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ডি ভ্রাইস্ (De Vries) প্রভৃতি জীব বিজ্ঞানীরা ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে কোন বিরাট ব্যবধান হঠাৎ অতিক্রান্ত হবার প্রমাণ পেয়েছেন; তাঁরা দেখেছেন যে মাত্র এক বা কয়েক পুরুষের ব্যবধানে একজাতীয় প্রাণী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রকৃতি যে এক পদক্ষেপে অনেক যোজন পার হল আর কেন যে হল তা বোঝা সহজ নয়।

3. উদ্দেশ্য কারণতাশ্রয়ী ক্রমবিকাশ তত্ত্ব[1]

উদ্দেশ্য কারণতাশ্রয়ী ক্রমবিকাশ তত্ত্ব বলতে চায় যে জাগতিক ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে—জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে অগ্রসর হতে হতে—প্রকৃতি কোন উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে আর ঐ অনাগত উদ্দেশ্যের সাহায্যেই ওই বিবর্তন বুঝতে হবে। তাই ক্রমবিকাশের প্রকৃত ব্যাখ্যা থাকবে ঐ প্রক্রিয়ার শেষ স্তরে প্রথম স্তরে নয়। যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় নিয়তপূর্ববর্ত্তী ঘটনা অনুগামী কার্য উৎপন্ন করে; উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যায় যেন অনাগত ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্তমানকে ঐ উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বলে নিয়োজিত করে। যান্ত্রিক কারণতায় দণ্ডের পূর্বসিদ্ধ আঘাত চক্র ভ্রমণের কারণ হয়। কিন্তু এই পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য, হয় দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করা অথবা পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া; এখানে বর্তমান পাঠক্রিয়া

1. Theory of Teleological Evolution

অনাগত উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে যান্ত্রিকতা ও উদ্দেশ্য সাধন বিরোধী বলে মনে হলেও, জীবদেহে ও প্রাণের কার্যকলাপে আমরা উভয়ের সহাবস্থানের প্রমাণ পাই। আজ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের শেষ স্তরে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের চৈতন্যসত্তার আবির্ভাব দেখা যায়; মানুষই কেবল কোন মূল্যবান আদর্শ সাধনে প্রাণপণ করতে পারে। আপাততঃ শেষ স্তর মানুষের উদ্ভবই তাই প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলে মনে হয়। উদ্দেশ্যধর্মী ক্রমবিকাশ তত্ত্ব তাই অধ্যাত্মবাদের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে।

(ক) বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নানারূপ শিল্পসৌকর্যের নিদর্শন দেখে যাঁরা ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যমুখিতা স্বীকার করেন তাঁরা স্বভাবতই জগৎ ব্যাপারের বহিস্থ কোন মহান শিল্পীর কল্পনা করেন, আর ভাবেন যে ঐ শিল্পীর উদ্দেশ্যই প্রকৃতি ধীরে ধীরে পূর্ণ করে চলেছে। এই মহাশক্তিধর শিল্পী বা ঈশ্বর কল্পনা কিন্তু যন্ত্রবিদের কাছ থেকেই এসেছে। যন্ত্রের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও যন্ত্রী তার অংশগুলি এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট করেন যে, প্রত্যেকটি অংশ অন্ধভাবে ঐ যন্ত্রীর উদ্দেশ্য সাধন করে। যন্ত্রের উপাদান (লোহা, তামা ইত্যাদি) নিজে নিজেই জটিল যন্ত্র উৎপাদন করতে পারে না; এজন্য যন্ত্রীর বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যন্ত্র তার বহিস্থ বুদ্ধিমান যন্ত্রীর উদ্দেশ্য বা অভিলাষ পূর্ণ করতে বাধ্য হয়। ঠিক এই রকমে বিশ্বপ্রকৃতি যেন ক্রমবিকাশ ধারায়, যন্ত্রের মতই বহিস্থ কোন শিল্পীর অভিলাষ বা উদ্দেশ্য পরিপূরণে নিযুক্ত আছে। যে মতে সমগ্র বিশ্বকে এক বিরাট যন্ত্র বলে কল্পনা করে, তার বাইরের প্রচণ্ড শক্তিধর শিল্পীর উদ্দেশ্য পূরণে নিযুক্ত বলে ভাবা হয়, সে মতকে "অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ"[1] বলে।

অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদীরা বলেন যে জগতের আদিম উপাদান অন্ধ জড়শক্তি; গ্রহনক্ষত্রের এই চিত্তচমৎকারী সংস্থানে পরিণত হবার প্রবণতা তার একেবারেই নেই। আমরা পূর্বে দেখেছি যে জীবদেহগত ঐক্য উদ্দেশ্যমুখীন; মানসভূমিতে তা আরও বেশী প্রকট। সমস্ত জীবজগতে প্রাণীকুলের সঙ্গে তার পরিবেশের এক অদ্ভুত অভিযোজন দেখা যায়; মেরুমণ্ডলের শৈত্যের সঙ্গে সেখানকার ভল্লুকের গরম গাত্রলোম অপূর্বভাবে খাপ খায়; মাছ জলে মিশ্রিত অক্সিজেন তার ফুলকার সাহায্যে টেনে নিতে পারে; পাখীর পাখা তাকে বায়ুমণ্ডলের পরিবেশে খাপ খাইয়ে দিয়েছে। সমগ্র প্রকৃতিতে উপায় ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে এমন সুন্দর এক সহযোগিতা দেখা যায় যে অন্ধ জড়শক্তির আকস্মিক সংঘাতে তার ব্যাখ্যা হয় না। জাগতিক ক্রমবিকাশের মধ্যে এক বিশেষ পারম্পর্যসমন্বিত স্তরভেদ দেখা যায়; প্রাণ জড়দেহাশ্রয়ী হয়েও অধিক জটিল ও উন্নত; মন আবার প্রাণকে আশ্রয় করেও আর এক ধাপ অগ্রসর। সরল থেকে যৌগিক অনুন্নত থেকে উন্নত ধাপে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হল পূর্বগামী ব্যাপারকে,

1. Theory of transendent Teleology

অনুগামী উদ্দেশ্য সাধনে উপায় হিসাবে নিয়োজিত করা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশ ও কাম্য কর্মের উপযোগী করে উৎপাদিত হয়। এই অঙ্গগুলি অঙ্গীর সঙ্গে এমন আন্তর সম্পর্কে সংবদ্ধ যে একটা অপরকে ছাড়া কখনও সম্ভব হয় না; জীবদেহের ঐক্য কেবল যান্ত্রিক নয়। তাই একটু অভিনিবেশ সহকারে প্রকৃতির মেজাজ বুঝতে গেলে, বহু চিত্তাকর্ষক ব্যাপার পাওয়া যায় যা আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হতে পারে না। কোন মুদ্রনালয়ে হঠাৎ বিষ্ফোরণ হয়ে কালিদাসের মেঘদূত রচিত হতে পারত কি? মানুষ যখন এই আশ্চর্যজনক প্রকৃতির কারণ নয়, তখন অবশ্যই এক পরমমঙ্গলময় বুদ্ধিমান শিল্পীর, ঈশ্বরের, দক্ষতাই প্রকৃতিতে প্রকাশিত বলে মনে হয়।

সমালোচনা—মানুষের বুদ্ধি ও ইচ্ছা অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক আর অভিলাষ সাধনে নিয়োজিত। কিন্তু জড়বিজ্ঞান বলে যে সমগ্র মনুষ্যেতর প্রকৃতি অনমনীয় যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। যন্ত্রবাদীরা জীবজগতের তথাকথিত প্রাকৃতিক 'নির্বাচন' ও চিত্তহারী অভিযোজনকে বহুযুগ ধরে জড় প্রকৃতির অন্ধ চেষ্টা ও ভুলের ফল বলে বলেন। প্রাণীর সঙ্গে তার পরিবেশের সার্থক অভিযোজনের উদাহরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অসংখ্যস্থলে অভিযোজনের অভাবও দেখা যায়। সহজাত প্রবৃত্তিবশে যাযাবর পক্ষিকুল দেশান্তরে গমনের সময় ঝড়ের মুখে হাজারে হাজারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই সার্থক অভিযোজনকে কোন শিল্পীর নৈপুণ্যে চালিত না বলে, অসার্থক অভিযোজনের মতো আকস্মিক বল্‌তে আপত্তি কি? উপরন্তু অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ ঈশ্বরকে এক যন্ত্রী হিসাবে একেবারে মানুষের স্তরে টেনে নামিয়েছে। যন্ত্রী যেমন যন্ত্রের বাইরে থাকেন, ঈশ্বরও তেমনি জগদ্‌ব্যাপারের বাইরে থেকে, নিজ পরিকল্পনা অনুসারে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এতে করে ঈশ্বর বহিস্থ জগতের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন, আর জগত ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, আন্তর না হয়ে, একান্তই বাহ্য, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই মতে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য ও অভিলাষ বাইরের থেকে জগতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। জগতের স্থূল, আদিম উপাদান ঐ অভিলাষকে বাধা দেয় বলেই না, তাকে নিয়মিত করতে, ঈশ্বরের বুদ্ধিদীপ্ত দক্ষতা ও গঠন-সৌকর্যের প্রকাশ হয়! এখন ঈশ্বর যদি অনন্তশক্তিধর সৃষ্টিকর্তা হন, তবে তাঁর লক্ষ্যবিরোধী ঐ রকম উপাদান সৃষ্টি করে কি তিনি খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন? আর যদি ঐ আদিম উপাদানের কর্তৃত্ব তাঁর না থাকে, তবে তার দ্বারা তিনি সীমিত হয়ে পড়বেন; তাঁকে আর সর্বশক্তিমান বলা চলবে না। 'অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ' এক হিসাবে যান্ত্রিক কারণতার নামান্তর—অন্ততঃ তারই প্রতিলোম প্রক্রিয়া। এই মতে ঈশ্বরের লক্ষ্য ক্রমবিকাশের শেষস্তরে পূর্ণপ্রকটিত হবে বলে স্বীকৃত হলেও, প্রয়োজক কর্তা হিসাবে ঈশ্বর ঐ ক্রমবিকাশের প্রারম্ভ থেকেই যন্ত্রীর মতো তাকে পরিচালিত করে চলেছেন।

(খ) কিন্তু অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ গ্রহণ করবো না বলে কি যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় নেই ? কান্ট্, হেগেল্ এই বিশ্বের ক্রমবিকাশের মধ্যে একরকম অন্তর্লীন উদ্দেশ্যকারণতার পরিচয় পেয়েছেন। আমরা দেখেছি যে জীবদেহের ঐক্য বা অঙ্গসমাবেশ উদ্দেশ্যমূলক বলে ভাবতে হয় ; জীব সর্বদাই নিজের ও নিজজাতির কল্যাণে জৈবক্রিয়া পরিচালিত করে। এই কল্যাণ বা অভীষ্ট যন্ত্রের মত বহিরাগত নয় ; এ জীবের অন্তর্লীন লক্ষ্য যার সাধনে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি নিয়োজিত রয়েছে। আমরা আরও বলেছি যে এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে স্বতন্ত্র করে দেখলে তাদের যান্ত্রিকতা প্রকট হয় ; এর অর্থ হল যে যান্ত্রিক জড়স্তর থেকেই প্রাণীন ঐক্য উদ্ভূত হয়। কিন্তু যন্ত্রের ঐক্য যেমন বাইরের সংযোগে উৎপন্ন, জৈব সমাবেশ তেমন নয়। তাই জীবজগতে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার বিরোধী হয় না (পৃঃ 246)। এই অন্তর্লীন উদ্দেশ্যকারণতা[1] সমগ্র জগতের ক্রমবিকাশেই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেণ্ডারসন্ বলেন যে যুগব্যাপী জড়স্তরের ক্রম-বিকাশ দেখলে মনে হয় যে সমস্ত অন্ধ প্রকৃতি যেন প্রাণকে সম্ভব করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। পৃথিবীর ভীষণ উত্তপ্তাবস্থা থেকে নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় রূপান্তর ও অন্যান্য পরিবর্তন যেন সবটাই প্রাণের উৎপত্তির প্রস্তুতি। জড়স্তরের অভীষ্ট মূল্য যদি 'প্রাণ' বলা যায়, তাহলে তা খুব অযৌক্তিক নাও হতে পারে। প্রাণও আবার জটিল থেকে জটিলতর হতে হতে, স্নায়ুকোষের বিকাশ করে, উন্নততর মূল্যবান চৈতন্যের সম্ভব করেছে।

ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষই এখন পর্যন্ত চরম স্তর ও সর্বাপেক্ষা পরিণত। মনুষ্যেতর প্রাণী চৈতন্য সম্পন্ন হলেও, মানুষের মতো আত্মজ্ঞান সম্পন্ন নয়। তাই সংবেদনশীল প্রাণী অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব উন্নততর। এখন উদ্দেশ্যবাদের মতে চরম স্তরই তার পূর্ববর্ত্তী স্তরগুলি নিয়ন্ত্রিত করে ; এর অর্থ এই যে জগতের অনাগত অভীষ্ট সাধনে পূর্ববর্তী স্তরগুলি উপায় হিসাবে অত্যাবশ্যক। তাই মনে হয় উচ্চ থেকে উচ্চতর মূল্যের বিকাশই যেন ক্রমবিকাশের লক্ষ্য আর এই অভীষ্ট প্রকৃতিতেই অন্তর্লীন। জড়পদার্থ অবশ্যই মূল্যবান ; কেননা শরীর ছাড়া প্রাণ ও মন সম্ভব নয়। প্রাণের মূল্য কিন্তু আরও গভীর ; বাড়ীতে আগুণ লাগলে স্থিতধী ব্যক্তি আগে বিপন্ন শিশুকে রক্ষা করে, পরে হয়তো ইঁট, কাঠ, বাঁচাতে চায়। মন বা বুদ্ধির মূল্য আরও বেশী ; কেননা, প্রচুর স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ প্রাণের অধিকারী ব্যক্তি যদি গণ্ডমূর্খ হয়, তবে তার মূল্য মোটামুটি স্বাস্থ্যবান অথচ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তির থেকে কম হবার কথা। একটু আধটু এদিক ওদিক করে বার্নার্ড বোসান্‌কোয়েট্, জন কেয়ার্ড, জোসিয়া রয়েস, হারমেন্ লোটজা প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক এই অন্তর্লীন উদ্দেশ্যবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই মত জড়স্তরের যান্ত্রিকতা বা উচ্চস্তরের অধ্যাত্মিকতা, কারুরই বিরোধী হয় না।

1. Immanent Teleology.

ক্রমবিকাশের ধারা এখনও অব্যাহত আছে, আর তাই তার অভীষ্ট চরমতম মূল্য যে কি তা হয়তো এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে এটা হয়তো মানা যায় যে প্রাথমিক স্তরে ঐ মূল্য প্রচ্ছন্ন হয়ে প্রকৃতিতে উপস্থিত ছিল আর প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনে তা ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে। জড়, প্রাণ ও মন এই পরম মূল্যের সাধনের জন্য অপরিহার্য হওয়ায়, ঐ অনাগত লক্ষ্য এক বিশেষ অর্থে ক্রমবিকাশের কারণ হতে পারে। বোসান্‌কোয়েট্‌ বলেছেন যে এক উদ্দেশ্যমূলক, মহাসঙ্গতিপূর্ণ ও সুব্যবস্থিত ঐক্য বা সমাবেশই ঐ চরমতম মূল্য। যান্ত্রিক, জৈবিক ও মানসিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে তারই ক্রমোন্নত প্রকাশ হয়েছে। এই সর্বব্যাপী, মহাসঙ্গতিপূর্ণ ঐক্যকে বোসান্‌কোয়েট্‌ পরব্রহ্ম বলেন আর সেই ব্রহ্ম এই জগৎ ব্যাপারের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছেন। এই মতে সমগ্র প্রকৃতিকে এক বহু অংশসম্ভূত, সচল, জৈবিক ঐক্য বলে কল্পনা করা হয়; ঐ অংশগুলি যেন নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে, পরস্পরসাপেক্ষ হয়ে, নিজেদের অন্তর্নিহিত ঐক্যেরই প্রয়োজনে নিয়োজিত থাকে। এই অন্তর্লীন উদ্দেশ্যকারণতা বিশ্বের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

4. উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশ তত্ত্ব[1]

সাম্প্রতিক কালে লয়েড মরগ্যান, স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার, লাভজয়, সেলার্স প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা জাগতিক ক্রমবিকাশকে নূতন নূতন সত্তার উন্মেষধর্মী বলে বর্ণনা করেছেন। এই তত্ত্ব ক্রমবিকাশের সকল স্তরেই একই সত্তার কম বেশী জটিল পুনরাবর্তন হয় বলে স্বীকার করে না; জড়কে চেতনসত্তায়, বা প্রাণ ও চেতনকে জড়সত্তায় পর্যবসিত করারও কোন উৎসাহ এই মতের নেই। ক্রমবিকাশের ধারা অনবচ্ছিন্ন হয়েও তা নব নবোন্মেষশালী, আর জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে যখন প্রকৃতির পদক্ষেপ ঘটে তখন নবীন সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে জীবদেহগত ঐক্যকে পুরোপুরি যান্ত্রিক সমাবেশ বলা চলে না; জড়ের সঙ্গে তার বৈজাত্য অতিশয় প্রকট। তাই প্রাণহীন ভৌত-রাসায়নিক উপাদানগুলি যখন প্রাণবান জীবকোষে রূপান্তরিত হলো তখন নূতন গুণধর্মের উন্মেষ হলো। জীবের পুষ্টি, বৃদ্ধি, সন্তান উৎপাদন, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন প্রভৃতি ধর্ম জটিলতম যন্ত্রেও দেখা যায় না; এই নবোদ্ভিন্ন গুণগুলি প্রাণকে মূলস্তর জড় থেকে বিজাতীয় করেছে। সকল জীব জড় দেহাশ্রিত হলেও, সকল জড়বস্তুই প্রাণবান নয়। আবার সকল চেতনপদার্থ প্রাণবান হলেও, বৃক্ষলতাদি নিম্নস্তরের প্রাণিন বস্তুর চৈতন্য নেই। তাই প্রাণস্তর থেকে চেতনস্তরে পুনরায় নবীন ধর্মের আগমন দেখতে পাই।

জর্জ হেনরী লিউইস্‌ বলেন যে, যোগগত ধর্ম ও উন্মেষিত ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এক বিশেষ মাত্রায় মিশ্রিত হয়ে জল উৎপন্ন করে। এই জলের ওজন তার উপাদানদ্বয়ের ওজনের যোগফল

1. Theory of Emergent Evolution

মাত্র —একটুও কমবেশী নয়। এই ওজন যোগগত ধর্ম —উপাদানের বা কারণের ধর্মই এখানে কার্যে পুনরাবর্তিত হয়। কিন্তু জলের তৃষ্ণা নিবারণ করার শক্তি অক্সিজেন বা হাইড্রোজেনে নেই —এই নূতন ধর্ম হল উন্মেষিত গুণ। রাসায়নিক মিশ্রনে এরূপ নূতনের আবির্ভাব প্রায়ই দেখা যায়। যেন কোন সুদক্ষ শিল্পী তিনটি সুর মিশিয়ে চতুর্থ এক সুর তৈরী করেন না —এক অনবদ্য রস সৃষ্টি করেন; আর ঐ রস তার উপাদানে ছিটে ফোঁটাও ছিল না। এই নবীনের উন্মেষ উপাদানগুলির সংগঠনেই সম্ভব। কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদি যখন এক বিশিষ্টরূপে সংগঠিত হয়, তখন ঐ সংগঠিত ঐক্যে নূতন জীবধর্ম উন্মেষিত হয়; ঠিক তেমনি নিম্নস্তরের প্রাণিন বস্তুর উন্নত ধরণের সংগঠনে চৈতন্যের বিকাশ হয়, আর ঐ নবরস তাদের উপাদানগত নয়। এই উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশতত্ত্ব প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তরে, নূতন ধর্ম ও মূল্যের সৃষ্টি স্বীকার করে। এই তত্ত্ব অন্তর্লীন উদ্দেশ্যবাদের সঙ্গেও সংগত হতে পারে; অন্ততঃ তার বিরোধী হবে না। আলেকজাণ্ডার বলেছেন যে আজ পর্যন্ত জড়, প্রাণ, মন ও মানসিক মূল্যের বিকাশ হয়েছে; এর পরবর্ত্তী স্তরে যে ধর্মের বিকাশ হবে তার নাম 'দেবধর্ম'। কিন্তু ঐ দেবধর্ম নূতন বলে, বিকাশের পূর্বেই তার স্বরূপ কি হবে তা আন্দাজ করা যাবে না। কেবল এটুকু বলা যায় যে মানুষের আত্মাতেই তার বিকাশ হবে —আরও উন্নতাবস্থায়।

অবশ্য রাসায়নিক সংমিশ্রণে সংগঠিত সামগ্রীর মধ্যে কোন নূতন ধর্মের উন্মেষ পরীক্ষণাগারে প্রমাণিত হলেও, জীবস্তর যে অজীবস্তর থেকেই এসেছে তার কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। জলের যে উন্মেষিত ধর্মের কথা উপরে বলা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই জৈব বা মানসধর্ম নয়—একান্তই ভৌতরাসায়নিক। চার্বাকেরা যে পান, চুন, সুপারীর সংমিশ্রণে রক্তরাগ উদ্ভবের কথা বলেছিলেন, তা অত্যন্ত স্থূল কথা বলে সব দার্শনিকই বর্জন করেছেন। 'রক্তরাগ' কিছু বিজাতীয় স্তরের ধর্ম নয়; সে ধর্মও ভৌতরাসায়নিক। তিনটি বা চারটি সুরের মধ্যে 'রস' যদি প্রচ্ছন্নভাবেও না থাকত তবে তাদের সমাবেশে ঐ ধর্ম কি আকাশ থেকে পড়বে? উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশতত্ত্ব তাই সব সমস্যারই সমাধান করে নি। তবু জড়, প্রাণ ও মনস্তরের বৈজাত্য স্বীকার করতেই হবে; ক্রমবিকাশের ধারা অনবচ্ছিন্ন না মানলে অবৈজ্ঞানিক কথা বলা হয়। তাই ঐ ধারার স্তরে স্তরে নবীনের উন্মেষ স্বীকার না করলে জগতের ব্যাখ্যা হয় না। মানুষ সর্বজ্ঞ নয়; বিশ্বের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য না হলেও, হয়তো উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশের পথেই সমাধান খুঁজতে হবে। এই মত আবার প্রকৃতির স্তরে স্তরে নব নব মূল্যের বিকাশের বিরোধী নাও হতে পারে। আলেকজাণ্ডার বলেছেন যে আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধাবান ও বিনয়াবনত হয়ে প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে নবীনের আবির্ভাব স্বীকার করে নেওয়াই উচিত।

5. সৃষ্টিমূলক ক্রমবিকাশ তত্ত্ব[1]

ক্রমবিকাশের প্রবাহে অসংখ্য নবীনতার সৃষ্টি স্বীকার করে ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ যে সৃষ্টিমূলক ক্রমবিকাশতত্ত্ব স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তা উন্মেষধর্মী তত্ত্বকে বহুলাংশে ছাড়িয়ে গেছে। বার্গসোঁ যদিও বলেছেন যে এই বিকাশ-ধারায় নব নব সত্তার অনবরত সৃষ্টি হয়, তবু তিনি এই স্রোতের মধ্যে কোন পূর্বাপর স্তরভেদ স্বীকার করেন নি। উন্মেষধর্মী তত্ত্ব জড়, প্রাণ, মনের পরম্পরা স্বীকার করে; বার্গসোঁ বর্ণিত ক্রমবিকাশ কিন্তু একান্তই একটি, ছেদহীন, নিরবচ্ছিন্ন স্রোত। এই স্রোতের আবর্তে জড়ের কোন স্থান নেই, কেননা জড় একান্তই স্থাণু ও নিশ্চল। প্রাণের মধ্যেই আমরা স্পন্দনের প্রথম পরিচয় পাই আর প্রাণস্পন্দনের ব্যর্থতাই নিশ্চল জড় বলে প্রতীয়মান হয়; জড় কিন্তু ভ্রান্তি। জগতের আদিম মূলসত্তা হলো এক চিরচঞ্চল 'প্রাণবেগ' (এল'। ভিতাল[2]), যার উপচীয়মান বিক্ষেপে জীবের নানারূপ জাতি-প্রজাতি, এমনকি মানসিক সত্তারও সৃষ্টি হচ্ছে। চলার পথে এই প্রাণবেগ নব নব বস্তুপুঞ্জের আবির্ভাব ঘটিয়ে এগিয়ে যায়। ভবিষ্যতে এই অনবচ্ছিন্ন স্রোতধারা আরও কি কি সৃষ্টি করবে তা এখনই আন্দাজ করা যায় না।

> স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
> বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
> পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেণা উঠে জেগে,
> আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
> ধাবমান অন্ধকার হতে,
> ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
> ... ...
> সূর্যচন্দ্র তারা যত
> বুদ্বুদের মতো। (রবীন্দ্রনাথ)

ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হাউই যেমন আকাশ পথে অজস্র আলোকের ঝর্ণা ঝরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়, তেমনি আদিম প্রাণবেগ বস্তু সৃষ্টি করতে করতে অগ্রসর হয়। হাউইয়ের বেগ যেমন মৃত অবস্থায় ভস্মরূপে পিছনে ঝরে পড়ে, তেমনি প্রাণস্রোতের উলটা গতিই নিশ্চল জড়ের সৃষ্টি করে থাকে। নিশ্চল জড় কিন্তু প্রকাণ্ড মিথ্যা; পরমাণুর অন্তর্নিহিত বৈদ্যুতিক প্রবাহই একমাত্র সত্য। আমাদের ভ্রান্ত বুদ্ধি এই অস্থির প্রবাহকে নিশ্চল ও স্থাণুরূপে উপস্থিত করে। উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশ তত্ত্ব কিন্তু এক নিশ্চল জড়স্তর ও ক্রমবিকাশে তার কারণতাও স্বীকার করে; বার্গসোঁ এমন কোন স্তর স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে প্রাণবেগ ব্যতীত জগতে আর কিছু নেই আর মানসিক চৈতন্যধারাও ঐ প্রাণবেগের প্রক্ষেপমাত্র।

বার্গসোঁর মতে প্রাণবেগের অবাধ, স্বচ্ছন্দ স্রোত একান্তই স্বাধীন ও অনির্দেশ্য; প্রাণবেগই একমাত্র সত্য বলে তা পরতন্ত্র হতে পারে না। বার্গসোঁ এই

1. Theory of Creative Evolution 2. elan vital

গতিবেগের কোন রকম নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন না। যান্ত্রিক কারণতায় পূর্বগামী ঘটনা অনুগামীকে নিয়ন্ত্রিত করে; উদ্দেশ্য কারণতায় অনাগত অভীষ্ট করে বর্তমানের নিয়ন্ত্রণ। বার্গসোঁর মতে উদ্দেশ্যবাদ তাই যন্ত্রবাদের প্রতিলোম পদ্ধতি মাত্র। স্বাধীন প্রাণবেগ কোন যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্য কারণতার অধীন নয়; তার স্বচ্ছন্দ গতি একান্তই বল্গাহীন বলে সে যে কি বস্তু ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবে তা এখনই বলা যাবে না। বার্গসোঁর মতে অসংখ্য জীবকুলের স্বরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তারা যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্য কারণতায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে সৃষ্ট হয় নি। বিচিত্র বর্ণের পতঙ্গরাজির আশ্চর্যজনক বর্ণান্তর, কীটকুলের আকার পরিবর্তন, অকস্মাৎ কোন প্রজাতির সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তর প্রভৃতি জৈব অভিব্যক্তির ঘটনা দেখলে, সৃষ্টি প্রবাহের বেহিসাবী, অনিয়ন্ত্রিত গতি সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। এই স্বাধীন চারণায় জগতের মূলীভূত প্রাণবেগ সরল থেকে জটিল, জটিল থেকে জটিলতর প্রজাতি সৃষ্টি করে চলেছে, আর যত জটিল হয়েছে তত বেশী বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে। বার্গসোঁর মতে এই বিশ্বের ক্রম-বিকাশকে তাই এক অনাদি প্রাণবেগের সৃষ্টি ও প্রকাশ বুঝতে হবে। এই প্রাণবেগের স্বরূপই হলো অনবরত বদলে যাওয়া, অনবরত স্তরহীন বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়া। সমস্ত বিশ্ব এই অবিরাম, অন্ধ, গতিশীল প্রাণবেগের তাড়নায় চিরচঞ্চল হয়ে রয়েছে। যতদিন যায় ততই এই বিকাশের সঞ্চয় বেড়ে চলে; কিন্তু কোন জায়গায় এই প্রাণবেগের থামা নেই। বার্গসোঁ আবার এই প্রাণবেগকে এক অবাধ কালধারা বলেও বর্ণনা করেছেন। কাল বা পরিবর্তনই সত্য; কোন নিশ্চল বস্তু কোথাও নেই; পরিবর্তনই একমাত্র বস্তু।

সমালোচনা ঃ বার্গসোঁ যেহেতু ক্রমবিকাশের মধ্যে কোন রকমের কারণতার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন না, সেই হেতু তাঁর মতবাদ খানিকটা অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি; তার কারণ আমাদের মতে বার্গসোঁর মতবাদ অনেকটা কবিকথা, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া শক্ত। বার্গসোঁ নিজে স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞার পার্থক্য করেছেন আর বলেছেন যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়ে রয়েছে স্বজ্ঞা। এই স্বজ্ঞা হলো নিজের ভিতরে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা; বাইরের থেকে প্রাণবেগকে দেখা বা বিশ্লেষণ করা নয়। প্রাণপ্রবাহে বাহিত হতে হতেই প্রাণকে অনুভব করা হল স্বজ্ঞা। বার্গেসোঁ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাকে মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করেছেন; রবীন্দ্রনাথও "জানা" আর "পাওয়া"র পার্থক্য করেছেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে অবশ্য স্বভাবতঃই অব্যক্ত স্বজ্ঞার এই অনুভূতি সন্দেহজনক ও কাব্যগন্ধময়। বিজ্ঞান কখনও সর্বব্যাপী কারণতা-নীতি অগ্রাহ্য করতে পারে না।

স্বাধীন, স্বতন্ত্র ঘটনা একেবারে সব রকমের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও নিয়মশৃঙ্খলা হীন বলা যায় কি? কোন ঘটনা বা অবস্থা যদি স্বনিয়ন্ত্রিত হয় তা হলেই তাকে স্বাধীন বলা যায়। কোন রকমের নিয়ম না থাকলে, বস্তু বা ঘটনা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বাইরে চলে যায়। কীট-পতঙ্গের হঠাৎ অবস্থান্তরের কারণ হয়তো

আমরা এখনও জানি না ; তাই বলে তারা চিরকালই অনির্দ্দেশ্য থাকবে বলা যায় কি ? একদিন তাদের কারণ বোঝা হয়তো সম্ভব হবে। তাই প্রকৃতির ক্রমবিকাশে স্তরভেদ, পূর্বস্তরের দ্বারা পরবর্তী স্তরের নিয়ন্ত্রণ, ক্রমোন্নত মূল্যের বিকাশের দিকে লক্ষ্য ইত্যাদি না স্বীকার করলে চলে না। "পরিবর্তনশীল বস্তু কিছু নেই ; পরিবর্তনই হলো "বস্তু"—বার্গসোঁর এই অদ্ভুত মত বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। কোন বাধা না পেলে প্রাণবেগ উলটামুখে যাবেই বা কি করে আর জড়ই বা সম্ভব হবে কি করে ? অথচ বার্গসোঁর মতে প্রাণবেগই একমাত্র সৎবস্তু বলে তার আর বাধা কি ? তাই জড়ের উৎপত্তিও আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। বার্গসোঁ অবশ্য বুদ্ধির ধার ধারেন না ; কিন্তু বিজ্ঞান কেবল স্বজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট হতে পরে না। তাই বার্গসোঁ বর্ণিত সৃষ্টিমূলক ক্রমবিকাশ তত্ত্ব আমরা পুরো-পুরি মানতে পারি না ; তবে ক্রমবিকাশের ধারায় নবীন গুণধর্মের আবির্ভাব স্বীকার করে বার্গসোঁ ঠিক পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন বলে মনে হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মন বা আত্মা

1. মন ও মনোবৃত্তি

ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে প্রকৃতির সঞ্চরণ হয় বলে আমরা দেখেছি। জড় ও প্রাণের বৈজাত্য আমরা আগে আলোচনা করেছি; এখন জড় ও প্রাণের সঙ্গে মনের বৈজাত্য বুঝতে হবে। স্মরণ, চিন্তন, অনুভূতি, বিচার, সংকল্প, ইচ্ছা প্রভৃতি চৈতন্যময় ক্রিয়া বা অবস্থাকে মনোবৃত্তি বলে। পাশ্চাত্য দর্শনে এগুলিকে মন বা আত্মার ক্রিয়া বলা হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও 'মন' এবং 'আত্মা' কোন কোন ক্ষেত্রে সমার্থক, যদিও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে এরা ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন বিশেষ অসুবিধা না হলে আমরা এই বাংলা পুস্তকে মন ও আত্মার সমার্থতা স্বীকার করেই অগ্রসর হবো। এই মন বা মনোবৃত্তি, জড় ও প্রাণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চেতনা বা মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সকল পদার্থই প্রাণবান হলেও, অনেক নিম্নস্তরের প্রাণিন পদার্থে চৈতন্যের কোন লক্ষণ নেই। বৃক্ষলতাদির বৃদ্ধি ও ক্ষয়, অর্থাৎ প্রাণ, থাকলেও চৈতন্য নেই; ধারাল অস্ত্র দিয়ে কাটবার সময় তাদের ব্যথা লাগে বলে মনে হয় না। প্রাণিন পদার্থ যখন জটিল হতে হতে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের অধিকারী হয় তখনই প্রাণিন দেহে মনোবৃত্তির সঞ্চার হয়ে থাকে। আবার অনেক কীটপতঙ্গের মধ্যে গন্ধসংবেদন, আলোকবোধ, সুখদুঃখানুভূতি প্রভৃতি প্রাথমিক চৈতন্যাবস্থা থাকলেও, মানুষের মধ্যেই কেবল বিচার, বিবেচনা, সংকল্প, স্মরণ, চিন্তন প্রভৃতি জটিল চেতন-ক্রিয়ার প্রকাশ দেখা যায়। অতএব সকল মনই জীবদেহাশ্রিত হলেও কিন্তু সকল প্রাণীই মানসসম্পদের অধিকারী নয়; এইরূপে সকল জৈব পদার্থ জড়দেহাশ্রিত হলেও, সকল জড়ই প্রাণবান হয় না। জড় ও প্রাণের বৈজাত্য যদি যুক্তিসিদ্ধ হয় তবে, জড় ও প্রাণের সঙ্গে মনের বৈষম্যও স্বীকার করতে হবে।

জড় এবং প্রাণিন পদার্থ বা তাদের কার্যকলাপ সকলেরই প্রত্যক্ষগম্য; একই কালে তারা সর্বলোকবেদ্য হতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তির স্মরণ, চিন্তন, অনুভূতি প্রভৃতি বাহ্য প্রত্যক্ষবেদ্য বৃত্তি নয়। আমি কখনও তোমার বেদনা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করতে পারি না, কেবল ঐ অবস্থায় তোমার বিকৃত মুখভঙ্গি ও গোঙানি প্রত্যক্ষ করতে পারি। আমি যে ভাবে, আন্তর প্রত্যক্ষে, আমার নিজের দন্তশূল উপলব্ধি করতে পারি, সেইভাবে তোমার দন্তশূল অনুভব করতে পারি না। এ কথা হয়তো স্বীকার করা যাবে যে কোন চেতন মনোবৃত্তি স্নায়ু বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীত সংঘটিত হতে পারে না। কিন্তু মনোবৃত্তির

জন্য ঐ ক্রিয়া অত্যাবশ্যক হলেও, তারা এক বা অভিন্ন নয়। জীবন্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া পরীক্ষা করার প্রযুক্তিগত বাধা অপসারিত হলে হয়তো কোনদিন ঐ ক্রিয়া সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কিন্তু আমি যে বেদনা অনুভব করব তা অবশ্যই আমার, তোমার নয়। "আমি কেবল আমার বেদনাই টের পাই" এর অর্থ হল "আমি যে বেদনা টের পাই, কেবল সেই বেদনাই আমি টের পাই"। এই তাদাত্ম্য-বোধক বাক্য কখনই মিথ্যা হতে পারে না। সমবেদনার সাহায্যে হয়তো আমি তোমার ব্যথার ব্যথী হতে পারি; কিন্তু একেবারে এক, অভিন্ন বেদনা আমরা দুজনে অনুভব করতে পারি না। আমাদের দুজনের বেদনা একই গুণ পরিমাণযুক্ত হলেও সংখ্যাগত ভাবে দুটি। তাই আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মনোবৃত্তি একান্তই গোপনীয় ও নিজস্ব। এই আত্মগত ভাবগুলি বাইরের থেকে অপ্রত্যক্ষ। বাহ্য প্রত্যক্ষে কেবল শরীরের নানারূপ বিকার বা আচরণ পাওয়া যেতে পারে, আর কোন বিশেষ আচরণের থেকে কোন বিশেষ মনোবৃত্তির উপস্থিতি অনুমান করা যেতে পারে যেমন, তোমার অশ্রু দেখে তোমার মনোগত বেদনা অনুমান করা যায়। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে অপরের মনোবৃত্তি বাহ্য প্রত্যক্ষগম্য নয়। ঘটপটাদি জড়বস্তু সর্বজন প্রত্যক্ষগম্য তো বটেই এমনকি প্রাণিন জীবকুলের বৃদ্ধি, ক্ষয়, প্রজননক্রিয়া সকলেরই প্রত্যক্ষবেদ্য। প্রাণস্পন্দন সকলেই বাইরের থেকে অনুভব করতে পারে; নাড়ী টিপলে বা বুকে হাত দিলে হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যায় ও দেহস্থ প্রাণের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। কিন্তু গোপনীয় মানসবৃত্তি কিছুতেই সর্বলোকবেদ্য হতে পারে না; আমি কি ভাবছি তা আমি বলে না দিলে তুমি জানবে কি করে? এইভাবে তোমার ইচ্ছাও আমি সাক্ষাৎভাবে টের পাব না। জড় ও প্রাণের এই সর্বলোকবেদ্যতা আর মনোবৃত্তির এই গোপন আত্মগম্যতা, জড় ও প্রাণের সঙ্গে মনের বৈজাত্য ও গুণগত পার্থক্য নির্দেশ করে।

পরন্তু মনোবৃত্তিগুলি সর্বলোক প্রত্যক্ষগম্য নয় বলে তাদের কোন স্থানব্যাপ্তি নেই; কিন্তু জড় ও জীবের কিছু না কিছু স্থানব্যাপ্তি থাকবেই। যে বস্তু কোন দেশকে আশ্রয় করে না তা জড় বা প্রাণবান হতে পারে না। চিন্তন, স্মরণ প্রভৃতি মনোবৃত্তি কিন্তু প্রাণবান জীবদেহকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হলেও, ঐ বৃত্তির কোন দেহ বা স্থানব্যাপ্তি নেই। কোন বর্ণের অনুভূতি হতে হলে আমার চক্ষু বাইরের আলোকতরঙ্গ দিয়ে উত্তেজিত হবে, আর অক্ষিপটের ঐ উত্তেজনা স্নায়ুবাহিত হয়ে মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশকে স্পন্দিত করবে। ঐ স্পন্দনের ফলে যে বর্ণানুভূতি হয় তা কোন স্থানকে আশ্রয় করে না। আলোকতরঙ্গ, অক্ষিপট, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক বা তাদের স্পন্দন সবই ভৌতিক ও তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্থানব্যাপ্ত করে থাকে; যথা, আলোকতরঙ্গ থাকে দেহের বাইরে, মস্তিষ্ক থাকে মাথার ভেতরে। বর্ণের অনুভূতি বা শব্দসংবেদন কিন্তু এক চেতনাবস্থা আর তা কোথায় থাকে তা বলা যায় না। যদি বল যে ঐ অনুভূতি মস্তিষ্কের ভিতরে থাকে, তাহলে, জীবন্ত

মস্তিষ্ককে বিশ্লেষিত করে দেখা যদি কোন কালে সম্ভব হয়, তার কোন অংশে ঐ অনুভূতিকে দেখা যাবার কথা ; কিন্তু অসংখ্য স্নায়ুকোষ ছাড়া ওখানে আর কিছু দেখার সম্ভাবনা নেই। আমি যখন তোমার মঙ্গল চিন্তা করি, তখন এই চিন্তা কতফুট লম্বা বা ক ইঞ্চি চওড়া এ প্রশ্ন অবান্তর ; কিন্তু স্নায়বিক বিদ্যুৎ প্রবাহ সেকেণ্ডে কত ফুট যায়, এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যে চিত্র দেখা যায় বা মুকুরে যে প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, তদনুরূপ চৈতন্যে অধিষ্ঠিত কুতুব মিনারের মনশ্চিত্রের যদি কিছু দৈর্ঘ্য নির্দেশ করি, তবু ঐ নির্দেশকে যাচাই করা যাবে না। তাই বিদেহী মনোবৃত্তি কোন স্থানব্যাপ্ত করে না, অথচ কিছু কাল ব্যাপ্ত করে। বিভিন্ন মনোবৃত্তির মধ্যে অন্ততঃ কালিক পৌর্বাপর্য স্বীকার করতে হয়।

অতএব সর্বজনবেদ্যতা ও স্থানব্যাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে জড় ও প্রাণ ও অন্যদিকে মনের বৈজাত্য স্বীকার করতে হয়, আর বলতে হয় যে মন-রূপ নূতন ধর্মের উন্মেষ হয়েছে পূর্বগামী জৈবস্তরের প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। দেহ ও স্নায়ুতন্ত্র এই নূতন আবির্ভাবের অগ্রগামী সোপান। অমানসিক জৈবস্তরের উপাদানগুলির বিশিষ্ট সংগঠনের উপরেই এই মানসিকতার ক্রমবিকাশ নির্ভর করে।

2. অপরের মনোবৃত্তি কিভাবে জানি ?

মনোবৃত্তির উপরোক্ত লক্ষণ গ্রহণ করলে নানা দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়। আন্তরপ্রত্যক্ষে যতটা সাক্ষাৎভাবে আমি নিজের দন্তশূল জানতে পারি ততটা সাক্ষাৎভাবে তোমার বেদনা আমি জানতে পারি না। এখন প্রশ্ন এই যে, তোমার মনোবৃত্তি কি ভাবে আমার জ্ঞানগোচর হবে। আমরা ইঙ্গিত করেছি যে অপরের মনোবৃত্তি আমরা তার শারীরিক আচরণ দেখে অনুমান করে থাকি যথা, তোমার বিকৃত মুখভঙ্গী, স্ফীতগণ্ড ও গোঙানী প্রত্যক্ষ করে তোমার দন্তশূল অনুমান করতে পারি। অবশ্য আমার নিজের ক্ষেত্রে আর্শিতে আমার মুখবিকৃতি দেখে নেবার পর, আমার বেদনার অনুভূতি অনুমান করতে হয় না। যদিও আমার নিজক্ষেত্রে কখনই অনুমানের প্রয়োজন হয় না, তবুও অপরের ক্ষেত্রে ঐরূপ অনুমান না করে মনোবৃত্তি জানা যায় না।

অপরের মনোবৃত্তি জানবার একমাত্র উপায় যে অনুমানের কথা বলা হল, সংশয়বাদী দার্শনিকেরা তার যৌক্তিকতায় সন্দেহ করেছেন। ধূম দেকে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করার পর, ঐ ধূমযুক্ত স্থানে গিয়ে বহ্নিকে প্রত্যক্ষ করে আমরা ঐ অনুমানের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারি। কিন্তু তোমার অশ্রু দেখে তোমার দুঃখানুভূতি অনুমান করলে ঐ অনুমানের যৌক্তিকতা কখনই যাচাই করা যাবে না ; কারণ তোমার অনুভূতি আদপেই আমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগম্য নয়। আর এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না যে, কুশলী অভিনেতা, মনে একেবারে উদাসীন থেকেও, আচরণের দ্বারা বেদনার প্রকাশ করতে পারেন। পরন্তু কোন

স্বয়ংক্রিয় রবট্ বা যান্ত্রিক পুতুল যদি একেবারে হুবহু তোমার মতো মুখভঙ্গী বা দৈহিক আচরণ করে, তা হলে তার সঙ্গে তোমার মুখভঙ্গী বা আচরণের পার্থক্য আমি কিভাবে করব? কোথায় সেই পার্থক্য, যার সাহায্যে আমি এক যায়গায় মনোবৃত্তির উপস্থিতি ও অন্য যায়গায় অনুপস্থিতি অনুমান করতে পারি?

কিন্তু জ্ঞান হতে হলেই যে জ্ঞানের বিষয়কে সাক্ষাৎ অনুভূতিগম্য হতে হবে এমন বলা যায় কি? তেজস্ক্রিয়তার উপস্থিতি অনুভব না করেও যেমন যন্ত্রের (গাইগার কাউণ্টার) সাহায্যে তার উপস্থিতি জানা যায়, তেমনি অপরের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ না জানলেও, দৈহিক আচরণ থেকে মনোবৃত্তির অনুমান করলেও জ্ঞান হতে পারে। অনুমানগম্য জ্ঞান কি জ্ঞান নয়? যে শারীরিক আচরণ থেকে মনোবৃত্তির অনুমান হবে তা কেবল প্রত্যক্ষ করলেই হয় না; তার পূর্বাপর প্রসঙ্গ, পারিপার্শ্বিক ও পরিপ্রেক্ষিতও বিচার করতে হবে। রঙ্গমঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কাউকে অভিনেতা বলে বুঝি, তবে সেখানে মনোবৃত্তি অনুমান করতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই। পূর্বাপর প্রসঙ্গভেদে প্রত্যক্ষগম্য কারুর অশ্রু, আনন্দাশ্রু না বিষাদাশ্রু, তা নির্ণয় করা কঠিন নয়। আর পারিপার্শ্বিক বিচার করে বস্তুটিকে যদি রবট্ বা যান্ত্রিক পুতুল বলে বুঝি, তবে সেখানে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনোবৃত্তির অনুমান একেবারেই করেন না। তাই সংশয়বাদীর যুক্তি খানিকটা আত্মঘাতী হয়; কেননা রবট্ বা গণকযন্ত্র, যার কোন মনোবৃত্তি থাকতেই পারে না বলে জানি, তার উল্লেখ না করে সংশয়বাদী তাঁর বক্তব্যই রাখতে পারেন না। তা ছাড়া কেবল বাইরের আচরণই নয়; নানারূপ যন্ত্রের যাহায্যে রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুমান আরও সুদৃঢ় হতে পারে। কখনো কখনো অবশ্য এই অনুমান ভ্রান্ত হবে; তাই বলে এরূপ অনুমান কখনই ঠিক হয় না বলা যাবে না।

আমার নিজক্ষেত্রে অবশ্য দৈহিক আচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুভূতিগম্য মনোবৃত্তির সম্পর্ক দেখার বাধা নেই; তাই অপরের মধ্যে অনুরূপ দৈহিক আচরণ দেখে মনোবৃত্তির অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়। মানুষে মানুষে যেমন ভিন্নতা আছে, তাদের সাদৃশ্য বা ঐক্যও কিছু কম নয়। বিদেশী জনতার মানুষদের মধ্যে এতই মিল দেখা যায় যে তাদের তফাৎ করাই কঠিন। চীনা বা নিগ্রো জনতার সকলকেই আমাদের একরকম বলে মনে হয়। তাই আমার মতো মনোবৃত্তি তোমার থাকা আশ্চর্য নয়। অপরের মনোবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের সাদৃশ্যমূলক অনুমান যদি সব সময় মিথ্যা হত তবে সংসার যাত্রা নির্বাহ হতো না; এক ভাষা দিয়ে পরস্পর মনোভাব প্রকাশ করতে পারতাম না। সামাজিক মানুষেরা সকলেই প্রায় একই রকমের ব'লে, বিশেষ দেশাচার ও সাধারণ আচরণবিধি মানুষ গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের দ্বারা অপরের মনোবৃত্তি জেনেই আমাদের কাজ চলে; আর যতক্ষণ

পর্যন্ত এই উপযোগ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ ঐ জ্ঞানের প্রায়োগিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রকল্পেও কেবল কাজ চালানো গোছের প্রায়োগিক সত্যতা থাকে। তাই অপরের মনোবৃত্তিতে বিশ্বাস খুব দুর্বল নয়।

3. আত্মা ও আত্মজ্ঞান[1]

আন্তর প্রত্যক্ষে যে সব গোপন মনোবৃত্তি পাওয়া যায় তারা স্মরণ, চিন্তন, অনুভূতি, সংবেদন, অভিলাষ ভেদে বহুবিধ, আর একই ব্যক্তির মনোবৃত্তিগুলির মধ্যে কালিক পরম্পরা দেখা যায়। মন বা আত্মাকে কিন্তু কোন বিশেষ মনোবৃত্তি অথবা কতকগুলি মনোবৃত্তির সমষ্টির সঙ্গে অভিন্ন বলা চলে না। স্বপ্নহীন প্রগাঢ় নিদ্রায় চেতনবৃত্তির অভাব থাকলেও মনের অনস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। কোন কোন মনোবিৎ মনের অচেতন বৃত্তিও স্বীকার করেছেন। তাই মনে হয় পরিবর্তনশীল মনোবৃত্তিগুলিকে ছাড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের এক অপরিবর্তনীয় মন বা আত্মা। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বলে যে, আমার মনোবৃত্তিগুলির যতই পরিবর্তন হোক না কেন, আমার আত্মা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক, অভিন্ন থাকে; অন্ততঃ এই রকমই আমাদের সাক্ষাৎ প্রতীতি। অর্থাৎ মন বা আত্মা হল স্মরণ, চিন্তন, অনুভূতি প্রভৃতি অসংখ্য মনোবৃত্তির আধার, আর মনোবৃত্তিগুলি মনে বা আত্মায় আধেয়। এখন প্রশ্ন এই যে, চলমান চেতনবৃত্তির পশ্চাতে এই এক অখণ্ড আত্মা, অহম্ বা মনের স্বরূপ কি। অসংবদ্ধ চেতনবৃত্তিগুলি ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব গঠন করে না; ঐগুলি সংগঠিত হয়ে এক তন্ত্রের অংশীভূত হলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। জড় বা প্রাণের ঐক্য থেকেও এই আত্মিক ঐক্যের সংহতি নিবিড়তর—নৈতিক ও জ্ঞানজীবনে এর স্ফুরণ দেখা যায়। তাই দার্শনিকের প্রশ্ন হল, এক ব্যক্তির জীবনে যে সব মনোবৃত্তি দেখা যায়, তাদের ঐক্য কিভাবে সম্ভব হয়; আত্মা বা মনেরই বা স্বরূপ কি? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

আত্মজ্ঞানও এক দার্শনিক সমস্যা সৃষ্টি করে। আমি যেমন আমার জ্ঞানের বিষয়গুলিকে—ঘটপটাদিকে—জানতে পারি তেমনি, অনেকের মতে, আমি নিজেকে বা আমার জ্ঞানকেও জানতে পারি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের জ্ঞানকে 'আত্মজ্ঞান' বলা যায়। আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্ত বলেছেন যে আত্মজ্ঞান কেবল সম্ভবই নয়, এই জ্ঞান বহিস্থ বস্তুর জ্ঞানাপেক্ষা অনেক বেশী নিঃসংশয় ও সহজ। আমাভিন্ন সকল বিষয়ের অস্তিত্ব সন্দেহ করা গেলেও এই চেতন রূপী 'সন্দেহ' কখনো সন্দিগ্ধ হয় না; হলে একটা সন্দেহ থেকেই যায়। তাই চিন্তনক্রিয়া (সন্দেহ) কখনও সন্দিগ্ধ হয় না ব'লে চিন্তাশীল আত্মাও সন্দিগ্ধ হয় না। "আমি চিন্তা করি, তাই, আমি আছি" একেবারে নিঃসংশয়, অবশ্যম্ভব জ্ঞান। আমার আত্মার অস্তিত্বে কখনও সন্দেহ হতে পারে না।

1. Self and Self-Consciousness

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট্ কিন্তু বলেছেন যে জ্ঞাতা কখনও জ্ঞাত হতে পারে না। যে জ্ঞাতা জ্ঞানক্রিয়া নিষ্পন্ন করবে সেও ,যদি ঘটপটাদি বিষয়ের মতো জ্ঞাত হয়, তবে তার স্বরূপহানি হতে বাধ্য। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের পার্থক্য যদি অটুট থাকে তাহলে 'অহম্' পদবাচ্য আত্মা বা জ্ঞাতা জ্ঞানাতীত অলৌকিক পদার্থ। অদ্বৈতবেদান্তও চৈতন্যকে অবিষয় বলে। কিন্তু শঙ্করাচার্য আত্মাকে সর্বথা জ্ঞানাতীত বলেন না। তাঁর মতে বিষয়রূপে আত্মজ্ঞান না হলেও, আত্মা স্বপ্রকাশ। অন্ধকার গৃহে দীপশলাকা যেমন বস্তুপ্রকাশ করে নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়ে থাকে, দীপকে দেখার জন্য যেমন অন্য দীপের প্রয়োজন নেই, তেমনি বিষয়কে প্রকাশ করেই স্বয়ম্প্রকাশ চিদ্‌রূপী আত্মা বিষয়ীরূপে প্রকাশিত থাকেন। স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার বলেছেন যে দেশকালাবচ্ছিন্ন বিষয়রাজিকে আমরা "জানি," কিন্তু আত্মাকে ঐ বিষয়জ্ঞানের মধ্যেই "ভোগ করি"। যে ভাবেই জানি না কেন, চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়; এক চৈতন্যকে সন্দেহ করতে হলে অন্য চৈতন্যই তা করবে; তাই চৈতন্য নিঃসন্দিগ্ধ।

এবার আত্মার স্বরূপালোচনা করতে হবে।

4. আত্মা—আধ্যাত্মিক দ্রব্য[1]

কোন ব্যক্তির চলমান মনোবৃত্তিগুলির একত্ব সম্পাদনের জন্য এক অপরিবর্তনীয় মূলসত্তা খুঁজতে গিয়ে মন বা আত্মাকে এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলা হয়েছে। জড়দ্রব্যকে যেমন ভৌতিক গুণাবলীর আধার বলতে পারি, আত্মাকেও তেমনি এক বিশেষ ব্যক্তির সকল মনোবৃত্তির আশ্রয় বা আধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দ্রব্য আধ্যাত্মিক—জড়দ্রব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোই প্রথমে দেহ ও আত্মার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করেন ও পরে দেকার্ত ও তাঁর অনুগামীরা ঐ তত্ত্বের আরও সম্প্রসারণ করেন। এই সব দার্শনিকের মতে আত্মা হল দেহহীন এক অধ্যাত্মবস্তু আর ঐ স্থায়ী দ্রব্যটি সতত সঞ্চরণশীল মনোবৃত্তিগুলির অধিষ্ঠানমাত্র। প্রত্যেক মানুষ যেন দুটো দ্রব্যের সমাহার—এক জড়াত্মক দেহ ও অন্যটি দেহহীন আত্মা। আত্মা দেহ ত নয়ই, কোন বিশেষ মনোবৃত্তি বা তাদের সমষ্টিও নয়। এই আত্মা প্রত্যেক মানুষে ভিন্ন ভিন্ন।

অবশ্য ভাষায় যখন নিজের বর্ণনা দেই তখন দেহতে আত্মবুদ্ধির নির্দেশ থাকতে পারে। যখন বলি "আমি মোটা" বা "আমি ঢ্যাঙ্গা" তখন আমার দেহই 'আমি' বা 'অহম্'-পদবাচ্য বলে মনে হয়; কেননা দেহই কেবল মোটা, লম্বা বা বেঁটে হতে পারে। দেহহীন আত্মা তা হতে পারে না। "আমি সাড়ে পাঁচফুট লম্বা, অথচ আমার দেহ সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা নয়"—এই উক্তি স্ববিরোধী। কিন্তু ভাষার এই নির্দেশ খুব নিয়মিত নয় ও সব সময় দেহের সঙ্গে আত্মার একত্ব পরিচায়কও নয়। যখন বলি "আমি চিন্তা করি" বা "আমি স্মরণ করি" তখন আমি আমার মনকেই নির্দেশ করি। এর কারণ হলো শরীর

1. Soul—a spiritual substance

চিন্তা বা স্মরণ করে না, যদিও মনকে চিন্তা করতে হলে দেহকে আশ্রয় করতে হয়। এই ভাবে "আমি বিশ্বাস করি," "আমি স্বপ্ন দেখি," "আমি দুঃখিত," "আমি আনন্দিত," প্রভৃতি বাক্য আমার মনকেই প্রধানতঃ "আমি" বলে নির্দেশ করে। তাই ভাষার নির্দেশ থেকে নিয়মিতভাবে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা যায় না। "আমার বৌ আছে" বাক্যের নির্দেশ হল আমি আর আমার বৌ ভিন্ন। এই ভাবে যখন বলি "আমার দেহ আছে" তখন আমি ও আমার দেহ ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। অবশ্য "আমার মন আছে" বলতেও আপত্তি নেই, আর তাই মনে হয় ভাষার নির্দেশ দিয়ে কোন কিছু ঠিক করা যাবে না। যে সব দার্শনিকেরা বলেন যে আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য তাঁদের মতে "আমি হচ্ছি আমার মন" বাক্যটিই সত্য এবং "আমি কেবল আমার দেহ" বাক্যটি একান্তই ভ্রমাত্মক। এই মন বা আত্মার সঙ্গে শরীর সম্পৃক্ত হয়ে থাকলেও, প্লেটো, সেইন্ট্ অগাস্টিন ও মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা দেহকে আত্মার "পিঞ্জর" বা "কয়েদখানা" বলেছেন। ভারতীয় দর্শনেও এই মত বহুলপ্রচারিত। ভগবদ্‌গীতা বলছেন, "হন্যমান শরীরে আত্মাকে হনন করা যায় না" আর "জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে নূতনবস্ত্র ধারণের মতো, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে আত্মা নূতন দেহ ধারণ করে"। এই মতে আত্মা দেহহীন অবস্থাতেও থাকতে পারে আর এতে করে আত্মার অমরতা বা নিত্যতা সূচিত হয়।

প্রাচীন মানুষেরা আত্মাকে শরীরেরই এক ছায়াময় প্রতিরূপ বলে মনে করত ; স্বপ্নে এই ছায়া সাময়িকভাবে ও মৃত্যুতে স্থায়ীভাবে যেন শরীরকে ছেড়ে যায়। এই ছায়ার খানিকটা স্থানব্যাপ্তি থাকেই ও প্রাচীন গ্রীকদর্শন আত্মাকে জড় বলেই কল্পনা করেছে। কখনো কখনো একে শরীরস্থ বাষ্প বা বায়ুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ডিমক্রিটাস একে অতিসূক্ষ্ম, মসৃন, গোলাকার বহ্নি-পরমাণু বলে মানতেন। প্লেটোই প্রথমে শরীর ও মনের বিচ্ছেদ ঘটান এবং জ্ঞানবান আত্মাকে নিত্য ও শরীরাতিগ বলে বর্ণনা করেন। প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিগ্রাহ্য নিত্য জ্ঞানের জন্য আত্মা শরীরেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে না, যদিও নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি, যথা—বীর্য, ইচ্ছা ও প্রত্যক্ষপর জ্ঞানের জন্য আত্মাকে শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয়। আত্মার বৌদ্ধিকরূপই হল তার প্রকৃতরূপ আর ঐ আত্মা দেহাতিগ, নিত্য দ্রব্য। প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটল অবশ্য দেহ-মনের সম্পর্ক আরও নিবিড় বলে মনে করেন। তিনি মনকে দেহের সংগঠন ও পূর্ণতা বলে বর্ণনা করেছেন। আত্মার জন্যই দেহ অখণ্ডতা প্রাপ্ত হয় ও আত্মার মধ্য দিয়েই দেহের চরম অভীষ্ট লাভ হয়। এ্যারিস্টটলের মতেও আত্মা দেহাতিরিক্ত সত্তা আর বুদ্ধিই তার প্রকৃত স্বরূপ, সে দেহের চালক বা নিয়ন্তা।

'আত্মা', 'মন' প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্য পদ বলে এরা কোন দ্রব্যকেই নির্দেশ করে বলে দার্শনিকেরা মনে করেন। তাই প্লেটো-এ্যারিস্টটলের উপরোক্ত মত দেকার্ত আরও বিশদভাবে প্রচার করেন। জন লক্ ও বিশপ বার্কলিও তাঁর

অনুগামী হন। দেকার্ত আত্মা ও জড়শরীরের মধ্যে পার্থক্য, এমনকি বিরোধিতাও স্বীকার করেছেন। জড়দ্রব্যের প্রধান গুণ হল স্থানব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি ; এতে চৈতন্যের একান্ত অভাব থাকে। লোহা, সীসা এমনকি মানুষের শরীরও এই প্রকারের জড়দ্রব্য। আত্মা কিন্তু অজড়দ্রব্য এবং এর স্থানব্যাপ্তি নেই ; এর মুখ্য গুণ হল চৈতন্য। আত্মা চৈতন্যময় অথচ তার স্থানব্যাপ্তি নেই ; জড় অচেতন আর তার স্থানব্যাপ্তি থাকবেই। তাই এরা বিরুদ্ধ দ্রব্য। মানুষের মধ্যে শরীর ও মনের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক থাকলেও, মানুষে দুইটি দ্রব্য সমাবিষ্ট হয়েছে—আত্মা ও জড়-শরীর। আধুনিক কালে গিল্‌বার্ট রাইল দেকার্তের মতে আত্মাকে "দেহযন্ত্রমধ্যস্থ প্রেত" বলে বর্ণনা করেছেন। এই মতে দেশব্যাপ্ত শরীর চিন্তা করে না—কিন্তু যান্ত্রিক কারণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিদেহী আত্মা কিন্তু চিন্তা করে আর কোন দেশস্থ নয় বলে অনিয়ন্ত্রিত, স্বাধীন। এই আত্মা অযুগ্ম, অবিভাজ্য, আধ্যাত্মিক দ্রব্য এবং চৈতন্যময় মনোবৃত্তিসমূহের মালিক ; মনোবৃত্তিগুলো নিয়ত পরিবর্তনশীল হলেও তাদের স্বত্ব থাকে আত্মায়। এরা আত্মার সম্পত্তি—আত্মা এদের এক অপরিবর্তনীয় আধার। ইংরাজ দার্শনিক জন লক্‌ও আত্মাকে সব মনোবৃত্তির আধার বলে কল্পনা করেছেন আর বিশপ বার্কলিও অনুরূপভাবে এই আধ্যাত্মিক দ্রব্যকে মানসিক ধারণাগুলির থেকে স্বতন্ত্র বলে নির্দেশ করেছেন। মানুষের মধ্যে এই আত্মা সাময়িকভাবে শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় ; কিন্তু স্বরূপতঃ এই দেহহীন আধ্যাত্ম দ্রব্যের নিত্যতা স্বীকার করতে হয়।

সমালোচনা ঃ আমরা বলেছি যে রাইল দেকার্তের আধ্যাত্মদ্রব্যকে দেহযন্ত্রস্থ প্রেত বলে বর্ণনা করেছেন। রাইলের মতে দেকার্তের মতটি কেবল অংশতঃ নয়, সর্বসাকুল্যেই একটা বিরাট ভ্রান্তি। এই মতের সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হল শরীর ও মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। আত্মার কোন স্থানব্যাপ্তি নেই বলে সে শরীরের বাইরে বা ভেতরে থাকতে পারে না এমনকি মস্তিষ্কের মধ্যেও না ; কেননা আত্মার পক্ষে কোন এক স্থানে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এমন আত্মা খুবই রহস্যময়। "আত্মা শরীরের ভেতরে থাকে" এই কথা, এই মতে, "গণিতের কোন সমীকরণ সিনেমা দেখতে যায়",* —এ কথার মতই অদ্ভুত। মনোবৃত্তিগুলি যদি আত্মায় আধেয় হয় তবে তাদেরও স্থানব্যাপ্তি থাকবে না ; তা হলে স্থানব্যাপ্ত মস্তিষ্কবৃত্তির সঙ্গে তারা কারণতা সম্পর্কে কি করে সম্পৃক্ত হবে ? অথচ দেকার্ত মনোবৃত্তিকে মস্তিষ্কবৃত্তির কারণ ও মস্তিষ্কবৃত্তিকেও মনোবৃত্তির কারণ বলেছেন। দেহের বৃত্তি যদি আত্মা বা আত্মিকবৃত্তির দ্বারা একবারও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে দেহকে পুরোপুরি যান্ত্রিক কারণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলা চলে কি ? অথচ দেকার্ত দেহকে পুরোপুরি যান্ত্রিক বলেছেন। এই রহস্যময় আত্মার অস্তিত্ব যাচাই করার কোন উপায় দেখা যায় না।

কার্তেসীয় মতের বিরুদ্ধে ডেভিড্ হিউমের এক বিখ্যাত, প্রায়শঃ উদ্ধৃত, উক্তি আছে। তিনি বলেছেন "বহু দার্শনিক মনে করেন যে তাঁরা নাকি প্রতিমুহূর্তে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে নিজেদের আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আছেন।

আমি কিন্তু যখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমি যাকে আমার "মন" বলি তাতে প্রবিষ্ট হই, তখন সব সময় আমি কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ বা সংবেদনের সঙ্গে ধাক্কা খাই— যেমন উত্তাপ বা শৈত্য সংবেদন, আলোকান্ধকার বোধ, ভালবাসা বা ঘৃণার অনুভূতি, সুখদুঃখচেতনা ইত্যাদি। আমি কখনও আমার আত্মাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বলে ধরতে পারি না ; কেবল প্রত্যক্ষকেই পেয়ে থাকি।" (ইংরাজী থেকে ভাবানুবাদ)। হিউম্ এখানে 'প্রত্যক্ষ' বলতে সব রকমের মনোবৃত্তিই বুঝেছেন। এইভাবে তিনি মনোবৃত্তির আধার কোন অধ্যাত্মদ্রব্যকে, প্রত্যক্ষ প্রমাণহীনতায়, অস্বীকার করে, কেবলমাত্র মনোবৃত্তিধারাকেই সত্য বলে বরণ করলেন।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে কাণ্ট্ও এই, অধ্যাত্মদ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন। কাণ্টের মতে 'অহম্'—পদবাচ্য আত্মাকে যদি অযুগ্ম, অবিভাজ্য, নিত্য, চৈতন্যময় দ্রব্য বলে বর্ণনা করি, তা হলে আত্মা জ্ঞানের বিষয় হয়ে পড়বে এবং ঐ বিষয়জ্ঞানে কোন না কোন বিষয়ীর বা জ্ঞাতার সংকেত থাকবে। এ ক্ষেত্রে একই বস্তু জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী হয়ে পড়ে। কিন্তু বিষয়ী চিরকালই জ্ঞাতা, কখনও জ্ঞেয় বিষয় হতে পারে না। কার্তেসীয় মত জ্ঞাতা আত্মাকে বিষয়গত করে তার স্বরূপহানি ঘটিয়েছে। হিউমের মত কাণ্ট্ও বলেছেন যে কেবলমাত্র মনোবৃত্তিগুলিই আন্তরপ্রত্যক্ষে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হতে পারে—'আমি' পদবাচ্য জ্ঞাতা কখনও জ্ঞাত হয় না এবং "দ্রব্য-গুণ" ধারণার সাহায্যে বর্ণনার অযোগ্য।

পরন্তু ঐ অধ্যাত্মদ্রব্য বিভিন্ন মনোবৃত্তির ঐক্য সম্পাদন করতে পারে না। অপরিবর্তনীয় এই নিষ্ক্রিয় অধিকরণ নিজেকে চলমান মনোবৃত্তি প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে অপারগ। এই বৃত্তিসমূহের স্বত্ব যে কি করে আত্মায় থাকে তারও ব্যাখ্যা নেই। আত্মা বৃত্তিগুলির মালিক হলেও, কোন বিশেষ বৃত্তি বা তাদের সমষ্টিও যদি না হয় তা হলে বৃত্তিহীন আত্মা একান্তই স্বভাবশূন্য ও রহস্যময় হয়ে পড়ে। তাই বিমূর্ত আধ্যাত্ম দ্রব্য স্বীকারে কোন যুক্তি নেই।

5. আত্মা সম্পর্কে প্রত্যক্ষবাদী মত[1]

ডেভিড্ হিউম্ অন্বয় অধ্যাত্ম আত্মার কোন সংবেদন হয় না বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতো প্রত্যক্ষবাদীদের মতে যে বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ বা সংবেদন হয় না, তার সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান সম্ভবপর নয় আর তার অস্তিত্বও জানা যায় না। "গগনকুসুম" একান্তই অলীক। আন্তর প্রত্যক্ষে আমরা কেবল আমাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল মনোবৃত্তিগুলির সাক্ষাৎ পাই বলে, আত্মা বা মন বলতে আমাদের ঐ চেতনবৃত্তিগুলিরই সমষ্টি বুঝতে হবে। চিন্তা, আবেগ, ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি 'প্রত্যক্ষ' বা মনোবৃত্তি আমাদের কিছু না কিছু সর্বদাই হচ্ছে। কোন এক ব্যক্তির মন হল তার জীবদ্দশায়

1. Empirical Theory

সংঘটিত যাবতীয় প্রত্যক্ষরাজির এক সমষ্টি। এই মতের সুবিধা হল এই যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ যোগ্য বস্তুই কেবল এখানে স্বীকার করা হয়েছে। হিউম্‌ বলেন যে নৈকট্য, কারণতা ও সাদৃশ্যের অনুষঙ্গ-নিয়মে আমাদের বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে আপনাআপনি সম্বন্ধ স্থাপিত হয় আর ঐ ভাবেই তাদের ঐক্যবিধান হয়ে থাকে। যথা—বহ্নি ধূমের একটি কারণ বলে ধূমের ধারণা বহ্নির ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে; তাজমহলের ধারণা যমুনা নদীর ধারণার সঙ্গে নৈকট্য নিয়মে সংবদ্ধ; সাদৃশ্য থাকার জন্য পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ প্রাণপ্রিয়ার ঘনকৃষ্ণ কুন্তলের মনশ্চিত্র স্মরণে আনতে পারে। কোন বিশেষ মুহূর্তের "আমি" হলাম আমার তৎকালীন চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতির অনুষঙ্গনিয়মে সংবদ্ধ সমষ্টিমাত্র—এই সব সতত পরিবর্তনশীল চেতনাবৃত্তির অতিরিক্ত কোন অধিকরণ বা অধ্যাত্ম দ্রব্যের কোন প্রমাণ নেই। এই সমষ্টিগুলি ভিন্ন মানুষে ভিন্ন, এবং আমার মধ্যেও প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন হয়ে যায়। ব্যক্তির অন্তর্গত এই চেতন বৃত্তির ধারাই হল আত্মা। বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও প্রত্যক্ষবহির্ভূত পদার্থকে অস্বীকার করতে গিয়ে মানুষের আত্মাকে "নাম-রূপ সংঘট" বলে বর্ণনা করেছেন। "নাম" শব্দের অর্থ হলো সংস্কার, বেদনা, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোবৃত্তি আর 'রূপ' শব্দের অর্থ হল বিভিন্ন শারীর বৃত্তি; এদের সমষ্টিই হলো আত্মা। এই "নাম-রূপ" বৌদ্ধমতেও চঞ্চল দীপশিখার মতো নিয়ত পরিবর্তনশীল।

সমালোচনা ঃ কিন্তু চিন্তা বা অনুভূতিগুলো কি ভাবে যে কোন অধিকারী ছাড়াই বিকশিত হতে পারে তা বোঝা যায় না। চিন্তা যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায় না—কোন ব্যক্তি বা মনের আধিপত্য তাদের উপর থাকতেই হয়। প্রত্যেকটি মনোবৃত্তিকে আমাতে বা অন্য কোন ব্যক্তিতে আধেয় হয়ে থাকতে হয়। "আমি" তাহলে কেবল মনোবৃত্তির সমষ্টি হতে পারি না। হিউম্‌ অবশ্য বলতে পারেন যে মনের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন নি; কেবল তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে মনের অর্থ বিশদ ও স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। কিন্তু মনোবৃত্তির এক অধিকারী ছাড়া মনের প্রকৃত বিশ্লেষণ হয় কিনা সন্দেহ। 'আধার—আধেয়' ভাব যদি ত্যাগ করি তা হলে, কোন চেতনবৃত্তি 'আমার' আর অন্য কোন চেতনবৃত্তি 'তোমার', এমন কি করে বলা যায়? হিউম্‌ যখন বল্লেন "আমি যখন খুব অন্তরঙ্গভাবে আমাতে প্রবিষ্ট হই…" ইত্যাদি, তখন "আমি" বলতে কি তিনি কোন চেতনবৃত্তির সমষ্টি বুঝেছেন? তাহলে তাঁর কোন্‌ "আমি" তাঁর মনোবৃত্তির সঙ্গে ধাক্কা খেল? হিউমের কথাই যেন প্রমাণ করে যে আমার মনোবৃত্তির সঙ্গে আমার এক নিবিড় স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্পর্ক রয়েছে যা অস্বীকার করা কঠিন। অনেক দার্শনিক বলেছেন—যে আমার যখন কোন অনুভূতি বা সংবেদন হয়, তখন অধিকরীরূপে আমার আত্মজ্ঞানও হয়ে থাকে। কেবল অনুভূতিরূপেই তার বোধ হয় না, "আমার অনুভূতি"-রূপেই হয়। আত্মজ্ঞান এই সমগ্র অনুভূতির অংশরূপেই থাকে।

হিউম্ বলেন যে প্রথমে যে মনোবৃত্তিগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে তারা অনুষঙ্গ-নিয়মে সংযুক্ত হলে পর সমষ্টিগত হয়। কিন্তু কাণ্ট্ বলেছেন যে অনুষঙ্গ-নিয়মের সাহায্যে স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না; অনুষঙ্গকে সম্ভব হতে হলে স্মরণকে তার পূর্বতোসিদ্ধ হতে হয়। দুই প্রকারের অনুভবকে নৈকট্য সম্বন্ধে সংবদ্ধ হতে হলে, তাদেরকে একই চৈতন্যে কয়েকবার পুনরাবৃত্ত হতে হয়; পূর্ববর্তী অনুভবগুলি যদি পরবর্তীগুলিকে প্রভাবিত করে অনুষঙ্গ সৃষ্টি করতে চায়, তবে তাদেরকে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। তাই স্মরণ না হলে অনুষঙ্গই সিদ্ধ হতে পারে না। কাণ্টের মতে স্মৃতি হতে হলে একজন স্মরণকর্তা অবশ্য প্রয়োজন; ঐ কর্তা সক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিগুলি সংবদ্ধ করে। পরন্তু যখন কোন ধারণা স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে তখন তদনুরূপ অনুভূতি যে পূর্বে আমার হয়েছিল তা বুঝতে পারি; একে "প্রত্যভিজ্ঞা" বলে। এখন পূর্বের অনুভূতিকাল থেকে বর্তমান স্মৃতিকাল পর্যন্ত সমস্ত সময় জুড়ে যদি আমি এক বা অন্বয় না থাকতাম তবে স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা কিছুই সিদ্ধ হতে পারত না। 'আমার' কোন অনুভূতি হলে তার মনশ্চিত্র 'তোমার' স্মৃতিপটে ফুটতে পারে না; আমার অনুভূতি আমার স্মৃতিতেই ভাসমান হয়। তাই স্মৃতিতে মন বা আত্মার এক অপরিবর্তিত অন্বয়সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমার এই একত্ব কখনই অনুষঙ্গনিয়মে আবদ্ধ মনোবৃত্তির সমষ্টিমাত্র হতে পারে না। আমার একত্ব স্বীকার করে নিলেই স্মৃতি, অনুষঙ্গ বা প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন আনুক্রমিক মনোবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আমার একাত্মতার সাক্ষাৎ অনুভবকে প্রত্যক্ষবাদীরা ভুয়া বা মিথ্যা বলতে বাধ্য। বৌদ্ধ দার্শনিকেরাও ঐ ব্যক্তিগত একত্ব-বোধকে ভ্রমাত্মক বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। অথচ এই একাত্মতাবোধ কি সাক্ষাৎ অনুভূতিগম্য নয়?

আমার আনুক্রমিক মনোবৃত্তিগুলির পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে সতত-সঞ্চারমান চেতনবৃত্তিগুলিকে এক ঐক্যের নিয়মে গ্রথিত করতে হয়; এই ঐক্যের নিয়ম অনন্য, অন্বয় 'আমি' থেকেই আসতে পারে। মনোবৃত্তিগুলি যদি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যেত, পূর্বাপর বৃত্তিকে যদি একত্র করে দেখা না যেত, তা হলে মনোবৃত্তির ধারাকে "ধারা" বলে বোঝা যেত না। তাই এই কালগত ধারার বাইরে কাণ্ট্ এক অলৌকিক "আমি" স্বীকার করেছেন; আর এই আমিই বৃত্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে থাকি। উপরন্তু কাণ্টের মতে হিউম্ যে মনোবৃত্তির সমষ্টিরূপ আত্মা স্বীকার করেন তা আন্তরপ্রত্যক্ষের বিষয়। হিউম্ বলেন যে চেতনবৃত্তিকে আন্তরপ্রত্যক্ষে জানতে পারি; কিন্তু "জ্ঞাতা-আমি"র সংবাদ এই "জ্ঞাত-আমি"তে থাকে না। অথচ জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞান হয় না। আধ্যাত্মিক দ্রব্যবাদী যেমন জ্ঞাতা আমিকে জ্ঞেয়বিষয়রাজ্যে রাখেন, প্রত্যক্ষবাদীমতও, কাণ্টের মতে, অনুরূপ দোষে দুষ্ট। হিউমের এই বিষয়মুখিতা মনোবিদ্যার ইতিহাসে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

6. আচরণবাদ বা ব্যবহারবাদ[1]

আমরা দেখেছি যে মনোবৃত্তিগুলি সর্বলোকপ্রত্যক্ষগম্য নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে গুপ্ত এই চেতনবৃত্তিগুলি কেবলমাত্র প্রত্যেকের নিজ নিজ আন্তরপ্রত্যক্ষে প্রণিধান যোগ্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয় হিসাবে এই আত্মগত মনোবৃত্তিগুলিই নির্বাচন করে নিয়েছে। স্মরণ, চিন্তন, সংবেদন, সংকল্প, অভিলাষ প্রভৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তাদের সম্ভাবনার নিয়মগুলির বর্ণনাই মনোবিজ্ঞানের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব মনোবৃত্তির পশ্চাতে অদ্বয় আত্মা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ কোন মাথাব্যথা নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। তাই পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে আলোচ্য বিষয় অধিকার করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা হিউম্ বর্ণিত মনোবৃত্তির ধারাকেই স্বীকার করে বসলেন; আর অলৌকিক "আমি"-কে বর্জন করলেন। হিউমের মতে চেতনবৃত্তিগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন; কিন্তু তারা অনুষঙ্গ-নিয়মে সম্পৃক্ত হয়। উইলিয়ম্ জেম্স্ এই মানসিক পরমাণুবাদ না স্বীকার করে এক নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যধারা বা প্রবাহকে মানলেন। তাঁর মতে এক মুহূর্তে এই প্রবাহের এক খণ্ডই এই মুহূর্তের "আমি"।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রত্যেক মনোবৃত্তি কোন না কোন মস্তিষ্ক বা স্নায়ুর ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। চিন্তা করার সময় মস্তিষ্কে রক্তচাপ বৃদ্ধি হয় আর তার স্নায়ুকোষে নানারূপ স্পন্দন হতে থাকে। জড়বাদী দর্শনে আত্মগত চেতনবৃত্তিকে এই মস্তিষ্কের সঙ্গে অনন্য মনে করা হয়। চিন্তনক্রিয়া নাকি মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত বৈদ্যুতিক স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। বেদনার অনুভূতি বিশেষ বিশেষ স্নায়ুমুখের উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই "তা ছাড়া আর কিছুই নয়"-মত অর্থাৎ মনোবৃত্তি ও মস্তিষ্কবৃত্তির অনন্যতাতত্ত্ব একান্তই ভ্রমাত্মক। চিদ্‌বৃত্তি মস্তিষ্কবৃত্তি ছাড়া ঘটে না, চেতনবৃত্তি স্নায়ুবৃত্তির উপর একান্তই নির্ভরশীল, এ সব কথা মেনে নিয়েও পরস্পরসংযুক্ত চিদ্‌বৃত্তি ও স্নায়ুর স্পন্দনকে আলাদা বলতেই হয়। আমার স্নায়ু আছে বা স্নায়ুমুখ উত্তেজিত হচ্ছে এ কথা না টের পেলেও আমার বেদনাকে টের পাই। 'ক'-এর উৎপত্তির জন্য 'খ' যদি অত্যাবশ্যক সর্ত হয় তা হলেও 'ক' আর 'খ'কে কেউ অনন্য বলে না; 'খ' হল সর্ত আর 'ক' হল সর্তসাপেক্ষ অন্য কিছু। তাই "চিদ্‌বৃত্তি স্নায়ুতন্ত্রের স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়"—এই জড়বাদী মত বিভ্রান্তিকর।

অথচ একদল মনস্তাত্ত্বিক বর্তমান শতকে জড়বাদেরই পাল্টি মত "আচরণবাদ" প্রচার করেছেন। আমেরিকার মনোবিৎ ওয়াট্‌সন্, রুশদেশের শরীরতাত্ত্বিক পাভলভের সহায়তায় সমস্ত রকম মনোবৃত্তিকে শরীরের আচরণ বা প্রতিক্রিয়াতে পর্যবসান করেছেন। বাইরের বা শরীরাভ্যন্তরের কোন উদ্দীপকের উত্তরে জীবদেহের যে বিকার বা প্রতিক্রিয়া হয় তাকেই "আচরণ" বা "ব্যবহার" বলে; গরমপাত্রে

1. Behaviourism

হাত লাগলে হাত সরে যাওয়া, মুখে খাদ্য গেলে লালা নিঃসরণ হওয়া, চোখের দিকে কিছু এলে চোখ বুজে ফেলা ইত্যাদি। এই শারীর প্রতিক্রিয়াগুলির পশ্চাতে আবশ্যিক সর্ত হিসাবে স্নায়ুতন্ত্রের স্পন্দন অবশ্যই থাকবে; কেননা স্নায়ু বা মস্তিষ্কের ক্রিয়া না হলে শরীরের কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। শরীরের এই আচরণগুলি সর্বলোক প্রত্যক্ষগম্য আর স্নায়ুর স্পন্দনও বাহ্যপ্রত্যক্ষে জানার সম্ভাবনা আছে।

ব্যক্তিগত গোপন চিত্তবৃত্তি স্বীকার করলে প্রত্যেককে নিজ নিজ আন্তরপ্রত্যক্ষে ঐ চিত্তবৃত্তির পরিচয় পেতে হবে। কিন্তু ওয়াট্‌সন্‌ মনে করেন, এই আন্তর-প্রত্যক্ষ মনোবৃত্তির যে বিবরণ দেয় তা ভিন্ন মানুষে ভিন্ন হয়ে থাকে; কোন ব্যক্তির আন্তর বিবরণ যাচাই করা যায় না, কেননা তার মনোবৃত্তি আমার সাক্ষাৎবেদ্য নয়। ওয়াট্‌সন্‌ তাই আন্তরপ্রত্যক্ষকে অবৈজ্ঞানিক বলেন। অপরের মনোবৃত্তি জানতে হলে তার শারীরিক আচরণ দেখতে হয়। শিশু ও জীব-মনোবিদ্যাকে শিশুদের ও প্রাণীদের শারীরিক আচরণ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাই শারীরিক আচরণের বাহ্য প্রত্যক্ষই মনোবিজ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি হওয়া উচিত। আন্তরপ্রত্যক্ষ অস্বীকৃত হলে ব্যক্তিগত সুগোপন চেতনবৃত্তির অস্তিত্বও স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। আচরণবাদ সমস্ত চিদ্‌বৃত্তিকে শারীরিক প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসান করে। ক্রোধ হলেই যখন রক্তচক্ষু, বদ্ধমুষ্টি, দ্রুতশ্বাসক্রিয়া, কম্পন প্রভৃতি আচরণ হয়, তখন ক্রোধানুভবকে ঐ বিশেষ আচরণের সঙ্গে অনন্য বলতে আপত্তি কি? চিন্তাবৃত্তিকে আচরণবাদ অস্ফুট বাক্‌ব্যবহার বলে আর সুখানুভূতি এই মতে যৌনাঙ্গের স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ সাধারণ প্রত্যক্ষগম্য আচরণ ব্যতীত আর কিছু স্বীকার করা যায় না। অতএব এই মতে মন হল প্রতিক্রিয়াশীল শরীর। শরীরের অভ্যন্তরে ও বাইরে যে সব প্রতিক্রিয়া ঘটে তাদের সমষ্টিই হল মন আর যে আচরণগুলি একই দেহে সংঘটিত হয় তাদের সমষ্টিই হল এক অন্বয় আত্মা।

গিল্‌বার্ট রাইল তাঁর বিখ্যাত "কন্‌সেপ্‌ট্‌ অব্‌ মাইণ্ড্‌" গ্রন্থে বলেছেন যে, যে সব ভ্রান্ত মনোবিদেরা মনের সুগোপন কোনে বসবাসকারী চিত্তবৃত্তি স্বীকার করেন, তাঁরা মনোবৃত্তিমূলক ধারণাগুলির প্রয়োগক্ষেত্র গোলমাল করে ফেলেন। "চালাক", "মূর্খ", "কুতূহলী", "একগুঁয়ে" প্রভৃতি শব্দগুলিকে কেউ ইঁট, কাঠ, পাথরের বিশেষণরূপে ব্যবহার করে না; অথচ মনোবৃত্তিমূলক এই বিশেষণগুলি কোন গোপন চিত্তের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করে না। বাহ্যপ্রত্যক্ষগম্য মানুষের কোন আচরণকেই "বুদ্ধিমান" অথবা "বোকা" বিশেষণে বিশিষ্ট করতে হয়। মানুষের আচরণই "বুদ্ধিমানের" মতো বা "বোকার" মতো হতে পারে। রাইল বলেন, 'কৌতূহল' বা 'মূর্খতা'ও শরীরযন্ত্রের অভ্যন্তরে গুপ্ত কোন প্রেতকৃতির ধর্ম নয়। স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কর্মের পার্থক্য সকলের প্রত্যক্ষগম্য শারীর আচরণের মধ্যেই পাওয়া যায়— মানসিক ইচ্ছার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দিয়ে ঐ পার্থক্য বোঝা ভ্রমাত্মক। রাইল যদিও তাঁর মতকে "আচরণবাদ" বলতে চান

নি, তবু যেহেতু তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশেষণগুলি মানুষের আচরণেই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, সেই হেতু পণ্ডিতেরা তাঁকে "আচরণবাদী" আখ্যা দিয়েছেন।

সমালোচনা ঃ ভাষাপ্রয়োগের প্রমাদ কিছু কিছু দূর করতে সক্ষম হলেও রাইল সব চেতনবৃত্তিকেই আজগুবী বলে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। রাইল নিজেই "দন্তশূল," "সিরসিরানি," "কনকনানি" প্রভৃতি সংবেদন-শব্দ নিয়ে বিপদে পড়েছেন। একটু অবহিত হলে বোঝা যায় যে এরা সকলের চক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত চেতনবৃত্তির নাম ; কেবলমাত্র শরীরের বা স্নায়ুতন্ত্রের সর্বলোকপ্রত্যক্ষবেদ্য আচরণ নয়। দেকার্তের মত সর্বাংশে সত্য না হলেও, মনোবৃত্তির সঙ্গে শরীরবৃত্তির ভিন্নতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

"চৈতন্য" বলতে কেউ শরীরের স্পন্দন বোঝেন না—ঐ স্পন্দনের অনুভূতিকে বোঝেন। "প্রেমানুরাগের" অর্থ কেবলমাত্র প্রেমাশ্রু বা বিশেষ গ্রন্থিরসের অত্যধিক ক্ষরণ নয়। ক্রোধানুভব রক্তচক্ষু বা বদ্ধমুষ্টির কারণ হতে পারে, কিন্তু ক্রোধানুভূতি ও রক্তচক্ষু ভিন্নজাতীয় পদার্থ। এ কথা হয় তো সত্য যে যখনই তীব্র ক্রোধানুভূতি হয় তখনই রক্তচক্ষু বা বদ্ধমুষ্টির আচরণ দেখা যায়। তাই বলে তাদের এক বা অনন্য বললে "এ ছাড়া আর কিছু নয়" ভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়। "ক্রোধ" শব্দের অর্থ যদি রক্তচক্ষু (আচরণ) হত, তাহলে "তোমার ক্রোধ হলে তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ হবে" এই বাক্যের অর্থ হত "তোমার ক্রোধ হলে তোমার ক্রোধ হবে" বা "তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ হলে, তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ হবে"। এই অর্থ কিন্তু সাধারণের সম্মত নয়। অবশ্য মনোবৃত্তিগুলিকে মানুষের বিশেষ অবস্থায় "আচরণ" বা প্রতিক্রিয়া বলতে আমাদের আপত্তি নেই ; তবে তাদের শারীর আচরণ থেকে বিজাতীয় বলতে হবে। অপরের মনোবৃত্তি জানতে হলে তাদের আচরণ পর্যবেক্ষন করতে হয়, তাও মানতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু মনে কর কোন শিশু মুখে বলছে "আমি একটা হাতী আঁকছি" ; কিন্তু তার চিত্রকর্মের মধ্যে, বাইরের দৃষ্টিতে, একটা বড়সড় গোল্লা ফুটে উঠছে। এখানে বাহ্যপ্রত্যক্ষবেদ্য শিশুর আচরণের সঙ্গে তার বক্তব্যের কোন মিল নেই। অথচ শিশুর বক্তব্যের প্রামান্য একমাত্র শিশুই হতে পারে ; তার আচরণ দেখে তার বক্তব্য উড়িয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়।

সি. ডি. ব্রড্ বলেছেন, এ কথা হয়তো ঠিক যে "আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে" এ কথা যখনই সত্য হয় তখনই "আমার মস্তিষ্কের একটা স্পন্দন হচ্ছে" এ বাক্যও সত্য হয়। তাই বলে "ধনী" ও "বিত্তবানের" মতো "আমার অনুভূতি" ও "আমার মস্তিষ্কের স্পন্দন" সমার্থক হতে পারে না। এর কারণ এই যে অনুভূতি সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন সার্থকভাবে তোলা যায়, মস্তিষ্কের স্পন্দন সম্পর্কে তারা একান্তই অবান্তর। আমার বর্ণানুভূতি স্পষ্ট না অস্পষ্ট এ প্রশ্ন নিরর্থক নয় ; কিন্তু স্নায়ুর স্পন্দন স্পষ্ট না অস্পষ্ট এ প্রশ্ন ওঠে না। আবার স্নায়বিক প্রবাহ দ্রুত না মন্থর, সরল না বক্র এ প্রশ্ন সার্থক হলেও, শব্দানুভূতি সরল না বক্র এ প্রশ্ন নিরর্থক। তাই অনুভূতি ও মস্তিষ্ক ক্রিয়া একসঙ্গে সংঘটিত হলেও এদের পার্থক্য স্বীকার করতেই হবে।

7. কাণ্টের মত

হিউম্ বর্ণিত মনোবৃত্তিধারা বা ওয়াট্সন্ সম্মত পূর্বাপর আচরণপ্রবাহ মনোগত ঐক্যের ব্যাখ্যা করতে পারে না। যে অনুষঙ্গসূত্র দিয়ে হিউম্ স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তার সম্ভাবনা ও সাফল্য, কাণ্টের মতে, স্মৃতির উপরেই নির্ভর করে; এবং বলা বাহুল্য, স্মৃতির সম্ভাবনা চৈতন্যের ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। কাণ্টের মতে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা এমন কি প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের মধ্যেও এক অদ্বয় "আমি"র নির্দেশ থাকে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জ সংবেদন এক চৈতন্যে বিধৃত হলেই তারা সংশ্লিষ্ট হয়ে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে। চৈতন্যের এই সংশ্লেষক ঐক্য ব্যতিরেকে, কাণ্টের মতে, কোন জ্ঞান বা বিচার সম্ভব নয়; এমনকি স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, অনুষঙ্গ প্রভৃতিও সম্ভব হয় না। যে বস্তুকে আমি জানলাম তা এক অর্থে "আমারই", "আমি"ই তাকে চিন্তা করছি, "আমি"ই তার মালিক; এই বোধের নির্দেশ প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞানে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানে বিষয়বস্তুগুলির স্বত্ব যে 'আমাতে' থাকে সেই "আমি" কিন্তু এক বা অদ্বয়; "আমি জানি" একথা পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত না হলেও, প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞানে তা উচ্চারিত হবার যোগ্যতা রাখে। কাণ্ট্ মনে করেন যে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানধারার অতিরিক্ত এই চৈতন্যগত সংশ্লেষক ঐক্য এক অলৌকিক, অজ্ঞাত ঐক্য; অর্থাৎ এই ঐক্য কখনো জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। এ কেবল স্বরূপতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞাত বিষয় নয়। ইন্দ্রিয় সংবেদন ছাড়া কোন কিছুকে জানা কাণ্টের মতে সম্ভব নয় এবং ইন্দ্রিয়বোধে যা থাকবে তা দেশকালাবচ্ছিন্ন অবভাসমাত্র—স্বয়ংসৎ বস্তু নয়। জ্ঞানের বিষয়মাত্রই স্বয়ংসতের অবভাস। হিউম্ বর্ণিত বিভিন্ন মনোবৃত্তিগুলি ও তাদের প্রবাহ জ্ঞানের বিষয় হয়—জ্ঞাতা কিন্তু ঐ মনোবৃত্তিধারার অতিরিক্ত তত্ত্ব। অন্তরেন্দ্রিয় যে মানস-সংবেদন গ্রহণ করে, তাদের বিচার ও তুলনামূলক সংশ্লেষণের দ্বারা জ্ঞাতা মনোবৃত্তির জ্ঞান সম্ভব করে। এই জ্ঞাত 'আমি', প্রত্যক্ষগম্য বিষয়রূপী 'আমি', হিউম্ বর্ণিত মনোবৃত্তিধারা ছাড়া কিছু নয়, আর এই জ্ঞাত 'আমি' স্বয়ংসৎ 'আত্মার' অবভাস মাত্র।

কাণ্ট্ যেমন হিউমের প্রত্যক্ষবাদী মত খণ্ডন করেছেন, তেমনি তিনি বুদ্ধিবাদ সম্মত অধ্যাত্ম দ্রব্য বা আত্মাও স্বীকার করেন নি। আত্মাকে সরল নিত্য অধ্যাত্মদ্রব্য বলে বর্ণনা করলে তাকে জ্ঞানের বিষয় করে ফেলা হয়। বিষয় জ্ঞানের প্রাক্‌সিদ্ধ কারণরূপে কাণ্ট্ যে চৈতন্যগত সংশ্লেষক ঐক্য মেনেছেন, মনোবৃত্তিগুলির অতিরিক্ত ঐ ঐক্য সবসময়ই জ্ঞানের কর্তা। বিষয়রূপে বিষয়ীর জ্ঞান অসম্ভব বলে জ্ঞানকর্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তত্ত্ব থেকে যায়। কিন্তু জ্ঞানজীবনে স্বয়ংসৎ, অলৌকিক আত্মা অজ্ঞাত হলেও, মানুষের নৈতিক জীবনের কর্তব্যসম্পাদনার মধ্যে ঐ আত্মার স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হয়; অর্থাৎ স্বয়ংসৎ আত্মার অস্তিত্ব ছাড়া মানুষের নৈতিক জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সমালোচনা ঃ কাণ্টের মতবাদে চৈতন্যগত ঐক্যের নির্দেশ পাওয়া গেলেও, ঐ মত সর্বথা গ্রহণ করা যায় না। কোন কোন ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানে বিষয়রূপে জ্ঞাতার জ্ঞান, কাণ্টের মতো, অস্বীকৃত হলেও, বিষয়ীরূপেই আত্মজ্ঞান সম্ভব বলে বলা হয়েছে। আত্মা বা চৈতন্য এই মতে স্বয়ংপ্রকাশ; এর স্বভাবই প্রকাশ ব'লে, এ নিজে অন্য কিছু দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে না। বিষয়কে প্রকাশ করেই চৈতন্য নিজে প্রকাশিত হয়। অন্ধকার ঘরে দীপশলাকা যেমন বস্তুকে প্রকাশ করে নিজেও প্রকাশিত হয়, তেমনি স্বয়ংপ্রভ চৈতন্য, প্রকাশের জন্য, অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না।

আর এক দিক থেকে কাণ্টসম্মত চৈতন্যগত ঐক্য সাতিশয় বিমূর্ত বলে মনে হয়। এর কারণ হলো একে মনোবৃত্তিগুলির অতিরিক্ত তত্ত্ব বলা হয়েছে। কিন্তু মনোবৃত্তিগুলিকে বাদ দিলে চৈতন্যগত ঐক্যের আর কি অবশিষ্ট থাকে? এভাবে কি ঐ ঐক্য এক ক্রমবিলীয়মান বিন্দুতে পর্যবসিত হয় না? অভিজ্ঞতার বহুত্বা ব্যতিরেকে ঐ ঐক্য এতই বিমূর্ত যে তার বাস্তবতা সন্দিগ্ধ হতে বাধ্য।

আবার কাণ্ট্ যে অবভাসরূপী 'আমি' (অর্থাৎ 'জ্ঞাত' আমি) এবং স্বয়ংসৎ 'আমি'র (অর্থাৎ 'জ্ঞাতা' আমি) মধ্যে পার্থক্য করেছেন তাও স্বীকার করা চলে না। এই অবভাস যদি স্বয়ংসৎ আত্মারই অবভাস হয়, তবে অবভাসকে জেনে স্বয়ংসৎ আত্মার স্বরূপই বা কিছুটা অন্ততঃ কেন জানা যাবে না? তাই কাণ্টের মতকে আরও খানিকটা প্রসারিত করে হয়তো এ সমস্যার সমাধান করা যাবে।

৪. মূর্ত আত্মা বা পুরুষবাদ[1]

কাণ্ট্সম্মত চৈতন্যগত ঐক্যকে যদি মনোবৃত্তিসমূহের বাইরে না কল্পনা করি, যদি বলি যে ঐ আধ্যাত্মিক ঐক্য এলোমেলো মনোবৃত্তিগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তা হলে যে ঐক্যবদ্ধ মনোবৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশ পাওয়া যাবে তাকেই মূর্ত আত্মা বলা যাবে। 'পুরুষ' বা 'ব্যক্তি' বলতে এই সাকার আত্মাকেই বোঝাবে আর এইজন্য ভাববাদী আত্মতত্ত্বকে 'পুরুষবাদ' আখ্যা দেওয়া যায়। হেগেল্ ও নব্যহেগেল্পন্থী দার্শনিকেরা সকলেই কমবেশী এই মূর্ত আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী।

এই মতে 'মন' বা 'আত্মা' বলতে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিধারাকেই বোঝায় না বা কেবলমাত্র তদতিরিক্ত চৈতন্যের নিরাকার ঐক্যকেও বোঝায় না। চৈতন্যগত ঐক্যের সক্রিয় সহযোগিতায় গঠিত বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন মানসবৃত্তির সুসংহত সমাবেশকেই আত্মা বা পুরুষ বলা যায়। চিত্তবৃত্তির বহুতার মধ্য দিয়ে অনুস্যূত চৈতন্যময় ঐক্য অথবা ঐক্যের মধ্যে বহুতার সমাবেশ স্বীকার করলেই মূর্ত পুরুষের ব্যাখ্যা হয়। পুরুষ বা ব্যক্তির আত্মগত ঐক্যকে

1. Concrete self or Personality

পরিবর্তনশীল মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে অবশ্য বাস্তব হতে হবে; অর্থাৎ মনোগত ঐক্য এবং বিভিন্ন মানসিকতা উভয়ই পুরুষতত্ত্বের উপাদান। এই ঐক্যকে বিভিন্ন চিন্তা, আবেগ, কল্পনা প্রভৃতি মনোবৃত্তি থেকে আলাদা করে দেখলে তা শূন্যগর্ভ ও নিরাকার হয়ে পড়বে। চিন্তা, আবেগ, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিকবৃত্তি-গুলির সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্যও এক আত্মা বা পুরুষের কল্পনা অপরিহার্য।

কাণ্ট্ বলেছেন যে জ্ঞাতা ব্যতিরেকে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্থহীন; তেমনি ভোক্তা ব্যতিরেকে সুখদুঃখ ভোগ আর কর্তা ব্যতিরেকে স্বাধীন ইচ্ছাসম্ভূত কৃতিও নিষ্পন্ন হয় না। মূর্ত পুরুষ এক জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা যিনি বাহ্য ও আন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আপন ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই পুরুষ বা বা আত্মার প্রকাশ বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যেই হয় ও এমন প্রকাশ ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব নেই। নানা মানসবৃত্তির মধ্য দিয়ে আত্মা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মনিয়ন্ত্রিত বলে উপলব্ধ হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে জীবদেহের ঐক্য যান্ত্রিক নয়; বিচ্ছিন্ন উপাদান-গুলিকে বাইরের থেকে একত্র সংযুক্ত করে ঐ ঐক্য উৎপন্ন করা যায় না। জীবের ঐক্য এক অন্তর্লীন ঐক্য যা বিভিন্ন জৈবিক উপাদানের মধ্যে প্রথম থেকেই প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক পুরুষগত ঐক্য আরও বেশী অন্তঃস্থ ঐক্য আর মানসিক অবস্থার বহুতা ব্যতীত পুরুষের সুসংহত সমাবেশ সর্বথা মিথ্যা। প্রত্যেক মনোবৃত্তির মধ্যে পুরুষের ঐক্য এক বিশেষভাবে, বিশেষকালে প্রতিফলিত হয়। কোন মনোবৃত্তি (জ্ঞান, ইচ্ছা ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন নয়; পূর্বাপর অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয়ে সে উজ্জীবিত হয়। আবার পুরুষের ঐক্য যেমন কোন বিশেষ মনোবৃত্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তেমনই ঐ ঐক্য আবার মনোবৃত্তির বহুতার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির জীবনে যে বিভিন্ন ভাবধারা আসে তারাই সুসংবদ্ধ হয়ে ব্যক্তির ঐক্য গঠন করে, আর এই পুরুষ বা আত্মা অনাত্ম জগতের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে অভিযোজিত থাকে।

উপরোক্ত পুরুষবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল ঐ মতের অস্পষ্টতা। এক এবং বহুর মধ্যে যদি ন্যায়গত বৈপরীত্য স্বীকার করি, তা হলে এক অদ্বয় তত্ত্ব যে কি করে বহুতাকে আশ্রয় করে উপলব্ধ হয় তা বিচারবুদ্ধির অগম্য। আজ পর্যন্ত এই বহুর মধ্যে একেকে বোঝা দর্শনের মূল সমস্যা রয়ে গেছে। উপরে যে পুরুষের ঐক্যের কথা বলা হল তাতে খানিকটা অস্পষ্টতা থাকলেও, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উদাহরণ নিয়ে হয়তো ঐ মত কিছুটা স্ফুট করা যায়। প্রকৃতির ক্রমবিকাশে যতো স্তরের আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে কোন মূল্যবান জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে তদনুযায়ী নিজের বিভিন্ন কামনাবাসনাকে সুসংবদ্ধ করতে পারে এবং ধীরে ধীরে এক ব্যক্তি বা পুরুষে পরিণত হতে পারে। কোন কাম্য আদর্শকে জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে এই মানুষ স্বাধীনভাবে গ্রহণ করবে সেই কামনা আর ভাবধারা যারা ঐ আদর্শের অনুগামী; আর বর্জন করবে সেই বাসনা

যা ঐ আদর্শের পরিপন্থী। এভাবে বিভিন্ন বাসনা-কামনার গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে, এক মূল্যবান আদর্শকে কেন্দ্র করে যে মনোবৃত্তিগুলি সংগঠিত হয়, সেই চারিত্র্য বা ব্যক্তিত্ব খুব অস্পষ্ট নয়। হেগেল্‌পন্থী আমেরিকার ভাববাদী দার্শনিক রয়েস্‌ ব্যক্তি বা পুরুষকে এই রকমের এক সুগঠিত চারিত্র্য বলে বর্ণনা করেছেন। এই চরিত্র স্বনিয়ন্ত্রিত চেষ্টা সাপেক্ষ; প্রথম থেকেই তা কারুর জীবনে সংগঠিত হয়ে থাকে না। বিভিন্ন মানুষে এই ব্যক্তিত্বের মাত্রাগত ভেদ মানতে হয়; বালকের ব্যক্তিত্ব থেকে যুবকের ব্যক্তিত্ব অনেকটা বেশী সুগঠিত। অবশ্য কেন্দ্রগত জীবনাদর্শের ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির গুণগত ভেদও মানতে হয় —সৎ ও অসৎ চরিত্রের ভেদ এইভাবে নির্ণীত হতে পারে। দৃঢ়চরিত্রের মানুষ এক অনমনীয়, একাভিমুখী সংগঠন আর ঐ দৃঢ়তা সে স্বাধিকারবলেই ভোগ করে। বাইরের কোন শক্তি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে ঐ সংগঠন সৃষ্টি করে না। মানুষ স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় যে দৃঢ়সংবদ্ধ চরিত্র গঠন করে তাই তার ঐক্য ও ব্যক্তিত্ব। মাত্রার তারতম্য থাকার জন্য কোন মানুষই যেন পূর্ণ পুরুষ নয়; অর্থাৎ যতটা সংগঠনই মানুষ তার জীবনে সম্ভব করুক না কেন, তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত সংগঠনও হয়তো সম্ভব। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুরুষত্বই হয়তো এই অর্থে পূর্ণব্যক্তিত্ব হবে; তিনিই পুরুষোত্তম। মানুষের ব্যক্তিত্ব সব সময় কম বা বেশী উপলব্ধ; যত বেশী সংখ্যক মনোবৃত্তি এই সংগঠনের ভাগীদার হবে তত বেশী পুরুষের উন্নতি বা উপলব্ধি স্বীকার করতে হবে। মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষত্ব বা আত্মত্ব হঠাৎ পাওয়া কোন পুরস্কার নয়; নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে—ভুল, ত্রুটি ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে—ধীরে ধীরে এই সংগঠন গড়তে হয়। পুরুষোত্তম ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সর্বদাই পূর্ণপ্রকাশ—তাঁর একত্ব কিন্তু চেষ্টার্জিত নয়।

ভাববাদী দার্শনিকেরা বলেন যে মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ঐক্য দেখা যায় তা মনুষ্যেতর বস্তুজগত বা জীবজগতের ঐক্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জড়বস্তু বা নিম্নস্তরের প্রাণীকে কেউ সাধারণ অর্থে 'পুরুষ' বা 'ব্যক্তি' বলে না; মানুষকেই ঐরূপ অভিধা দেওয়া যায়। বৃক্ষলতায় না থাকলেও, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে সুখদুঃখসংবেদনাদি সরল চেতনবৃত্তি থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু এই প্রাণীদের মধ্যে এই বৃত্তিগুলি আসে আর চলে যায়; জলের দাগের মত তারা স্মৃতিপটে কোন স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায় না। কিন্তু পূর্বাপর সংবেদনাদিকে একত্র গ্রথিত করে মানুষের বিচারবুদ্ধিই কেবল জ্ঞানগত ঐক্য গঠন করতে পারে। যথা—অনুমিতিতে বিভিন্নজ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়ে তা থেকে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। মানুষ যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন বর্তমান ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলিকে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে অর্থবহ করে নেয় এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সহযোগে এক সুসংবদ্ধ জ্ঞানসামগ্রী লাভে ক্রমশঃ পুষ্ট হতে থাকে। মানুষ স্বজ্ঞানী ও স্বনিয়ন্ত্রিত প্রাণী। মনুষ্যেতর প্রাণীদের চেতনবৃত্তি (সুখ দুঃখাদি) থাকলেও তারা আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন নয়। মানুষই কেবল নিজের প্রত্যক্ষানুমিত জ্ঞানাদিকে

যথার্থ বা অযথার্থ বলে বিচার করতে পারে অথবা নিজের ইচ্ছাদিকে কল্যাণকর বা অশুভ বলে জানতে পারে। মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার পশুর নেই। সহজাত প্রবৃত্তিই পশুকে নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু মানুষ বাইরের শক্তিদ্বারা তাড়িত না হয়ে নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অর্থে স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের নৈতিক জীবন কখনও সম্ভব হতো না; আর পশুর কোন নীতিবোধ নেই। অতএব আত্মজ্ঞান ও আত্মনিয়[illegible] মানুষের বিশেষ ধর্ম এবং এই ক্ষমতাই মানুষের পুরুষত্ব বা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। পুরুষ নিজ শক্তি বলে নিজের মানসবৃত্তির মধ্যে সংহতি আনে ও ধীরে ধীরে এক অন্বয় সংগঠনের দিকে অগ্রসর হয়। এই ধরণের ঐক্য পশুর চেতনাদির মধ্যে থাকে না।

ষোড়শ অধ্যায়

দেহমনের সম্পর্ক

1. ভূমিকা

আমরা দেখেছি যে মানসিক ঘটনা শারীরিক ঘটনার থেকে ভিন্ন। মনোবৃত্তিগুলি ভৌতিক বৃত্তি নয়। মনুষ্য বা প্রাণীদেহে কিন্তু এদের মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। মনোবৃত্তিগুলি শারীর বৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ঘটে বলে দেখা যায়। মনকে এক অধ্যাত্ম দ্রব্য বলব কি বলব না এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তি ও শারীরবৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। এই সম্পর্কের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা দার্শনিকের নানা মত।

মানসিকতা ও শারীরিক বৃত্তির নিকট সম্পর্ক অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই আমরা বুঝতে পারি। মস্তকে আঘাত পেলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে আর খাওয়া বেশী হয়ে গেলে সুক্ষ্ম চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শরীর যদি বেশী মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তা হলেও মানসিকতা অস্বাভাবিক হয়ে যায়; মনের ক্রোধাবেগ চক্ষুকে রক্তবর্ণ ও হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে—দুঃখাবেগ অশ্রু ঝরায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও দেখা যায় যে অধিক চিন্তা করলে মস্তিষ্কে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, আর শ্বাসযন্ত্রে গ্যাস প্রয়োগ করে মানুষকে অচেতন করে ফেলা যায়। শারীরবিদ্যা প্রমাণ করেছে যে মস্তিষ্কের কোন স্থান কেটে বাদ দিলে ঐ স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানসিকতা লোপ পায়; এবং সাধারণভাবে যে মস্তিষ্ক যত ভারী ও জটিল সেই মস্তিষ্কধারী ব্যক্তি তত উচ্চমননশীল ও প্রতিভাধর হয়। অতএব মানসিকতা ও শারীরবৃত্তির নিকট সম্পর্ক অনস্বীকার্য। এই সম্পর্কের স্বরূপ কি-তাই বিচার্য্য।

2. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ[1]

এই মত অনুসারে মন ও শরীরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করতে হবে। মানসিক অবস্থা কারণরূপে শারীরিক বৃত্তি উৎপন্ন করতে পারে; যেমন, মনের দুঃখ অশ্রু ঝরিয়ে দেয়। আবার শারীর অবস্থাও কারণরূপে মনোবৃত্তি উৎপন্ন বা নষ্ট করতে পরে; যথা, উদরপূর্তি করে খেলে দুরূহ চিন্তা ব্যাহত হয়। শরীর ও মন উভয়ে উভয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দেহমনের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাদ সর্বসাধারণে, অন্ততঃ অস্পষ্টভাবে, স্বীকার করে নেয়। কোন ভৌতিক উদ্দীপক (আলো) যখন আমার চাক্ষুষ সংবেদন

1. Theory of Interactionism

জাগায়, তখন ভৌতিক জগত যে মানসিক অবস্থা উৎপন্ন করতে পারে তাতে সংশয় থাকে না। অবশ্য আলোকতরঙ্গই উক্ত সংবেদনের একমাত্র কারণ নয়; চক্ষু, স্নায়ুকেন্দ্র, মস্তিষ্ক ইত্যাদিও ঐ কারণের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে ভৌতিক শক্তি মানস অবস্থার কারণ হতে পারে। আবার যখন মনের ভয়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় তখন প্রমাণ হয় যে মানসিক অবস্থা দৈহিক ঘটনার কারণ। অতএব মন ও দেহ কার্যকারণরূপে পরস্পরের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। সাধারণের কাছে এই মত অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়। দার্শনিক দেকার্ত এই মতের অত্যন্ত স্পষ্ট রূপ দিয়েছেন।

আমরা দেখেছি যে দেকার্তের মতে মন হল এক অধ্যাত্মদ্রব্য আর ভৌতিক যান্ত্রিকতাবদ্ধ শরীর এক বিজাতীয় দ্রব্য। আত্মা চেতন, শরীর বা জড় অচেতন দ্রব্য। আবার আত্মার কোন স্থানব্যাপ্তি নেই কিন্তু শরীর স্থানব্যাপ্ত করে থাকবেই। দেকার্তের মতে এই বিজাতীয় শরীর ও মন কেবল মানুষের মধ্যেই কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ; মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে কেবল শরীর থাকে, চেতন আত্মা থাকে না। মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে একটি গ্রন্থি আছে, যার দ্বৈত নেই; এই একক গ্রন্থির নাম 'পিনিয়েল' গ্রন্থি। আত্মা এই পিনিয়েল গ্রন্থির মধ্যে অবস্থান ক'রে শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আর শরীরও ঐ গ্রন্থির মধ্য দিয়েই আত্মার ওপর ক্রিয়া করে থাকে। এর থেকেই বোঝা যায় যে দেকার্ত এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ অত্যন্ত স্থূলভাবে উপস্থিত করেছেন।

সমালোচনা ঃ শরীর ও মন যদি দুটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় দ্রব্য হয় তাহলে তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে কি করে হতে পারে তা কিছুতেই বুদ্ধিস্থ করা যায় না। এই মতের প্রধান অসুবিধা হল এই যে এই মত অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। আত্মার যদি স্থানব্যাপ্তি নাই থাকে তা হলে সে কি করে পিনিয়েল্ গ্রন্থির মতো স্থানে অবস্থান করে? তা ছাড়া কার্যকারণভাব সমজাতীয় বস্তুর মধ্যেই থাকতে পারে বলে মনে হয়। বন্দুকের গুলি মাথা ফুটো করতে পারে কেননা গুলি ও মাথা উভয়েই জড়পদার্থ; কিন্তু বন্দুকের গুলি কি কোন অজড় ইচ্ছা বা ধারণাকে ফুটো করতে পারে? রেলগাড়ীর সম্মুখস্থ চালক ও পিছনের গার্ডসাহেবের মধ্যে প্রেম বা ভালবাসার সূত্রে কি রেলগাড়ীর কক্ষগুলি সংযুক্ত থাকতে পারে?

পদার্থবিজ্ঞান ভৌতিক শক্তির অক্ষয়তা প্রকল্প বিশ্বাস করে। তাপরূপ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হলেও, জাগতিক ভৌতশক্তি বাড়েও না কমেও না; যতটুকু তাপশক্তি বিদ্যুতে রূপায়িত হয় ঠিক ততটুকু বিদ্যুৎশক্তিই আমরা পেতে পারি। এখন বিজাতীয় মন ও শরীরের ওপর উভয়তঃ কার্যকারণ প্রভাব থাকলে, এই 'শক্তির অক্ষয়তা' প্রকল্পের হানি হবে। অভৌত মন যখন শরীরের পরিবর্তন উৎপন্ন করবে তখন শক্তিপ্রয়োগ হলে, অভৌত, অশরীরী মন, শরীরে কিছু ভৌতশক্তি সঞ্চারিত করে সামগ্রিকভাবে ভৌতশক্তির বৃদ্ধি সূচিত করবে। আবার শরীরের ভৌতশক্তি যদি মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়, তবে কিছুটা

ভৌতশক্তি ভৌতিকজগত থেকে বেমালুম লুপ্ত হয়ে, ঐ শক্তির হ্রাস সূচিত করবে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ এক অসম্ভব ব্যাপার।

দেকার্তের মতটি যে বেশ কিছুটা স্থূল তা বোঝা গেল। এই স্থূলতা পরিহার করতে তাঁর পরবর্তী কিছু চিন্তানায়ক শরীর ও মনের মধ্যে সরাসরি কার্যকারণভাব অস্বীকার ক'রে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মাধ্যমে ঐ সম্পর্ক বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই মতে আমি যে মুহূর্তে বা অবস্থায় অপরকে আঘাত করতে মনে মনে সংকল্প করি, ঠিক সেই মুহূর্তে ঈশ্বর আমার হাতটিকে ধাবিত করে দেন; আমার সংকল্প কিন্তু আমার হাতকে গতিশীল করতে পারে না। এই রূপে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে, বিভিন্ন সময়ে, প্রতিটি উপলক্ষে কোটি কোটি বার ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ স্বীকার করতে হয়। এই "উপলক্ষ-বাদ"[1] দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাদ থেকেও অস্বাভাবিক মনে হয়। ঈশ্বরকে সাধারণতঃ পরমাত্মারূপে কল্পনা করা হয়। আত্মা ও শরীর যদি সম্পূর্ণ বিজাতীয় দ্রব্য হয় তবে সর্বশক্তিমান হলেও, পরমাত্মারূপী দেহহীন ঈশ্বর কি করে জড়ধর্মী হাতকে (শরীরের অংশকে) উত্তোলিত করবেন? আর তা যদি পারেন তো আমার সংকল্পই বা কেন ঐ হাতকে গতিশীল করতে পারবে না? দার্শনিক লাইব্‌নিজ্‌ প্রতিটি উপলক্ষে ঈশ্বরের মধ্যস্থতা স্বীকার করতে রাজী হলেন না। তাঁর মতে সৃষ্টিকালে ঈশ্বর শরীর ও মনের মধ্যে একবারই এমন এক সমতান বা শৃঙ্খলা স্থাপিত করে দিলেন যে, দুটি সুষ্ঠুভাবে মেলান ঘড়ি যেমন একই সময় নির্দেশ করে তেমনি শরীর মন, অসংযুক্ত হয়েও, সমতানে চলতে থাকে। এই "পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ"[2] প্রতিটি উপলক্ষে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপবাদের থেকে খুব বেশী ভিন্ন নয়। লক্ষ কোটি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ না করে লাইব্‌নিজ্‌ একবারই সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করেছেন। ঐ অলৌকিক সমতান আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য হয় না।

3. সমান্তরবাদ[3]

দার্শনিক স্পিনোজা সমান্তরবাদ প্রবর্তন করেন ও পরে বহু দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী এই মত সমর্থন করেছেন। স্পিনোজার মতে মন আর দেহ দুটি পৃথক দ্রব্য নয়; বরং মানসিকতা ও জাড্য একই পরব্রহ্মের দুই পরস্পর নিরপেক্ষ ধর্ম। এদের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। কোন মানসিক ঘটনা পরবর্তী কোনো মানসিক ঘটনার কারণ হতে পারে; যথা—কোন ইষ্টবস্তুর জ্ঞান থেকে তাকে পাবার আকাঙ্খা উৎপন্ন হতে পারে। জ্ঞান ও আকাঙ্খা, কারণ ও কার্য, উভয়েই এস্থলে মানসিক। আবার কোন শারীরিক ঘটনা পরবর্তী অন্য কোন শারীর ঘটনার কারণ হতে পারে; যথা—মস্তিষ্কের কোন স্নায়ুকেন্দ্রে স্পন্দন হলে কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারে। কিন্তু এই মতে কোন মানসিক ঘটনা পরবর্তী শারীর ঘটনার কারণ অথবা,

1. Occasionalism 2. Pre-established Harmony 3. Parallelism

বিপরীতক্রমে, কার্য হতে পারে না। এক মনোবৃত্তি 'ক', পরবর্তী মনোবৃত্তি 'খ'-কে উৎপন্ন করে এবং 'খ' আবার পরবর্তী মনোবৃত্তি 'গ'-কে উৎপন্ন করে। এই ক্রমে মানসিক ঘটনা প্রবাহ একটি সরল খাতে ব'য়ে চলে বলে কল্পনা করতে পারি। আবার শারীরিক ঘটনাবলীর প্রবাহ অনুরূপভাবে অন্য একটি খাতে ব'য়ে যায়। এই দুই মানসিক ও শারীরিক সরল খাতের মধ্যে কোন যোগাযোগ হয় না; কিন্তু তারা সমান্তরালভাবে নিরন্তর প্রবাহিত হয়। এর অর্থ হল যখনই কোন মানসিক ঘটনা ঘটে তখনই কোন অনুরূপ, উপযুক্ত শারীর ঘটনা ঘটে যায়; এবং বিপরীত ক্রমে যখনই কোন দেহজ ঘটনা ঘটে তখনই কোন তদুপযুক্ত মানস ঘটনা সংঘটিত হয়। এই দুই অসংযুক্ত সমান্তরাল প্রবাহ কখনই তাদের সমান্তরতা হারায় না।

সমান্তরবাদও, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের মতো, মন ও দেহের অত্যন্ত স্বাভাবিক, নিকট সম্পর্ক অস্বীকার করে না; কেবলমাত্র ঐ সম্পর্কের ব্যাখ্যা একটু স্বতন্ত্র ভাবে করতে চায়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাদ বলে যে মস্তিষ্কের কোন স্পন্দন, কারণরূপে, আমার আলোকানুভূতি উৎপন্ন করে। সমান্তরবাদও বলে যে মস্তিষ্কের ঐ বিশেষ স্পন্দন না হলে কখনও আলোকচেতনা ঘটবে না; তবে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলা ঠিক নয়—এ দুটি সমান্তর খাতে প্রবাহিত ঘটনা মাত্র। প্রত্যেক স্ফুট বা অস্ফুট মানসিকতার সঙ্গে অনুরূপ শারীরিক ঘটনা ও প্রত্যেক স্ফুট ও অস্ফুট শারীর ঘটনার সঙ্গে অনুরূপ মানস ঘটনা সমান্তরালভাবে সহযাত্রী হয়, যদিও তাদের কোন যোগাযোগ নেই।

সমালোচনা ঃ সমান্তরবাদ দেহজঘটনা ও মনোবৃত্তির যে নিয়ত সহগামিতার কথা বলে তা সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য হলেও, কেন যে তারা নিয়ত সহচারী হবে তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। আচম্কা যদি কোন মানসিক ঘটনা ঘটে, তা হলে তার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা সমান্তরবাদ করতে পারে না। ধরা যাক্ যে পাঠাগারে কোন শান্তচিত্ত পড়ুয়া ছাত্র হঠাৎ বজ্রধ্বনিতে চম্‌কে উঠল। এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হল ভৌতিক জগতে অত্যন্ত দ্রুত কম্পনশীল বায়ু কর্ণকুহরের স্নায়ুকে স্পন্দিত করায় ঐ চমকপ্রদ অনুভূতি উৎপন্ন হয়েছে। সমান্তরবাদী কিন্তু ঐ আচম্কা অনুভূতির কারণ পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থার মধ্যে অনুসন্ধান করবেন। কিন্তু ঐ চমকের পূর্বে ছাত্রটি শান্ত, সমাহিত চিত্তে পুস্তক পাঠ করছিল; তার মানসিকতায় তৎকালে এমন কোন উত্তেজনা ছিল না যা তার চমক্ উৎপন্ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদই অধিকতর সমর্থনযোগ্য মনে হয়।

সমান্তরবাদ স্বীকার করলে জগতের ক্রমবিকাশে মননশক্তির উদ্ভব একেবারেই নিরর্থক বলতে হয়। আমরা দেখেছি যে জীবনসংগ্রামে যা কিছু প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা রক্ষিত হয় তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সমান্তরবাদ মানলে জীবনযুদ্ধে মননশক্তির কোন উপযোগ থাকে না। মনের সহায়তা ছাড়াই যদি শরীর সকল ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে, মন যদি ভৌত জগতে কোন প্রভাবই বিস্তার না করতে পারে, তা হলে মননশক্তির

বিকাশের কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশে মনের আবির্ভাব ও অবস্থান ক্রমশঃই প্রয়োজনীয় বলে দেখা যায়।

কোন কোন দার্শনিক বলেছেন যে শরীর ও মন যদি সর্বদাই সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়, তা হলে সব শারীর ঘটনার সঙ্গে, স্ফুট বা অস্ফুটভাবে, মানসিক ঘটনা সহগামী হবার কথা। তাহলে ভৌতিক জগতে সর্বত্র মানসিক ঘটনার অবস্থিতি স্বীকার করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং 'সর্বমানসবাদ'[1]-এর অদ্ভুত প্রকল্প মেনে নিতে হয়। মানবশরীরের পাকক্রিয়া শারীরিক বলে তার সহভূত কোন মানস ক্রিয়া মানতে হবে—তা সে যত অস্পষ্টই হোক না কেন। বোধ হয় এখানেও থামা চলে না। জলের কম্পন বা গাড়ীর গতি ভৌতিক জগতের ঘটনা বলে, তাদের সহযাত্রী মানস ঘটনাই বা থাকবে না কেন? তাই বিশ্বের সর্বত্র মানসিকতার উপস্থিতি মানতে হয়। সমান্তরবাদ অসম্ভব না হলেও, এই হেতু ইষ্ট মত হতে পারে না।

4. উপাবভাসবাদ বা গৌণাবভাসবাদ[2]

কোন কোন জড়বাদী দার্শনিক জড় বা শরীরেরই একান্ত প্রাধান্য স্বীকার করেন আর মন বা চেতনবৃত্তিকে শরীরের বা মস্তিষ্কক্রিয়ার ছায়া বা উপাবভাস বলে বর্ণনা করেন। মানুষের যে ছায়া পড়ে তা তার গৌনাবভাস। মানুষের গতি তার ছায়ার গতির কারণ হয় বটে, কিন্তু বিপরীতক্রমে ছায়ার গতি কখনো মানুষের নড়াচড়ার কারণ হয় না। অনুরূপভাবে মস্তিষ্ক ক্রিয়া মানসক্রিয়ার কারণ হলেও এই কারণতা একাভিমুখী; মানসক্রিয়া কখনও, এই মতে, শারীর ক্রিয়ার কারণ হতে পারে না।

এই মতের প্রধান দোষ হল এই যে জগতের ক্রমবিকাশে মনন শক্তির আবির্ভাবের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না; কারণ মন ভৌতিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এবং তাহলে এই উপাবভাসই বা কেন ক্রমবিকাশের এক নূতন স্তর রচনা করল বোঝা যায় না। বই লেখা, সঙ্গীত রচনা, বিদ্যামন্দিরের উৎপত্তি মনন ব্যতিরেকে হতে পারে বলে তো মনে হয় না। কেবলমাত্র মস্তিষ্কক্রিয়ার দ্বারাই এগুলির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গেলে জড়বাদের সব দোষ দেখা দেবে।

5. দ্বিপার্শ্ববাদ[3]

স্পিনোজার সমান্তরবাদ মানসিকতা ও শারীর ধর্মকে একই পদার্থের দুই ধর্ম বলে স্বীকার করে। অনেক দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী মন ও শরীরকে একই মুদ্রার দুই দিকের মতো, একই পদার্থের দুই পার্শ্ব বলে বর্ণনা করতে চান। এই পদার্থ যে কিরূপ তা না জানলেও, তার দুই পার্শ্ব—মন ও শরীরকে —আমরা অবশ্যই জানি। আমি যদি দুইদিকে লম্বিত আয়নার ঢাকা কোন

1. Panpsychism 2. Epi-phenomenalism 3. Double-aspect theory

বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাই, তা হলে দুই দিকে যে প্রতিবিম্ব ফুটবে, তারা আমারই দুই ভিন্ন দিক; এখানে এক বিম্ব আর এক বিম্বকে উৎপন্ন করতে পারে না। মনে কর, দুই বিপরীত দিক থেকে একই প্রাসাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হল। চিত্রদুটি অবশ্যই ভিন্ন; এ চিত্রে যে ঘরটি ছোট তা ও চিত্রে বড় হয়ে ফুটবে। অথচ তারা একই প্রাসাদের দুই দিক। এখন রৌদ্রালোকে আলোকচিত্র নিলে ছবি দুটি যা হবে, মেঘলা দিনে আলোকচিত্র নিলে দুটি ছবিই তা থেকে ভিন্ন হবে; অথচ একটি ছবি আর একটিকে উৎপন্ন করবে না।

এই মতের দোষ হল এই যে, এক রহস্যময় সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে এই মত অন্য এক রহস্যের সৃষ্টি করে বসে। মন ও শরীরকে একই পদার্থের দুই দিক বললেও, যতক্ষণ না ঐ পদার্থ সম্পর্কে আমার জ্ঞান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার দুই দিকের সম্বন্ধও আমার কাছে রহস্যাবৃত থাকতে বাধ্য। এক মুদ্রার দুই দিক আমরা বুঝতে পারি বা দুই মুকুরে বিম্বিত একই শরীরের ছায়াও বুঝি; এইগুলি সবই ভৌতিক অবস্থা। কিন্তু মন ও শরীরের মতো ভিন্ন ধর্মী বিষয় কি করে যে এক বস্তুর দুই পার্শ্ব হয় বোঝা যায় না। আর ঐ বস্তুটিই বা কি তা বুঝতে অসুবিধা। দ্বিপার্শ্ব-বাদ শেষ পর্যন্ত তাদাত্ম্য-বাদে পর্যবসিত হতে চায়। এই শেষোক্ত মতে যে বস্তু একদিক থেকে শরীর তাই আবার অন্যদিক থেকে মন; ঠিক এইভাবে, নামভেদ বা স্থানভেদ স্বীকার করলেও 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' একই শুক্রগ্রহের নাম।

6. তাদাত্ম্যবাদ[1]

কোন কোন জড়বাদী এবং কোন কোন অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক মস্তিষ্কের স্পন্দন ও মানসিক অনুভূতিকে একেবারে সর্বতোভাবে, এমনকি সংখ্যাগতভাবেও, এক এবং অদ্বিতীয় বলতে চান। জড়বাদ শুধু শরীরকেই মানে আর এই মতে মন হল শারীরক্রিয়ার সঙ্গে এক। আধ্যাত্মবাদ অবশ্য মনকেই প্রাধান্য দেয় আর জড় শরীরকে মনে পর্যবসিত করে। কিন্তু শরীর ও মন, ভৌত মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও মানসবৃত্তির মধ্যে আমরা যে ভেদ লক্ষ করি, তাদাত্ম্য-বাদ তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, চেতন ও অচেতনের ভেদ না মানলে জ্ঞানই সম্ভব হয় না। প্রাচীন কালে সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা যে একই তারা, তা মানুষে জানত না; বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান অবশ্য আবিষ্কার করেছে যে, নামভেদ, কালভেদ থাকলেও, ওই দুই নাম একই শুক্রগ্রহকে নির্দেশ করে। এখন যেমন বলতে পারি 'সন্ধ্যাতারাই শুকতারা' বা 'শুকতারাই সন্ধ্যাতারা' তেমনি কি বলা যায় যে 'মস্তিষ্কক্রিয়াই মানসিক' ক্রিয়া? তা হলে কি আন্তরপ্রত্যক্ষে জটিল মস্তিষ্কক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে জানা যাবে? অথবা এ কথা কি বলব যে "মানসবৃত্তিই মস্তিষ্কবৃত্তি"? তা যদি হয় তো "আজ রবিবার" এই চিন্তার কি আকার,

1. Identity theory

দৈর্ঘ্য বা বর্ণ স্বীকার করতে হবে বা ঐ চিন্তার কি আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাবে? তাদাত্ম্যবাদ তাই যেন এক অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। আচরণবাদের সমালোচনায় আমরা দেখেছি যে, যে বিশেষণগুলি মানসবৃত্তিতে সার্থকভাবে লাগে তারা কিন্তু শারীরবৃত্তিতে সার্থকভাবে প্রযোজ্য হয় না। তাই তাদাত্ম্য-বাদ মানা যায় না।

উপসংহার ঃ কোন দার্শনিক সমস্যার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান করা যায় না আর ঐরূপ কোন সমাধান কাম্যও নয়। তবু উপরের আলোচনা থেকে এটুকু অন্ততঃ স্বীকার করতে হবে যে শারীরবৃত্তি ও মানসবৃত্তি পরস্পর ভিন্ন, অথচ মানুষের মধ্যে এ দুয়ের কিছু সম্পর্ক আছে। উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশতত্ত্ব নূতন স্তরের আবির্ভাব স্বীকার করে। জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে জগতের ক্রমবিকাশ এবং স্তরে স্তরে নূতনের আগমন সম্ভব হয়েছে। এই মত স্বীকার করলে, মানসিকতার ভিত্তিমূলে শারীরবৃত্তি থাকলেও, মনন একান্ত ভিন্ন, নূতন তত্ত্ব। তাই একবার প্রাণময় শরীরে আবির্ভূত হবার পর, সে শরীর নিরপেক্ষ হয়ে সম্ভব হতেও পারে বা।

শরীর-মনের ভিন্নতা স্বীকার করলেও তাদের প্রকৃত সম্বন্ধ আমাদের কাছে এখনও রহস্যময়। এই সম্পর্ক ব্যাখ্যায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ এবং সমান্তরবাদ দুটি প্রধান মত। তাদাত্ম্যবাদ ছাড়া অন্য সব মতই এই দুই মতের রকমফের মাত্র। সাধারণ বিচারে কিন্তু ঐ দুয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদই বেশী সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়। অবশ্য এই মতে যেন ভৌতশক্তির অবিনশ্বরতার প্রকল্প ব্যাহত হয়; কিন্তু কারণতার মধ্যে যদি শক্তিব্যয়ের প্রশ্ন না থাকে, নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাকেই যদি কারণ বলা যায়, তা হলে তো ভৌতশক্তির হ্রাসবৃদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না। "মস্তিষ্কবৃত্তি মানসিক ঘটনার কারণ" এ কথার অর্থ এই নয় যে মস্তিষ্ক, শক্তিক্ষয় ক'রে, মানসবৃত্তি উৎপন্ন করছে; এর অর্থ হল মস্তিষ্কবৃত্তিটি মানসবৃত্তির নিয়ত পূর্বগামী। অর্থাৎ কারণতার মধ্যে শক্তিসঞ্চারের প্রশ্ন না থাকলে ঐ শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধির ব্যাপারটাই আর থাকে না। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ লোকে, এমন কি বৈজ্ঞানিকও, শক্তিব্যয়ের প্রকল্প গ্রহণ করবেন; যথা—আমার মুষ্ট্যাঘাত যখন অপরের বেদনার কারণ হয় তখন যেন মুষ্টিগত শক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু, যখন কোন চক্রনেমির মসৃণ বর্তুলতা তার সহজ ঘূর্ণনের কারণ হয়, তখন এই কারণতায় কোন শক্তিপ্রয়োগ দেখা যায় না।

'ক্রিয়া', 'প্রতিক্রিয়া' শব্দগুলি ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন করতে পারে। এই সব শব্দ, কারণতার মধ্যে শক্তিক্ষেপের বাস্তবতা উপস্থিত করে। কিন্তু, ডেভিড্ হিউমের মত দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার নিয়ত পূর্বগামিতা বা নিয়ত অনুগামিতাকেই যদি কারণতা আখ্যা দেওয়া যায়, (যথা—ঘর্ষণ থাকলেই উত্তাপ থাকে) তা হলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও সমান্তরবাদের মধ্যে, ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া, বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। সমান্তরবাদ বলতে চায় যে মস্তিষ্কবৃত্তি ও মানসবৃত্তির মধ্যে কখনও সরাসরি সম্পর্ক হয় না। ঠিক এইভাবে, সরাসরি

সংযোগের অভাব থাকলেও, লক্ষকোটি আলোকবর্ষ দূরস্থ গ্রহপিণ্ডাদির মধ্যে মহাকর্ষরূপী কারণতা স্বীকার করা যায়। এই মহাকর্ষরূপী কারণতা এক প্রকার যোগাযোগহীন নিয়ত সহচার; চক্রনেমির বর্তুলতা যখন চক্রের মসৃণ ঘূর্ণনের কারণ হয়, তখন এই নিয়ত সহচার স্পষ্ট। এখন প্রত্যেক মস্তিষ্কবৃত্তির অনুরূপ, উপযুক্ত মানসবৃত্তি সবসময়েই ঘটে (সমান্তরবাদ) বলাও যা, মানসবৃত্তি ও শারীরবৃত্তির মধ্যে নিয়ত পূর্বগামিতা বা নিয়ত সহচারী কারণতা আছে, এ কথা বলাও তাই। তাই এক অর্থে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও সমান্তরবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

7. আত্মার অমরতা[1]

আত্মার অবিনাশিতা বা মরণোত্তর মানসিকতা স্বভাবতঃই সংশয়াচ্ছন্ন—প্রমাণ অপ্রমাণের বাইরে। যাঁরা বলবেন যে মস্তিষ্কবৃত্তি ছাড়া কোন মানসিকতা থাকতেই পারে না, তাঁদের মতে অবশ্য মৃত্যুর পর দেহোত্তর মানসিকতা (চিন্তা ইত্যাদি) অসম্ভব। কিন্তু মানসিকতা ও শারীরবৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করে আমরা দেখছি যে ঐ সম্পর্ক আমাদের কাছে খানিকটা রহস্যময়। নিয়ত পূর্ববর্তিতা বা নিয়ত সহচার ছাড়া আর কোন সম্পর্ক তাদের মধ্যে আছে বলে আমরা জানি না। ডেভিড হিউমের মতে "ক-ঘটনা খ-ঘটনার নিয়ত পূর্ববর্তী" এ কথার অর্থ হলো আজ পর্যন্ত ক-ঘটনাকে আমরা খ-ঘটনার পূর্বে ঘটতে দেখেছি, আর ভবিষ্যতেও ক-ঘটনা ঘটতে দেখলে খ-ঘটনাকে প্রত্যাশা করব। কিন্তু এই দুই ঘটনার মধ্যে এমন কোনো অনিবার্য বা অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ নেই যে, আমরা হলপ্ করে বলতে পারি "ক ঘটলে খ ঘটবেই"—তা আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার ভিতরেই হোক বা বাইরেই হোক। ত্রিভুজের তিনটি অন্তঃস্থ কোণ এবং দুই সমকোণের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অনিবার্য, অবশ্যম্ভব বলে জানি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ কার্যকারণের নিয়ত পূর্ববর্তিতা ওরকমের অবশ্যম্ভব নয়। এখন যতদূর আমরা দেখেছি তাতে হয়তো মনে হবে যে শারীর বা মস্তিষ্ক স্পন্দন না হলে জীবদ্দশায় চিন্তা, ভাবনা বা অন্য মনোবৃত্তি সম্ভব নয়; কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরেও যে ঐ সম্বন্ধ থাকবেই তা কি করে বলি। শারীরবৃত্তি ছাড়াও মানসিকতার অস্তিত্ব মানলে অবশ্য আত্মবিরোধ হয় না—শরীরে অনাশ্রিত মানসিকতা অন্ততঃ "বন্ধ্যাপুত্রে"র মতো স্ববিরোধী নয়। শরীর ও মনের সম্বন্ধ অবশ্যম্ভব নয় বলে, মানসিকতার দেহোত্তর উপস্থিতি অসম্ভব নয়। অর্থাৎ শরীর, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক ইত্যাদি ধ্বংস হবার পরও মানসিক চিন্তা, ভাবনা,—এমনকি দর্শন, স্পার্শন প্রভৃতি অনুভূতিও—থাকতে পারে, যদিও তাদের প্রকাশ দেশ-কালে অনুভব করা যাবে না। উইলিয়াম্ জেমস্ বলেছেন যে মন নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য শরীরকে এক যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে। যদি শরীরকে এই প্রকাশের মাধ্যম বলে ভাবি তা হলে, শরীর-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার ধ্বংস কেন স্বীকার

1. Immortality of soul

করব ? স্বরবিস্তারী যন্ত্রটি (মাইক্রোফোন) সরিয়ে নিলেও বক্তা তার কথা বলার শক্তি হারায় না। এইভাবে আত্মার অমরতার সম্ভাবনা হয়তো নির্দেশ করা যায়।

বর্তমান শতকে অলৌকিক মানসিকতার রাজ্যে যে সব গবেষণা হচ্ছে সেই গবেষণালব্ধ ফলের মূল্য বহু মনিষী বিচার বিশ্লেষণ করে স্বীকার করে নিয়েছেন। আবার অনেক পণ্ডিত এদের নির্দেশ সম্বন্ধে সন্দিহান রয়ে গেছেন। এই সব বিদেহী আত্মাঘটিত ঘটনাবলী উইলিয়াম্ জেমস্, স্যার অলিভার লজ্, সি. ডি. ব্রড্, এচ্. এচ্. প্রাইস্ প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। ধরা যাক, ঠাকুমা নাতনীকে বল্‌লেন, "মরার পর যদি আমার চেতনা থাকে, তবে আমি সম্ভব হলে তোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করব। আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিন বসবার ঘরে, নির্দিষ্ট সময়ে, তিনবার আমি পিয়ানোতে মধ্যম 'মা' ধ্বনি তুলব, আর বাধা না থাকলে, দিদি, তোর সঙ্গে কথা বলব"। এখন নাতনী যদিও সংশয়বাদী, তবুও ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিন যথাসময়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে, টেপরেকর্ডার নিয়ে, প্রস্তুত হয়ে বসবার ঘরে বসল। হঠাৎ মধ্যম 'মা' ধ্বনি স্বাভাবিক কারণ ছাড়াই তিনবার ধ্বনিত হল, আর হুবহু মৃত পিতামহীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আরও ধরা যাক্ যে ঐ স্বর টেপ্‌রেকর্ডে গৃহীত হল ও ঐ অশরীরী স্বর এমন কথাও নাতনীকে বলল যা ঠাকুমা-নাতনী ছাড়া আর কারও জানার সম্ভাবনা নেই। এখন যদি ঠাকুমা নাতনীর সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন আর বারে বারে ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, তবে কি তাঁর (ঠাকুমার) মরণোত্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণই হবে না ; এর সবটাই কি আকস্মিক যোগাযোগে ঘটতে পারে ? বর্তমানে অলৌকিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণা নাকি এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থিত করছে। আর যদি পিতামহী তাঁর প্রতিশ্রুতি নাও রাখতেন তবু তাঁর দেহোত্তর অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হত না ; কেননা মৃত্যুর পর হয়তো তাঁর যোগাযোগ করার মতো সুযোগই ছিল না। এ সব প্রমাণ অবশ্যই নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে না, আর অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতদের এখানে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। তবু এসব প্রমাণ ভাল করে যাচাই করা দরকার। আর যদি ধরেও নিই যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক শব্দাদি ঘটিত প্রমাণগুলি একান্তই ভ্রান্ত, তবু, যেহেতু মরণোত্তর মানসিকতা থাকা স্ববিরোধী নয়, সেই হেতু নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রয়োজনে, অন্য যুক্তি থাকলে তা গ্রাহ্য হতে পারে।

কাণ্ট্ বলেছেন যে যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা আত্মার অবিনাশিতা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণসিদ্ধ করা যায় না, তবু মানুষের নৈতিক জীবনের প্রয়োজনে এদের সম্ভাবনা স্বীকার করে নিতে হয়। আত্মার অবিনাশিতাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেই মানুষ তার জীবনে নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। এই জগতে দেখা যায় যে সজ্জন ব্যক্তিরা সবসময়েই তাঁদের কর্মানুযায়ী পুরস্কার লাভ করেন না। অবশ্য কোন পুরস্কারের লোভে কর্তব্য

কর্মে নিয়োজিত হলে মানুষ তার কর্মের নৈতিক মূল্য হারায়; সজ্জন ব্যক্তি কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করেন—পুণ্যলোভে বা পাপভয়ে নয়। তবু যদি কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি পুরস্কৃতও হতেন তবে যেন জগত অধিকতর ন্যায়ানুগ হত। অথচ দেখা যায় যে এ জগতে সাধারণতঃ সজ্জন ব্যক্তির সম্মান বা প্রতিষ্ঠা হয় না, আর দুর্জনেরই ঐ সবে অধিকার থাকে। কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনের যদি কোন সার্থকতা থাকে তো এটাই কিছু শেষ কথা হতে পারে না। এ জীবনে যে ন্যায়বিচার পাওয়া গেল না, তা যদি ভাবি জীবনে পাবার সম্ভাবনা না থাকে তা হলে কর্তব্যকর্মে লিপ্ত থাকা দুরূহ হয়। তাই মরণোত্তর জীবনের সম্ভাবনাতে বিশ্বাস নৈতিক সততার জন্য প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনে আলোচিত "কর্মবাদেরও" এই কথা। এই মতে কল্যাণকর, পুণ্যকর্মের, সঙ্গে পুরস্কার ও অশুভ, পাপকর্মের সঙ্গে শাস্তি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ; অন্যথায় এ জগত ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে না। এ জন্মে যদি কর্মানুযায়ী ফলভোগ না হয়; তবে পরজন্মে বা তৎপরজন্মে হবে।

আবার মানুষ তার নৈতিক জীবনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা কখনো এক জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই আদর্শকে এতই সুদূরপ্রসারী বলে বোধ হয় যে মানুষের সীমিত জীবনে তা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। সততার পরিধি সর্বদাই ক্রমপ্রসারিত মনে হয়—তার দিগন্ত যেন মানুষ কখনো স্পর্শ করতে পারে না। এ জীবনে দেখা যায় যে সর্বাপেক্ষা সজ্জন ও মহান ব্যক্তিও মহত্তর ও উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন; নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের যেন অন্ত নেই। এই আদর্শের কাষ্ঠা লাভ করা কারুরই পক্ষে সম্ভব হয় না। এখন যদি আমাদের ভাবী জীবন না থাকত; এ জীবনে যতটা ইষ্ট লাভ হল তার থেকে অধিকতর, মহত্তর ইষ্টলাভের আশা যদি না থাকত; এ জীবনের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই যদি সব শেষ হয়ে যেত, তা হলে সজ্জন ব্যক্তির অভীষ্ট লাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। নৈতিক জীবনাদর্শ যদি কেবলমাত্র কল্পনা-বিলাস না হয়, মনুষ্য জীবনে যদি তার বাস্তব প্রতিষ্ঠা থাকে, তা হলে আত্মাকে অবিনাশী হতে হয়, যাতে পরবর্তী জীবনধারায় উত্তরোত্তর ইষ্টলাভ হতে পারে। অতএব হয় সজ্জনের নৈতিক প্রচেষ্টা একটা মিথ্যা প্রহেলিকা, অথবা নীতিমান ব্যক্তির মরণোত্তর জীবন স্বীকার করতে হয়।

৪. ভাবী জীবনের স্বরূপ

ভাবী জীবনে আত্মা কি রকম ভাবে অবস্থান করবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। বিভিন্ন শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, মহাকাব্যে এ বিষয়ে বহু রকমের মত দেখা যায়। কেউ বলেন যে মৃত্যুর পর আত্মা নূতন দেহ ধারণ করে নবজীবনের কর্মযজ্ঞে ব্রতী হবে। কেউ বা তাদের সুখময় স্বর্গে বা দুঃখময় নিরয়ে স্থান দিয়েছেন। কেউ বা বলেন যে আত্মা দেহহীন হয়ে চিরকাল এক কর্মহীন জীবন যাপন করবে, শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। অন্যেরা বলেন যে মানুষের

চিন্ময় আত্মা শেষপর্যন্ত বিশ্বব্যাপী চিন্ময় মহাসাগরে বিলীন হয়ে যাবে। এ সব মত স্বভাবতঃই খানিকটা কল্পনাশ্রয়ী আর এ বিষয়ে সংশয়বাদই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তবে ভাবী জীবনের সম্ভাবনার যে নৈতিক যুক্তি আমরা উপস্থিত করেছি সে যুক্তি স্বীকার করলে, মরণোত্তর আত্মার নবকলেবরে নূতন কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত হওয়াই যেন যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বর্তমান জীবনে নৈতিক আদর্শকে যতটা প্রতিষ্ঠা করা গেল, তার পর থেকে আরম্ভ হবে ভাবী-জীবন, আর তাতে হবে ঐ আদর্শের উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ বর্তমান ও ভাবী জীবনের মধ্যে কোন ছেদ থাকবে না। এই মতে ব্যক্তিগত অমরতার বাধা হয় না; কেননা বিভিন্ন মানুষের নৈতিক উন্নতি বিভিন্ন মাত্রায় হয়। তাই প্রত্যেকে তার ভাবী জীবনে বিভিন্ন সোপান থেকে অগ্রসর হবে আর তাদের ব্যক্তিগত ভেদ লুপ্ত হবে না।

অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী দার্শনিকেরা কিন্তু এক অদ্বিতীয় বিশ্বাত্মা ছাড়া আর সব ব্যক্তিসত্তাকে মিথ্যা বলতে চান। বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিসত্তা ঐ এক পরমাত্মার অবভাস বা মিথ্যা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যক্তির একমাত্র আদর্শ হল ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে, নিজের বিশিষ্টতার মিথ্যাত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। তা করতে হলে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজন ও তাতেই জীবের মুক্তি। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর, এমনকি নব্য হেগেল্‌পন্থী ব্র্যাড্‌লিও বলতে চান যে ঐ আদর্শের কাষ্ঠা লাভ হলে ব্যক্তিসত্তা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়—তার কিছুই যেন অবশিষ্ট থাকে না। দুটো নদী যতক্ষণ মাটি কেটে অগ্রসর হয় ততক্ষণ তাদের ভেদ থাকে; কিন্তু তারা সমুদ্রে পড়লে আর তাদের ভিন্নতা থাকে না। এই ভাবে, শেষ পর্যন্ত, ব্যক্তিগত ভিন্নতা পরব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় এবং জীবাত্মা ব্রহ্মরূপেই মুক্ত ও অমর হয়ে থাকে। এই অদ্বয় ব্রহ্মবাদ বিশেষ ব্যক্তির অনন্যসত্তার অবিনাশিতা স্বীকার করে না। তাই এই মতে আমাদের আগ্রহ থাকা খুব স্বাভাবিক নয়। আমার বিশেষত্ব নিয়েই যদি আমি অবিনাশী না হলাম, তা হলে আমি ব্রহ্মরূপে থাকলাম কিনা তাতে কি যায় আসে? অদ্বৈত মতে আমি আমার অনন্যতায় ধ্বংসই হয়ে যাব। কিন্তু অমরতার প্রশ্নে বোধ হয় জীবের অনন্যসত্তা সম্পর্কেই ওঠে; পরমাত্মার অমরতার প্রশ্ন ওঠে না। তাই অদ্বৈত মত খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

সপ্তদশ অধ্যায়

মূল্য বা ইষ্ট[1]

1. ভূমিকা

যে সব বাক্যে 'ভাল-মন্দ', 'সুন্দর-কুৎসিৎ', 'সত্য-মিথ্যা' প্রভৃতি বিশেষণ সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়, সেই সব বাক্যে ঐ বিশেষণে বিশেষিত বস্তুর মূল্য নির্ধারণ বা মূল্যাবধারণ হয়; যথা—"পরনিন্দা মন্দ"; "তাজমহল সুন্দর" ইত্যাদি। মানুষের কোন ইচ্ছাকৃত কর্মকে বা কোন কর্মের উদ্দেশ্যকে 'ভাল' বা 'মন্দ' বলা যায়; যথা "সত্যকথা বলা ভাল বা কল্যাণকর", "নিষ্ঠুরতা মন্দ বা অশুভ", ইত্যাদি। এখানে 'ভাল' বা 'মন্দ' বিশেষণ নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করে। কোন কিছুকে 'ভাল' বললে তার সমাদর করা হয়, প্রশংসা করা হয়; আর 'মন্দ' বললে হেয় করা হয়, নিন্দা করা হয়। আবার কোন জ্ঞান 'সত্য' বা 'মিথ্যা' হতে পারে; আমরা সত্য জ্ঞানের সমাদর করি ও মিথ্যা, অযথার্থ জ্ঞানকে হেয়জ্ঞানে পরিহার করি। তেমনি কোন শিল্প-কর্মকে 'সুন্দর' বা 'কুৎসিৎ' বলা চলে; স্পষ্টতঃই এই সব বাক্যেও নিন্দা-প্রশংসা বর্তমান থাকে। মূল্যবান বিষয়কে আমরা কাম্য বা ইষ্ট বলে থাকি আর যা ঐ অর্থে মূল্যহীন তা আমাদের দ্বিষ্ট হয়। সত্য বা যথার্থ জ্ঞান মূল্যবান বলেই তা মানুষের ইষ্টরূপে কল্পিত হয়; মিথ্যা বা অনৃত জ্ঞান মূল্যহীন এবং তাই দ্বিষ্ট। যে কবিতা সুন্দর তা আমাদের ইষ্ট, কেননা সে আমাদের অনাবিল আনন্দের জনক হয়, আর যে গাথা কুৎসিৎ তাকে আমরা হেয়জ্ঞান করি। এইভাবে মানুষের কর্মজীবনের সুনীতি ইষ্ট ও দুর্নীতি দ্বিষ্ট হয়। অতএব জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতিমান পুরুষের জীবনেই একমাত্র সত্য, কল্যাণ ও সুন্দররূপী মূল্যের বিকাশ দেখা যায়। সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান উভয়েই একই শ্রেণীর বিপরীত মূল্য নির্দেশ করে; প্রথমটি ইষ্ট ও পরেরটি দ্বিষ্ট। এইভাবে সুনীতি ও দুর্নীতি একই শ্রেণীর বিপরীত মূল্য আর সুন্দর-কুৎসিতও ক্রমানুযায়ী ইষ্ট ও দ্বিষ্ট হয়। যে বস্তু এদের কোনটাই নয়, অর্থাৎ সুন্দরও না কুৎসিতও না, ভালও না মন্দও না, তার প্রতি আমাদের উপেক্ষাবুদ্ধি থাকে; অর্থাৎ তা ইষ্টও না, দ্বিষ্টও না, কিন্তু উপেক্ষ।

2. বর্ণনামূলক ও মূল্যনির্ধারক বাক্য

যে বাক্যে কোন বস্তুর মূল্যনির্ধারণ হয় সেই বাক্য বস্তুর বর্ণনামূলক বাক্য থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। "এই ফুলটি লাল" বললে, ফুলটির কোন বাস্তব

---

1. Value

ধর্মের বর্ণনা হয়; কিন্তু তাকে সমাদর বা অনাদর করা হয় না। "এই ফুলটি বড় সুন্দর" বললে কিন্তু সেই সমাদর বা প্রশংসাই প্রকাশ পায়। তাই মূল্যবোধক বাক্য ও বর্ণনাবোধক বাক্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান। বর্ণনা-মূলক বাক্য কোন বাস্তব অবস্থাকে বর্ণনা করে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে "যথা সামনের টেবিলটি গোলাকার"; কিন্তু যদি বলি, "টেবিলটি অসুন্দর", তাহলে বোধ হয় টেবিলের বাস্তব স্বরূপের বর্ণনা হয় না; কেবল বলা হয় যে টেবিলটি আমার অসন্তোষ উৎপাদন করছে। "টেবিলটি বাস্তবে কি হতে পারত, অথচ হয়নি, তাই হয়তো "টেবিলটি অসুন্দর" বলাতে বলতে চেয়েছি। এই ভাবে "টেবিলটি সুন্দর" বলার অর্থ যেন আমি টেবিলটিকে অনুমোদন করছি বা টেবিলটি আমার পছন্দ। এখানে টেবিলের কোন বাস্তবধর্মের বর্ণনা না করে, আমার কোন মনোভাবের বর্ণনা করছি বলে মনে হয়।

এর থেকে হয়তো এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে ধর্ম বা গুণাবলী দিয়ে বস্তুর বর্ণনা করা হয় তারা মানুষের মানসনিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ মানুষে জানুক বা না-জানুক, ঐ বস্তু ও তার ধর্মগুলি অনুভবনিরপেক্ষ হয়েই বাস্তব হতে পারে। মর্মরের 'দৃঢ়তা' বা তুষারের 'শুভ্রতা', বস্তুগুলির মতই মানুষের জ্ঞাননিরপেক্ষ বাস্তব ধর্ম ব'লে, "মর্মরটি দৃঢ়", "তুষারগুলি শুভ্র" প্রভৃতি বাক্য বাস্তব ধর্মের বর্ণনা করে। কিন্তু শ্বেতমর্মরে গঠিত আগ্রার তাজহলের 'সৌন্দর্য' ঐ রকমের কোন মানসনিরপেক্ষ ধর্ম নয়। তাজমহল যদি মানুষের সন্তোষ উৎপাদন না করত তা হলে "সুন্দর" বলে মানুষ তার সমাদর করত না। অতএব মর্মরের 'দৃঢ়তা' বর্ণনামূলক ধর্ম; তা মানুষের সন্তোষ বা অসন্তোষ উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু বস্তুর 'সৌন্দর্য' বা মনুষ্য কৃতির 'সততা' ঐ সন্তোষজনকতার উপরেই নির্ভর করে; তাই এরা মানুষের অনুভূতি-সাপেক্ষ।

'ভাল' 'মন্দ' বিশেষণগুলি অত্যন্ত ব্যাপক; নৈতিক, অনৈতিক নানা প্রসঙ্গে তারা মূল্যাবধারণ নির্দেশ করে। মনুষ্যকৃতিতে প্রয়োগ করলে এরা নৈতিক মূল্য প্রকাশ করে বলে বলা হয়েছে; অন্য যে কোন দ্রব্যে প্রযুক্ত এই বিশেষণগুলি অনৈতিক মূল্য নির্দেশ করে; যথা, "এই আপেলটি (বাড়ীটি, গাড়ীটি, জুতোটি ইত্যাদি) ভাল" আর "ওই আপেলটি (বাড়ীটি ইত্যাদি) খারাপ।" এই মূল্যবোধক বিশেষণ এবং বর্ণনামূলক বিশেষণের (লাল, নীল, দীর্ঘ, খর্ব ইত্যাদি) প্রয়োগে এক প্রকার ক্রম দেখা যায়। "খুব ভাল", 'ভাল', 'মোটামুটি ভাল', 'কিছুটা খারাপ' 'অত্যন্ত খারাপ' আপেল হতে পারে আর ফলওয়ালা এই ক্রমানুযায়ী তার ফলগুলি দোকানে সাজাতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ফলওয়ালার মনে 'সর্বাপেক্ষা ভাল আপেলের' একটি আদর্শ আপনাআপনি কাজ করবে। এইভাবে কোন এক মনোগত আদর্শকে মানরূপে ব্যবহার করেই পরীক্ষক ছাত্রদের বিভিন্ন উত্তরপত্রের ক্রমমূল্যায়ণ করে থাকেন। কিন্তু বর্ণনামূলক বিশেষণের ক্রম এই প্রকারের কোন মনোগত আদর্শানুযায়ী হয় বলে মনে হয় না।

'টকটকে লাল', 'লাল', 'হাল্কা লাল', 'গোলাপী' ইত্যাদি বর্ণনার ক্রম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের বাস্তব, মাত্রাগত তারতম্য অনুসারে নির্দিষ্ট হয়। 'উচ্চ' বা 'ক্ষীণ' শব্দের তীব্রতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; শব্দের তারতম্য কোন মনোগত আদর্শের তুলনায় নিষ্পন্ন হয় না। ক্রম বা তারতম্যবোধ ছাড়াও, মূল্যবোধে মনোগত আদর্শকে আশ্রয় করতেই হবে; কিন্তু বর্ণনায় কোন আদর্শকে আশ্রয় করতে হয় না। কোন চরিত্র বা কৃতিকে 'ভাল' বা 'মন্দ' বলতে হলে, সর্বপেক্ষা মূল্যবান আদর্শ চরিত্র কল্পনা করে নিয়ে তার কতটা নিকটবর্তী ঐ চরিত্র বা কৃতি হয়েছে তা বিচার করতে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা অনুমিতির সাহায্যেই বাস্তবের বর্ণনা হতে পারে; বর্ণনায় কোন আদর্শের সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন নেই। তাই মূল্যবোধক বাক্য আদর্শনিষ্ঠ এবং বর্ণনামূলক বাক্য বস্তুনিষ্ঠ।

আবার মূল্যবোধক বাক্যে উচিতার্থক নির্দেশ থাকে যা বর্ণনায় থাকে না। "ক-কাজটি ভাল বা কল্যাণকর" বাক্যটিকে* "ক-কাজটিকে নির্বাচন করা উচিত" বাক্যে সহজে রূপান্তরিত করা যায়; আর "এই কবিতাটি সুন্দর" বাক্যকে "এই কবিতাটিকে সমাদর করা উচিত" বাক্যে অনুবাদ করতে অসুবিধা নেই। বিপরীতক্রমে, "পিতামাতাকে মান্য করা উচিত", "মিথ্যা বলা অনুচিত" প্রভৃতি বাক্যকে, "পিতামাতাকে মান্য করা ভাল", "মিথ্যা বলা মন্দ" প্রভৃতি বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু বর্ণনামূলক বাক্যকে উচিতার্থক বাক্যে অনুবাদ করা যায় না। "ঘাস সবুজ" এই বাক্যের অর্থের মধ্যে 'ঘাসের সবুজ হওয়া উচিত' বা 'ঘাসকে সমাদর করা উচিত' নির্দেশ নেই। বর্ণনামূলক বাক্য বাস্তব ঘটনা কি তা নির্দেশ করে; মূল্যবোধক বাক্য নির্দেশ করে কি হওয়া উচিত বা করা উচিত। তাই "ক সবুজ" আর "ক ভাল" বাক্যাকার দুটির মধ্যে ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকলেও, তাদের ন্যায়সম্মত নির্দেশ ভিন্ন।

উচিতার্থক বাক্যগুলি আবার খানিকটা অনুজ্ঞাবোধক। "দরজা বন্ধ কর" —পরিষ্কার অনুজ্ঞা বা হুকুম। "পরস্ত্রীর প্রতি নজর দেওয়া অনুচিত"ও অস্পষ্টভাবে "—নজর দিও না" এইরূপ সামাজিক অনুজ্ঞা। সব মূল্যবোধক বাক্যকেই অনুজ্ঞায় অনুবাদ করা চলে যথা: "পরস্ত্রী-কামনা খারাপ"কে "পরস্ত্রী কামনা করিও না" বাক্যে পরিবর্তিত করলে অর্থহানি হয় না। কিন্তু বর্ণনা মূলক বাক্য কেবল বিবৃতি—কখনই অনুজ্ঞা নয়। 'ঘাস সবুজ' অর্থ এই নয় যে 'ঘাসকে সবুজ কর'। বাস্তবে সংঘটিত, কোন ঘটনা অনুজ্ঞাকে সত্য বা মিথ্যা করে না, কিন্তু বর্ণনাকে সত্য বা মিথ্যা করে। "ক্রীট্ দ্বীপের সকলেই মিথ্যা কথা বলে" এই বর্ণনামূলক বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় যদি বাস্তবে একটি সত্যবাদী ক্রীট্দ্বীপের অধিবাসীকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিকই কে সত্য বলল বা কে মিথ্যা বলল তা দিয়ে "মিথ্যা বলা অনুচিত"

* "ক-কাজটি ভাল" এটি একটি বাক্যাকার; একটু বিস্তৃত অর্থে একে 'বাক্য' বলা হয়েছে।

এই নীতির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায় না। পৃথিবীর সবাই যদি মিথ্যাও বলত, তবু "মিথ্যা বলা অনুচিত" বাক্যের হানি হত না ও তা গ্রাহ্য হতে পারত। উচিতার্থক বাক্য বা অনুজ্ঞা-বাক্য সাধারণ অর্থে সত্য বা মিথ্যা হয় না—যুক্তিযুক্ত বা অযৌক্তিক হতে পারে। গান্ধীজি ইংরাজ শাসকের অনুজ্ঞাকে 'অযৌক্তিক' জ্ঞান করতেন; কিন্তু তাকে মিথ্যা বলা চলে না। প্রাকৃতিক নিয়ম কিন্তু সত্য হয় আর তাই নৈতিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম একান্তই ভিন্ন।

বাস্তবধর্মের বর্ণনা মূলক বাক্য আর মূল্যবোধক বাক্যের মধ্যে উপরে লিখিত পার্থক্য থাকলেও, সাধারণ ভাষায় এই পার্থক্য করা সব সময়েই খুব সহজ নয়। ভাষাগত বাক্যগুলিকে অভিনিবেশসহকারে বিশ্লেষণ করলেই ঐ পার্থক্য ধরা পড়তে পারে। "এই যুবকটি লম্বা"—এ বাক্য যে বাস্তব ধর্মের বর্ণনা তা সহজে বোঝা যায়; কেননা দেহের দৈর্ঘ্য মাপা যায়। কিন্তু "এই যুবকটি দৃঢ়চেতা," এ বাক্য বর্ণনা করে না প্রশংসা করে তা নির্ণয় করা খুব সহজ নয়। উদ্দিষ্ট যুবকটির আদর্শনিষ্ঠা বা তার চিত্তের অনমনীয়তাকে যদি তদগত বাস্তবধর্ম বলিও, তা হলেও 'দৃঢ়চেতা' বিশেষণ খানিকটা প্রশংসা প্রকাশ করে; অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে নিন্দাও প্রকাশ করে, যদি 'দৃঢ়চেতা' বলতে 'গোঁয়ার' বুঝি। "এই যুবকটি লম্বা" এবং "এই যুবকটি দৃঢ়চেতা" দুটি বাক্যই ব্যাকরণসম্মতভাবে একই এবং দুটি বাক্যকেই, প্রথমদর্শনে, বর্ণনামূলক বলে মনে হয়। এমনকি "তাজমহল বড় সুন্দর" বাক্যটিও ব্যাকরণগতভাবে বর্ণনামূলক হতে আপত্তি নেই; কেননা উক্ত সৌন্দর্যকে তাজমহলেরই বাস্তব ধর্ম বলতে পারি। কিন্তু একটু মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, "তাজমহল বড় সুন্দর", এ বাক্যে প্রশংসা, সমাদর নিহিত আছে; কিন্তু "তাজমহল মর্মর নির্মিত" এ বাক্যে বর্ণনা আছে—সমাদর বা অনাদর নেই।

অবশ্য সমাদর বা অনাদর নিছক শূন্যকে আশ্রয় করে হয় না। তাজমহলের মধ্যে এমন কিছু বাস্তব ধর্মের (সামঞ্জস্য, সমানুপাত) প্রকাশ চাই যে, তাকে সমাদর করতে আমরা বাধ্য হব। তাই নিন্দা প্রশংসা হয়তো কোন বর্ণনা মূলক বাস্তব ধর্মকে আশ্রয় করেই হয়। তেমনি সাধারণভাষায় নিছক বর্ণনাও যেন সম্ভব নয়। অবস্থা বিশেষে বা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনামূলক বাক্যও ক্ষীণভাবে সমাদর—অনাদর প্রকাশ করতে পারে। পাত্রীকে যখন কেবল তার গাত্রবর্ণ দেখে নির্বাচন করা হয় তখন, "মেয়েটি ফর্সা", এই বর্ণনার মধ্যে সমাদর লুকিয়ে থাকতে পারে। "মেয়েটি কালো" নিছক বর্ণনা কিনা সন্দেহ; এ বাক্যে অনাদর মিশে থাকতে পারে। আবার "কৃষ্ণকলি"র কালো হরিণ চোখ রবীন্দ্রনাথের সমাদর উদ্রেক করেছে। এই কারণে সাধারণ ভাষায় বর্ণনা ও মূল্যবোধের মধ্যে প্রায়ই মিশ্রণ দেখা যায়। একমাত্র প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিকের বাক্যই নিছক বর্ণনামূলক; কারণ এই বৈজ্ঞানিকেরা সচেতনভাবে তাঁদের বাক্যে মূল্যায়ণ—সমাদর বা অনাদর—পরিহার করেন। 'রক্তবর্ণ এক বিশেষ দৈর্ঘ্যের

আলোকতরঙ্গ নির্দেশ করে'—এই বাক্য একান্তই বর্ণনামূলক। প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়মাবলী সম্পূর্ণভাবে বাস্তব ধর্ম বা ঘটনাবলীকে নির্দেশ করে বলে, তার বিবৃতিতে মূল্যসূচক কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। বিজ্ঞানীকে তাই অত্যন্ত সাবধানে ও সচেতনভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে হয়। "ঘর্ষণে উত্তাপ সৃষ্টি হয়" "আর্দ্রতা সহযোগে লোহাতে মরিচা পড়ে" প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম-বোধক বাক্য একান্তই মূল্যায়ণ-নিরপেক্ষ। এর থেকে হয়তো এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মূল্য কিছু মানস-নিরপেক্ষ প্রকৃতির বাস্তব ধর্ম নয়। মূল্য হল এমন ধর্ম যা মানুষের সন্তোষ-অসন্তোষ, সমাদর-অনাদর সাপেক্ষ হয়েই প্রাকৃত বস্তুতে থাকে। সৌন্দর্য তাই এমন এক ধর্ম যা অজন্তার গুহাচিত্রেও থাকে, আর তাকে সমাদর করে যে পুরুষ, তার সহৃদয় চিত্তেও থাকে।

3. মূল্য বা ইষ্টের শ্রেণীবিভাগ

দার্শনিক চিন্তায় প্রধানতঃ দু রকমের মূল্যের কথা বলা হয়—(1) স্বাধীন বা স্বকীয় মূল্য এবং (2) আশ্রিত বা পরকীয়মূল্য। যে ইষ্ট, কাম্যপদার্থ হবার জন্য অন্য কোন কাম্যবস্তুর উপরে নির্ভর করে না, অর্থাৎ যে ইষ্ট স্বতোমূল্যবান তাই স্বকীয় মূল্যবান। আর নিজস্ব কিছু মূল্য না থাকলেও, যে পদার্থ অন্য কোন ইষ্টের সহায়ক বা উপায় হিসেবে কাম্য হয়, তাকেই পরকীয় মূল্য বলা হয়। রোগমুক্তি আমাদের কাম্য পদার্থ; এ কারণে বিস্বাদ ঔষধও আমাদের কাম্য হয়। ঐ ঔষধ কিন্তু নিজে নিজেই মূল্যবান নয়; রোগমুক্তিরূপ ইষ্টের উপায় হিসেবে মূল্যবান। অর্থাৎ যে মূল্যবান পদার্থ আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যরূপে উপস্থিত থাকে তাই স্বাধীন, আর যে পদার্থ ঐ অভীষ্ট লাভের সহায়ক, তার মূল্য ঐ স্বাধীন মূল্যে আশ্রিত হয়। যদি বলি "ক খকে পাবার উপায় রূপে কাম্য" তা হলে 'ক'-এর মূল্য 'খ'-এর উপর আশ্রিত হয়। কিন্তু 'খ' যদি কাম্য না হ'তো তবে উপায় হিসেবে, 'ক' কাম্য হতে পারে না; 'খ'-এর মূল্য তাই স্বাধীন। আবার যদি বলি "গ-এর উৎপাদক হিসেবে ক খ-এর থেকে অধিকতর কাম্য" তা হলে 'গ'-এর মূল্য স্বাধীন আর 'ক' এর আশ্রিত মূল্য খ-এর মূল্য থেকে বেশী। ধনসম্পত্তি নিজে নিজেই কারুর ইষ্ট হয় না; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করতে পারে বলেই ইষ্ট হয়।

মনুষ্য জীবনে অভীষ্ট ও উপায়ের মধ্যে এক ক্রম দেখা যায় আর এই ক্রম সহজেই চরমতম অভীষ্টে পৌঁছে যায়। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য মূল্যবান; পরীক্ষা পাশ উচ্চতর পরীক্ষা পাশের উপায়; উচ্চতম পরীক্ষাপাশ আত্মোন্নতির সহায়ক। এই ক্রমে চরমতম সন্তোষ উৎপাদনকারী অভীষ্টের দিকে আমাদের অগ্রগতি। আজ যা স্বতোমূল্যবান, কাল তা উচ্চতর আদর্শ লাভে সহায়ক হয়ে আশ্রিত মূল্য হ'য়ে যায়। মূল্যবোধক বাক্যে যে আদর্শের সঙ্গে তুলনা সূচিত হয়, যে আদর্শ পরিপূর্ণ সন্তোষের উৎপাদক, যার উপরে মানুষের আর কিছুই কাম্য থাকতে পারে না, তাই প্রকৃত স্বাধীন মূল্য। এ কেবল

অভীষ্টরূপেই মূল্যবান ; কখনই উচ্চতর আদর্শ লাভের উপায়রূপে পরকীয় হয় না। এই স্বকীয় ইষ্টকে কমবেশী উপলব্ধি করে অন্যান্য সব কিছু কমবেশী মূল্যবান হয়। এই চরমতম স্বকীয় মূল্য বা মূল্যগুলিই দার্শনিক সমস্যার জনক হয়। এদের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারলে, এদের সহায়ক পরকীয় মূল্যকে চিনে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। মানুষের চরমতম অভীষ্ট নির্ণয় করা খুব সহজ নয়।

অধিকাংশ দার্শনিকের মতে সত্য, কল্যাণ আর সৌন্দর্য হল মানুষের চরমতম কাম্য পদার্থ। মানুষ তার জ্ঞানজীবনে সত্যতা বা যাথার্থ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে পারে না ; কিন্তু মানুষ সর্বজ্ঞ নয় বলে পরিপূর্ণ সত্য হয়তো তার নাগালের বাইরে। জ্ঞানবিদ্যা এই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ বিচার করে। ভাব বা আবেগের জীবনে মানুষের চরমতম কাম্য হল সৌন্দর্য ; আমরা সৌন্দর্যের জন্যেই সুন্দরের আরাধনা করি। সুন্দর বস্তু আমাদের আনন্দঘন রসাবেশ উৎপন্ন করে, আর ঐ আনন্দময় ভাবের মধ্যে দুঃখের ছোঁয়া থাকে না একটুও। কান্তিবিদ্যা এই সৌন্দর্য বা রসের অনুসন্ধান করে। আবার সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ মানুষের নৈতিক জীবনের স্বকীয় মূল্য। সেই চরমতম কল্যাণ বা সততার নির্ধারণ হয় নীতিবিদ্যায়। জ্ঞানবিদ্যা, নীতিবিদ্যা বা কান্তিবিদ্যা বিজ্ঞান নয়—দর্শনের শাখা। বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ, আদর্শনিষ্ঠ নয়। কি ঘটছে বা ঘটেছিল, বাস্তব অবস্থা যে কি তাই কেবল বিজ্ঞান বলতে পারে ; কি হওয়া উচিত বা আমাদের কি করা উচিত তা দর্শনের আলোচ্য। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের মধ্যেই সত্য, শিব ও সুন্দরের আবির্ভাব। প্রকৃতির ক্রমবিকাশে পুরুষসত্তার অভিব্যক্তি এই স্বতোমূল্যবান অভীষ্টগুলিকে সম্ভব করেছে। মানুষই নিজের কামনা বাসনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভালমন্দ, সদসৎ নির্ধারণ করতে পারে ; নিজের ভাবগুলি সুন্দর বা অসুন্দর বলে বুঝতে পারে ; আর নিজের জ্ঞানগুলিকে সত্যাসত্য বলে জানতে পারে। তাই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের জীবন-রঙ্গমঞ্চেই স্বতোমূল্যবান অভীষ্টগুলি নটনটীরূপে বিরাজ করে। এই মানুষই কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়—মনুষ্যেতর প্রাণীরা হয় না।

4. মূল্য—আত্মগত না বিষয়গত[1]

আমরা দেখেছি যে কাম্য পদার্থের মূল্য এক অর্থে আমাদের কামনার ওপরে, সমাদরের ওপরে, নির্ভর করে। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সন্তোষবিধানের নিরপেক্ষ হয়ে কোন বিষয় ইষ্ট হতে পারে না। সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি স্বকীয় পুরুষার্থগুলি জ্ঞানচিকীর্ষাকৃতিমান পুরুষকে কেন্দ্র করেই সম্ভব হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে কিছু কিছু স্থূল মূল্য থাকলেও,—যথা, খাবারদাবার—; পশুর কোন শুভাশুভ নৈতিক জীবন নেই, নান্দনিক সৌন্দর্যচর্চাও সে করে না। মানবসত্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় মূল্যগুলির উন্মেষ হয়েছে বলে মনে হয়। এক অর্থে মানুষের কামনাই বস্তুজগতে মূল্যের উন্মেষ সম্ভব করে।

---

1. Value—Subjective or Objective

অবশ্য এ বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। স্পিনোজা বলেছেন, "মানুষ ভাবে যে কোন কিছু ভাল বলেই সে তাকে কামনা করে; কিন্তু আসলে মানুষ কামনা করে বলেই সেই বস্তু ভাল"। মূল্যের এই আত্মগত সত্তা আবার অন্য চিন্তানায়কেরা মানেন নি; তাঁদের মতে স্বকীয় মূল্যগুলি মানুষের চেতনানিরপেক্ষ বস্তুগত ধর্ম।

5. মূল্য আত্মগত

এই মতে মূল্যগুলি ব্যক্তির সন্তোষজনকতার ওপর নির্ভর করে ব'লে তাদের অস্তিত্ব মানসসাপেক্ষ। কোন বস্তু মানসনিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারলেও তার মূল্য কিন্তু তা পারে না। দার্শনিক লোট্‌জা বলেছেন যে বস্তুর মূল্য সম্পূর্ণ-ভাবে আমাদের সন্তোষবিধানে বা আনন্দবিধানে থাকে। এই সন্তোষ বা আনন্দ একান্ত মানসিকবৃত্তি ব'লে মূল্য একান্তই ব্যক্তিসাপেক্ষ। যে বস্তু আমার আনন্দ বিধান করে তা কিন্তু তোমার নিরানন্দের কারণ হতে পারে; তাই আমার যা ইষ্ট তা তোমার কাছে দ্বিষ্ট হতে পারে। মূল্য যদি বস্তুগত হত তা হলে লাল, নীল প্রভৃতি বিষয়গত গুণের মতো তা সকলের কাছেই এক বলে প্রতিভাত হত; অথচ মূল্যের বেলা এক শৃঙ্খলাহীন অনৈক্যই নিয়ম। মূল্যবোধে এক নৈরাজ্যই দেখা যায়। দেশকালপাত্র ভেদে মূল্য ভিন্ন হয় বলে দেখা গেছে। নৈতিক বা নান্দনিক আদর্শ নানা দেশে নানারূপ নিয়েছে। অসভ্য হটেন্‌টট্‌দের কল্পিত সুন্দরী নারীমূর্তি সভ্য মানুষের চোখে বীভৎস। যে প্রথা এদেশে সমর্থন পায় তা অন্যদেশে নিন্দা ছাড়া আর কিছু পায় না। স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলে বিধবারা এককালে 'সতী' হত আর সেখানে 'সতীতীর্থ' স্থাপিত হত; আজ ঐ প্রথা নিন্দনীয়, বর্জনীয়। পুরুষের বহুবিবাহ এককালে গর্বের ব্যাপার ছিল; আজ তার সেই মহিমা অস্তমিত। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মাধুর্য্য গ্রহণ করা কি আমাদের পক্ষে এতই সহজ? যা এখানে সুন্দর, ওখানে অসুন্দর তা বস্তুগত ভাবে সুন্দর-অসুন্দর হতে পারে না; আমাদের আবেগ, আমাদের আনন্দ-নিরানন্দই কোন বস্তুকে মূল্যবান করে। আসলে মূল্যহীন বিষয়ের উপরে মূল্যগুলি আগন্তুক ধর্ম—আমাদের মানসিকতার অভিক্ষেপ।

আমরা উপরের মতকে একেবারে অস্বীকার করতে পারব না। তবে বিচার করে দেখতে হবে মূল্য একান্তই ব্যক্তির মানসসাপেক্ষ, না সর্বমানবের সমাদর সাপেক্ষ হয়ে সকলের কাছেই এক। প্রথম মতে ব্যক্তির রুচিভেদে মূল্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হবে—ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। কিন্তু এই একান্ত ব্যক্তিগত মূল্যের মত পরিহার করে এমন হয়তো বলা যায় যে, যা প্রকৃত মূল্যবান বা পরম-পুরুষার্থ তা সমগ্রমানবের সন্তোষ বিধান ক'রে সকলের কাছেই এক ও অভিন্ন হয়। ঐ পরমপুরুষার্থ যে কি তা নির্দেশ করা হয়তো কঠিন; কিন্তু মূল্যকে একান্ত ব্যক্তিগত ভাবলে মূল্যবিষয়ে বিবাদের অবকাশ থাকে না এবং আরও

নানা অসুবিধা উপস্থিত হয়। মূল্যের মানসসাপেক্ষতার মত নানা আকারে উপস্থিত করা হয়েছে।

(5.1) "মূল্যের স্থান মানুষের মনে" এই মতবাদীদের কেউ কেউ মূল্যবোধক ও বর্ণনামূলক বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ স্বীকার করেন না। 'ক-বস্তুটি লাল' এই বাক্যে যেমন মানসনিরপেক্ষ কোন গুণের বর্ণনা হয়, এই মতে তেমনি "ক-বস্তুটি ভাল" এই বাক্যে আমার কোন মনোভাবের বর্ণনা হয়; যথা "ক-বস্তুটি আমি পছন্দ করি বা অনুমোদন করি"। "আমি সুখী" বললে যেমন আমার কোন মনোভাবের বিবৃতি দেওয়া হয়, তেমনি "ক ভাল বা মন্দ" বললে ক-বস্তুর কোন বাস্তব ধর্মের বর্ণনা হয় না; কেবল কএর প্রতি আমার মনোভাবের বর্ণনা হয়। এখন মূল্যবোধক বিশেষণ দিয়ে যদি ব্যক্তিবিশেষের মনোগত অবস্থার বর্ণনা হয়, তাহলে মূল্য বিষয়গত না হয়ে একান্তই আত্মগত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ঐ ক-বস্তু নিজেই নিরপেক্ষভাবে 'ভাল' বা 'সুন্দর' নয়; ক-বস্তুর প্রতি আমার পছন্দ-অপছন্দ থাকার অর্থই হলো ক ভাল বা মন্দ। অতএব এই মতে নিম্নলিখিত সমীকরণ মানতে হবে ঃ

'ক' ভাল = 'ক'কে আমি পছন্দ করি।
'ক' মন্দ = 'ক'কে আমি পছন্দ করি না।
'ক' সুন্দর = 'ক'কে আমি সমাদর করি।
'ক' অসুন্দর = 'ক'কে আমি সমাদর করি না।

অথচ বস্তুটি নিজে ভাল বলেই হয়তো আমি তাকে পছন্দ বা অনুমোদন করে থাকি। এখন বস্তুর নিজস্ব সৌন্দর্য যদি তাকে সমাদর করার কারণ হয়, তা হলে উপরোক্ত সমীকরণ অনুযায়ী কারণ ও কার্যকে কি অভিন্ন বলতে হবে? তা ছাড়া, আগেই বলা হয়েছে যে আমার যা পছন্দ, তোমার তা অপছন্দ হতে পারে। এই মত মানলে, আমি যখন বলব "আজকের নাটকটি সুন্দর" আর তুমি বলবে "আজকের নাটকটি অসুন্দর", তখন একই নাটক সম্পর্কে এই দুই বাক্য বিরোধী হতে পারবে না; এর কারণ হলো "আমি পছন্দ করি" আর "তুমি অপছন্দ কর" এই দুই বাক্যই একই নাটক সম্পর্কে এক যোগে সত্য হতে পারে। অথচ সাধারণ ভাষার নির্দেশ মানলে দেখা যায় যে, একই নাট্যকর্ম সম্বন্ধে সুন্দর এবং অসুন্দর বিশেষণ অবশ্যই বিরুদ্ধ। যদি এই বিরোধিতা অস্বীকার করে বলি যে, আমার কাছে আমারটা সুন্দর আর তোমার কাছে তোমারটা সুন্দর হোক্, তা হলে মূল্যগুলি একান্তই ব্যক্তির মানস সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। অথচ সাধারণতঃ 'সুন্দর—অসুন্দর', 'ভাল—মন্দ' বিশেষণের ন্যায়গত অসঙ্গতি মানতে হয় আর এ কারণেই আমরা মূল্যবিচারের বেলা বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হয়ে থাকি। এ বিবাদের মীমাংসা হয়তো শেষ পর্যন্ত হয় না; তবু বিবাদের সম্ভাবনার এই নির্দেশ যে, বিরোধ মেটাবার জন্য এক সর্বজনগ্রাহ্য যোগ্য মানদণ্ড, নাটকাদির ক্ষেত্রে, অবশ্যই রয়েছে।

(5.2) ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের যে দোষ দেখা গেল, সেই দোষই দেখা

যাবে সমাজের অধিকাংশ মানুষের অনুমোদন বা অননুমোদনের মতবাদে। এই মতে—

'ক'-বস্তু ভাল = 'ক'-বস্তুকে অধিকাংশ মানুষ পছন্দ করে।

'ক'-বস্তু মন্দ = 'ক'-বস্তুকে অধিকাংশ মানুষ অপছন্দ করে।

এখন এই সমীকরণের দুই দিকে বাক্যগত অর্থ যদি অভিন্ন হয়, তাহলে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে পরিহার করতে পারলেও, মূল্য অধিকাংশ মানুষের মানস সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। এক সমাজের বৃহৎ অংশ যা অনুমোদন করে অন্য সমাজের অধিকাংশ মানুষ তা অনুমোদন নাও করতে পারে—এতে কোন ন্যায়গত অসঙ্গতি নেই। তা হলে কোন বস্তুকে সর্ব দেশে, সর্বকালে ভাল বা মন্দ বলা যাবে না। সব সমাজেই বিধবার সহমরণ প্রথা অনুমোদিত ছিল না। সত্যতার বেলা অধিকাংশের অনুমোদিত মত ভ্রান্ত হতে পারে। অধিকাংশের অনুমোদিত "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে" মতটি গ্যালিলিও স্বীকার করেননি বলে তাঁকে শহীদ হতে হয়েছিল—অথচ আমরা জানি যে ঐ একক বিজ্ঞানীই সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। তাই অধিকাংশের ভোটে মূল্য নির্ধারণ হয় না। "অধিকাংশ যা পছন্দ করে তাই ভাল কি ?"—এ প্রশ্ন অবশ্যই নীতিবিজ্ঞানে উঠতে পারে।

(5.3) অন্য এক মতে, ভাল-মন্দ-র অর্থ আমার, তোমার বা সমাজের অধিকাংশের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে না খুঁজে, আদর্শ এক অপক্ষপাত জ্ঞানীপুরুষের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই মতে "ক-বস্তু ভাল" এই বাক্যটি "নিরপেক্ষ আদর্শ জ্ঞানী বা জ্ঞানীরা ক-বস্তুর অনুমোদন করেন" বাক্যের সঙ্গে সমার্থক। এই আদর্শ দ্রষ্টা হলেন তিনি যাঁর কোন রকমের পক্ষপাত থাকবে না, বিচারাধীন বিষয় সম্পর্কে যাঁর পূর্ণজ্ঞান থাকবে, আর তিনি বাদী-প্রতিবাদী উভয়েরই সঙ্গে কল্পনায় একীভূত হবার ক্ষমতা রাখবেন। নন্দনশাস্ত্রে সহৃদয় রসবেত্তার কথা বলা হয়েছে ও নীতিশাস্ত্রে আদর্শ বিচারক প্রায়শঃই উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু একদম অপক্ষপাত নির্লিপ্ত দ্রষ্টা পাওয়া অসম্ভব। আমি যাকে আদর্শ বলব অপরে তাকে মানবে কেন ? অনেকের কাছে মহাত্মা গান্ধী আদর্শ হলেও তাঁর আততায়ী নিশ্চয় তাঁকে আদর্শ ব'লে ভাবে নি আর পছন্দ-অপছন্দের বেলা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। সহৃদয় রসবেত্তার খোঁজই যদি থাকত তা হলে নন্দনশাস্ত্রে বিরোধের মীমাংসা বহু আগেই হয়ে যেত। অবশ্য আদর্শ দ্রষ্টা বাস্তব না হলেও, তাঁর সম্ভাবনা মেনে, ভালমন্দ, সুন্দর-কুচ্ছিতের অর্থ করা যায় ঃ

'ক' ভাল বা সুন্দর = আদর্শ দ্রষ্টা 'ক'কে অনুমোদন করেন।

'ক' মন্দ বা অসুন্দর = আদর্শ দ্রষ্টা 'ক'কে অনুমোদন করেন না।

কিন্তু যতদিন না আদর্শ দ্রষ্টা বাস্তব হচ্ছেন, ততদিন 'ভাল' 'সুন্দর' শব্দগুলি আমাদের কাছে, এই মতে, অর্থহীন হবে। অথচ এগুলিকে আমরা সার্থকভাবে প্রয়োগ করে থাকি। আরও কথা, কোন বস্তু সুন্দর বলেই সহৃদয় রসবেত্তা তাকে অনুমোদন করেন ; তিনি অনুমোদন করেন বলেই কোন কিছু সুন্দর হয় না।

(5.4) উপরের মতগুলিতে দেখা গেল যে মূল্যবোধক বাক্যগুলি যেন আমার,

তোমার, সামাজিক মানুষের বা আদর্শ দ্রষ্টার মনোভাবের বর্ণনা বা বিবরণ। কিন্তু বর্তমানে এ. জে. এয়ার প্রমুখ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন যে, মূল্যবোধক-বিশেষণগুলি মনোগত বা বিষয়গত কোন অবস্থারই বর্ণনা করে না—কেবল বক্তার মানসিক আবেগ প্রকাশ করে, বিকীর্ণ করে। অধ্যাপক এয়ার বলেন যে, "তুমি চুরি করে খারাপ কাজ করেছ" এই বাক্যের দুটি অংশ; (1) "তুমি চুরি করেছ" —এটা একান্তই কোন বাস্তব ঘটনার বর্ণনা। (2) "কাজটা খারাপ" —এই দ্বিতীয় অংশে বক্তার উষ্মার প্রকাশ হচ্ছে। "ছি! ছি!" শব্দ দিয়ে যেমন ধিক্কার প্রকাশ (বর্ণনা নয়) পায়, "মন্দ" বিশেষণও ঠিক তাই করে। এই মতে :

"তুমি চুরি করে খারাপ কাজ করেছ" = "তুমি চুরি করেছ।—ছিঃ!"

রক্তচক্ষু বা বদ্ধমুষ্টিতে যেমন ক্রোধের প্রকাশ হয় তেমনি 'ভাল', 'মন্দ', 'সুন্দর' 'কুচ্ছিত' বিশেষণে যথাযোগ্য আবেগের প্রকাশ হয়ে থাকে। এইভাবে :

"ভাল" = "সাবাস !"

"মন্দ" = "ছ্যাঃ ছ্যাঃ"

"তুমি চুরি করে খারাপ কাজ করেছ" এই বাক্যে একটি ঘটনার বর্ণনা আছে—"তুমি চুরি করেছ"; এই বিবরণে ঐ ঘটনার জ্ঞানও নির্দেশিত হচ্ছে। কিন্তু "খারাপ" শব্দটি দিয়ে বাড়তি কোন ঘটনার বর্ণনা বা জ্ঞান সূচিত হচ্ছে না। ওই শব্দ বক্তার ধিক্কার বা ঘৃণা প্রকাশ করছে। একটু অবধান করলে সাধারণ শব্দের আবেগমূলক অর্থ প্রকট হতে পারে। "কিছু মুখে দিন", "কিছু খান", "নাও—গেলো!" এই তিনটি অনুজ্ঞা যে ক্রিয়াকে অবলম্বন করে তা অভিন্ন হলেও, আবেগমূলক অর্থে অনুজ্ঞা তিনটি কতই না ভিন্ন। মূল্যবোধক বিশেষণও কোন বস্তু, ঘটনা বা ধর্মের জ্ঞান নির্দেশ করে না। ঐ বিশেষণ অধ্যাপক এয়ারের মতে কেবল মনোগত আবেগ প্রকট করে থাকে।

অধ্যাপক সি. এল. স্টিভেন্‌শন্‌ আর একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চান যে মূল্যবোধক বিশেষণের সাহায্যে বক্তা শ্রোতার মনে বিশেষ ধরণের আবেগ উদ্রিক্ত করতে প্রয়াসী হন অথবা শ্রোতার অনুমোদন-অননুমোদন জাগাবার চেষ্টা করেন। মা যখন ছেলেকে বলেন যে "চুরি করা খারাপ" তখন মায়ের মনোগত আবেগের প্রকাশ করার থেকে ছেলের চুরির প্রতি বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে দেওয়াই যেন প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গোঙানি, চীৎকার বা অট্টহাস্য যে রকম ভাবে আবেগ প্রকটিত করে, নৈতিক বা নান্দনিক বাক্য (ক-ভাল, ক-সুন্দর) তেমন ভাবে বক্তার আবেগ প্রদর্শন করে না। বক্তা যেন এ রকম বাক্যে শ্রোতাকে কিছু অনুজ্ঞা দেন আর শ্রোতার মনে পছন্দ-অপছন্দের ভাব জাগানোই যেন তাঁর লক্ষ্য। আমরা আগেই বলেছি যে "চুরি করা মন্দ" এর অর্থ "চুরি করো না" অনুজ্ঞায় পর্যবসান হতে পারে। তাই সি. এল. স্টিভেনশন্‌ বলেছেন যে মূল্যবোধক বাক্য একাধারে মনোভাবের বর্ণনা এবং অনুজ্ঞার প্রকাশ হয়। এই মতে :

"ক—ভাল" = "আমি 'ক'কে অনুমোদন করি; তুমিও করো।"

এই বিশ্লেষণে নৈতিক বাক্যের দুটি অংশ ; প্রথম অংশে বক্তার মনোভাবের বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশ শ্রোতার প্রতি অনুজ্ঞা।

কিন্তু নৈতিক নিয়মকে কোন অনুজ্ঞায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হলেও, এই অনুজ্ঞা সাধারণ হুকুমের মত নয়। সাধারণ অনুজ্ঞা কেবল শ্রোতার প্রতিই প্রযোজ্য, বক্তার নিজের প্রতি নয় ; যথা, যখন কাউকে বলি "দরজাটা বন্ধ কর" তখন নিশ্চয়ই আমি নিজে ঐ অনুজ্ঞার দ্বারা বদ্ধ হই না। কিন্তু নৈতিক অনুজ্ঞা এ বিষয়ে অনন্য এবং স্বতন্ত্র। "চুরি করিও না" এই অনুজ্ঞার দ্বারা বক্তা-শ্রোতা সকলেই দায়বদ্ধ বলে মনে হয়। এই কারণে অধ্যাপক এয়ার এবং অধ্যাপক স্টিভেনশন্ বহু বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছেন। এ কথা হয়তো ঠিক যে মূল্যবোধক বিশেষণে বক্তার ভাবাবেগ প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অধ্যাপক ব্রেথ্‌ওয়েটের মতে নৈতিক বাক্যে এই ভাবাবেগ প্রকাশের বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। চরিত্রবান ব্যক্তি তাঁর কর্মকে অপরে অনুমোদন করল কি করল না, তাতে মোটেই বিচলিত হন না। কোন কর্মকে কর্তব্য বলে বুঝলে তিনি তা করতে উৎসাহী হন—নিজে বা অপরে তা পছন্দ করুক চাই নাই করুক। কর্তব্যকর্মের অবশ্যম্ভাব্যতা কারুর ব্যক্তিগত রুচি বা মর্জির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

আবার শুধু পছন্দ নয়—পছন্দের কিছু কারণও নির্দেশ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক এয়ার বলেছেন যে মূল্যবোধক বিশেষণের অনুরূপ কোন ধর্ম বস্তুজগতে নেই। কিন্তু কেন যে ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন রকমের আবেগের প্রকাশ হয় তা তিনি বলেন নি। এই আবেগ কি খেয়াল খুশি মতো প্রকট করা হয়? বিপরীত মনোভাবের প্রকাশ হলে মূল্যবোধে বিরোধ উপস্থিত হয় বলে দেখেছি। এই বিরোধ দূরীকরণে যুক্তি উপস্থিত করতে গেলে মূল্যবান বিষয়টিকে কোন গুণের আশ্রয় বলে স্বীকার করতে হয়। আবেগ বা পছন্দ-অপছন্দরূপ মনোভাবের প্রকাশক হয়েও মূল্যবোধক বিশেষণে কিছু বিষয়গত ধর্মের বর্ণনা থাকতে পারে। এই বিশেষণগুলির প্রয়োগ অত্যন্ত জটিল—এর একটি দিক আবেগ প্রকাশ করে ও অপর একটি দিক সমাদৃত বস্তুর ধর্মের বর্ণনা করে। কোন কোন চরমপন্থী অবশ্য শুভাশুভ, সুন্দর—অসুন্দরকে একেবারে মানসনিরপেক্ষ, বিষয়গত ধর্ম বলতে চেয়েছেন।

6. মূল্য বিষয়গত

আমরা দেখেছি যে মূল্যকে মানুষের বোধসাপেক্ষ, তার সমাদর সাপেক্ষ মনে হবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, ঐ মূল্যকে পুরোপুরি আত্মগত বলা যায় না। মূল্যবান বস্তু কাম্য বলেই, মানুষের সন্তোষ উৎপাদন না করলে তা ইষ্ট হয় না ঠিকই ; কিন্তু এটাও ঠিক যে কোন বস্তুকে সমাদর করলে তা নিছক রুচির উপরে নির্ভর করে না। মূল্যবান বস্তু বা বিষয়ে এমন কিছু থাকবে যা আমাদের সমাদরকে আকর্ষণ করবে। এইদিক থেকে মূল্যকে বিষয়গতও

মনে হয়। আমি যাকে সমাদর করি, তুমি হয়তো তার সমাদর কর না; তবু আমি ঐ বস্তুর মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করেছি যা তাকে সমাদর করতে আমাকে বাধ্য করে। সূর্যাস্তের বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যে তাকে 'সুন্দর' বলতে আমি বাধ্য হই। এই মূল্যায়ন আমার খেয়াল খুশির ওপরে নির্ভর করে বলে মনে হয় না। আমার মূল্যচেতনাকেই বা ঐ মনোভাবকেই কেউ মূল্যবান বলে না—সমাদৃত বস্তুর মূল্য থাকে ঐ বস্তুতেই। আমার মনোগত সন্তোষ-অসন্তোষ বস্তুর মূল্যকে নির্দেশ করে মাত্র—কিন্তু ঐ মনোভাবই মূল্য নয়।

সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধ খানিকটা অনুশীলন ও শিক্ষা সাপেক্ষ। কোন শিল্পে যথা রন্ধনকার্যের শিক্ষা যেমন পুস্তক পাঠে হয় না, কিন্তু বারে বারে রন্ধন অভ্যাসের ফলে হয়; তেমনই রসবোধকে শিক্ষিত হতে হলে বিভিন্ন রসঘন বস্তুর সঙ্গে বারে বারে পরিচয় হওয়া আবশ্যক। এইরূপ অনুশীলনে মানুষ সহৃদয় হয়ে উঠতে পারে। পর্যাপ্ত অনুশীলন হলে সকলেরই অভিন্ন রকমের রসবোধ হতে পারে বলে ধরে নেওয়া যায়। রুচিভেদ হলে আমরা তর্ক করি, বিবাদ করি; একই চলচ্চিত্রকে আমি 'সুন্দর' আর তুমি 'অসুন্দর' বললে, আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই তা বলি কি করে? এই বিবাদ একটা বাস্তব ঘটনা। আমাদের এই বিবাদের মূলে রয়েছে সেই বিশ্বাস যে সৌন্দর্যের কাষ্ঠা জানতে পারলে এই বিবাদ নিরস্ত হবে। মূল্যের এই কাষ্ঠা বা সর্বোচ্চ মান সকলের কাছে এক হওয়ার কথা। ঐ কাষ্ঠাগ্রহণে অক্ষমতাই ব্যক্তিগত রুচিভেদের কারণ। আদর্শ সত্য, কল্যাণ, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি স্বকীয় মূল্যের কাষ্ঠাকে বিষয়গত বলার অর্থ কেবল এই যে, তারা সর্বলোকগ্রাহ্য; কোন বিশেষ ব্যক্তির সমাদর-অসমাদরের উপর নির্ভরশীল নয়।

তাইবলে একেবারে মানুষের সন্তোষ-অসন্তোষ নিরপেক্ষ ভাবেও মূল্যকে বুঝতে চাওয়া ভ্রমাত্মক হবে। বর্তমান শতকে ইংরাজ দার্শনিক জি. ঈ. মুর তাঁর বিখ্যাত "প্রিন্সিপিয়া এথিকা" গ্রন্থে মূল্য বা মূল্যবান জিনিষগুলিকে, ইঁটকাঠের মত, মানুষের প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ এমন কি সমাদরনিরপেক্ষ, অস্তিত্ববান পদার্থ বলতে চেয়েছেন। কল্যাণ বা সৌন্দর্য এই মতে, মানসনিরপেক্ষ বস্তুগত ধর্ম। "ক-বস্তুটি ভাল" আর "ক-বস্তুটি নীল" বাক্য দুটি একজাতীয়; উভয়েই 'ক' বস্তুর বাস্তব ধর্মের বর্ণনামূলক। তবে পার্থক্য এই যে, 'নীল' শব্দে বস্তুর কোন প্রাকৃত ধর্মের বর্ণনা হয়, কিন্তু 'ভাল' শব্দে বস্তুর অপ্রাকৃত ধর্মের বর্ণনা হয়। অর্থাৎ প্রথম ধর্মটি (নীল) যদিও প্রত্যক্ষগম্য, দ্বিতীয়টি (ভাল) ঐরূপ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য ধর্ম নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে 'প্রকৃতি' বলা হয়েছে। কোন বস্তুকে দেখেই বলা যায় যে ঐ বস্তু 'লাল' না 'নীল', 'বড়' না 'ছোট' ইত্যাদি; তাই ওগুলিকে বস্তুর প্রাকৃত ধর্ম বলা যাবে। কিন্তু প্রথম দর্শনেই কোন মানুষকে 'ভাল মানুষ' বা 'খারাপ' বলা যায় না; তাই 'ভাল', 'খারাপ' প্রভৃতি নৈতিকগুণকে অপ্রাকৃত ধর্ম বলতে হয়। 'ভাল' বা 'মন্দ' কোন

বিষয়ের এক অনন্যসাধারণ অতিপ্রাকৃত গুণ। আদর্শ-ভিত্তিক এই গুণের লক্ষণ কোন প্রাকৃত বা বাস্তব ধর্মের সাহায্যে করা যায় না। আদর্শ ও বাস্তবের দূরত্ব অপরিসীম; উচিত আদর্শকে বাস্তবে টেনে আনলে 'প্রাকৃত' বা 'গ্রাম্যতা' দোষ হয়। মূর বিচার করে দেখিয়েছেন যে নীতিবিদ্যার ইতিহাসে 'ভালপনার' যে সব লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তারা সবাই এই প্রাকৃত দোষে দুষ্ট। "ভালপনা" কেবল ভালপনা; অন্য কিছু নয়। এই অতিপ্রাকৃত ধর্ম এক সরল, অনন্য, বিশ্লেষণের অযোগ্য ধর্ম, যাকে স্বজ্ঞার সাহায্যে সাক্ষাৎভাবে পেতে হবে। ঠিক এইভাবে 'নীল'ও এক বিশ্লেষণহীন, অনন্য, সাক্ষাৎগ্রাহ্য প্রাকৃত গুণ আর ঐ অনন্য গুণের সংজ্ঞা রচনা করা যায় না।

মূল্যকে বিষয়গত বলতে গিয়ে দার্শনিক মূর আর এক চরম সীমায় উপনীত হয়েছেন বলে মনে হয়। যে মূল্য মানুষের কামনানিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে, সে আবার 'কাম্য' বা 'ইষ্ট' হয় কি করে? 'মূল্য' শব্দটি এক বিশেষ্য পদ ব'লে ঐ শব্দের অনুরূপ কোন বস্তু জগতে রয়েছে ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু সমস্ত বিশেষ্যপদের ব্যবহার সাধারণ ভাষায় এক রকমের হয় না। 'সোনার পাহাড়' যেমন কোন বস্তুর নাম নয়, তেমনি 'মূল্যও' কোন মানসনিরপেক্ষ পদার্থের নাম হতে পারে না।

7. মূল্য আত্মগত এবং বিষয়গত উভয়ই

স্বকীয় মূল্য বা মানুষের পুরুষার্থগুলিকে আত্মগত সমাদরসাপেক্ষ বিষয়গত ধর্ম বলতে হবে। এই মতে 'ইষ্ট' আত্মগত ও বিষয়গত উভয়ই, আর এই মতই মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। আমাদের মূল্যায়ণ সাপেক্ষ হ'য়ে ইষ্টকে বিষয়গত ধর্ম বলার অসুবিধে নেই। এই স্বকীয় আদর্শ মূল্যগুলি (সত্য, শিব, সুন্দর) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সন্তোষ-অসন্তোষের উপর নির্ভর করে না। সর্বমানবে যার সমাদর করে, সে সমাদরসাপেক্ষ হয়ে বিশেষ ব্যক্তির মানসনিরপেক্ষ হতে পারে। আদর্শ পুরুষার্থকে নির্দিষ্ট করা হয়তো কঠিন; কিন্তু তাকে মানবমাত্রেরই কাছে সমাদরযোগ্য হতে হয়। সমাদরসাপেক্ষ বলেই ঐ আদর্শ ইষ্ট মানুষের জীবনে বাস্তবে উপলব্ধ হবার দাবী রাখে; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে কোন ইষ্ট মানুষের সীমিত জীবনে উপলব্ধির বিষয় হয় না। জ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণরূপী ইষ্টগুলির সতত বিস্তারশীল দিগন্তের নাগাল মানুষ কখনই পায় না। স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণগুলিকে সম্পূর্ণ বিষয়গত বলেও, মূল্যকে মানুষের মানসসাপেক্ষ এক তৃতীয় পর্যায়ের বিষয়গত ধর্ম বলতে বাধ্য হয়েছেন। আদর্শ মূল্যগুলিকে সমাদর করি বলেই তারা মূল্যবান; অথচ তারা পূর্ণভাবে আমাদের উপলব্ধির বাইরে বলে, পরিপূর্ণ ইষ্ট আমাদের মানসনিরপেক্ষও বটে।

অবশ্য উপরে যে ভাবে বিচারপুষ্ট দূরকল্পনার আশ্রয় নিয়ে আদর্শ মূল্যের কথা বলা হল, তার থেকে আরও সহজে, সাধারণ উদাহরণের সাহায্যে, ইষ্টের মানস-

সাপেক্ষতা ও মানসনিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা করা যায়। প্রত্যেক মূল্যবোধক বিশেষণের প্রয়োগে এক জটিল অর্থ ব্যঞ্জিত হয় ;—এদের প্রত্যেকেরই একটি সমাদর প্রকাশক অর্থ ও একটি বস্তুগত ধর্মের বর্ণনামূলক অর্থ আছে। তাই ঐ বিশেষণের প্রয়োগে মানুষের সমাদর এবং বস্তুর ধর্ম উভয়েই প্রকাশ পায়। অধ্যাপক আর, এম, হেয়ারের মতে, 'বাড়ীটা ভাল', 'বইটা ভাল', 'মোটর গাড়ীটা ভাল', 'নাটকটি ভাল', 'কাজটা ভাল' ইত্যাদি সব স্থলে 'ভাল' বিশেষণের দ্বারা সমাদর, প্রশংসা করা হচ্ছে ; আর ঐ সমাদর হলো 'ভাল' বিশেষণের সাধারণ অর্থ। কিন্তু এই সমাদর অকারণে করা হয় না — উল্লিখিত বাড়ী, বই, মোটর গাড়ী, নাটক, কাজ ইত্যাদিতে কতগুলি ধর্ম অবশ্যই দেখা গেছে যার জন্য ঐ সমাদর। এই বস্তুগত ধর্মগুলি ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন হয় ; যেমন, বাড়ীটা যে খোলা মেলা, বাড়ীটার চওড়া বারান্দা, বড় বড় ঘর ইত্যাদি হয়তো তাকে সমাদরের বিষয় করে ; মোটর গাড়ীর দ্রুত, স্বচ্ছন্দ গমন, কম তেল খরচে বেশী দূর চলা, প্রচুর পা রাখবার জায়গা ইত্যাদি তাকে সমাদর করার কারণ। তাই এ বিশেষণের প্রয়োগে যেমন সর্বত্র সমাদর প্রকাশ হয় তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়গত ধর্মের বর্ণনাও হয়ে থাকে। অতএব এই 'ভাল' বিশেষণ মূল্যজ্ঞাপক ও বর্ণনামূলক উভয়ই। কেবল মনে রাখতে হবে যে, 'ভাল' বিশেষণের অন্তর্গত সমাদর, কিছু বর্ণনা করে না ; ঐ সমাদর বা প্রশংসা ক্রিয়ামূলক ও খানিকটা আবেগমূলক। মানুষকে বা কোন বিষয়কে 'ভাল' বললেই তাকে সমাদর করা হয়ে যায় ; ঐ কার্যপর বাক্য "আমি সমাদর করলাম" বলে আমার মনোভাবের বর্ণনা করে না। কিন্তু এই কার্যজনকতা ছাড়াও ঐ বিশেষণের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বস্তুর বর্ণনাও থাকে এবং তা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সিদ্ধি সূচিত করে। তাই নৈতিক মূল্যবোধক বাক্যও কার্যপর এবং সিদ্ধপর- উভয়ই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে 'গানটি সুন্দর' 'কবিতাটি সুন্দর', মেয়েটি সুন্দরী, প্রভৃতিতেও সমাদর ও বর্ণনা উভয়ই থাকে। যদি বলি কোন দ্রষ্টা দেখুক চাই না দেখুক, ছবিটি বাস্তবিকই সুন্দর, তখন এ কথাই হয়তো বলি যে, যদি কেউ ছবিটিকে দেখে তাহলে ছবিটি দ্রষ্টার সন্তোষ উৎপন্ন করবে, কতকগুলি ধর্মের ভিত্তিতে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিশ্বতত্ত্ব[1] ও ভাববাদ[2]

1. জড়বাদ বনাম ভাববাদ

আমরা আগেই বলেছি যে দার্শনিকের একটি প্রধান কর্তব্য হল কিছুই বাদ না দিয়ে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা। অন্য অর্থে একেই বলে পরম-পদার্থকে বর্ণনা করা। আমরা ইতিমধ্যে জড়বাদী বিশ্বতত্ত্ব আলোচনা করেছি। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে সমগ্র বিশ্বের —অর্থাৎ জড়, প্রাণ ও মনের —ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক জড়বাদ কখনই পর্যাপ্ত হতে পারে না। প্রাণবান পদার্থ পুরোপুরি যন্ত্র নয় আর মনকেও মস্তিষ্কক্রিয়ার উপাবভাস বলা অযৌক্তিক। সমগ্রের বাখ্যায় জড়বাদী প্রকল্প তাই পর্যাপ্ত নয়। যুক্তিনিষ্ঠ দূরকল্পনার সাহায্যে যে কোন বিশ্বতত্ত্বই উপস্থিত করা হোক না কেন, বিচার করে দেখতে হবে যে ঐ বিশ্বমত শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত আর সুসঙ্গত কিনা। দর্শনে কোন অপর্যাপ্ত ও স্ববিরোধী বিশ্বমত গ্রাহ্য হতে পারে না। বিশ্বের মূলীভূত উপাদান জড়াত্মক আর সেই জড় পদার্থের যান্ত্রিক ক্রমবিকাশের পূর্বাপর স্তরে জড়েরই কমবেশী জটিল পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে, এই মত স্ববিরোধী না হলেও, পর্যাপ্ত নয়। তাই ঐ জড়বাদবিরোধী ভাববাদী বিশ্বতত্ত্ব বিচার করে দেখতে হবে।

ভাববাদ বিশ্বের মূলীভূত সত্তাকে মানসিক বা আধ্যাত্মিক বলে বর্ণনা করতে চায়। জড়বাদ যেমন মনকে জড়স্তরে টেনে নামায়, তেমনি ভাববাদ বলে যে জড়বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের প্রত্যক্ষ বা চৈতন্যসাপেক্ষ। ভাববাদী মতে জড়বস্তু মনের ধারণারাজিতে পর্যবসিত হয়। মন বা আত্মতত্ত্ব এই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক মূলতত্ত্ব আর অন্য সব কিছুই ঐ অধ্যাত্মতত্ত্বের উপর আশ্রিত। স্বয়ংসৎ বা স্বতোনির্ভর সত্তা আধ্যাত্মিক, আর অনাত্ম প্রকৃতি হয় মিথ্যা, অথবা তার আশ্রিত সত্তা ঐ আধ্যাত্মিক সত্তা থেকে ধার করা। জগতের মূলতত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে মন ও তার ধারণা, আত্মা ও তার চিন্তারাজি, ইচ্ছা, সংকল্প, কৃতি প্রভৃতি আত্মিক বৃত্তিকেই পাওয়া যাবে। দেকার্ত এই আত্মাকেই সর্বাপেক্ষা নিঃসন্দিগ্ধ সত্তা বলে স্বীকার করেছেন। অন্য সব কিছু সন্দিগ্ধ হতে পারলেও চৈতন্যের অস্তিত্ব সন্দিগ্ধ হতে পারে না। এর কারণ হলো এই যে সংশয়ও এক প্রকারের চৈতন্য বলে, চৈতন্যকে সংশয় করলে অন্য এক চৈতন্যের অস্তিতা স্বীকার করা হয়ে যায়। উপনিষদেও কোন এক বিশেষ অর্থে আত্মা বা চৈতন্যকে পরমপদার্থ বা পরব্রহ্ম বলে উপস্থিত করা হয়েছে। এই পরব্রহ্ম থেকে সমস্ত জীব ও জড়জগতের উৎপত্তি হয়েছে। সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্মের অবভাস বা বাহ্যপ্রকাশ।

---

1. Cosmology 2. Idealism

জড়বাদী ও ভাববাদী বিশ্বতত্ত্ব একান্তই বিরোধী। এই দুই মতই কিছু সত্য হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে বর্তমান পরমাণুবিজ্ঞান জড়কে নিশ্চল ভাবে না, আর তাই সে জড়বাদ সমর্থক নয়। প্রাণের ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্য কারণতার আশ্রয় নিতে হয় আর তাও যন্ত্রবাদ বিরোধী। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপে বেশী বেশী গুরুত্বপূর্ণ মূল্য বা ইষ্টের বিকাশ হয়; আর মূল্যও একান্ত মানসনিরপেক্ষ নয়। ভাববাদী বিশ্বতত্ত্ব উদ্দেশ্য-কারণতা, মূল্য, আদর্শ ইত্যাদি সমর্থন করে আর তাই সে জড়বাদ-বিরোধী। অবশ্য পর্যাপ্ততা সুসংগতির মান গ্রহণ করলে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাববাদী বিশ্বমতও দুর্বল হ'য়ে পড়তে পারে। জড়বস্তুকে মনের ধারণায় পুরোপুরি পর্যবসান করা যায় না বলে অনেকেই বলেছেন। তবু এই দুই মতের মধ্যে ভাববাদই অধিকতর সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়। অবশ্য এমন বলা যায় না যে সব কিছুই সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে গেছে। মানুষের সীমিত দৃষ্টিতে হয়তো পরম পদার্থের অনন্তরূপ ধরা পড়ে না। হাবার্ট স্পেনসার বলেন যে পরমতত্ত্ব একান্তই অজ্ঞেয়। এই মত কিন্তু একদেশদর্শী। পরমতত্ত্বের অজ্ঞেয়তাবাদ খণ্ডন না করলে বিশ্বতত্ত্ব আলোচনা নিরর্থক হয়।

2. পরমতত্ত্বের অজ্ঞেয়তাবাদ[1]

অজ্ঞেয়তাবাদকে একপ্রকার নেতিমূলক বিশ্বতত্ত্ব বলা যায়। এই মতে বিশ্ব-তত্ত্ব অজ্ঞাত তো বটেই; বিশ্লেষণমুখে মানুষের জ্ঞানের যে আকার ও উপাদান পাওয়া যায়, তার স্বরূপ এমনই যে পরমতত্ত্ব মানুষের কাছে অজ্ঞেয় থাকতে বাধ্য হয়। কাণ্টের 'বিচারবাদ' মানুষের জ্ঞান মাত্রকেই অবভাসের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বলে; স্বয়ংসৎ বস্তু ঐ জ্ঞানের সীমার মধ্যে পড়ে না। প্রকৃত এবং সম্ভবপর সব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয়বস্তু অবভাস; স্বয়ংসৎ বস্তু বুদ্ধির প্রত্যয়ের দ্বারা আকারিত হ'য়ে আমাদের জ্ঞানে ভাসমান হয়। ঐ স্বয়ংসৎ বস্তুও অজ্ঞাত বলে মানায় কাণ্ট্‌কে অজ্ঞেয়বাদী বলতে হয়।

হার্বার্ট স্পেন্‌সার বলেন যে মানুষের জ্ঞানমাত্রেই এমন কোন বিষয়ের জ্ঞান যা অন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জ্ঞানে ভাসমান হয়। অর্থাৎ এক বিষয়ের জ্ঞান অন্য বিষয় সাপেক্ষ। এই কারণে অনপেক্ষ, অনন্য বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব নয়। অসীম, অনন্ত বিশ্বের বাইরে আর কিছু নেই বলে তাকে অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে ভাবা যায় না, আর তাই এই অনন্য তত্ত্বকে জানা যায় না। যখন কোন বস্তুকে 'কলম' বলে জানি, তখন ঐ জ্ঞাত বস্তু যে পূর্বদৃষ্ট কলমের সদৃশ আর অন্যান্য জ্ঞাত বিষয় (দোয়াত, কাগজ) থেকে ভিন্ন তা বুঝতে হয়। মানুষের জ্ঞানের এমনই স্বভাব যে, যে কোন জ্ঞানের বিষয়ই অন্যান্য বিষয় সাপেক্ষ হয়ে, অন্যান্য সদৃশ ও বিসদৃশ বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে বিষয়মাত্রেই অন্যান্য বাইরের বিষয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

1. Agnosticism

কিন্তু অনপেক্ষ বা অন্য সকল বস্তুনিরপেক্ষ অনন্ত বিশ্বতত্ত্ব এইরূপ সাপেক্ষ, সীমিত বস্তুর বিপরীত বলে তা অজ্ঞেয় থাকতে বাধ্য। বিশ্বের পরমতত্ত্ব সবকিছুই নিজের কুক্ষিভূত করে নেয় বলে সে তদতিরিক্ত অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করে না। সে স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠ—তার সত্তা কোন সর্তাধীন নয়। কিন্তু জ্ঞানের বিষয়মাত্রেই সসীম, অন্যবস্তুসাপেক্ষ বলে, পরমবস্তু অজ্ঞাত এবং চিরকালই অজ্ঞাত থাকবে।

সমালোচনা : উপরোক্ত মতের প্রধান দোষ হল ঐ মতে অনপেক্ষ ও সাপেক্ষ, স্বয়ংসৎ বস্তু ও তার অবভাস অত্যন্ত বিরোধী বলে কল্পিত হয়েছে। কাণ্ট্ বলেছেন যে রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন সর্পরূপ অবভাস ও তার অধিষ্ঠান রজ্জুর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, যেমন দুটোই লম্বা, আঁকাবাঁকা কিছু। কিন্তু জ্ঞানের বিষয়রূপ অবভাস ও স্বয়ংসৎ বস্তুর মধ্যে ঐটুকু মিলও নেই। এখন কাণ্টের মতের বিরুদ্ধে হয়তো এটুকু বলা যায় যে, স্বয়ংসৎ বস্তু যদি পুরোপুরিই অজ্ঞাত থাকে তা হলে তার সঙ্গে অবভাসের যে কোন সাদৃশ্য নেই তাই বা বলি কি করে? অবভাস যদি স্বয়ংসৎ বস্তুরই অবভাস হয় তা হলে অবভাসকে জেনেই বা তার অধিষ্ঠানকে অন্ততঃ কিছুটা কেন জানা যাবে না? স্বয়ংসৎ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাকে কিছুটা অন্ততঃ জানা হয়।

আমরা ঘটকে জানি, পটকে জানি বিষয়রূপে। কিন্তু দার্শনিক বলেন যে সমস্ত বিষয়ই সাপেক্ষ বা সীমাবদ্ধ ; কিন্তু এই সাধারণ দার্শনিক জ্ঞানটি পেতে হলে জ্ঞানের বিষয়মাত্রকেই অনপেক্ষ, স্বপ্রতিষ্ঠ পরমতত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রাথমিক ঘটজ্ঞানে হয়তো পূর্বদৃষ্ট ঘটের সাদৃশ্য ও অন্য বস্তুর বৈসাদৃশ্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় যে সাপেক্ষ, এই দ্বিতীয় পর্যায়ের দার্শনিক জ্ঞানে, সাপেক্ষ বিষয়কে অনপেক্ষের সঙ্গে বিসদৃশ ভাবতে হয়, আর তাতে করে অনপেক্ষ তত্ত্বের এক প্রকার জ্ঞান হয়ে যায়। ব্রাড্লি বলেছেন যে তত্ত্ববিদ্যাবিরোধীরাও একপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞানী ; কারণ পরমতত্ত্বকে অজ্ঞেয় বললেও তার সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞান সূচিত হয়।

এ কথা অবশ্য ঠিকই যে অনন্ত পরমতত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে আমাদের সীমিত জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বলয়ে অসীম তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। অজ্ঞেয়তাবাদ হয়তো পরমতত্ত্বের এই রহস্যময়তাকেই অজ্ঞেয়তা বলে ধরেছে। আমাদের সীমিত জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান কল্পনা করা একান্তই ভ্রমাত্মক। তত্ত্বজ্ঞান আমাদের ক্রমশঃ অধিকৃত হয়—যুগে যুগে তার নবমূল্যায়ন হয়ে থাকে। এখানে

> কিছু তার দেখি আভা
> কিছু পাই অনুমানে ;
> কিছু তার বুঝি না বা। (রবীন্দ্রনাথ)

3. অদ্বৈতবাদ বনাম বহুতত্ত্ববাদ[1]

পরমতত্ত্ব জড় না চৈতন্যময় এ প্রশ্ন ছাড়াও, ঐ তত্ত্ব 'এক না বহু' এ সমস্যাও দার্শনিকদের আলোচ্য বিষয় হয়েছে। যুগে যুগে একদল দার্শনিক বিশ্বের পরম-তত্ত্বকে এক, অভিন্ন ও অদ্বিতীয় বলতে চেয়েছেন; এ'রা বিশ্বের নানা বস্তু বা ঘটনার মধ্যে একরূপতা ও সুসংহতি দেখতে পান। অন্য একদল দার্শনিক আবার এই বিশ্বে নানা পরস্পর-নিরপেক্ষ তত্ত্বের সমাবেশের উপরে জোর দিয়ে বহুত্ববাদী হয়েছেন। কিন্তু পূর্ণ অদ্বৈতবাদের অনন্য তত্ত্ব আর বহুত্ববাদীর বহুতার মধ্যে নানারূপ মাত্রাগত প্রভেদ দেখা যায়। কিছু দাশনিক পরমতত্ত্বকে এক এবং অদ্বিতীয় বলতে গিয়ে বহুতার কোন পারমার্থিক সত্তাই স্বীকার করেন নি; এই মতে জগতের বিবিধ বস্তু বা ঘটনাবলী মায়া বা মিথ্যা অবভাসে পর্যবসিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু অদ্বৈতবাদী এক, অভিন্ন পরমতত্ত্বের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। এই দ্বিতীয় মতে বহুর মধ্যে একক ও একের প্রকাশরূপে বহুতাকে কল্পনা করা হয়েছে যেমন, একই চাঁদ নদীজলে শত চাঁদ হয়ে দেখা দেয়। যাঁরা কেবল এককেই স্বীকার করেন আর 'নানা'কে বলেন মিথ্যা তাঁদের অমূর্ত বা নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী[2] বলা হয়; আর যাঁরা সমগ্র বিশ্বকে এক বলে স্বীকার করেও, ঐ সমগ্রের অন্তর্গত বহু-তত্ত্বকেও ঐ পরমঐক্যনির্ভর রূপে স্বীকার করেন তাঁদের বলা হয় মূর্ত বা সবিশেষ অদ্বৈতবাদী[3]। তাই অদ্বৈতবাদ নানা প্রকারের হয়েছে। এ মতের কিছু দার্শনিক বহুকে একেবারেই মানেন না; আবার অন্য কোন দার্শনিক বহুকে একেরই সত্যরূপ বা সত্যপ্রকাশ বলে স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন বিশিষ্ট বস্তুকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ অদ্বৈত সত্তা যাঁরা মানেন তাঁরা 'নির্বিশেষ' অদ্বৈতবাদী; আর বিশিষ্ট বস্তুগুলির সহযোগে অদ্বৈত সমগ্রকে যাঁরা মানেন তাঁরা 'সবিশেষ' অদ্বৈতবাদী।

বহুতত্ত্ববাদীরা আবার জগতের ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যের উপর জোর দেন, আর ঐ বিচিত্র বিষয়গুলিকে পরস্পর-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্রসত্তাক বলতে চান। নিকটে অথবা দূরে, উপরে অথবা নীচে বহু বস্তু ও প্রাণীকুল রয়েছে যারা পরস্পর অসম্পৃক্ত হয়েও থাকতে পারে। আবার অতীতে অনেক ঘটনা ঘটেছিল, বর্তমানেও অসংখ্য ঘটনা ঘটছে আর ভবিষ্যতে আরও অনেক ঘটবে। অর্থাৎ বহুতত্ত্ববাদীরা জগতের মধ্যে বৈচিত্র্য মানেন আর ঐ বিচিত্র সত্তাগুলিকে পরস্পর-নিরপেক্ষ বলতে চান। বৈচিত্র্য যদি পরস্পর-সাপেক্ষ হয় তবে তারা আবার একই সমগ্রের অবয়ব হয়ে পড়বে।

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থান প্রথম থেকেই বহুতত্ত্ববাদী; এই মতে জড়, চেতন, দিক, কাল, ইত্যাদি ভেদে পদার্থ অসংখ্য। তাই নৈয়ায়িকদের অনিয়তপদার্থবাদী বলা হয়। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে হয়তো পরমাণুবাদী ডিম-ক্রিটাসকে বহুতত্ত্ববাদী বলা যায়। কিন্তু সচেতনভাবে, যুক্তিসিদ্ধ বহুতত্ত্ববাদ

---

1. Monism vs. Pluralism 2. Abstract Monist 3. Concrete Monist

পাশ্চাত্য দর্শনে আধুনিক কালের পূর্বে ঠিক সমর্থিত হয় নি। লাইব্‌নিজ্‌কে বহুতত্ত্ববাদী বলা হয়। এর কারণ হলো এই যে তাঁর মতে জগতের বিভিন্ন উপাদানগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ আর তাদের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাইব্‌নিজ্‌ও অদ্বৈতবাদী ; কেননা তাঁর মতে অন্য সকল তত্ত্ব এক, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৃষ্টি আর ঐ সব তত্ত্ব ঈশ্বরের দ্বারা পূর্বস্থাপিত সুশৃঙ্খল রাজত্বে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ইংরাজ ও আমেরিকান নব্য-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা[1] ও সবিচার বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা[2] সচেতনভাবে বহুতত্ত্ববাদ প্রচার করেছেন ; এঁদের মতে অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত, ভৌতিক পদার্থ, চেতন মানসবৃত্তি ইত্যাদি সবই নিরপেক্ষ তত্ত্ব। এদের মধ্যে কেউ আবার চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না ; চেতনা চৈতন্যোদ্ভাসিত বিষয়রাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার কোন কোন বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী ভ্রান্তপ্রত্যক্ষের বিষয়কে ও মুকুরের প্রতিবিম্বকেও কোন এক অর্থে সৎ বলতে চেয়েছেন। এরপর বারট্রাণ্ড রাসেল্‌, হ্বিট্‌গেন্‌ষ্টাইন ও তাঁদের অনুগামীরা যুক্তিসিদ্ধ চরম বহুত্ববাদ প্রচার করেছেন। এই মতে জগত অসংখ্য ব্যাপার বা ঘটনার সমাহার ; আর এই তথ্যগুলি পরস্পর অসম্পৃক্ত। নৈয়ায়িক বিশ্লেষণে জগতের চরম উপদানরূপে যে অবিভাজ্য ব্যাপার বা তথ্যাদি পাওয়া যায়, সেই পরমাণুসদৃশ তথ্যগুলির অস্তিত্ব, অন্যকোন অনুরূপ তথ্যের অস্তিত্বের উপর ন্যায়সিদ্ধভাবে নির্ভর করে না। এই অবিভাজ্য তথ্যগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ। 'এটা নীল', 'ওটা লাল', 'এখানে ঠাণ্ডা', 'ওখানে গরম', 'এটা ওর পাশে', 'ওটা এর নীচে' প্রভৃতি তথ্যগুলি, মনে হয়, জগতের আদিম উপাদান। এদের মধ্যে ধারাবাহিকতা বা নিরবচ্ছিন্নতা নেই—নেই কোন একরূপতা।

এইরূপ চরম বহুতত্ত্ববাদী রাসেল্‌ও কিন্তু অন্য এক অর্থে অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে জড় ও চেতন-ঘটনা উভয়েই শেষ পর্যন্ত একই উদাসীন উপাদানে গঠিত—যে উপাদান জড়ও নয়, চেতনও নয়। একই উদাসীন উপাদান এক পরিপ্রেক্ষিতে জড় ও অন্য পরিপ্রেক্ষিতে চেতনরূপে বিরাজ করে। জড় ও চেতন যে শেষ পর্যন্ত পরস্পর ভিন্ন নয়, এ কথা মানা অদ্বৈতবাদীর পক্ষেই সম্ভব।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে অদ্বৈতবাদ আর বহুতত্ত্ববাদ অনেক চিন্তানায়কদের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে—কোথাও বা অভিন্নতা, নিরবচ্ছিন্নতা, ধারাবাহিকতা, একরূপতার উপরে আস্থা ; অন্য কোথাও বা বিচ্ছিন্নতা, নিরপেক্ষতা, বহুতার উপরে জোর পড়েছে। অনেক বহুতত্ত্ববাদী আবার, জড় এবং চেতন, এই দুইপ্রকারের অসংখ্য তথ্য স্বীকার করে দ্বৈতবাদী দার্শনিক রূপে পরিচিত হয়েছেন। অধিকাংশ দার্শনিক মতই এই কারণে দ্বৈতাদ্বৈত ও বহুত্ববাদের কমবেশী মিলিত ফল। চরম দ্বৈতবাদী জড় ও চেতনকে সর্বথা নিরপেক্ষ ও অসম্পৃক্ত তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন ; চরম বহুত্ববাদী আবার বহু পরস্পর নিরপেক্ষ ঘটনা বা

1. Neo-realists 2. Critical Realists

তথ্যরাজিকে জগতের অসম্বদ্ধ উপাদান বলতে চান; আর চরম অদ্বৈতবাদ এক, অভিন্ন তত্ত্ব ব্যতীত আর সব কিছু মিথ্যা বলে পরিহার করেন।

4. বহুতত্ত্ববাদ

সাধারণ লোকে হয়তো সচেতনভাবে কোন বিশ্বমত পোষণ করে না। কিন্তু শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে প্রথমতঃ বহুতত্ত্ববাদকেই গ্রহণ করতে চাইবে। জগতের মধ্যে সব কিছু তথ্যই যে অন্য সব কিছুর সঙ্গে সাতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হয়ে এক সুসঙ্গত তন্ত্র রচনা করেছে, এ কথা সাধারণবুদ্ধি নির্বিচারে স্বীকার করতে চাইবে না। কলকাতার একাংশে বসে আমার এই বই লেখা রূপ ঘটনার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিশের বিষপানরূপ ঘটনার কোন সম্বন্ধ আছে এ কথা ভাবা প্রায় অসম্ভব। অথবা দূরস্থ মঙ্গল গ্রহে যে ঘটনা এখন ঘটছে তা আমার রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে এ কথাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অতএব এই সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ ও অসম্পৃক্ত মনে হয়।

শিথিল, "বাহ্য-সম্বন্ধের" সম্ভাবনা বহুতত্ত্ববাদের সমর্থনে একটি শক্ত যুক্তি। এক বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে এই একান্ত অনাবশ্যক, বাহ্য সম্বন্ধে সম্পৃক্ত হলেও, ঐ সম্বন্ধ অংশতঃও তাদের স্বরূপ নির্ণয় করে না বা ঐ সম্বন্ধ নষ্ট হলে বস্তুর কোন রূপহানি হয় না। টেবিলের উপরে কলম থাকতেও পারে। নাও থাকতে পারে। টেবিলের সঙ্গে ঐ অনাবশ্যক সম্পর্ক (সংযোগ) কলম বা টেবিল কারুরই স্বরূপ নির্ণয় করে না। অর্থাৎ ঐ সংযোগ সম্বন্ধের ভেতরে বা বাইরে কলম ও টেবিলের স্বরূপ একই থাকে। তাই এমন বাহ্য, অনাবশ্যক সম্বন্ধে সম্পর্কিত তথ্যরাজি পরস্পর নিরপেক্ষ হয়েও থাকতে পারবে। অবশ্য জগতে কিছু কিছু ঘনিষ্ঠ বা আন্তর সম্বন্ধ রয়েছে। এই সব আবশ্যিক সম্বন্ধের উপরে সম্পর্কিত বস্তুর স্বরূপ নির্ভর করে। 'কারণতার' সম্বন্ধ এই ভাবে আবশ্যিক। আমার এই পুস্তক রচনা কালি, কলম ও কাগজের উপর নির্ভর করে আর ঐ ঘটনা 'সুলেখা' কালির কারখানা, তার শ্রমিক, মালিক ইত্যাদির সঙ্গে কারণতা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; কেননা তারা না থাকলে এই কালির উৎপাদন হত না আর আমার এই বিশিষ্ট রচনাও সম্ভব হত না। অতএব কালি, কাগজ ইত্যাদির সঙ্গে আমার এই রচনার ঘনিষ্ঠ, আবশ্যিক সম্বন্ধ রয়েছে, আর এরা পরস্পর নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু আমার রচনার সঙ্গে সমুদ্রের জলতলে যে লালমাছ ঘুরে বেড়ায়, তার সঙ্গে এমন নিবিড় কারণতার সম্পর্ক নেই। অতএব এই জগতে সবকিছুই অন্য সব কিছুর সঙ্গে অনিবার্য, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত হয়ে এক নিত্যসংবদ্ধ তন্ত্র রচনা করে আছে এমন বলা যায় না। বরং অনাবশ্যক, বাহ্য সম্বন্ধ জগতের তথ্যাদির বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পর নিরপেক্ষতাই প্রমাণ করে। বারট্রাণ্ড রাসেলও এই বাহ্য সম্বন্ধের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে অবিভাজ্য মূল ঘটনাবলী পরস্পর

বিচ্ছিন্ন ; এরা নানারূপ বাহ্যিক সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়ে জটিল তথ্যাদি উৎপন্ন করতে পারে ; মূল তথ্যগুলি কিন্তু একটা আর একটা ছাড়াই থাকতে পারে।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল দৃশ্যমান বস্তু ও তথ্যাদির বিশ্লেষণ। ঐ বিশ্লেষণ-মুখে জড়বস্তু অসংখ্য পরমাণুতে, জীবন্ত প্রাণীদেহ অসংখ্য জীবকোষে, আর মন দ্রুত পরিবর্তনশীল মনোবৃত্তি ধারাতে পর্যবসিত হয় বলে দেখেছি। এই বহুতাকে জগতের মূল উপাদান বলা যায় আর এরা সর্বত্রই ঘনিষ্ঠ, আন্তর সম্বন্ধে থাকে না। অধিকাংশ সম্বন্ধই বাহ্যিক এবং বস্তুর স্বরূপ সৃষ্টিতে অনাবশ্যক ব'লে, এই বস্তুগুলি বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে। উইলিয়াম্ জেমস্ও জগতের তথ্যাদির বিচ্ছিন্নতা ও নিরপেক্ষতা স্বীকার করেন। ভাল বস্তু, মন্দ বস্তু, মন-প্রাণ-দেহ সব কিছুই একের প্রকাশ বলতে গিয়ে অদ্বৈতবাদ যেন অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হ'য়েছে। যে তত্ত্বের মধ্যে সব কিছু অন্য সব-কিছুর সঙ্গে আন্তর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, যে তন্ত্রে একটা কিছু পরিবর্তিত হলে অন্য সবকিছুই অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেই অদ্বৈততন্ত্র, জেম্সের মতে, এক "তাত্ত্বিক রাক্ষস" ছাড়া আর কিছু নয়।

দৈনন্দিন ব্যবহার জীবনে আমরা যেন অনাবশ্যক, অপ্রাসঙ্গিক সম্বন্ধ স্বীকার করেই কর্মে প্রবৃত্ত হই। যদি সব জিনিষের সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর অনিবার্য সম্বন্ধ থাকত, তা হলে সবকে না জেনে কোন বিশেষ বস্তুকে জানা যেত না। অথচ আমরা সর্বজ্ঞ না হলেও অনেক কিছুই জানি। তাই কতক কতক সম্বন্ধকে বস্তুর স্বরূপগত না ভেবে, ঐ স্বরূপের জন্য অনাবশ্যক ভাবতেই হয়। শাঁমিলা যদি সুরজিতকে ভালবাসে তা হলে তার পক্ষে সুরজিতের সঙ্গে হয়তো তার বাবা মার সম্পর্কই প্রাসঙ্গিক হতে পারে ; সুরজিতের চোদ্দপুরুষ এমনকি প্রাচীন মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকলেও, শাঁমিলার প্রেমপ্রসঙ্গে ঐ সম্বন্ধগুলি অবান্তর ও অনাবশ্যক।

সমালোচনা ঃ সীমিত ব্যবহার জীবনে যা ঠিক বলে মনে হয় তাই যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও ঠিক হবে এমন কোন কথা নেই। এ কথা মানতে হয় যে এ বিশ্বে সব কিছুই অন্য সব কিছুর সঙ্গে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, কোন না কোন সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়ে আছে। দেশ, কাল বা কারণতা সম্বন্ধ এইরূপ সর্বগত সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধগুলির নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা, প্রাসঙ্গিকতা ও আবশ্যকতার মাত্রাভেদ অবশ্যই রয়েছে। অর্থাৎ এরা কম বেশী প্রাসঙ্গিক হয়। এদের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধ এত অল্পমাত্রায় ঘনিষ্ঠ ও প্রাসঙ্গিক যে, কার্যতঃ তাদের অনাবশ্যক, বাহ্যিক সম্বন্ধ বলতে হয়। তৎসত্ত্বেও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঐ তথাকথিত বাহ্যিক সম্বন্ধও কোন অধিকতর ব্যাপক, আন্তর সম্বন্ধের পরিণত ফলমাত্র। একখানা ইঁট আর একখানা ইঁটের 'পাশাপাশি' না 'উপর-নীচে' থাকবে তাতে ইঁটের কিছু যায় আসে না ; কিন্তু উভয়েই এক, অভিন্ন দেশগত পদার্থ আর যদি সমস্ত রকমের দৈশিক সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়ে যায় তা হলে ইঁট আর ইঁট থাকবে না। এ কথা ঠিক যে আমরা সব সময় সব বস্তুর মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ দেখতে পাই না। তবু ঐ সম্বন্ধগুলি বিভিন্ন মাত্রায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

অনেক দার্শনিক বলেছেন যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সব কিছুই এক সর্বগ্রাসী কারণতা-সম্বন্ধে সম্পর্কিত ব'লে মনে হয়। আমার এই রচনার সঙ্গে কালি ও কালির কারখানার কারণতা-সম্পর্ক আছে বলে দেখেছি। আর গতকাল বা আজ সূর্যমণ্ডলে যে বিস্ফোরণ ঘটল তারও কোন কারণ অবশ্য রয়েছে। কিন্তু আমার রচনার সঙ্গে সূর্যমণ্ডলের হয়তো কোন সাক্ষাৎ কারণতা সম্বন্ধ নেই। তবু সূর্যালোকে আমার দেশের মাটিতে আমার খাদ্যাদির উৎপত্তি, ঐ খাদ্যে আমার পুষ্টি, আমার কর্ম-ক্ষমতা ও তজ্জনিত এই রচনা—এইভাবে পরম্পরা সম্বন্ধে সবকিছুকেই এক সুসংবদ্ধ তন্ত্রে ব্যবস্থিত বলা যেতে পারে।

আবার বিজ্ঞান যে কেবল বিশ্লেষণই করে তাও ঠিক নয়। তার একটি প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার। ঐ নিয়ম হলো বহু বিশিষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত একরূপতা। "ঘর্ষণে উত্তাপের সৃষ্টি হয়" এই প্রাকৃতিক নিয়ম, দূরে নিকটে, অতীতে-বর্তমানে, এ দেশে-ও দেশে বহু অবস্থায় বহু উত্তাপের এক সমানধর্মের বর্ণনা করে যা সর্বাবস্থায় একরূপ থাকে। আবার অল্পব্যাপক প্রাকৃতিক নিয়ম অধিকব্যাপক নিয়মের থেকে ন্যায়ানুগভাবে গৃহীত হতে পারে; যথা— গ্যালিলিও আবিষ্কৃত বস্তুপতনের নিয়ম ও কেপ্‌লার আবিষ্কৃত গ্রহাদির সূর্যপ্রদক্ষিণের নিয়ম, উভয়েই নিউটনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহাকর্ষ নিয়ম থেকে ন্যায়ানুসারে নিঃসৃত হয়। এইভাবে অধিক থেকে অধিকতর ব্যাপক নিয়মের রাজত্বে সর্ববিষয়কেই একই ব্যাপকতম নিয়মের অধীন মনে করা খুব অযৌক্তিক নয়। বিজ্ঞান তাই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ-মূলক আর প্রকৃত জ্ঞান বহুর মধ্যে একের প্রকাশ দেখতে চায়। মানুষের তাত্ত্বিক চিন্তা আপাতঃপ্রকাশ বহুতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একেকে আবিষ্কার করে, বহুতত্ত্বকে এক সুসংবদ্ধ তন্ত্রে বিধৃত দেখতে চায়, আর তাতেই ঐ চিন্তার তৃপ্তি সাধিত হয়ে।

5. দ্বৈতবাদ[1]

দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা পরমতত্ত্বকে পরস্পর নিরপেক্ষ এমন কি বিরুদ্ধ, দুই প্রকারের তত্ত্বে ভাগ করতে চান। দেকার্ত জড় ও চেতন, মন আর দেহ, এই দুই পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। অবশ্য অসংখ্য জড়বস্তু ও অসংখ্য চৈতন্যবান আত্মা এই জগতে রয়েছে; কিন্তু এই মতে জড় ও চেতন হ'লো দুই বিরুদ্ধ রকমের পদার্থ—একটিকে আর একটিতে রূপান্তরিত করা যায় না। ভারতীয় দর্শনের সাংখ্যমতও প্রকৃতি এবং পুরুষ, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ভেদে, দুই প্রকার তত্ত্ব স্বীকার করে।

দেকার্তের তাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ চরম এবং আপোষহীন। আগেই বলা হয়েছে যে দেকার্তের মতে চৈতন্যময় আত্মা সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ এবং ঐ আত্মা ভৌতিক পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভৌতিক জগতের উপাদান হলো জড়। জড়-পদার্থের কিছু না কিছু স্থানব্যাপ্তি থাকবেই, কিন্তু চেতন আত্মার কোন

1. Dualism

স্থানব্যাপ্তি নেই। পক্ষান্তরে আত্মার অবশ্যম্ভব গুণ হলো চৈতন্য, আর জড়-পদার্থ একান্তই অচেতন। জড় বা ভৌতিক জগৎ সর্বথা যান্ত্রিক কারণতায় নিয়ন্ত্রিত; চেতন আত্মা কিন্তু সর্বথা স্বাধীন ও অনিয়ন্ত্রিত। অবশ্য দেকার্ত এই পরস্পর বিরুদ্ধ ও নিরপেক্ষ জড় ও চেতন উভয়কেই ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল বলাতে তাঁকেও অদ্বৈতবাদী বলা যেতে পারে। জড় ও চেতন উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে, পরস্পর নিরপেক্ষ হয়েও তারা ঈশ্বরসাপেক্ষ। কিন্তু দেকার্তের মতে ঈশ্বরও যেহেতু চৈতন্যময় আত্মা, সেই হেতু দেকার্ত জড় ও চেতন এই দুই প্রকারের পদার্থই স্বীকার করেছেন। দর্শনের ইতিহাসে দেকার্ত এই কারণে দ্বৈতবাদী বলে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

সমালোচনা ঃ মন ও দেহের যে বৈজাত্য দেকার্ত স্বীকার করেছেন তা মানলে মানুষের মধ্যে, শরীর ও মনের সম্বন্ধ এক রহস্যময় হেঁয়ালী হয়ে পড়ে। আমরা আগেই দেখেছি যে দেকার্তসম্মত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বিজাতীয় শরীর-মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে পারে না। স্পিনোজা তাই জড় ও চেতনকে একই পরমপদার্থের দুই ধর্ম বলতে চেয়েছেন। তারপরে নদীর জল অনেক গড়িয়ে গেছে; কিন্তু দেহমনের বৈজাত্য রক্ষা করে, তাদের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যায় নি। স্বভাবতঃই দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের পথে অগ্রসর হয়েছে। মন ও তার চৈতন্য যদি ভৌতিক জগতের থেকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় হয়, তা হলে মন কেবল তার ধারণাগুলোকেই জানতে পারবে—বাহ্য, ভৌতিক জগতকে সরাসরি জানতে পারবে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকালে বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপ ধারণাকেই প্রতীকরূপে আমি জানতে পারব। অর্থাৎ বাহ্যবস্তু আমার মনে তদনুরূপ ধারণা-প্রতীক উৎপন্ন করবে, আর আমি সাক্ষাৎভাবে বস্তুকে না জেনে তার মানস-প্রতীককে জানব। এই প্রতীকবাদ আত্মগত-ভাববাদের, এমনকি অহং-সর্বস্ববাদের মতে, পর্যবসান হয়েছে। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নেই বলে, "আমি আর আমার ধারণা-প্রতীকগুলোই কেবল আছে", এই অহংসর্বস্ববাদ মানতে হবে কেন? এই মত এক উদ্ভট মত। হোয়াইট্‌হেড্ বলেছেন যে দেকার্তের দ্বৈতবাদ তৎপরবর্তী দর্শনকে "বিষাক্ত" করে দিয়ে গেছে।

কোন কোন চিন্তানায়ক বলতে চেয়েছেন যে শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল—প্রভৃতি নৈতিক মূল্য এতই বিরোধী যে তাদের একই তত্ত্বের অন্তর্গত ভাবা প্রায় অসম্ভব। এই নৈতিক দ্বৈতভাব দর্শনের ইতিহাসে ধর্মীয় দ্বৈতবাদে পর্যবসিত হয়েছে। ঈশ্বর ও তাঁর সদিচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে শয়তান ও তার অশুভেচ্ছা; যা কিছু ভাল তার কারণ ঈশ্বর আর মন্দের কারণ হলো শয়তান। অবশ্য এ সবই কল্পকাহিনী, যার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা অপ্রমাণ নেই। পারসীক 'আবেস্তা', আলোকের দেবতা আহুরা মাজ্‌দা ও আঁধারের দেবতা আহিরমনের মধ্যে দ্বন্দ্ব কল্পনা করেছেন। প্রাচীন চীনের চিন্তায়ও পুরুষ-নারী, ইয়াং-ইন্-এর সংগ্রাম কল্পিত হয়েছে; কিন্তু আবার কোন কোন জায়গায় তাদের "তাও" নামক এক অজ্ঞাত নিয়মের দ্বৈতপ্রকাশও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত

দ্বৈতবাদীরাই শেষপর্যন্ত অদ্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকেছেন। এ জগত যদি অর্ধেক ঈশ্বরের ও বাকী অর্ধেক শয়তানের কবলিত হয়, তা হলে ঈশ্বর সীমিত হয়ে পড়েন আর ঐ সীমিত-শক্তি ঈশ্বর ধার্মিক ব্যক্তির ঈপ্সিত হতে পারে না। অতএব ভালমন্দ, শুভাশুভ সবকিছুকেই এক অদ্বয়তত্ত্বে গ্রথিত করতে পারলেই মানুষের তাত্ত্বিকচিন্তা তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

6. অদ্বৈতবাদ—সবিশেষ ও নির্বিশেষ[1]

এক, অভিন্ন পরমতত্ত্ব স্বীকার করবার যুক্তি আমরা পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ ধার্মিক ব্যক্তি একেশ্বরবাদী ও তাঁদের ধর্মচিন্তায় সমগ্র বস্তুজগত সেই অদ্বয় পরমেশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে এক সুসংবদ্ধ তন্ত্রে বিধৃত বলে মানা হয়। বিজ্ঞানও বিশ্বে সর্বত্র নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে; যেখানে নিয়ম আবিষ্কার করা যায়নি সেখানেও নিয়ম রয়েছে বলে বিজ্ঞান ধরে নেয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কমবেশী সাধারণ বা ব্যাপক হতে পারে, আর অধিকব্যাপক নিয়ম তদন্তর্গত কমব্যাপক নিয়মগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে বলে দেখেছি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার এই স্বরূপও ক্রমিক নিয়মপরম্পরায় এক অদ্বৈত জগতের সন্ধান দেয়। এই জগতকে যদি অসংবদ্ধ, ব্যবচ্ছিন্ন, সাবকাশ, অসম্পৃক্ত বস্তু বা ঘটনারাজির এক খেয়ালী সমাহার বলে ভাবি, তা হলে তাকে নিয়মিত বুদ্ধিতে অধিকার করা যেত না।

আবার আমরা দেখেছি যে জগতের সব বস্তুই যদি অন্য সব বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, কমবেশী আবশ্যিক, আন্তর সম্বন্ধে সম্পর্কিত বলে ভাবি, তা হলে অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হতে পারে। কার্য-কারণরূপ সর্বব্যাপী সম্পর্ক এইরূপ ঘনিষ্ঠ ও আবশ্যিক সম্বন্ধ বলা যায়। 'ক' যদি 'খ'-এর কারণ হয়, তা হলে 'ক' উপস্থিত থাকলে, 'খ' তার অনুগামী হবেই; অর্থাৎ 'খ' 'ক-এর অনুগামী' না হয়ে পারে না। 'ক' যদি 'খ'কে ছাড়াই থাকতে পারত, হলে 'ক'কে 'খ'-এর কারণ বলা যেত না। আমরা বলেছি যে সর্ববস্তুই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, কার্যকারণে বিধৃত এক বিরাট, সুসংবদ্ধ সমাবেশ। এ দিক থেকেও অদ্বৈতবাদ সমর্থন-যোগ্য হতে পারে। এই বিশ্বজগতকে এক অব্যবস্থিত, আকস্মিক বাহ্যসম্পর্কযুক্ত অসংখ্য তথ্যের সমাবেশ ভাবার চেয়ে, এক অদ্বৈত তত্ত্বের সুসংবদ্ধ, সুতান্বিত প্রকাশ কল্পনা করা অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি অধিকতর তৃপ্তিদায়ক মনে করেন। ধার্মিক ব্যক্তিরা, মরমিয়া সাধকেরা, এই বিশ্বকে একের দিব্যপ্রকাশ ভাবলেই খুশী হন। সকলেই যে যুক্তির পথে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা নয়। তবু ভারতীয় অদ্বৈতবাদী শঙ্কর শ্রুতি বা উপনিষদের অনুগামী সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে, ভেদ বা তথ্যাদির বিভিন্নতা খণ্ডন করে, বিশুদ্ধাদ্বৈতে পৌঁছেছেন; আর স্পিনোজাও যুক্তির পথে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত মরমী দৃষ্টিতে পেয়েছেন অদ্বৈতকে। অবশ্য অদ্বৈতবাদও বহুপ্রকারের,

1. **Monism—Concrete and Abstract**

হয় আর তাদের মধ্যে কোন মতটি যে পর্যাপ্ত ও সুসংহত তা বলা অত্যন্ত কঠিন।

আমরা আগেই বলেছি যে অদ্বৈতবাদ প্রধানতঃ দু রকমের হয়—নির্বিশেষ বা ভেদবর্জিত বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ আর সবিশেষ বা ভেদসহিষ্ণু অদ্বৈতবাদ। একমাত্র ভারতীয় দর্শনের মহাবৈদান্তিক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যায় উপনিষদের তত্ত্বকে নির্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্বরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। উপনিষদ পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় বলেছেন; শঙ্করের মতে ভেদ বা বহুতা সেই ঐক্যের অন্তর্গত হতে পারে না; এর কারণ হলো এই যে এক এবং বহু পরস্পর বিরুদ্ধ। একরস ব্রহ্ম এই হেতু, বাহ্য ও আন্তর, সর্বভেদবিবর্জিত হওয়ায়, ভেদযুক্ত বহু জীব ও বস্তুময় জগতের কোন পরমার্থ সত্তা নেই। এই ভেদময় জগতের কিছুটা নিম্নস্তরের 'ব্যবহারিক সত্তা' থাকলেও, শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভেদপ্রপঞ্চই পরব্রহ্মের মিথ্যা অবভাস মাত্র। অর্থাৎ আমাদের সীমিত ব্যবহার জীবনে ঘটপটাদি সত্তাবান বলে মনে হলেও, বা তারা আমাদের ব্যবহারোপযোগী হলেও, ব্রহ্মসত্তার মতো অবাধিত সত্তা তাদের কখনই থাকতে পারে না। আমাদের সাধারণ জীবনে যে ভ্রান্তি দেখা যায়, সমস্ত ভেদপ্রপঞ্চই তার সঙ্গে তুলনীয়। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন ঐ অলীক সর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক; ঐ সত্তা মিথ্যা সর্পের অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত ও বাধিত হয়ে যায়। রজ্জুর সত্তা এই কারণে অধিকতর ন্যায়সিদ্ধ উচ্চাঙ্গের সত্তা যার নাম 'ব্যবহারিক' সত্তা। কিন্তু ব্যবহারিক সত্তাও শেষ পর্যন্ত অদ্বয় ব্রহ্মের পারমার্থিক জ্ঞানের সাহায্যে বাধিত হয়; আর ঐ ব্রহ্ম কখনও বাধিত হন না। পরমার্থসত্তা চিরকাল অবাধিত থাকে। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সর্প যেমন রজ্জুর মিথ্যা অবভাস, তেমনি ব্যবহারিক ভেদময় জগত পারমার্থিক ব্রহ্মের মিথ্যা অবভাসমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে এই প্রপঞ্চময় জগত খণ্ডিত ও তুচ্ছ হয়ে যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা এই মতের প্রায় কাছাকাছি এসেছেন যদিও তাঁর দার্শনিক মত নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। স্পিনোজার মতে এক ঈশ্বর হলেন পরমতত্ত্ব, আর চৈতন্য ও জাড্য ঐ নির্গুণ ঈশ্বরে মনুষ্যবুদ্ধির দ্বারা আরোপিত ধর্ম। ঐ ধর্মদ্বয় নানা মানস ও জড় বস্তুরূপে আকারিত হয়ে থাকে। অথচ তারা আরোপিত ধর্মের আকার বলে ঐশ্বরিক সত্তা লাভ করতে পারে না। তাই সমস্ত ভেদময় জগত মিথ্যা হয়ে যায়। স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ একমাত্র স্বপ্রতিষ্ঠ ঈশ্বরকেই স্বীকার করে, আর বৈচিত্র্যময় জগতকে অবস্তু বলে।

নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বা উপরোক্ত সর্বেশ্বরবাদ এক চরম মত বলে মনে হয়। ঐক্য এবং বৈচিত্র্য, এক ও বহুতা পরস্পরসাপেক্ষ—একে অন্যকে বর্জন করলে অর্থহীন হয়। এই বিশ্বের ঐক্যকে এক সুসংবদ্ধ, বৈচিত্র্যময় সমাবেশ বলেও ভাবা যায়, আর বলা যায় যে ঐ সুসংহত তন্ত্রের মধ্যে প্রত্যেক তথ্য অন্য সকলের সঙ্গে কমবেশী ঘনিষ্ঠ বা আন্তর সম্বন্ধে সম্পৃক্ত হ'য়ে রয়েছে। এইরূপ নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে উপলব্ধ ঐক্যই সবিশেষ ব্রহ্মরূপে কল্পিত হয়েছে। কেবলমাত্র বহুর পটভূমিকাতেই

ঐক্যের সার্থকতা ; বহু যদি মিথ্যা হয় তো একও মিথ্যা হবে। সুসংবদ্ধ ও সুসংহত বহুকেও এক অভিন্ন তত্ত্বের অন্তর্গত বলে ভাবা যায়। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তে ব্রহ্মকে চিদাচিদ্‌ভেদ-বিশিষ্ট ঐক্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে ; ঐ ঐক্যের মধ্যে ভেদ থাকাতে ভেদময়, বিচিত্র জগতকে ব্রহ্মেরই সত্য প্রকাশ বলা যায়। সামান্য ও বিশেষ, এক ও বহুর সম্বন্ধ আন্তর, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—একটিকে আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিশ্বের ঐক্য ভেদময় বৈচিত্র্যের মধ্যে এমনভাবে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে যে, বৈচিত্র্য যেমন একের উপর নির্ভরশীল, তেমনি অনন্য ব্রহ্মও তাঁর বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই অস্তিত্ববান্। হেগেল্ ও উনবিংশ শতকের ইংরাজ নব্য হেগেল্‌পন্থীরা, এইভাবে সবিশেষ ব্রহ্মবাদ, কমবেশী সমর্থন করতে চেষ্টা করেছেন। এই ব্রহ্মই আবার ধর্মজীবনের ঈশ্বররূপে কল্পিত হয়েছেন আর ঈশ্বরই সমস্ত বৈচিত্র্যময় জগতের মূল বলে বর্ণিত হয়েছেন। এই ভেদময় বৈচিত্র্য ঈশ্বরের সত্যপ্রকাশ বলেই সত্য। এই সবিশেষ ব্রহ্মবাদ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ অপেক্ষা অধিকতর সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়। নির্বিশেষ ভেদবর্জিত ব্রহ্ম জীবের বহুতাকে শেষপর্যন্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ; কিন্তু আমার আত্মজ্ঞানে জীবচৈতন্য কখনও সন্দিগ্ধ হতে পারে না। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে শুভা-শুভ, মঙ্গলামঙ্গল, সত্যমিথ্যার ভেদও লুপ্ত হয়ে যায়। এতে ক'রে আমাদের নৈতিক জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং কর্মজীবনে আমাদের স্বাধীন দায়িত্ববোধ নষ্ট হয়। সবিশেষ ব্রহ্মবাদ জগতের ঐক্য স্বীকার করেও এক অর্থে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও কৃতকর্মের দায়িত্বকে অস্বীকার করে না বলেই ঐ মত অধিকতর উপাদেয়। অবশ্য সবিশেষ ব্রহ্মবাদেও জীবচৈতন্য, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরচৈতন্যেরই এক সত্য প্রকাশ রূপে কল্পিত হয়েছে ; এতে করে জীবের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার কোনরূপ হানি হয় কি না ভেবে দেখতে হয়। কোন কোন দার্শনিক মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর ও তাঁর সত্যপ্রকাশকে অস্বীকার করতেও রাজী (পরের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তথাপি নৈতিকজীবন ও ধর্মজীবনের দাবীতে একমাত্র সবিশেষ ব্রহ্মবাদই সমর্থিত হতে পারে।

7. ভাববাদী বিশ্বতত্ত্ব ও তার প্রকারভেদ

এই অধ্যায়ের প্রথমেই জড়বাদ-বিরোধী ভাববাদী বিশ্বতত্ত্বের প্রধান বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে। ভাববাদীদের মূল যুক্তি হল কোন ভৌতিক বা জড়-পদার্থের অস্তিত্ব তার প্রত্যক্ষাত্মক কোন চৈতন্যের উপরে নির্ভর করে। অন্য-ভাবে বলা যায়, যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বা যে বস্তু কোন ভাবেই কোন চৈতন্যের বিষয় হয় না, তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। বিশপ বার্কলির মতে প্রত্যক্ষাত্মক চৈতন্যই বস্তুর অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ বলে, জ্ঞানের বিষয়মাত্রেই মানসিক ধারণা হয়ে পড়ে ; কেননা যে বস্তুই অস্তিত্ববান তাকে কোন চৈতন্যে ভাসমান হতে হবেই। ব্রাড্‌লিও বার্কলির প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, যে বস্তু কোন অবস্থাতেই অনুভূত বা প্রত্যক্ষ নয়, যে বস্তু কোন

ভাবেই, কথনো কোন সংবিতের বিষয় হয় না, যা একান্তই চেতনা-নিরপেক্ষ তা আমাদের কাছে একান্তই অর্থহীন। তাই চেতনা বা সংবিতই প্রাথমিক তত্ত্ব ও অন্য সব তথ্য ঐ চেতনাকে অবলম্বন করে থাকতে পারে। অতএব ভাববাদী বিশ্বমত চৈতন্যকে জড় থেকে উদ্ভূত বলতে পারে না; বরং জড়কেই চৈতন্যাশ্রিত ও ভৌতিক অস্তিত্বকে চৈতন্যসাপেক্ষ বলতে চায়। আমরা আগেই বলেছি যে ভাববাদী বিশ্বতত্ত্ব জগতের ক্রমবিকাশে উদ্দেশ্য কারণতা সমর্থন করে; মানসসাপেক্ষ ইষ্ট বা মূল্যাদির উপরে গুরুত্ব আরোপ করে; ক্রমবিকাশের ধারায় জড়, প্রাণ, মন প্রভৃতি ক্রমোচ্চ, ক্রমপরিণত মূল্যের বিকাশ স্বীকার করে, আর আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্বের বিকাশকেই এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বিকাশ বলে মানে। জগতের ভাববাদী ব্যাখ্যায় ক্রমবিকাশের সর্বাপেক্ষা শেষস্তরই প্রধান ও এই শেষ স্তরের আবির্ভাবের সহায়ক হিসাবে পূর্বস্তরগুলিকে বুঝতে হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্তরগুলির উদ্দেশ্য যেন পরবর্তী স্তরের সাহায্য করা। প্রকৃতির এই উদ্দেশ্যকারণতা যদি ঠিক হয়, তা হলে আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন চৈতন্যময় অধ্যাত্মতত্ত্বই হবে বিশ্বের মূলসত্তা আর ঐ মূলসত্তা ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে কমবেশী উপলব্ধ হচ্ছে বলে মানতে হবে। তাই এই স্তরগুলিকে ঐ আধ্যাত্মিক মূলসত্তার কমবেশী প্রকাশও বলা যায়। অর্থাৎ জড়স্তরে আধ্যাত্মিক প্রকাশ অত্যন্ত অস্পষ্ট, আর প্রাণ, মন ও ব্যক্তিত্বের স্তরে ঐ আধ্যাত্মিক সত্তা অধিক থেকে অধিকতর স্ফুট ও বাঙ্ময় হয়েছে। অতএব এই স্তরগুলিতে একই অধ্যাত্মতত্ত্বের মাত্রা ভেদে প্রকাশ হয়েছে—জড়স্তরে যা সর্বাপেক্ষা কমমাত্রায় ছিল। এই মতে তাই মূলসত্তা বিভিন্ন অবস্থায় মাত্রাভেদে প্রকাশ পায়। এই ভাববাদী বিশ্বমত নানা বিক প রূপ ধারণ করেছে।

7.1 আত্মগত ভাববাদ[7]

ধর্মযাজক বার্কলি প্রবর্তিত ভাববাদ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত মত। জ্ঞানের বিষয়মাত্রকেই বার্কলি জ্ঞাতার প্রত্যক্ষসাপেক্ষ মানসিক ধারণা বলেছেন। জ্ঞাতা নিজে চৈতন্য, আর জ্ঞানের যে কোন বিষয় সেই চৈতন্যগত ধারণা হওয়াতে চৈতন্য ও তার ধারণা ব্যতীত আর কিছুই থাকতে পারে না। বার্কলির ভাববাদের যুক্তি হল এই যে, কোন বিষয়ের অস্তিতা তার প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ কোন চেতনার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কোন ভৌতিক বিষয়ের আমার ধারণা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। আমি দেখেছি বলেই গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র রয়েছে; আমি যা দেখি না তার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ অন্ততঃ আমার কাছে নেই। এইভাবে বিষয়মাত্রেই আমার প্রত্যক্ষ সাপেক্ষ বলে, যে বস্তু আমার ধারণায় নেই তার অস্তিতা নেই। এমন হয়তো বলা যায় যে, কোন বস্তু 'আমার' মানস-নিরপেক্ষ হয়েও অপরের মন-সাপেক্ষ হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু অপরের মনের অস্তিত্ব মানতে হলেও আমাকে তা প্রত্যক্ষ করতে হবে, অর্থাৎ তা আমার মানসসাপেক্ষ

1. Subjective Idealism

হবে। এর অর্থ হল এই যে আমি ও আমার ধারণাগুলো ছাড়া আর কিছুরই অস্তিতা স্বীকার করা যায় না। এরই নাম "অহংসর্বস্ববাদ" আর বার্কলির "আত্মগত ভাববাদের" পরিণতি হল "অহংসর্বস্ববাদ"। আমি আর আমার ধারণাগুলি যে সৎ একথা সকলেই স্বীকার করতে পারেন; আত্মজ্ঞানের এই নির্দেশ সকলেই মানতে হয়। কিন্তু "কেবলমাত্র আমি ও আমার ধারণাই সৎ—আর কিছু নেই" এই অহংসর্বস্ববাদ এক দার্শনিক মত, যা কিনা মানা শক্ত। "কেবলমাত্র," "আর কিছু নেই" ইত্যাদি কথায় যেন আমি ছাড়া আর কিছুর অস্তিতা কল্পনা করা হয়; অতএব ঐ দার্শনিক মত খানিকটা স্ববিরোধী হয়ে পড়তে চায়। আমরা পূর্বেই এই আত্মগতভাববাদ বা অহংসর্বস্ববাদ আলোচনা ও খণ্ডন করেছি। বিশপ বার্কলিও পরবর্তীকালে ভৌতিক বস্তুগুলিকে ঈশ্বরের মানস-সাপেক্ষ বলাতে সেগুলিকে ব্যক্তি-মানসনিরপেক্ষ বলে দেখাতে চেয়েছেন। এখানে তিনি নিছক জ্ঞানবিদ্যা ছাড়িয়ে তত্ত্ববিদ্যার দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

7.2 ভাববাদী বহুত্ববাদ

জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজের বিশ্বতত্ত্ব বলে যে এই বিশ্ব অসংখ্য চিৎপরমাণু বা চিদণুর সমাবেশে গঠিত। এই অবিভাজ্য চিৎকণিকাগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ। একটির কোনপ্রভাব নেই অপরটির উপরে। প্রত্যেক চিদণু এক ছিদ্রবিহীন ঐক্য যা নাকি একাকী তার আন্তরসত্তা ভোগ করে। বহুত্ববাদের প্রয়োজনে লাইব্‌নিজ্ এই রকমের নিরপেক্ষ অসংখ্য চিৎপরমাণু স্বীকার করেছেন। এই চিদণুগুলির চেতনার মাত্রাভেদ আছে—কতগুলি চিদণু আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, অন্য কতকগুলি স্পষ্ট চৈতন্যবান, আর কতকগুলিতে অস্পষ্টভাবে বিভিন্ন মাত্রায় চেতনা থাকে। যে চিদণুর চেতনা একান্তই অস্পষ্ট, অর্থাৎ যাকে নিদ্রিত চিদণু বলা যায়, তাদেরই বিশেষ সমাবেশে জড়বস্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু তত্ত্বতঃ জড়ও এক অপরিণত চিদণু-বিশেষ। প্রত্যেক চিদণুর জ্ঞানজীবন অন্য-নিরপেক্ষ হলেও জগতের সামঞ্জস্য কিন্তু বিঘ্নিত হয় না। এর কারণ হলো সৃষ্টিকালে পরম-চিদণু ঈশ্বর তাদের মধ্যে এক শৃঙ্খলা স্থাপিত করে দিয়েছেন। এই পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলার জন্য একটি চিদণুর বোধ অপরকে বাধিত করে না। এই পরমচিদণু ঈশ্বরের কল্পনায় লাইব্‌নিজের বহুত্ববাদ খণ্ডিত হয়ে গেছে। পরস্পর নিরপেক্ষ হয়েও, ঐশ্বরিক সমাবেশ ও শৃঙ্খলার ভাগীদার হয়ে চিৎপরমাণুগুলি তাদের নিরপেক্ষতা বর্জন করেছে, একেশ্বরের নীতি অনুসরণ করাতে।

7.3 সর্বমানসবাদ[1]

এই মতে সর্ববস্তুই চৈতন্যময়। ভাববাদের খাতিরে, ভৌতিক বস্তুগুলিকে, এই মতে, আমার বা ঈশ্বরের চৈতন্য সাপেক্ষ, বলার প্রয়োজন নাই। এর কারণ হলো অত্যন্ত অস্পষ্ট হলেও অনুভূতি বা চেতনা রয়েছে আমার প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ

1. Panpsychism

জড়বস্তুর মধ্যে। মন ও দেহের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় সমান্তরবাদ বলে যে মানসিক বৃত্তি ও শারীরবৃত্তি সর্বদাই সমান্তর ভাবে চলে। অতএব যেখানেই ভৌতিকবৃত্তি সেখানেই মানসবৃত্তি থাকবে, তা সে যত অস্পষ্টই হোক না কেন; আর যেখানেই মানসবৃত্তি সেখানেই কোন স্নায়বিক বৃত্তি থাকবে, তাকে জানি আর নাই জানি। জাড্যবৃত্তি আর মানসবৃত্তি সমান্তরাল হওয়ায় সমগ্র ভৌতিক জগত চৈতন্যময় হয়ে পড়ে। এই সর্বমানসবাদ কিন্তু 'সমান্তরবাদের' সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অতএব এই মত আজ আর কেউ মানেন না।

7.4 ভাববাদীব্রহ্মতত্ত্ব[1]

জার্মান দার্শনিক হেগেল্, বিচারবাদী কাণ্ট্ সমর্থিত জ্ঞানতত্ত্বকে সমালোচনা করে এক ভাববাদী ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। জ্ঞানাতিরিক্ত বা জ্ঞাননিরপেক্ষ কোন সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না বলে, কাণ্টের স্বয়ংসৎ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন হেগেল্। কাণ্ট্ যে স্বয়ংসৎবস্তু ও আবভাসিক জ্ঞানরাজ্যের পার্থক্য করেছেন তা স্বীকার না করায়, হেগেলের কাছে জ্ঞানগত রাজ্যই একমাত্র সত্তাবান হয়। আর ঐ জ্ঞানজগৎ স্বভাবতঃই চেতন জ্ঞাতার উপরে নির্ভর করে। জ্ঞানজগতের বাইরে আর কোন সত্তা না থাকায়, যুক্তিবিজ্ঞানের নীতিগুলি কেবল জ্ঞানেরই নিয়ম নয়, জ্ঞানগত বস্তুজগত বা প্রকৃতি রাজ্যেরও নিয়ম। তবে এই জ্ঞান আমার বা তোমার ব্যক্তিচৈতন্য নয়; বিষয়-গত জগত এক অদ্বয় বিষয়গত ব্রহ্মচৈতন্যের উপর নির্ভরশীল আর আমার-তোমার চেতনা হল ঐ অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যের খণ্ড প্রকাশ। ঊনবিংশ শতকের ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন্, কেয়ার্ড, ব্র্যাড্‌লি, বোসাঙ্কোয়েট্ ও আমেরিকান দার্শনিক জে. রয়েস্ প্রভৃতি ঐ মত সমর্থন ক'রে নব্য হেগেল্‌পন্থী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অবশ্য এঁরা সকলেই যে একই ভাবে এই মতস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন এমন নয়; বিভিন্ন দার্শনিক এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিভিন্ন অংশে গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। কিন্তু সকলেই এক, অদ্বয়, আধ্যাত্মিক ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশরূপে দেখেছেন এই বৈচিত্র্যময় জগতকে।

এখন পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে আধ্যাত্মিক মনে করলে তাঁকে ধর্মজীবনের ঈশ্বররূপেও ভাবা যায়। তাই কোন কোন দার্শনিকের মতে ভেদময় জগত ঈশ্বরেরই অব-ভাস বা প্রকাশ। অথচ এই ব্রহ্মবাদ, বার্কলির মতো ঈশ্বরকে জগদাতিরিক্ত বা অতিবর্তী বলতে চায় না। বার্কলির মতে ঈশ্বরের চৈতন্য মানবীয় চৈতন্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর তাঁর সত্তাও জগদাতিরিক্ত। আধ্যাত্মিক ব্রহ্মবাদ কিন্তু ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে এই জ্ঞানগত জগতের মধ্যেই ব্যাপ্ত বলতে চায়। ব্যক্তির সীমিত চৈতন্যের মধ্যেই সেই পরমচৈতন্যের খণ্ডপ্রকাশ; অর্থাৎ আমার চৈতন্য এক পরম, অনন্ত, চৈতন্যেরই অংশরূপে এই মতে কল্পিত হয়েছে। 'আমি' যে বিশেষ ব্যক্তিটি সে কোন পরিবার বা সমাজেরই অংশ। আমার চৈতন্য তাই, সামাজিক

1. Absolutism

চৈতন্যেরই এক বিশেষ প্রকাশ। এভাবে দেখলে আমাকে, দেশ ও সর্বমানব-গোষ্ঠির গণ্ডী বা বেড়া ডিঙ্গিয়ে, এক বিশ্বচেতনার ভাগীদার বলেও দেখা যায়। এর কারণ হলো আমি, আমার পরিবার, সমাজ, আমার দেশ, সর্বমানবসমাজ, সৌরমণ্ডল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংবদ্ধ তন্ত্র মাত্র। এই তন্ত্রে সকলেই সকলের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে।

দেকার্ত বলেছিলেন আমার চৈতন্যকে আমি কোন ক্রমেই সন্দিগ্ধ করতে পারি না। বার্কলি বলেছেন চৈতন্য ভিন্ন সকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে চৈতন্যে বা তার ধারণায়। কিন্তু হেগেল্ বলেন যে আমার ব্যক্তি চৈতন্যকে ছাপিয়ে রয়েছে এক অনন্ত পরমচৈতন্য যা আমার ব্যক্তি চেতনায় অনুস্যূত ও ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ আমার বা তোমার চৈতন্য সেই পরম ঐশ্বরিক চৈতন্যেরই অংশ বা প্রকাশ। এই কারণে সত্য বা অভ্রান্ত জ্ঞান আমাদের সকলের দ্বারাই স্বীকৃত, সকলের মধ্যেই এক; সত্য চিন্তা আমার, তোমার মধ্যে যে এক পরমচৈতন্য অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন, তাঁরই চিন্তা। ভ্রান্তিতেই কেবল আমরা বিশেষ বিশেষ চৈতন্যের বিশিষ্টতার পরিচয় পাই; কারণ সকলের একরূপ ভ্রান্তি হয় না, যদিও সত্যজ্ঞান সকলের কাছেই এক।

এখন আমার বিশিষ্ট চেতনা আমার ব্যক্তিগত আত্মসাপেক্ষ হলেও, পরম চৈতন্য বা ব্রহ্ম আমার বা অন্য কারোর আত্মসাপেক্ষ নয়। পরমচৈতন্য এক বিষয়গত অনন্ত চৈতন্য, যা আমার বা তোমার মতো কোন বিশেষ বিষয়ী বা জ্ঞাতাকেই কেবল আশ্রয় করে না। কোন বিশেষ বিষয়ীর আশ্রয় ছাড়াও এই সার্বিক বিষয়গত চেতনা থাকতে পারে। সার্বিক চেতনার অস্তিত্ব আমার চেতনা-সাপেক্ষ নয়; বরং বিপরীত ভাবে আমার চেতনা ঐ সার্বিক চেতনার খণ্ড প্রকাশ রূপে তাঁর উপরে নির্ভর করে। এই বিষয়গত পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে কখনও নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্য, কখনও বা এক পুরুষোত্তমের চৈতন্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মবাদী ভাববাদ পরবর্তী কালে নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে।

(7.4A) এফ্. এইচ্. ব্রাডলি বলেন যে পরব্রহ্ম এমন এক পরম পদার্থ যা ব্যক্তিগত মানবীয় সত্তা ও মনুষ্যেতর জগতের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা উভয়েরই মূল এবং উভয়কেই ব্যাখ্যা করে। এই কারণে পরব্রহ্ম কোন ব্যক্তিগত চৈতন্য হতে পারে না—তাকে এক অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক চেতনা রূপে কল্পনা করতে হবে। শঙ্করাচার্যের মতেও উপনিষদের ব্রহ্ম এক নৈর্ব্যক্তিক চেতনা মাত্র—কোন চিদ্-বিশিষ্ট পুরুষ বা পুরুষোত্তম নয়। চৈতন্যই যদি একমাত্র নিঃসন্দিগ্ধ পদার্থ হয় তাহলে কেবল চৈতন্যকেই স্বীকার করতে হবে; চৈতন্যবিশিষ্ট কোন পুরুষের কল্পনা আরও বেশী জটিল বিধায়, তা শুদ্ধ চৈতন্যের মত নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে না। ব্যক্তিগত পৌরুষেয় চেতনা আর প্রকৃতির উর্ধে বিরাজ করে ব্রহ্ম-চৈতন্য, যা একান্তই অপৌরুষেয়। এই নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদে ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর এক নয়; বরং পুরুষোত্তম ঈশ্বর ব্রহ্মের এক সীমিত প্রকাশ মাত্র। এই মত নির্বিশেষ

ব্রহ্মবাদে পর্যবসিত হয় আর এই মতে নৈতিক বা ধর্ম জীবনের চরম সার্থকতা কিছু থাকে না।

(7.4B) এন্ড্রু সেথ প্রিঙ্গল-প্যাটিসন্, জে. রয়েস্ প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্রহ্মবাদ কিন্তু ব্যক্তিচৈতন্যকে ছাড়িয়ে রয়েছে যে বিষয়গত পরমচৈতন্য, তাকে নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্য বলতে চায় না। এই মতে বিষয়গত চৈতন্যকেও কোন অনন্ত পুরুষের চৈতন্য হতে হবে। এর কারণ হল এই যে নৈর্ব্যক্তিক চেতনা এক বিমূর্ত ধারণা, যার অস্তিত্ব অসম্ভব। চৈতন্যকে থাকতে হলে কোন আত্মাকে আশ্রয় করেই থাকতে হয়। ভারতীয় ন্যায় দর্শনেও চৈতন্য বা জ্ঞানকে আত্মারূপ দ্রব্যবিশেষের গুণমাত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে; গুণ কখনও দ্রব্যাশ্রিত না হয়ে থাকতে পারে না। এই পুরুষবাদীদের মতে বিষয়গত অনন্ত চেতনা কোন অনন্ত পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করেই থাকবে; অতএব ঈশ্বর ও পরব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। এখানে মানবের ব্যক্তিত্বও ঈশ্বরের সত্য প্রকাশরূপে সত্তাবান হতে পারে। কিন্তু আগেকার নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদে (7.4A) জীবের ব্যক্তিসত্তা অলীক বা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্ম চৈতন্য নৈর্ব্যক্তিক হ'লে বিশেষ পুরুষের ব্যক্তিসত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে; কেননা ঐ ব্যক্তিসত্তা নৈর্ব্যক্তিক চেতনার যুক্তিগ্রাহ্য ফল হতে পারে না। ব্যক্তিসত্তা এইভাবে বিপন্ন হলে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মজীবনের দায়িত্ববোধ সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে। পুরুষবাদীরা কিন্তু নৈতিক মূল্যকে এতটা অবহেলা করতে রাজী নন। পুরুষবাদীদের মতে পুরুষোত্তম ভগবানই পরমতত্ত্ব আর মানুষের সীমিত ব্যক্তিত্ব তাঁরই সত্য প্রকাশ। এ কথা মানলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও দায়িত্বকে মিথ্যা বলবার প্রয়োজন নেই। আবার কোন কোন পুরুষবাদী মনে করেন যে, মানবীয় অস্তিত্বকে যদি পুরুষোত্তম ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হয়, তা হলেও তার পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাহত হবে। তাই মানবের নৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তার কোন আদর্শ বেছে নেবার শক্তিকে স্বীকার করতে গিয়ে, প্রয়োজন হলে, ঈশ্বরকেও অস্বীকার করতে হবে বলে এ'রা মনে করেন।

(7.4C) হেগেল্ চৈতন্যের জ্ঞানাত্মক বৃত্তির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আর ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি বৃত্তিকে ওই জ্ঞানের উপরে নির্ভরশীল বলেছেন। এই কারণে হেগেল্ পরমচৈতন্যকে এক পরাজ্ঞান বা সর্বব্যাপী "ধারণা" বলেছেন। এই ভাবে তত্ত্ববিদ্যা হয়েছে যুক্তিবিদ্যার (অর্থাৎ জ্ঞানবিদ্যার) সামিল, আর হেগেলের মত, সর্বতর্কবাদে পরিণতি লাভ করেছে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান "প্রত্যয়" বা "ধারণা" সাপেক্ষ। জ্ঞানজীবনের সম্ভাবনায় মূল প্রত্যয়গুলি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে উপচিত হতে হতে, সর্বব্যাপী পরম প্রত্যয়ে গিয়ে মিলিত হয়। দুই বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের ("সাপেক্ষ—নিরপেক্ষ", "থাকা—না থাকা") সমন্বয় সাধন করে করেই জ্ঞান অগ্রসর হতে থাকে, আর পরম প্রত্যয় বা ধারণাতে সমস্ত জ্ঞানের সমন্বয় সাধিত হয়।

(7.4D) ব্রাড্‌লি জ্ঞান, আবেগ বা অভিলাষাত্মক চেতন বৃত্তির মূলীভূত আরও

প্রাথমিক চৈতন্যকে বলেছেন এক সাধারণ সংবিৎ। ঐ সাধারণ অনুভূতি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হয়ে জ্ঞান, বা ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হয়। আমেরিকান জে. রয়েস চৈতন্যের কৃত্যাত্মক বৃত্তির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ইচ্ছা বা সংকল্পরূপী চেতনাই প্রধান ও বস্তুজ্ঞান হল সংকল্পের সহায়ক মাত্র। এই ইচ্ছাশ্রয়ী ব্রহ্মবাদে পরমচৈতন্য হল এক পরম অভিলাষ যা সৃষ্টির স্তরে স্তরে উপলব্ধ হয়। এখানে মানুষের চেতনা প্রধানতঃ ইষ্ট বা মূল্যগ্রাহী অভিলাষরূপে কল্পিত হয়েছে, আর সেই ব্যক্তিচৈতন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ এক ঐশ্বরিক অভিলাষ রূপায়িত করে চলেছে।

ভাববাদী ব্রহ্মবাদের উপরোক্ত মতভেদগুলি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে ভাববাদ পূর্ণাঙ্গ, পর্যাপ্ত ও সুসংগত বিশ্বমত হতে পারে কিনা বিচার করে দেখতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গত ভাববাদে জগতের মূলীভূত কোন অনন্ত অধ্যাত্মতত্ত্বের উপস্থিতি স্বীকার করা হয়েছে। এই মতে বিশেষ মানুষের চেতনাকে সেই অনন্ত চেতনারই খণ্ডপ্রকাশ বলে ধরা হয়েছে। এইভাবে সমগ্র জগত বিষয়গত পরমচৈতন্যের ওপর আশ্রিত হয়ে মানসসাপেক্ষ হয়; ভাববাদ এইভাবেই সমর্থিত হয়েছে। অথচ কোন বস্তুই শেষ পর্যন্ত বিশেষ মনুষ্য চৈতন্যের উপর আশ্রিত নয় বলে, ঐ বস্তুগুলিকে ব্যক্তিনিরপেক্ষও বলা যায়। তাই এই ব্রহ্মতত্ত্বকে ভাববাদ ও বস্তুবাদের এক সমন্বয় বলা হয়েছে।

৪. স্বয়ংসৎ বস্তু ও অবভাস—সত্তার মাত্রাভেদ[1]

স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ংসৎ পরমতত্ত্বকে যদি এক বা অদ্বিতীয় বলে কল্পনা করা হয়, তা হলে এই বৈচিত্র্যময় জগত ও তার বহুতাকে ঐ পরমতত্ত্বের প্রকাশ বা অবভাস বলতে হয়। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এই বহুতাকে অলীক বা মিথ্যা অবভাস বলে; রজ্জুকে কেবল ভ্রান্তিবশতঃই সর্পরূপে দেখা যায় কিন্তু সর্প রজ্জুর প্রকৃত রূপান্তর নয়। সবিশেষ অদ্বৈতবাদ কিন্তু এই জগৎ বৈচিত্র্যকে অদ্বৈতের সত্য অবভাস বলে, যেমন দই হলো দুধের প্রকৃত রূপান্তর। আগের মতে একই সত্য, বহু মিথ্যা; পরের মতে এক এবং বহু উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ পরমার্থসত্য। এই দ্বিতীয় মতে আবার কোন কোন অবভাস পরমতত্ত্বের পূর্ণতর প্রকাশ বলে বেশী সত্য এবং অন্য কোন অবভাস তার ক্ষীণতর প্রকাশ বলে কম সত্য হয়। অতএব পূর্ণসত্তার যে আবভাসিক জগত, তার মধ্যে বিভিন্ন অবভাসের মাত্রাগত ভিন্নতা থাকতে পারে।

উপরোক্ত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও অতিসাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুকে যেমন দেখায় সে তেমন নয়। কথায় বলে, "চক চক করলেই সোনা হয় না"। জলের মধ্যে অর্ধনিমজ্জিত লাঠিকে ভাঙ্গা দেখায়, গোলাকার মুদ্রা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডিম্বাকার মনে হয় আর সমান্তরাল রেলপথ দূরে সংযুক্ত বা মিলিত দেখায়। এই সব স্থলে সাধারণ লোকে বলবে যে ঋজু

---

1. Appearance and Reality—Degrees of Reality

লাঠিই প্রকৃত বস্তু আর 'ভাঙ্গা লাঠি' তার অবভাস; অথচ যুক্তি বলবে যে বায়ুর মধ্যে লাঠিকে ঋজু দেখায় ও জলে দেখায় ভাঙ্গা। অতএব ঋজু ও ভাঙ্গা লাঠি উভয়েই "অবভাস"; প্রকৃত বস্তু যে কি তা জানা কঠিন। মুদ্রাকেও কোন পরিপ্রেক্ষিতে গোল ও অন্য পরিপ্রেক্ষিতে ডিম্বাকার দেখায় বলে, উভয় আকারকেই 'অবভাস' বলতে হয়। অর্থাৎ যা কিছু দেখি তাকেই অবভাস বলতে হয়, আর স্বয়ংসৎ বা নিরপেক্ষ বস্তু যেন অজ্ঞাত থেকে যায়। উঁচু মন্দিরের চূড়াকে এক মাইল দূর থেকে যেমন দেখায় একশ গজ দূর থেকে তেমন দেখায় না। এক মাইল দূরের অবভাস অনেক ছোট আর অস্পষ্ট, আর একশ গজ দূরের অবভাস অনেক বড় ও স্পষ্ট। কোন কোন দার্শনিক বস্তুকে, দূর থেকে, নিকট থেকে, ডাইনের থেকে, বাঁয়ের থেকে, নানা অবস্থায় নানা প্রত্যক্ষে গৃহীত অসংখ্য অবভাসের এক নিয়মিত সমাহার বলে ভাবেন; এই মতে বস্তুমাত্রেই দৃশ্যমান অবভাসের প্রপঞ্চমাত্র। বস্তুর সঙ্গে অবভাসের সম্বন্ধও যা, নিয়মবদ্ধ অবভাসগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধও তাই। আবার অন্য দার্শনিকেরা কোন অবভাসকেই অস্তিত্ববান বা সৎ বলেন না; মুকুরের প্রতিবিম্বের মত, যতক্ষণ কোন পুরুষ ঐ অবভাস দেখে, যতক্ষণ তার ভাস হয় কোন চেতনায়, ততক্ষণ পর্যন্তই অবভাসের স্থিতি; মানুষের প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ হয়ে তার কোন সত্তা নেই। দূরত্বের জন্য ধ্রুবতারাকে পূর্ণচন্দ্রের থেকে অনেক ছোট দেখালেও আসলে ধ্রুবতারা অনেক বড়। এখানে অবভাসটি হলো "পূর্ণ চন্দ্রের তুলনায় ধ্রুবতারার খর্বতা"; এই অবভাস জগতে কোথাও নেই; কেবল যতক্ষণ দেখি ততক্ষণ আমার চেতনায় থাকে। এই স্বয়ংসৎ বস্তু ও অবভাসের সম্বন্ধ বিচারও দার্শনিকদের এক বিশেষ সমস্যা। আমরা এ বিষয়ে প্রধান প্রধান দার্শনিকেরা কে কি বলেছেন তা সংক্ষেপে ব'লে, আমাদের আলোচনা শেষ করব। এ স্থলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

কাণ্টের মতে এই দৃশ্যমান, বিচিত্র বস্তুময় জগতপ্রপঞ্চ, নিরপেক্ষ স্বয়ংসৎ বস্তুর এক বিরাট অবভাস। জ্ঞানের সম্ভাবনার কথা বিচার করে তিনি বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বয়ংসৎবস্তুর প্রভাবগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিবিধ বিকার সৃষ্টি করে; এই প্রভাবগুলিকে আবার মানুষের জ্ঞানের বিষয় হতে হলে, বুদ্ধির কতকগুলি নিজস্ব আকার ও প্রত্যয়ের দ্বারা পরিবর্ধিত ও অর্থবহ হতে হয়। অতএব ঘটপটাদি জ্ঞাত বিষয়রাজি আমাদের জ্ঞানে প্রতিফলিত স্বয়ংসৎ বস্তুর 'অবভাস'; স্বয়ংসৎ বস্তু একান্তই অজ্ঞাত থাকে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিবিধ অনুভূতিকে দেশ-কালাবচ্ছিন্ন হতেই হয়; এই "দেশ—কাল" সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভবের এক আকার হওয়ায় মানুষের প্রত্যক্ষ বহির্ভূত নয়। তাই প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ স্বয়ংসৎ বস্তুর কোন দেশকালাবচ্ছেদ নেই; অথচ সব ইন্দ্রিয়ানুভবকেই দেশকালাবচ্ছিন্ন হ'তে হয় ব'লে, ওগুলিকে মানুষের ইন্দ্রিয়ে স্বয়ংসৎবস্তুর 'আভাস' বলা যায়। এই ইন্দ্রিয়াভাসগুলি আবার বুদ্ধির নিজস্ব আকার ও সর্ববিষয়গত প্রত্যয়রাজির দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে, জ্ঞানের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়। এই বিষয়গুলি এই কারণে স্বয়ংসৎ বস্তুর থেকে দুই ধাপ

দূরবর্তী—"অবভাস"। একবার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে নিরপেক্ষ বস্তুর ওপর "দেশ—কাল" চাপিয়ে স্বয়ংসৎ বস্তুর থেকে একধাপ সরে যাই; আবার ঐ ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপর বৌদ্ধিক আকার চাপিয়ে জ্ঞানের বিষয়কে সম্ভব করি, আর এখানে দুই-ধাপ দূরে যাই। কাণ্ট্ অজ্ঞাত স্বয়ংসৎ বস্তু, ইন্দ্রিয়ের বিবিধ 'আভাসরাজি' ও জ্ঞান-বিষয়রূপী 'অবভাসের' মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ 'অবভাস'গুলি হল মানুষের বুদ্ধি ও তন্নিষ্ঠ আকারাদির দ্বারা নির্মিত, আর সেই, নির্মানের উপাদান হল অজ্ঞাত 'স্বয়ংসৎ বস্তুর' ইন্দ্রিয়ে গৃহীত 'আভাস' সমূহ।

নব্যহেগেলপন্থী ব্র্যাড্লি কাণ্ট্সম্মত 'আভাস' ও 'অবভাসের' পার্থক্য অগ্রাহ্য করে জ্ঞানে ভাসমান বিষয়মাত্রকেই 'অবভাস' বলেছেন ও তার সঙ্গে স্বয়ংসৎ পরমসত্তার পার্থক্য করেছেন। এ বিষয়ে ব্র্যাড্লির যুক্তি খানিকটা তত্ত্ববিদ্যা-গত, কাণ্টের যুক্তির মত জ্ঞানবিদ্যাগত নয়। ব্র্যাড্লি কাণ্টসম্মত বৌদ্ধিক আকার এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকারগুলিকে স্ববিরোধী দেখাবার চেষ্টা করেছেন। 'দেশ-কাল', 'কার্য-কারণ', 'দ্রব্য-গুণ' প্রভৃতি সম্বন্ধগুলি জ্ঞানগত যে কোন বিষয়নিষ্ঠ আকার। জ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়রূপী জগতের মধ্যে এই সার্বিক সম্বন্ধগুলি থাকবেই; অথচ এই সম্বন্ধগুলি স্ববিরোধী বলে তারা কখনো পরমার্থতত্ত্ব হতে পারে না। যে তথ্য স্ববিরোধী তা নিজেই নিজেকে বাধিত করে, আর ঐ রকম তথ্য আমাদের সুস্থিত চিন্তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। আমাদের চিন্তা তাই পরম-তৃপ্তির খোঁজে জ্ঞানরাজ্যের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। পরমতত্ত্ব অতি সুসঙ্গত, নির্বিরোধ, সম্বন্ধহীন এক অদ্বয় তত্ত্ব। ব্র্যাড্লির মতে এই স্বয়ংসৎ পরব্রহ্ম এক সর্বব্যাপী এবং সর্বথা সুসংঙ্গত এক পরমা অনুভূতি বা সংবিৎ; এই মূলীভূত সংবিৎ থেকে সম্বন্ধাদিযুক্ত জ্ঞান বা ইচ্ছা 'অবভাস' রূপে নিঃসৃত হয়। এই সীমিত অবভাসগুলি স্ববিরোধী বলে সুসঙ্গত পরব্রহ্মে তাদের কোন স্থান নেই। অবশ্য, ব্র্যাড্লির মতে, অবভাসের স্ববিরোধ যদি কোনক্রমে দূরীভূত হয়, তা হলে ঐ পরিশোধিত ও পরিমার্জিত 'অবভাস' পরমতত্ত্বের অংশীভূত হতে পারে। জ্ঞানগত 'অবভাস' যতটা ব্যাপক ও যতটা সংগতিপূর্ণ হবে, পরমতত্ত্ব ততটাই ঐ অবভাসে প্রতিফলিত হবে; এর কারণ এই যে পরমতত্ত্ব এক সর্বব্যাপী ও চরমসঙ্গতিপূর্ণ সংবিৎ। অতএব ব্র্যাড্লির মতে অবভাসগুলি কমবেশী মাত্রায় সৎ হতে পারে। যে অবভাসের স্ববিরোধ দূর করার জন্য কম পরিমার্জন প্রয়োজন হয় সেই অবভাস বেশীমাত্রায় সৎ, আর যে অবভাসের অধিকতর পরিবর্তন প্রয়োজন তা হল কম মাত্রায় সৎ। এই ভাবে পরিশোধিত অবভাস স্বয়ংসৎ পরব্রহ্মে নিজের স্থান করে নিতে পারে।

মহাবৈদান্তিক আচার্য শঙ্কর কিন্তু অবভাসপ্রপঞ্চ ও পরমচৈতন্যরূপী স্বয়ংসৎ ব্রহ্মের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করেছেন। অবভাসের কোন স্থান কোনক্রমেই পরব্রহ্মে থাকতে পারে না। ভেদশূন্য ব্রহ্মে বৈচিত্র্যময় জগত একেবারেই নিষিদ্ধ। তথাপি যে 'প্রাতিভাসিক' ও 'ব্যবহারিক' সত্তার কল্পনা করা হয়েছে, তারা কেবল অসত্তারই মাত্রা বর্ণনা করে—সত্তার মাত্রা নয়। অর্থাৎ

প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা উভয়েই মিথ্যা, ব্রহ্মবলয়ে কারও প্রবেশ নেই ; কেবল ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে 'ব্যবহারিক' সত্তাকে কম মিথ্যা ও 'প্রাতিভাসিক' সত্তাকে বেশী মিথ্যা বলতে হয়। অবভাসবর্জিত পরমার্থ সত্তাই একমাত্র শুদ্ধ স্বয়ংসৎ তত্ত্ব।

দর্শনশাস্ত্রে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ ; আজ পর্যন্ত কোন মতকে পুরোপুরি পর্যাপ্ত ও সুসংগত হতে দেখা যায় নি। তবু মনে হয় আচার্য শঙ্করকে অনুসরণ করলে অবভাস-জগত মিথ্যা হয়ে যায় আর স্বয়ংসৎ পরমতত্ত্ব এক ভেদবর্জিত নির্বিশেষ তত্ত্ব হয়, যা আমাদের কাছে একান্তই শূন্য ও বিমূর্ত। এ দিক থেকে হয়তো স্বয়ংসৎ অদ্বৈতকে এক সঙ্গতিপূর্ণ, অবাধিত, সর্বব্যাপী সমগ্র বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ; আর তা হলে অবভাস প্রপঞ্চ মাত্রাভেদে কমবেশী সত্য হতে পারে। আচার্য শঙ্করের যুক্তি কিন্তু অপ্রতিরোধ্য। পরব্রহ্ম 'এক' হলে বহু তার সঙ্গে মিশবে কি করে? তবু যেন শঙ্করের মত আমাদের তৃপ্তি দেয় না ; কারণ সেই মতে আমি, আমার আশা-আকাঙ্খা, আমার আদর্শ, মূল্য ইত্যাদি সবকিছু শেষপর্যন্ত মিথ্যা হয়ে যায়। তাই সবিশেষ অদ্বৈতবাদই অধিকতর তৃপ্তিদায়ক মনে হতে পারে। সেই সবিশেষ পরব্রহ্ম যদি চৈতন্যরূপী আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হন তা হলে, মানুষের চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মাই পরব্রহ্মের অধিকতর নিকটবর্তী হ'য়ে অধিকতর সত্য অবভাস, আর দূরবর্তী জড়স্তর হবে কম সত্য অবভাস। অতএব সব অবভাসই একস্তরের নয়। মুদ্রার গোলাকার 'অবভাসই' বেশী মাত্রায় আর ডিম্বাকার 'অবভাস' কমমাত্রায় সত্য বলেই স্বীকার করি। তাই হয়তো পরমসতের কমবেশী মাত্রা ভেদে প্রকাশরূপে অবভাসপুঞ্জ স্বীকার করতে হয়। অবশ্য জগতের অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপন করলেই উপরের সিদ্ধান্ত মানা যাবে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে, বহুতত্ত্ববাদী বা দ্বৈতবাদীর কাছে, ঐ মত সর্বথা পরিত্যাজ্য।

মূল্য সঞ্চার করে। অস্তিবাদের মূল কথাটি হল মানুষের স্বভাবের কেন্দ্রে রয়েছে বেছে নেবার, স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার, সম্ভাবনা। "অস্তিতা সারভূত সামান্য-লক্ষণের পূর্ববর্তী" এই গুরুত্বপূর্ণ মতেরও নিষ্কর্ষ হলো এই যে মানুষের এমন কোন স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় স্বরূপ নেই যা তার চরম স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত করতে পারে। আমার কোন স্থায়ী স্বরূপ বা ধর্ম নেই বলেই আমি, সার্ত্রের মতে, একান্তই শূন্য। শূন্যতাই আমার স্বভাব।

দুই বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানিতে, মানুষের অস্তিতার ওপরে যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে, মানুষের পরিবেশের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায়, তারই ফলশ্রুতি হল আধুনিক অস্তিবাদ। এই কারণে সার্ত্রে, হাইডেগার প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা বিশেষ করে মানব-অস্তিতাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। তবে মানুষের সামাজিক বা পার্থিব পরিবেশকে এরা একেবারে উপেক্ষা করেন নি। কির্কেগোরের অন্তর্মুখীন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে এ'রা বলতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তির চৈতন্যই তার পরিবেশকে নির্বাচন করে। আত্মা ও পরিবেশ দুটা পৃথক জিনিষ নয়। হাইডেগার বলেন "পরিবেশ-সমন্বিত-আত্মা" একটা জিনিষ; আর এই মানবীয় "পৃথিবী-মধ্যস্থ-অস্তিতা" এক "নিজেকে-অতিক্রমকারী-অস্তিতা" বলে বর্ণিত হয়েছে। মানবীয় অস্তিতাকে হাইডেগার বলেন "ডাজাইন" (Dasein)। এই ডাজাইন এখানকার বা ওখানকার অস্তিতা নয়; এ হল পরিবেশের মধ্যে এক বিশেষ গতিশীল অস্তিতা; এর স্বভাবই হলো সবসময়ে নিজেকে অতিক্রম করে চলা; এ নবমূল্যায়নের মধ্যে নূতন সৃষ্টি করে চলে।

মানবীয় অস্তিতার এই ব্যাখ্যা একটু নূতন ধরণের আর মানবিক স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যেরও এক অভিনব মর্য্যাদা সার্ত্রে ও হাইডেগারের মধ্যে পাওয়া যায়। চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বোধই হল নিজ অস্তিতার বোধ। সামান্যধারণার সাহায্যে এই বোধ ন্যায়াকারে গ্রথিত হতে পারে না; এই বোধ সাক্ষাৎ অনুভূতি বা আবেগগম্য। স্বাধীন নির্বাচনে মানুষ এক অপরিসীম অনস্তিতা বা শূন্যতার মুখোমুখি হয়; সংকল্প নেবার বা স্বতঃপ্রবর্তনার সময়ে মানুষ বড় একাকী—দূরে বা নিকটে কাউকেই সে সাহায্য করার জন্য পায় না। পায় না ঈশ্বরকে, কারণ ঈশ্বর নেই; পায় না পরিবেশকে, কারণ পরিবেশও মানবিক অস্তিতা বা ব্যক্তিত্বের প্রসারণ মাত্র। ইস্পাত, পাথর, কাঠ ইত্যাদি মানুষ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তা দিয়ে তৈরী বাড়ী, সহর হলো আমার পরিবেশ, যার প্রতি আমি উদাসীন নই। বাড়ী বা সহর 'আমার'; আমি তাকে ভালবাসি বা ঘৃণা করি; তাকে ছেড়ে যাই বা তাতে ফিরে আসি। তাকে ব্যবহার করে আমি তার মধ্যে নূতন মূল্য সৃষ্টি করি। যে চেতনা পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে চায়, পরিবেশ সেই চেতনা-সাপেক্ষ। ব্যক্তি ও তার পরিবেশ একই সঙ্গে জন্মলাভ করে এবং পরিবেশকে ছাড়িয়ে যেতে যেতে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে চলে। মানুষের স্থায়ী কোন স্বরূপ

নেই—আছে দায়িত্বপূর্ণ কর্মধারা। এই কর্মগুলির মধ্যে কোন যৌক্তিক যোগাযোগ নেই। এখানে যেমন অনাগত কর্মের আশা রয়েছে, তেমনি কৃতকর্মের জন্য রয়েছে পূর্ণ দায়িত্ব। স্বাধীন কর্মধারা তাই অপরিসীম যন্ত্রনাদায়ক। আগামী দিনে আমি কি হবো কেবল তাই নয়; আজ কি হলাম, আর আমি আমার পরিবেশে কি করে উঠতে পারিনি, এ সবই আমার স্বাধীনতার পরিধির মধ্যেই রয়েছে। আমার কৃতিত্বের জন্য যা কিছু শ্রদ্ধা বা সম্মান, আমার অকৃতকার্যতার যা কিছু লজ্জা বা অনুশোচনা সবই একা আমার প্রাপ্য। মার্কসবাদ, জড়বাদ বলে যে পরিবেশ মানুষকে সৃষ্টি করে; পরিবেশের চাপে কেউ হয় কৃষক, কেউ মজুর, কেউ গৃহবধু, কেউ বা চটুল দীপ্তিময়ী আধুনিকা। সমাজের ইতিহাসে এ কথার কিছুটা সত্যতা থাকলেও, আমি পরিবেশকে কি মূল্যে কিনেছি তা দিয়ে হয় 'আমার' পরিবেশ। অপুষ্টি ও জঘন্য পল্লীতে বাস মানুষকে অপরাধপ্রবণই করবে এমন কোন মানে নেই; ঐ পরিবেশে কবি, সাহিত্যিক ও বিরাট শিল্পপতিও সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতা অপরিসীম যন্ত্রনাময় আর প্রকৃত স্বাধীন নির্বাচনে মানুষ শূন্যতার মুখোমুখি হয়; এ সময়ে তার একাকীত্বের বোধ প্রচণ্ড ভীতিপ্রদ। এই ভয় কোন বিশেষ বস্তু সম্পর্কে (সাপ, বাঘ সম্পর্কে) ভয় নয়—এই ভয় এক নামহীন, গোত্রহীন শূন্যতার ভয়। কোন বিশেষ বস্তুনিষ্ঠ ভয় ছাড়াও আমাদের এক সাধারণ ভীতি থাকতে পারে যেমন, শূন্যতা বা সম্পূর্ণ ধ্বংসের ভয়। এই 'বিশেষ কিছু না'র প্রতি ভয়ের অর্থ কিন্তু ভয়হীনতা নয়; কেননা, এই সাধারণ ভয় ভাবরূপে বিদ্যমান থাকে। তাই 'শূন্যতাও' এক অস্তিমান ভাবপদার্থ যার প্রতি থাকে আমাদের মহাত্রাস। কেবল একাকীত্ব বা নির্বাধ শূন্যতার মধ্যে অস্তিতা রয়েছে স্বাধীনতার মূলে; আর এই মূলীভূত মহাত্রাস বা শূন্যতার সাক্ষাৎকার মানুষকে তার স্বাধীন অস্তিতার অনপেক্ষ পরিচয় দেয়। সার্ত্রে তাই বলেন যে শূন্যতাই স্বাধীনতার পটভূমি। নামহীন উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগই ঐ শূন্যতাশ্রয়ী একাকীত্বের পরিচায়ক স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন। রত্নাকর দস্যু যখন জানতে পারল যে তার স্ত্রী বা বৃদ্ধপিতামাতা কেউ তার নরহত্যাজনিত পাপের ভাগ নিতে রাজী নয়, তখন তার আধ্যাত্মিক একাকীত্ব ও তজ্জনিত মহাত্রাস তাকে স্বীয় অস্তিতার গভীরে নিয়ে গেছে। এতদিন সে তার পিতামাতা বা স্ত্রীর প্রয়োজনে বেঁচে ছিল; এখন সব হারিয়ে তাকাল নিজের দিকে; অন্তর্মুখী সত্য দীপ্ত হলো তার জীবনে—মহাকবি বাল্মীকি হয়ে সে নূতন অস্তিতায় দ্রবীভূত হল। একাকীত্ব বা শূন্যতাই অস্তিতার বোধ জাগায় —এমনকি আত্মোপলব্ধির সহায়ক হয়।

কারণাপ, এয়ার প্রভৃতি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা 'শূন্যতা' প্রসঙ্গে হাইডেগারের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তত্ত্ববিদ্যার অর্থহীনতা বোঝাতে চেয়েছেন। হাই-ডেগারের রচনায় যেন শূন্যতাকে কোন ভাবাত্মক বস্তুর নাম হিসেবে ধরা হয়েছে; কিন্তু এয়ার অভিযোগ করেছেন যে সব বিশেষ্যপদই যে বস্তুর 'নাম'

নয়, এ কথা হাইডেগার ভুলে গেছেন। হাইডেগার অবশ্য শূন্যতাকে এক রহস্য-ময় উপস্থিতি বলে মানেন আর প্রত্যক্ষবাদীদের বিরোধিতা তাঁকে স্পর্শও করে না। "শূন্যতা শূন্য হয়ে যায়" ইত্যাদি বাক্যে হয়তো কিছু কথার কথাই আছে। কিন্তু উপরোক্ত নাম-গোত্রহীন মহাত্রাস যদি জীবনে কখনও অনুভব করা যায়, তা হলে তখন যে শূন্যতা বা একাকীত্বের সম্মুখীন হই, তা হয়তো সম্পূর্ণ নেতিমূলক নয়।

হাইডেগারের মতে এই মহাত্রাস হলো আমার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চেতনা, যে মৃত্যুর দিকে আমার স্বাতন্ত্র্য প্রসারিত রয়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখি হলে বা সম্পূর্ণ ধ্বংসের কিনারে দাঁড়ালে আমি স্বাধীনভাবে সংকল্প গ্রহণ করতে পারি যে আমার বিগত পরিবেশ থেকে নূতন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এই মৃত্যুভয় আমাদের দৈনন্দিন লাভক্ষতির উর্ধে নিয়ে যায়, আর তাতেই আমার খাঁটি প্রকৃত আত্মার উপলব্ধি। সার্ত্রে কিন্তু মৃত্যুর এই মহিমা কীর্তন করতে পারেন নি। যে কয়েদী কয়েকঘণ্টা পরে ফাঁসি যাবে, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে কতকটা পশুতে পরিণত হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় তার অস্তিতার সীমা খুবই পরিচ্ছিন্ন ও সঙ্কীর্ণ। ভবিষ্যতে যার প্রসারণ সম্ভাবনা নেই এমন অস্তিতা ঠিক, সার্ত্রের মতে, মানবিক অস্তিতা নয়। সার্ত্রের মতে স্বাধীন সংকল্প গ্রহণই ভয়াবহ; স্বাধীনতায় থাকে একাকীত্বের বোধ। এখানে মৃত্যু নয়—শূন্যতার মুখোমুখি হওয়া আর তার থেকেই জাগে মহাত্রাস। সার্ত্রে বলেছেন "মানুষের ওপর স্বাধীন হবার অভিশাপ রয়েছে"।

মৃত্যুর ভয় বা শূন্যতার ভয়—যার শারীরিক প্রকাশ বমনেচ্ছা বা বিবমিষাতে —ক্বচিৎ কখনো জীবনে দেখা দেয় বলে, প্রচ্ছন্নভাবে সবসময়েই থাকে। পারি-বারিক বা সামাজিক জীবন যাপনের যে দৈনন্দিন নিশ্চিন্ত্য সত্তা তাকে ছাপিয়ে থাকে এই ভয়াল অস্তিতা। স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যই তাই খাঁটি, সত্যিকারের অস্তিতার মূলে। ক্বচিৎ কখনও মনে হয়ঃ

> শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
> শরমের ডালি,
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমাঙ্কিত কালি,
> লাভক্ষতি-টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
> কলহ সংশয়—
> সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
> দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।
>
> ** **
>
> শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্ধে লয়ে যাও
> পঙ্ককুণ্ড হতে,
> মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
> বজ্রের আলোতে।

(রবীন্দ্রনাথ)

• এই মিথ্যা গ্লানিকর দিন যাপনও কিন্তু, সার্ত্রের মতে, আমার অস্তিতারই একটা দিক ; কেননা এরই মধ্যে স্বাধীন মানুষের নৈতিক উদ্বেগ ও অস্থিরতা হঠাৎ, আচমকা প্রকাশ পায়।

4. কার্ল ইয়াস্‌পের্স[1] ও গেব্রিয়েল মার্সেল[2]

সার্ত্রে-হাইডেগারেরও পূর্বে ডেভিড হিউম্‌ ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কার বলেছেন ; কার্ল মার্কস্‌ প্রচলিত ধর্মকে "জনগণের ঘুমপাড়ানী আহিফেন" বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত অস্তিবাদী নাস্তিকেরা যে ভাবে মানবীয় অস্তিতার মর্যাদা দিয়েছেন হিউম্‌ বা মার্কস্‌ তা দেননি। সার্ত্রে, হাইডেগারের নাস্তিকতার অপর প্রান্তে রয়েছে আধুনিক ঈশ্বরানুরাগী অস্তিবাদ, যার প্রধান প্রবক্তা হলেন জার্মান দার্শনিক কার্ল ইয়াস্‌পের্স ও ফরাসী চিন্তানায়ক গেব্রিয়েল মার্সেল। ঈশ্বর এঁদের কাছে 'মৃত' নন। মার্সেল ও ইয়াস্‌পের্স উভয়েই বর্তমান যন্ত্রবাদী সভ্যতার তীব্র সমালোচক। যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যা বর্তমান সভ্যতার ধারক ও বাহক হওয়াতে, এঁদের মতে, মানুষের প্রকৃত আত্মা মরে যাচ্ছে, আর তার মূল্যগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিবিদ্যা ও সাম্যবাদের যুগে সব মানুষকে সমান করে ফেল্যার—জ্ঞানে, কর্মে, শিক্ষায় দীক্ষায় সবাইকে এক স্থির নমুনার দৃষ্টান্ত বানানোর—যে আদর্শ দেখা যাচ্ছে ইয়াস্‌পের্স তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। মার্সেলের মতে বর্তমান যুগ ধর্মহীনতার যুগ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঈশ্বরানুরাগী থাকলেও, দার্শনিকের কাজ হবে সকলকে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া ; এ ছাড়া, মার্সেলের মতে, বর্তমান সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিপদ কাটানো অসম্ভব।

কার্ল ইয়াস্‌পের্স প্রথম দিকে মানসিক রোগের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। পরে অবশ্য ভেবেছেন যে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক মনের বিজ্ঞান মানুষের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যে আত্মা স্বাধীন সংকল্প গ্রহণ করে, যে আত্মা নূতন সৃষ্টির মূলে বিরাজ করে, তাই কেবল খাঁটি, প্রকৃত আত্মা ; আর যে মন আমাদের সামাজিক পরিবেশে, বংশগতির দ্বারা নির্দিষ্ট দৈহিক কাঠামোতে বিরাজ করে, অর্থাৎ যে মনকে মনোবিজ্ঞানীরা বুঝবার চেষ্টা করেন, সেই মন খাঁটি আত্মার তুলনায় অসত্য। ইয়াস্‌পের্স বর্ণিত এই খাঁটি, সত্যিকারের 'আমি' ও জ্ঞানের বিষয়রূপী অসত্য 'আমির' পার্থক্য, ক্যাণ্টের অলৌকিক আমি ও আন্তর প্রত্যক্ষে জ্ঞাত লৌকিক আমির পার্থক্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সার্ত্রে চৈতন্যে ভাসমান পদার্থের অতিরিক্ত কোন অলৌকিক স্বয়ংসৎ বস্তু, কাণ্টের মতো, স্বীকার করেন নি। তবে তাঁর মতে অবভাসকে কোন সত্তার নিকটে ভাসমান হতে হবে। এই সত্তা হলো চৈতন্য আর এই বিষয়ী বা জ্ঞাতারূপী চৈতন্য কখনও বিষয়ের মতে অবভাস হতে পারে না। সর্ববিধ চৈতন্যই বিষয়কে প্রকাশ করে, আর বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়।

1. Karl Jaspers 2. Gabriel Marcel

ব্রেনটানো, হুসার্ল'ও সব চৈতন্যকে 'অভিপ্রেত' বা বিষয়াভিমুখী বলে বর্ণনা করে-ছেন। বিষয়কে প্রকাশ করেই চৈতন্য নিজ সম্পর্কে সচেতন হয়। সার্ত্রের মতে এই আত্মজ্ঞান কিন্তু বিষয়রূপে আত্মজ্ঞান নয়। এ দেকার্তের "আমি চিন্তা করি"র থেকেও অধিকতর মূলীভূত তত্ত্ব; কেননা আগে আমার অস্তিতা, পরে আমার চিন্তা। সার্ত্রের এই যে বিষয়ীরূপ চৈতন্য তাই ইয়াস্‌পের্সের খাঁটি আত্মা। যেহেতু সে কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না, সে হেতু সে মনোবিজ্ঞানকেও ছাড়িয়ে যায়। ইয়াস্‌পের্সের মতে, বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যা অধ্যুষিত সংস্কৃতির কবলে পড়ে, বিষয়মুখী বিজ্ঞানের দাসত্ব করতে গিয়ে, অসত্য, ভেজাল আত্মার সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ এসে যেতে পারে। কিন্তু অস্তিবাদ-সম্মত যন্ত্রনা, পাপ বোধ, মৃত্যু ও সংগ্রাম চেতনার মধ্যেই বোঝা যায় যে জাগতিক বস্তুগত অস্তিতাই সব নয়। ইয়াস্‌পের্স "সীমান্ত পরিবেশের" কথা বলেছেন। যন্ত্রনা, পাপবোধ, মৃত্যু ইত্যাদি অস্তিবাদের সীমান্ত পরিবেশ। চৈতন্যের এই সব বিশেষ বিশেষ সীমিত মুহূর্তে আমার অস্তিতা যা হতে পারবে না তার উপলব্ধিতে ধ্বংস হয়ে যেতে চায়; অথচ কেবল এই সব মুহূর্তেই অস্তিতা তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে।

ইয়াস্‌পের্সের রচনায় ঈশ্বর জগদাতিরিক্ত বলে কল্পিত হয়েছেন। পরে অবশ্য তাঁর মত খৃষ্টধর্মাবলম্বীর মতো রূপগ্রহণ করেছে। গেব্রিয়েল মার্সেল বলেন যে তথাকথিত ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণগুলির কোন মূল্য নেই—ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসই আসল কথা। যার বিশ্বাস আছে তার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করবে এই তথাকথিত প্রমাণগুলি; আর যার বিশ্বাস নেই তার কাছে প্রমাণগুলি দুর্বল ও মিথ্যা মনে হবে। মার্সেলও কির্কেগোরের মতো ভাববাদ ও ব্রহ্মবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের বক্তব্য খানিকটা রহস্যাবৃত হেঁয়ালীর মতো। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার দিনপঞ্জী রাখার পদ্ধতিতে তিনি দর্শন আলোচনা করেছেন আর এই দিনপঞ্জীর বক্তব্য ভাল করে বোঝা যায় না। মার্সেল রক্তমাংসের শরীরজাত কামনা বাসনার উর্ধে উঠে মানুষকে অনাবিল প্রেমের জগতে অধিষ্ঠিত দেখতে চান। তিনি বিশ্বাসে ফিরতে বলেছেন। মানুষের অস্তিতার উপরে তাত্ত্বিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা ঈশ্বরে পৌঁছুতে পারি। অথচ ঈশ্বর যৌক্তিক প্রমাণ সিদ্ধ নন। মার্সেলও, ইয়াস্‌পের্সের মতো, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রের কোন বিশেষ ধারণানুযায়ী সমস্ত মানুষকে এক অভিন্ন ভাবে গঠন করার তীব্র বিরোধী ছিলেন। কোন বিশেষ ছাঁচ বা আকারের মধ্যে পুরে দিলে মানুষের স্বাধীন চিন্তা বা কর্ম ব্যাহত হয়।

5. অস্তিবাদের- সমালোচনা

মানুষের কর্মজীবনের যে সর্বপাশবিনির্মুক্ত স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য তার এক অভিনব ব্যাখ্যা অস্তিবাদে পাওয়া যায়। শূন্যতার বোধ, একাকীত্বের মহাত্রাস, মৃত্যুভয়, উৎকণ্ঠা, বিরক্তি প্রভৃতি আবেগ এর পূর্বে ঐভাবে বিস্তারিত ও বিশ্লেষিত

হয়নি ; আর স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে, ব্যক্তিগত অস্তিতার সঙ্গে এদের সম্পর্কও এ ভাবে বর্ণিত হয়নি। সমসাময়িক ইংরাজ ও আমেরিকান দার্শনিকেরা কতকগুলি শব্দের ও শব্দার্থের বিশ্লেষণে মনোযোগ দিয়েছেন ; যথা—'জ্ঞান' 'বিশ্বাস' 'সত্যতা', 'অপরের মন', 'মানসিক বৃত্তি', 'প্রত্যক্ষ', 'উপাত্ত', 'সত্য-মিথ্যা' ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অস্তিবাদীরাও মানুষের আবেগ বা প্রক্ষোভ-পরিচায়ক শব্দগুলির (উৎকণ্ঠা, ত্রাস) বিশ্লেষণ করেছেন। অথচ এই দার্শনিকেরা তাঁদের বক্তব্য বুদ্ধিগ্রাহ্য ন্যায়াকারে গ্রথিত করেন না, কেননা এ'দের মতে অস্তিতা ও স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিকে অতিক্রম করে। অস্তিবাদের বিরোধীরা বলেন যে এই কারণে কোন কোন স্থলে সার্ত্রে, হাইডেগার বা মার্সেলের রচনা অর্থহীন প্রলাপে পর্যবসিত হয়েছে। ভাষা প্রয়োগের নিয়ম যে এ'রা সবসময়েই পালন করেছেন তা বলা যায় না। বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণ ও বাগর্থতত্ত্ব অনেক স্থলেই অবহেলিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে হাইডেগারের 'শূন্যতা' সম্পর্কিত কোন কোন বাক্যে ঐ বাগর্থতত্ত্ব সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছে ; অন্ততঃ এ. জে. এয়ার এবং রুডলফ্ কারনাপের এই অভিযোগ। সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝতে গেলেও অস্তিবাদীদের সব কথা বোঝা যায় না।

যেটুকু বোঝা যায় তার মধ্যে নূতন কথা বিশেষ পাওয়া যায় না ; নূতন বোতলে পুরানো মদই এ'রা ফেরি করেছেন। প্রত্যক্ষবাদীরা বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, একটু নাটকীয়ভাবে, অস্তিবাদীরাও সেই রকমের যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যক্ষবাদীদের কথা হল, বুদ্ধিবাদ যেন অনিবার্যতাহীন, আপতিক বাস্তবকে অস্বীকার করে ও তার কাছে যেন সব কিছুই অবশ্যম্ভব সুসংবদ্ধ, তন্বিত ধারণা। অন্ততঃ সর্বজ্ঞের কাছে কিছুই আপতিক নয় ; সবই যেন যা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু হতে পারত না। প্রত্যক্ষবাদীরা কিন্তু বাস্তব ঘটনার রাজ্যে কোন কিছুকে অবশ্যম্ভব বলতে রাজী নন। যা কিছু অস্তিতা, তারা যা হয়েছে তার থেকে অন্য কিছুও হতে পারে বা পারত। এই বাস্তবের জ্ঞান কম বেশী সম্ভবপর হয় ; কিন্তু একেবারে যৌক্তিক বা অবশ্যম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে সার্ত্রও লাইব্নিজের পর্যাপ্ত কারণতা নীতিকে অস্বীকার করে, সাপেক্ষতা ও বাস্তবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর সাধারণভাবে অস্তিবাদীরা আপতিক অনিবার্যতাহীন বাস্তবকে "অযৌক্তিক" বলেছেন। এ আর নূতন কথা কি? পরে অবশ্য অযৌক্তিককে 'অশ্লীল' বা 'বিরক্তিকর' বা 'উৎকণ্ঠার জনক' বলা খানিকটা নাটকীয় বিস্তার মাত্র বলে মনে হয়। হেনরী বার্গসোঁও সত্তার গভীরে যাবার জন্য বুদ্ধিবাদ অতিক্রম করে "স্বজ্ঞার" আশ্রয় নিয়েছেন। সত্তাকে তিনিও যুক্তিতর্কের উর্ধে, ন্যায়াকার বিবর্জিতভাবে দেখেছেন। অস্তিবাদীরা কেবল স্বজ্ঞার পথে না গিয়ে প্রক্ষোভের পথ গ্রহণ করেছেন। অস্তিবাদীদের মত আবেগের ওপরে এতটা গুরুত্ব আর কোন দর্শন সম্প্রদায় দিয়েছে বলে মনে হয় না।

আগেকার ভাববাদী দার্শনিকেরা সকলেই যে ব্যক্তিসত্তাকে ব্রহ্মসত্তায় লীন করে

ফেলেছেন এমন বলা যায় না। অস্তিবাদের পূর্বেও ব্যক্তিগত ভাববাদীরা,—প্রিঙ্গল্-প্যাটিসন, রয়েস প্রমুখ ব্রহ্মবাদীরা—ব্রহ্মসত্তায় ব্যক্তিসত্তার অবলুপ্তি স্বীকার করেন নি। তাঁরাও ব্যক্তিচৈতন্যকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বলতে চেয়েছেন। যে হেতু ব্যক্তিচৈতন্য, তাঁদের মতে, এক মহাচৈতন্যের (ব্রহ্মের) ক্ষুদ্র প্রকাশ, যে হেতু সীমিত ব্যক্তির চারিপাশে রয়েছে এক অসীম, অনন্ত জীবন, সেই হেতু সে স্বাধীনভাবে আরও মহান, আরও উদার জীবনের ভাগীদার হতে পারে। পরব্রহ্ম তাই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে হরণ করেন না, সম্ভব করেন। এ'দের বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখতে হবে; তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা অস্তিবাদের আগেও শোনা গেছে।

তা ছাড়া 'অস্তিতার' প্রতি সার্ত্রে, হাইডেগারের মনোভাব একটু উভয়বলতার দিকে ঝুঁকেছে বলে মনে হয়। একই নিঃশ্বাসে মানব অস্তিতাকে এ'রা শ্রদ্ধাও করেন ঘৃণাও করেন। সার্ত্রে বলেছেন "মানুষের ওপরে স্বাধীন হবার অভিশাপ রয়েছে"। এ'দের মতে মানুষের সমস্ত সম্ভাবনা তার স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করে; অথচ ঐ স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে শূন্যতার মহাত্রাস বা মৃত্যুভয়, যা অপরিসীম যন্ত্রনাদায়ক। উৎকণ্ঠা, অস্থিরতাই স্বতন্ত্র অস্তিতার একমাত্র পরিচয় বহন করে। অতএব মানব-অস্তিতার প্রতি, স্বাতন্ত্র্যের প্রতি, এ'দের আকর্ষণ ও বিদ্বেষ একত্রে বর্তমান। এরূপ উভয়বলতা মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ বলে মনে হয়।

অস্তিবাদীদের মতে জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তেই কেবল প্রকৃত মানবিক অস্তিতার দিব্য প্রকাশ হয়। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে ঐ প্রকাশ কোন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে একেবারে নাও আসতে পারে। ইয়াস্পের্সের "সীমান্ত পরিবেশ"—যন্ত্রনা, পাপবোধ, সংগ্রাম—মানবজীবনের কতকগুলি ব্যতিক্রম মাত্র; কারণ এগুলি সাধারণ জীবনের "চরম" অবস্থা। এ কথা যদি ঠিক হয় তা হলে অস্তিবাদীরা ব্যতিক্রম বা ব্যভিচারীভাবকেই মানবের প্রকৃত চরিত্র-প্রকাশক বলে মানছেন বলতে হয়। বিরোধীরা বলতে পারেন ব্যতিক্রম কি করে স্বাভাবিক মানবীয় পরিবেশ হয় তা বোঝা যায় না।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে অস্তিবাদ আধুনিক যুগযন্ত্রনার ফলশ্রুতি। যুদ্ধোন্মাদ, পারমাণবিক মারনাস্ত্র সজ্জিত, স্বার্থক্লিন্ন মানুষ আজ ধ্বংসের খুব কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। এই বিভীষিকার মধ্যেও ব্যক্তিকে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল বলে চিত্রিত করে অস্তিবাদ মানুষকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিয়েছে। এ দিক থেকে দর্শন জগতে অস্তিবাদের মূল্য কিছু কম নয়।

পাঠনির্দেশ

'পাঠনির্দেশ'-এতে যে সব বই পড়তে বলা হয়েছে সেগুলির নাম উল্লেখ না করে সংক্ষেপকরণের জন্য, কেবল গ্রন্থকারের নাম ব্যবহার করা হল। কোন্ গ্রন্থকার-নাম কোন্ গ্রন্থ বোঝাচ্ছে তা পাঠনির্দেশ-এর শেষে সংযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি (343 পৃঃ) দেখলেই বোঝা যাবে। 'পাঠনির্দেশ'-এতে গ্রন্থকারের নামের সঙ্গে (1), (2) ইত্যাদি সংখ্যা কেন ব্যবহার করা হল গ্রন্থপঞ্জি দেখলেই তা বুঝতে পারবে।

'পাঠনির্দেশ'-এতে অনেক বইর কথা বলা হয়েছে। তবে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Hospers : An Introduction to Philosophical Analysis
Russell : The Problems of Philosophy
Wisdom : Problems of Mind and Matter
Woozly : Theory of Knowledge
Walsh : Metaphysics

প্রথম অধ্যায়

দর্শনের বিষয়বস্তু

ড্যান্টো : প্রথম অধ্যায়
ব্রাড্লি : ভূমিকা
রাসবিহারিদাস : দর্শন, 1370, সংখ্যা বৈশাখ
রাসেল্ (1) : পঞ্চদশ অধ্যায়
প্যাপ্ : প্রথম অধ্যায়
এড্ওয়ারডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারণা

হস্পারস্ : পঞ্চম বিভাগ
আকেরমান্ : বার্কলি হিউম্ সংক্রান্ত অংশ
প্যাপ্ : প্রাসঙ্গিক অংশ
হিউম্ (2) : ভূমিকা, প্রথম ও চতুর্থ বিভাগ
হিউম্ (1) : প্রথম খণ্ড,* প্রথম অংশ,* প্রথম বিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান

চিজ্হোম্ : প্রথম অধ্যায়
উজ্লি : অষ্টম অধ্যায়
রাসেল্ (1) : ত্রয়োদশ অধ্যায়
হস্পারস্ : অষ্টম বিভাগ

---

* খণ্ড=Book, অংশ=Part

চতুর্থ অধ্যায়

সত্যতা

মূর : তৃতীয় প্রবন্ধ
রাসেল্ (1) : দ্বাদশ অধ্যায়
উইস্ডম্ : একাদশ অধ্যায়
হেম্লিন্ : পঞ্চম অধ্যায়
উজ্‌লি : ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়
ব্লানসার্ড্ (1) : পঞ্চবিংশ অধ্যায় ও ষড়বিংশ অধ্যায়
এর্ডওয়ারডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

পঞ্চম অধ্যায়

দেশ ও কাল

কানিংহাম্ : দ্বাদশ অধ্যায়
ইউইং (1) : সপ্তম অধ্যায়
টেইলর : তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়
ব্রাড্‌লি : চতুর্থ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্রব্য ও জাতি

হস্‌পারস্ : অষ্টাদশ বিভাগ
কানিংহাম্ : নবম ও একাদশ অধ্যায়
ইউইং (1) : চতুর্থ, পঞ্চম ও দশম অধ্যায়
জোড্ : ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়
টেইলর : দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়
এডওয়ারডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

সপ্তম অধ্যায়

কারণ

হস্‌পারস্ : পঞ্চদশ বিভাগ
জোসেফ্ : চতুর্থ অধ্যায়
ইউইং (1) : অষ্টম অধ্যায়
ওয়ালস্ (1) : সপ্তম অধ্যায়
ম্যাক্‌নেব্ : চতুর্থ ও সপ্তম অধ্যায়
আকেরমান্ : পঞ্চম অংশ
এড্‌ওয়ারডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ
হিউম্ (1) : প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অংশ, দ্বিতীয়—ষষ্ঠ ও চতুর্দশ বিভাগ

অষ্টম অধ্যায়

দৃষ্টিবাদ, বুদ্ধিবাদ, বিচারবাদ ও স্বজ্ঞাবাদ

হস্‌পারস্ : সপ্তম বিভাগ
জোড্ : চতুর্থ অধ্যায়
আকেরমান্ : ষষ্ঠ অংশ
রাসেল্ (2) : তৃতীয় খণ্ড
রাসবিহারিদাস : কাণ্টের দর্শন

ওয়ালস্ (2) : দ্বিতীয় (তৃতীয়, চতুর্থ) অধ্যায় ব্রড্ : চতুর্থ অধ্যায়
প্যাপ্ : প্রাসঙ্গিক অংশ পাউলসেন্ : দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় বিভাগ
এড্ওয়ারডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

নবম অধ্যায়

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ (দৃষ্টসত্ত্ববাদ)

ইউইং (1) : দ্বিতীয় অধ্যায় এয়ার (1) : প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়
হস্পারস্ : নবম ও দশম বিভাগ পাস্মোর : ষোড়শ অধ্যায়
চিজ্হোম্ : পঞ্চম অধ্যায় আরম্সন্ : সপ্তম অধ্যায়
হেম্লিন্ : নবম অধ্যায় রাইল (1) : ষষ্ঠ প্রবন্ধ
ওয়াল্স্ (1) : অষ্টম অধ্যায় ব্রানসারড্ (2) : পঞ্চম অধ্যায়
এড্ওয়ারডস্ : দর্শনকোষ— প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

দশম অধ্যায়

বস্তুবাদ

হস্পারস্ : ত্রয়োবিংশ বিভাগ এয়ার (2) : তৃতীয় অধ্যায়
এয়ার (3) : প্রথম অধ্যায় প্রাইস্ : দ্বিতীয় অধ্যায়
ইউইং (1) : চতুর্থ অধ্যায় জোড্ : তৃতীয় অধ্যায়
রাসেল্ (1) : দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পিটারফ্রয়েণ্ড : প্রথম অধ্যায়
পাস্মোর : একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় এডওয়ার্ডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

একাদশ অধ্যায়

ভাববাদ

হস্পারস্ : চতুর্বিংশ বিভাগ জোড্ : দ্বিতীয় অধ্যায়
ইউইং (2) : প্রাসঙ্গিক অংশ রাসেল্ (1) : দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়
পিটারফ্রয়েণ্ড : দ্বিতীয় অধ্যায় পেরি : প্রাসঙ্গিক অংশ
এড্ওয়ারডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

দ্বাদশ অধ্যায়

জড় ও জড়বাদ

কানিংহাম্ : দশম অধ্যায় কলিংউড্ : প্রাসঙ্গিক অংশ
হকিং : প্রাসঙ্গিক অংশ এড্ওয়ারডস্ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক অংশ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাণ ও প্রাণবাদ

হস্‌পারস্‌ : ঊনবিংশ বিভাগ কানিংহাম্‌ : চতুর্দশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্রমবিকাশতত্ত্ব

কানিংহাম্‌ : ত্রয়োদশ অধ্যায় এডওয়ারডস্‌ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

পঞ্চদশ অধ্যায়

মন বা আত্মা

কানিংহাম্‌ : পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় ইউইং (1) : চতুর্থ অধ্যায়
রাইল (2) : প্রথম অধ্যায় হস্‌পারস্‌ : বিংশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

দেহমনের সম্পর্ক

হস্‌পারস্‌ : বিংশ অধ্যায় কানিংহাম্‌ : সপ্তদশ অধ্যায়
এডওয়ারডস্‌ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ হিউম্‌ (1) : প্রথম খণ্ড, চতুর্থ অংশ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিভাগ

সপ্তদশ অধ্যায়

মূল্য বা ইষ্ট

এয়ার (1) : ষষ্ঠ অধ্যায় লিলি : অষ্টাদশ অধ্যায়
হেয়ার : প্রাসঙ্গিক অংশ ইউইং (1) : পঞ্চম অধ্যায়
কানিংহাম্‌ : একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায় এডওয়ারডস্‌ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক অংশ

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিশ্বতত্ত্ব ও ভাববাদ

ইউইং (1) : দশম অধ্যায় হকিং : তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

অস্তিবাদ

ওয়ারনক্‌ : তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায় গ্রীন : প্রাসঙ্গিক অংশ
এড্‌ওয়ারড্‌স্‌ : দর্শনকোষ—প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ

গ্রন্থপঞ্জি

[আকেরমান্] Ackermann, R. : Theories of Knowledge—a Critical Introduction

[আরম্‌সন্] Urmson, J. D. : Philosophical Analysis

[ইউইং (1)] Ewing, A. C. : The Fundamental Questions of Philosophy

[ইউইং (2)] ,, Idealism—a Critical Survey

[উইস্‌ডম্] Wisdom, J. : Problems of Mind and Matter

[উজ্‌লি] Woozly, A. D. : Theory of Knowledge

[এড্‌ওয়ারড্‌স্ : দর্শনকোষ] Edwards, Paul : The Encyclopedia of Philosophy

[এয়ার (1)] Ayer, A. J. : Language, Truth and Logic

[এয়ার (2)] ,, : The Problem of Knowledge

[এয়ার (3)] ,, : The Foundations of Empirical Knowledge

[ওয়ারনক্] Warnock, M. : Existentialism

[ওয়ালস্ (1)] Walsh, W. H. : Metaphysics

[ওয়ালস্ (2)] ,, : Reason and Experience

[কলিংউড্] Collingwood, R. G. : Idea of Nature

[কানিংহাম্] Cunningham, G. W. : Problems of Philosophy

[গ্রীন্] Green, M. : Existentialism

[চিজ্‌হোম্] Chisholm, R. : Theory of Knowledge

[জোড্] Joad, C. E. M. : Guide to Philosophy

[জোসেফ্] Joseph, H. W. B. : An Introduction to Logic

[টেইলর] Taylor, A. E. : Elements of Metaphysics

[ড্যান্টো] Danto, A. C. : What Philosophy is

[পাউলসেন্] Paulsen, Fr. : Introduction to Philosophy

[পাস্‌মোর] Passmore, J. : A Hundred Years of Philosophy

[পিটারফ্রয়েণ্ড]	Peterfreund, & Denise :	Contemporary Philosophy and its Origins
[পেরি]	Perry, R. B. :	Present Philosophical Tendencies
[প্যাপ্]	Pap, Arthur :	Elements of Analytical Philosophy
[প্রাইস্]	Price, H. H. :	Perception
[ব্লানসারড্ (1)]	Blanshard, B. :	Nature of Thought
[ব্লানসারড্ (2)]	,, :	Reason and Analysis
[ব্রড্]	Broad, C. D. :	The Mind and Its Place in Nature
[ব্রাড্লি]	Bradley, F. H. :	Appearance and Reality
[মূর]	Moore, G. E. :	Philosophical Studies
[ম্যাকনেব্]	Macnabb, D. G. C. :	Hume : His Theory of Knowledge and Morality
[রাইল্ (1)]	Ryle, Gilbert :	The Revolution in Philosophy
[রাইল্ (2)]	,, :	The Concept of Mind
[রাসেল্ (1)]	Russell, B. :	The Problems of Philosophy
[রাসেল্ (2)]	,, :	Human Knowledge : its Scope and Limits
[লিলি]	Lillie, William :	An Introduction to Ethics
[হকিং]	Hocking, W. E. :	Types of Philosophy
[হস্পারস্]	Hospers, J. :	An Introduction to Philosophical Analysis
[হিউম্ (1)]	Hume, David :	Treatise of Human Nature
[হিউম্ (2)]	,, :	An Enquiry Concerning Human Understanding
[হেমলিন্]	Hamlyn, D. W. :	The Theory of Knowledge
[হেয়ার]	Hare, R. M. :	The Language of Morals

পরিভাষা

অক্ষোপাত্ত	—sense-data
অক্ষোপাত্ত বাক্য	—ostensive proposition
অজীবজনি	—abiogenesis
অজ্ঞেয়বাদ	—Agnosticism
অতিগামিতা	—transcendence
অতিবর্তী অহং	—transcendental ego
অতিবর্তী উদ্দেশ্যকারণতা	—transcendental teleology
অদ্বয়তন্ত্র	—monistic system
অদ্বয়বাদ	—Monism
অদ্বৈতবাদ	—Monism
অধিবিদ্যা	—Metaphysics
অধ্যাত্মদ্রব্য	—soul substance
অধ্যাত্মবাদ	—Spiritualism
অনবশ্যম্ভব	—contingent
অন্তর্লীন উদ্দেশ্যবাদ	—Theory of Immanent Teleology
অনবস্থা	—infinite regress
অনুভব	—sensibility
অনুলিপি	—copy
অন্তর্বেদন	—reflection
অন্তর্ভাববাদ	—Theory of Immanence
অপভাস	—false appearance
অবচেতন	—unconscious
অবদমন	—repression
অববর্তিতা	—subsistence
অবভাস	—appearance
অবরোহ তন্ত্র	—deductive system
অবলোহিত	—infra-red
অবশ্যম্ভব	—necessary
অবশ্যম্ভবতা	—necessity
অবাচনিক	—non-propositional
অবাধকতা নীতি	—Law of Non-contradiction
অভিপ্রেত	—intentional

অভিসারী —convergent
অমূর্ত —abstract
অলৌকিক আত্মা —transcendental self
অস্তিত্ববাদ —existentialism
অহংকেন্দ্রিকতা —ego-centric predicament
অহংসর্বস্ববাদ —Solipsism
অসংশোধনীয় —incorrigible
আক্ষরিক অর্থ —literal meaning
আচরণবাদ —Behaviourism
আত্মগত —subjective
আধিবিদ্যক —metaphysical
আনুরূপ্য (বাদ) —correspondence (theory)
আন্তর (সম্বন্ধ) —internal (relation)
আপাতিক —contingent
আবশ্যিক (সর্ত) —necessary (condition)
আবেগ —emotion
আবেগবহ —emotive
আবেগব্যঞ্জক (অর্থ) —emotive (meaning)
আবেগসর্বস্বতত্ত্ব —Emotive Theory
আশ্রিত মূল্য —extrinsic value
আস্রাবণ —decantation
ইন্দ্রিয়ানুভব —sense-experience
ইন্দ্রিয়োপাত্ত —sense-data
ইষ্ট —value
উৎপাদকতত্ত্ব —Generative Theory (of-perception)
উদাসীন —neutral
উদ্দেশ্য কারণতা —teleological causation
উদ্দেশ্য কারণতাশ্রয়ী ক্রমবিকাশ —teleological evolution
উন্মেষধর্মী (ক্রমবিকাশ) —emergent (evolution)
উপকরণ সংস্থানের অভিন্নতা —identity of structure
উপলক্ষবাদ —Occasionalism
উপাত্ত —data
উপাত্ত অতিক্রমণ —transcendence of the data
উপাবভাস —epiphenomenon
উভয়বলতা —ambivalence
এক-এক সম্বন্ধ —one-to-one relation

ঐকান্তিকতা (দোষ) —(fallacy of) exclusive particularity
কূটাভাস —paradox
কেবলবর্তিতা —subsistence
কেলাসন —crystalization
ক্রমবিকাশ —evolution
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ —Interactionism
চক্রকদোষ —circularity
চিৎপরমাণু (চিদণু) —monad
চেষ্টিতবাদ —Behaviourism
ছাপ —impression
জড় —matter
জড়বাদ —Materialism
জাতিবিভেদকঘটিত সংজ্ঞা —definition per genus et differentiam
জীবজনি —biogenesis
জ্ঞানতত্ত্ব (জ্ঞানবিদ্যা) —Epistemology
জ্ঞানীয় অর্থ —cognitive meaning
তত্ত্ববিদ্যা —Metaphysics
তন্ত্র —system
তাদাত্ম্য —identity
তাদাত্ম্য বাক্য —tautology
তাদাত্ম্যবাদ —Identity Theory
তাত্ত্বিক অর্থ —theoretical meaning
তেজস্ক্রিয়তা —radioactivity
ত্বরণ —acceleration
দৃষ্টসত্ত্ববাদ —Positivism
দৃষ্টিবাদ —Empiricism
দ্বিপার্শ্ববাদ —Double-aspect Theory
দ্বৈতবাদ —Dualism
ধর্মসংঘট —character-complex
ধারণা —idea
ধারণাগঠনবাদ —Conceptualism
নামবাদ (নামসর্বস্ববাদ) —Nominalism
নিশ্চিতি —certainty
নির্মধ্যতার সূত্র —Law of Excluded Middle
নির্মধ্যম নীতি —Law of Excluded Middle
নির্জড়ীকরণ —dematerialization

নির্বাচন তত্ত্ব —Selective Theory (of perception)
নির্বিচারবাদ —Dogmatism
নিসর্গবাদ —Naturalism
পরকীয় মূল্য —extrinsic value
পরতসাধ্য (পরতঃসাধ্য) —a posteriori
পরব্রহ্ম —Absolute
পরিচ্ছিন্ন —distinct
পর্যাপ্ত (সর্ত) —sufficient (condition)
পর্যাপ্ত-আবশ্যিক (সর্ত) —necessary-and-sufficient (condition)
পূর্বতসিদ্ধ (পূর্বতঃসিদ্ধ) —a priori
পুরুষবাদ —Personalistic Theory (of mind)
প্রজাতি —species
প্রজ্ঞা —reason
প্রতিচ্ছবি —image
প্রতিপত্তি —implication
প্রতিপাদক —implicant
প্রতিপাদ্য —implicate
প্রতিপাদন করে —implies
প্রতিবস্তু —anti-matter
প্রতিরূপী (বস্তুবাদ) —Representative (Realism)
প্রত্যক্ষ বাক্য —observation statement
প্রত্যক্ষবাদ —Empiricism
প্রত্যয় —concept
প্রয়োগবাদ —Pragmatism
প্রসক্তি তত্ত্ব —Entailment Theory
প্রসঙ্গঘটিত সংজ্ঞা —contextual definition
প্রস্থচ্ছেদ —cross-section
প্রাকৃতদোষ —naturalistic fallacy
প্রাকৃতবাদ —Naturalism
প্রাণবাদ —vitalism
প্রাণবেগ —elan vital
প্রায়োগিক —pragmatic
বংশগতি —heredity
বর্ণালী —spectrum
বস্তুবাদ (বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ) —Realism
বহুতত্ত্ববাদ —Pluralism

বাক্যমণ্ডল	—proposition-system
বাচনিক	—propositional
বিদ্যমানতা	—subsistence
বিমূর্ত	—abstract
বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া	—specific response
বিশ্লেষক	—analytic
বিষয়গত	—objective
বিষয়ী (গত)	—subject (ive)
বুদ্ধি	—understanding
বুদ্ধিবাদ	—Rationalism
বোধশক্তি	—understanding
বৈশ্লেষিকতা	—analyticity
ব্যবহারঘটিত সংজ্ঞা	—definition in use
ব্যবহারবাদ	—Behaviourism
ব্যাপার	—fact
ব্রহ্ম	—Absolute
ভোগসুখবাদ	—Hedonism
মধ্যবিহীনতার সূত্র	—Law of Excluded Middle
মনশ্চিত্র	—mental image
মণ্ডল	—system
মরমিয়া	—mystic
মানসবাদ	—Mentalism
মিথ্যাপ্রতিপাদ্যতা	—falsifiability
মূল্য	—value
মৌল বাক্য	—basic proposition
যাচাইকরণ	—verification
যান্ত্রিক কারণতা	—mechanical causality
রাসায়নিক প্রশমন	—neutralization
লৌকিক অহং	—empirical ego
লৌহযবনিকা তত্ত্ব	—Iron-curtain Theory
সংবেদন	—sensation
সংবেদনশক্তি	—sensibility
সংশ্লেষক	—synthetic
সংসক্তি (বাদ)	—coherence (theory)
সততসংযোগ তত্ত্ব	—Regularity Theory
সবিচারবাদ	—Criticism

সবিচার বস্তুবাদ	—Critical Realism
সমর্থনযোগ্যতা	—confirmability
সমান্তরবাদ	—parallelism
সরলমতি (সরল)	—naive
সহজাত	—innate
সাক্ষাৎকার	—acquaintance
সামান্য দৃষ্টিবাদ	—Concept Empiricism
সামান্য বুদ্ধিবাদ	—Concept Rationalism
সামান্যসত্ত্ববাদ	—Realism (of concepts)
সীমান্ত পরিবেশ	—boundary situation
সৃষ্টিমূলক ক্রমবিকাশ	—Creative Evolution
স্বগতবাক্য	—tautology
স্বজ্ঞা (বাদ)	—intuition (ism)
স্বজ্ঞাগত সামান্যীকরণ	—intuitive induction
স্বতবোধ্যতা (স্বতঃবোধ্যতা)	—self-evidence
স্বতমিথ্যা (স্বতঃমিথ্যা)	—self-inconsistent (self-contradiction)
স্বতসত্য (স্বতঃসত্য)	—tautologous (tautology)
স্বপ্রামান্য	—self-evident
স্ববিরোধী	—self-contradictory
স্বয়ংসৎ বস্তু	—thing-in-itself
স্বাতন্ত্র্য	—freedom (independence)
স্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব	—Theory of Independence
স্বাধীনতা	—freedom
হেতু	—reason